OBJECT LESSONS
(IN BENGALI)
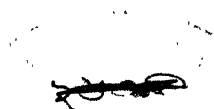
পদার্থ পরিচয়।

BY AGHOR NATH ADHIKARI,
SUPERINTENDENT, NORMAL SCHOOL,
SILCHAR.

প্রকৃতি প্রবেশ

পদার্থ পরিচয়।

বালক বালিকার

অধ্যাপক ও অভিভাবকের

সাহায্যার্থ।

কারসিয়ং ভিক্টোরিয়া ট্রেণিং কলেজ, জব্বলপুর ট্রেণিং ইন্‌ষ্টিটিউসন

ও নাগপুর এগ্রিকাল্‌চারেল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত,

শিলচর নর্ম্মাল স্কুলের বর্ত্তমান সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট

শ্রীঅঘোরনাথ অধিকারী

প্রণীত।

———০———

(প্রথম সংস্করণ—বহু চিত্র সম্বলিত)

———

কলিকাতা

২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীটস্থ ভারতমিহির যন্ত্রে

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

এবং

সান্যাল & কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নভেম্বর, ১৯১২]　　　　[মূল্য দুই টাকা।

হিমালয়ের তুষারাবর্ণাবৃত শৃঙ্গাবলী।

উৎসর্গ

স্বনামধন্য

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল মজুমদার, পি. আর. এস.

(কনট্রোলার অব্ ইণ্ডিয়ান্ ট্রেজারিস্)

উপেন,

আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৌভাগ্য তোমার মত পরম আত্মীয় ও অকৃত্রিম সুহৃদ্ লাভ। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে তোমার অপরিমেয় স্নেহের ঋণ পরিশোধ করিবার সামর্থ্য হইবে না।

তুমি আমাকে যেমন ভালবাস, আমার পুত্রকন্যা ও আত্মীয় স্বজনকেও তদ্রূপ ভালবাসিয়া থাক। আমার এই সামান্য পুস্তক তোমার নামের অযোগ্য হইলেও, তোমার আদর লাভে বঞ্চিত হইবে না—এই বিশ্বাসে ইহাকে তোমার করে সমর্পণ করিলাম।

এই পুস্তকে ভুলভ্রান্তি আছে বলিয়া মনে হয়, কারণ ইহার অনেক প্রবন্ধ কেবল আমার নিজের পর্য্যবেক্ষণের ফল। এইরূপ ভুলভ্রান্তিযুক্ত পুস্তকের সহিত তোমার নাম সংস্পৃষ্ট দেখিলে হয় ত তোমার প্রতিও সাধারণের ভক্তি কমিয়া যাইবে—এই চিন্তায় তোমার নামে উৎসর্গ করিতে প্রথমে একটু ভয় হইয়াছিল। কিন্তু শেষে দেখিলাম ভয় করা বৃথা, কারণ সাধারণে তোমার বিদ্যাবুদ্ধিও জানে আর আমার বিদ্যাবুদ্ধিও জানে এবং এই উভয়ের পার্থক্যও জানে। ইতি তারিখ ১লা আশ্বিন, ১৩১৯।

তোমার

অঘোর।

নিবেদন।
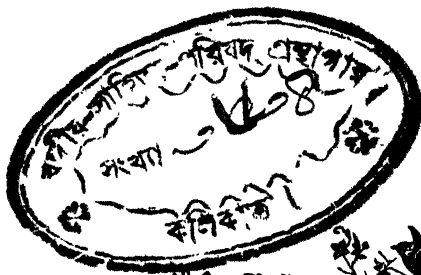
গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য।—পদার্থপরিচয় শিক্ষাদান বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর একটী প্রধান অঙ্গ। কিন্তু এ বিষয় শিক্ষাদানের উত্তমরূপ ব্যবস্থা হইতেছে না। ইহার প্রধান কারণ পুস্তকের অভাব। পদার্থ দেখাইয়া পদার্থপরিচয় শিক্ষা দিতে হইবে—ইহাই নিয়ম বটে। কিন্তু যে সকল শিক্ষক বাল্যকালে পদার্থপরিচয় বিষয়ে নিজেরা কোনরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহাদিগের নিকট পদার্থপরিচয়ের শিক্ষাদান আশা করা বৃথা, কারণ তাঁহারা বিষয় ও পদ্ধতি উভয় সম্বন্ধেই সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বিজ্ঞানাদিতে সামান্য পরিমাণ জ্ঞান থাকিলে পদার্থপরিচয় শিক্ষাদান সমধিক সহজ হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদিগের দেশে প্রাথমিক ও মধ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সে জ্ঞানেরও অভাব। তারপর বাঙ্গলায় বিজ্ঞান বিষয়ক সহজ সহজ পুস্তক থাকিলেও কিছু সুবিধা হইতে পারিত—শিক্ষকগণ নিজের চেষ্টাতে অনেক বিষয় শিখিয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু সে বিষয়েরও অপ্রতুল। এমত অবস্থায় ছাত্র-শিক্ষকগণের অনুরোধে 'পদার্থ-পরিচয়' মুদ্রিত করিতে হইল। ইহাতে অন্য কাহারও কোনরূপ উপকার হইবে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমার ছাত্রগণের যে বিশেষ উপকার হইবে ইহা আমার বিশ্বাস।

বিলাতের প্রায় বিদ্যালয়ই বোর্ডিং স্কুল। অভিভাবকগণ শিক্ষকগণের হস্তে পুত্র কন্যার সম্পূর্ণ ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। কিন্তু আমাদিগের অবস্থা ভিন্নরূপ। এখানে অধিকাংশ বিদ্যালয়ই ডে-স্কুল। সুতরাং কেবল শিক্ষকগণের উপর ভার দিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। অভিভাবককেও শিক্ষাকার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতে হয়। কিন্তু ইংরাজী অনভিজ্ঞ অভিভাবকের সাহায্যার্থে কোন পুস্তক নাই। এই পুস্তকের দ্বারা সেই অভাব কথঞ্চিৎ পূর্ণ হইলে কৃতার্থ হইব।

পদার্থ পরিচয় শিক্ষা প্রচলনের ইতিহাস।—আমাদিগের দেশে এইরূপ শিক্ষাদানের কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল কি না, এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে তাহা বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় নাই। বুদ্ধদেব-চরিত পাঠে জানা যায় যে বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহাকে, তাঁহার ভাবী শ্বশুরের নিকট নানা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। সেই পরীক্ষায় তিনি অন্যান্য প্রতিযোগী পরীক্ষার্থীর সহিত নিম্নলিখিত বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন :—

"উল্লঙ্ঘন, সর্ব্বাগ্রে গমন, লিখন, মুদ্রা, গণনা, সংখ্যাবধারণ, সাঙ্গস্ত ধনুর্ব্বেদ, ধাবন, উল্লম্ফন, সন্তরণ, বাণনিক্ষেপ, হস্তীগ্রীবারোহণ, অশ্বারোহণ, রথারোহণ, ধনুর্নির্ম্মাণ, ধ্বজেস্থৈর্য্য, সামর্থ্য, শৌর্য্য, বাহুব্যায়াম, অঙ্কুশগ্রহ, পাশগ্রহ, যানের উর্দ্ধ ও অধোভাগ দিয়া গমন, মুষ্টিবন্ধ, শিখাবন্ধ, ছেদ্য, ভেদ্য, তরণ, আস্ফালন, অক্ষুণ্ণবেধিত্ব, মর্ম্মবেধিত্ব, শব্দবেধিত্ব, দৃঢ়প্রহারিত্ব, অক্ষক্রীড়া, কাব্য, ব্যাকরণ, গ্রন্থরচনা, রূপ, রূপকার্য্য (চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি), অধ্যয়ন, অগ্নিকার্য্য (আতসবাজী প্রস্তুত করণ), বীণাবাদন, নৃত্য, গীত, বাদ্য, আখ্যানকথন, হাস্য, পরিহাস, স্ত্রীনৃত্য, নাট্য, অনুকরণ, মাল্যগ্রন্থন, সংবাহন, মণিরাগ, বস্ত্ররাগ (বস্ত্র রঞ্জিত করা), ইন্দ্রজাল, স্বপ্নাধ্যায়, কাকচরিত্র, স্ত্রী লক্ষণ, পুরুষ লক্ষণ, অশ্ব লক্ষণ, হস্তী লক্ষণ, গো লক্ষণ, অজ লক্ষণ, মিশ্রিত লক্ষণ, কৈটভেশ্বর লক্ষণ, নিঘণ্ট, নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, বেদ, নিরুক্ত, শিক্ষা, ছন্দ, যজ্ঞকল্প, জ্যোতিষ, সাংখ্য, যোগ, ক্রিয়াকলাপ, বৈশেষিক, বেশিক (বেশ ভূষাদি রচনা), অর্থবিদ্যা, বার্হস্পত্য, আশ্চর্য্য বিদ্যা, অসুর বিদ্যা, মৃগপক্ষীর শব্দজ্ঞান, হেতু বিদ্যা, যতুযন্ত্র, ঋতুবস্ত্র, মধুচ্ছিষ্টকৃৎ (মোমের পুতুল গঠন), সূচীকার্য্য।" (সাধু অঘোরনাথ কৃত শাক্যমুনি চরিত হইতে)

বর্ত্তমান কালে (ইংরাজ যুগে) সাধারণ শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, পূর্ব্ব কালে এই দেশেই যে ইহা অপেক্ষা উন্নততর প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল, তাহা এই পরীক্ষার বিষয় দৃষ্টে বেশ বুঝিতে পারা যায়। বিবাহের সময় বুদ্ধদেবের বয়স ২০ বৎসরের অধিক ছিল না। সুতরাং এইরূপ শিক্ষা যে অতি বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। তারপর এই পরীক্ষায় যখন বুদ্ধদেবকে অন্যান্য পরীক্ষার্থীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইয়াছিল, তখন ইহাও অনুমান করা অন্যায় নহে যে কেবল ব্যক্তি বিশেষের শিক্ষার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল না। যাহা হউক, যাহা নাই তাহা ভাবিয়া লাভ কি?

পদার্থ পরিচয়ের বর্ত্তমান প্রণালী, ইউরোপীয় প্রণালী। সর্ব্বপ্রথমে ফরাসী পণ্ডিত রুসো[১] (জন্ম ১৬৯৫ খৃঃ) পদার্থ পরিচয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন। শিক্ষাদানে

যে বালকগণকে কেবল শব্দই শিখান হয়—বিষয় শিখান হয় না, এই দোষ তিনিই প্রথমে প্রদর্শন করেন। ইহার পর [illegible] কোমিনিয়াস (১৬১২) সুইটজারলণ্ডের শিক্ষা-বিভাগ পরিচালনার জন্য এই বিষয়ের উত্তমরূপ আলোচনা করেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ অনুসারেই আজ পর্য্যন্ত পদার্থ পরিচয় শিক্ষা পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। নিম্নে তাঁহার উপদেশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল :—

"In the place of dead books, why should we not open the living book of Nature? ......To instruct the young is not to beat into them by repetition a mass of words, phrases, sentences and opinions gathered out of authors; but it is to open their understanding through things......*We must offer to the young, not the shadows of things, but the things themselves,* which impress the senses and the imaginations. Instruction should commence with a real observation of things, and not with a verbal description of them." ইহার পর ১৭২৮ খৃঃ ফরাসী পণ্ডিত রোলিন এ বিষয়ে পুনরালোচনা করেন। পদার্থ পরিচয় ও বিজ্ঞান শিক্ষার পার্থক্য তিনি এইরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন :—"I call *children's physics* a study of nature which requires scarcely anything but eyes and which for this reason is within the reach of all sorts of persons and even of children. It consists in making ourselves attentive to the objects which nature presents to us, to consider them with care, and to admire their different beauties, but without searching into their secret causes, which comes within the province of the physics of the scientist. I say that even children are capable of this, for they have eyes, and are not wanting in curiosity. They wish to know; they are inquisitive. It is only necessary to awaken and nourish in them the desire to learn and to know, which is natural to all men. This study, moreover, if it may be so called, far from being painful and tedious, affords

only pleasure and amusement" ইহার পর ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পণ্ডিত রূশো তাঁহার 'এমিলি' নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করেন। তাঁহারও দুই একটী উপদেশ বাক্য উদ্ধৃত হইল :—"Do not give your pupil any kind of verbal lesson ; he should recieve none save from experience. The most important, the most useful rule in education is, not to gain time, but to lose it...State questions within his comprehension and leave him to solve them for himself. For the body as for the mind, the child must be left to himself."

তৎপর সুইটজরলণ্ডের পেসটালটসী ও জর্ম্মণীর ফ্রোবেল এবং হারবার্ট নানারূপ নূতন বিধানের ব্যবস্থা করিয়া এই বিষয় শিক্ষাদানের প্রণালী উন্নততর করিয়াছেন।

৺ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় 'বস্তু বিচার' নামক যে পুস্তক রচনা করেন, তাহাই বোধ হয় বাঙ্গালায় পদার্থ পরিচয় বিষয়ক প্রথম পুস্তক।

পুস্তকের বিষয়।—আমি বিশেষ কোন পাঠ্যতালিকার অনুসরণ করি নাই। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জর্ম্মণী ও জাপানের কয়েকখানি পাঠ্যতালিকার সহিত আমাদিগের নানা প্রদেশের পাঠ্যতালিকা মিলাইয়া একটা নূতন তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি এবং আমি নিজে যে প্রণালীতে কার্য্য করিয়া ফললাভ করিয়াছি, ইহাতে সেই প্রণালীরই আভাস প্রদান করিয়াছি। তবে সাধারণতঃ পদার্থ পরিচয়ের পাঠ্যতালিকায় যে সমস্ত বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, এ গ্রন্থে তাহার প্রায় বিষয়ই আছে। আর বিশেষ কথা এই যে পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানে কোন নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করা না করা যখন শিক্ষকের স্বেচ্ছাধীন, তখন কোন বিশেষ পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করা কর্ত্তব্যও মনে করি নাই। শিক্ষক নিজের সুবিধা মত এক শ্রেণীর পাঠ্য অন্য শ্রেণীতেও পড়াইতে পারেন; কেবল বালকের বয়স বিবেচনায় বিষয়টীকে শক্ত বা সহজ করিয়া লইতে হইবে। বিড়াল, কুকুর, গোরু, ঘোড়া, মাকড়সা প্রভৃতি বিষয়ক পাঠ, তৃতীয় ও চতুর্থ উভয় প্রকরণেই প্রদত্ত হইয়াছে; তৃতীয় প্রকরণে সহজ বর্ণনা, চতুর্থ প্রকরণে কিঞ্চিৎ শক্ত—ইহাই পার্থক্য।

গঙ্গা আমাদিগের প্রধান নদী আর কলিকাতা আমাদিগের প্রধান নগর। এই দুই বিষয় কোন পাঠ্যতালিকা ভুক্ত না থাকিলেও ইহাদিগের বিষয় আলোচনা কর্ত্তব্য। ভারতের হিমালয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে জগতে অদ্বিতীয়; আর ভারতের তাজমহল, শিল্প

সৌন্দর্য্যে জগতে অতুলনীয়। সুতরাং এই দুইটী বিষয়কেও পাঠ্যতালিকা ভুক্ত করা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি।

প্রকৃতি পরিচয় (Nature Study) পদার্থ পরিচয়ের (Object Lessons) অন্তর্গত। প্রকৃতি পরিচয়ে কেবল বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয়ের আলোচনা থাকে; পদার্থ পরিচয়ে এ সকল ত থাকেই, তাহার উপর ঘর, বাড়ী, রেল, ষ্টীমার, বাজার, তাজমহল প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পদার্থের বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময় 'প্রকৃতি পরিচয়' ও 'পদার্থ পরিচয়' একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

ইংরাজী পুস্তকে পদার্থপরিচয় শিক্ষার পদ্ধতি ও ধারা বিষয়ে নানারূপ শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রথম আদানের ধারা (Eliciting or Questioning Method) অর্থাৎ বিষয় সম্বন্ধে বালককে এরূপ প্রশ্ন করিতে হইবে যে বালক যেন সেই প্রশ্ন শুনিয়াই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং অনুসন্ধান করিয়া প্রশ্নের উত্তর দেয়। এই ধারা অনুসারে শিক্ষা দানে বালকগণকে কোনরূপ প্রশ্ন করিবার সুযোগ প্রদান করা হয় না, কারণ বালকেরা প্রশ্ন করিতে জানে না অথবা এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, যাহার কোনরূপ উত্তর হয় না। ["বিড়াল কথা বলিতে পারে না কেন?" কি উত্তর দেবে?] নিম্ন শ্রেণীর অধিকাংশ পাঠেই এই ধারা অবলম্বন করিতে হইবে। উচ্চ শ্রেণীতে কথোপকথনের ধারা অবলম্বন করা যাইতে পারে। ষষ্ঠ প্রকরণে 'হিমালয়' পাঠে কথোপকথনের ধারার (Conversation Lesson) দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। পদার্থ পরিচয়ের এক রকম পাঠকে 'চিত্রে পাঠনা' (Picture Lesson) বলে। ইহাতে চিত্র দেখাইয়া তাহার বিষয় বর্ণনা করিতে হয়। ষষ্ঠ প্রকরণের 'তাজমহলের' পাঠ এই শ্রেণীর। মানচিত্র পরিচয় ও নক্সা পরিচয়—চিত্র পরিচয়ের প্রকারভেদ। ষষ্ঠ প্রকরণের 'অষ্ট্রেলিয়া' বিষয়ক পাঠ 'প্রদানে পাঠনার' (Information Lesson) দৃষ্টান্ত। এই পাঠে প্রদানের ধারা (Telling Method) অবলম্বনীয়। ষষ্ঠ প্রকরণের অনেক পাঠই এই শ্রেণীর। পঞ্চম প্রকরণের 'গঙ্গা' ও 'কলিকাতা' বিষয়ক পাঠও 'প্রদানে পাঠনার' দৃষ্টান্ত। তবে শিক্ষকগণ নাম লইয়া ব্যস্ত হইবেন না। নাম যাহাই হউক, শিক্ষা সুসম্পন্ন হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

পুস্তকে যে সকল চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কেবল শিক্ষকের সাহায্যার্থ। ব্ল্যাকবোর্ডে যেরূপ চিত্রাঙ্কণ করিতে হইবে, তাহাই প্রদর্শন করা এই সকল চিত্রের উদ্দেশ্য।

কৃতজ্ঞতা।—আমি অনেক ইংরাজী পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি বটে কিন্তু কোন পুস্তকেরই অনুসরণ করি নাই। তবে Chatty Object Lessons (Longmans

and Green) এবং Murche's Object Lessons in Science (Macmillan) নামক পুস্তকদ্বয়ের নিকট বিশেষ ঋণী। অনেক চিত্রের পরিকল্পনা এই দুই পুস্তক হইতে গৃহীত। 'জন্মদিনের বাজার' শীর্ষক কবিতা অনৈক মহিলার রচনা।

পুস্তকে অনেক ভুল-ভ্রান্তি আছে বলিয়া মনে হয়। বলা বাহুল্য যে এই সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী পাঠকগণ ভ্রম।ক্রটি প্রদর্শন করিলে অনুগৃহীত হইব।

আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান্ বনমালী শ্যাম এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন ও সান্ন্যাল এণ্ড কোম্পানীর অধ্যক্ষ স্নেহভাজন শ্রীমান্ বিজয়কুমার মৈত্রেয় ইহার মুদ্রাঙ্কণের তত্ত্বাবধান করিয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

শিলচর
তাং ১লা মে, ১৯১২

নিবেদক
শ্রীঅঘোরনাথ অধিকারী

নবীন শিক্ষকের প্রতি উপদেশ।

বুঝিতে পারুন বা নাই পারুন, পুস্তকখানির প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত একবার পড়িয়া যান। দ্বিতীয়বার পাঠ করিবার সময় দেখিতে পাইবেন যে অনেক বিষয় সহজ হইয়া গিয়াছে। তারপর যখন যে বিষয়ে পাঠ দিতে হইবে, কেবল সেই বিষয়টী সময়মত উত্তমরূপে পড়িয়া প্রস্তুত হইবেন।

উপক্রমণিকা।

প্রথম প্রকরণ।

(৪।৫।৬ বৎসরের শিশুগণের জন্য)

দ্বিতীয় প্রকরণ।

(৬।৭।৮ বৎসরের বালকবালিকার জন্য)

তৃতীয় প্রকরণ।

(৮।৯।১০ বৎসরের বালকবালিকাদিগের জন্য)

চতুর্থ প্রকরণ।

(৯।১০।১১ বৎসরের বালকবালিকাদিগের জন্য)

পঞ্চম প্রকরণ।

(১০ ১১।১২ বৎসরের বালকবালিকার জন্য)

ষষ্ঠ প্রকরণ।

(১১।১২।১৩ বৎসরের বালকবালিকাদিগের জন্য)

উপসংহার।

পরিশিষ্ট।

প্রকৃতি প্রবেশ

পদার্থ পরিচয়।

"Out on Your Idle Words! Give Us Things! Things!"

—*Rabelais*

উপক্রমণিকা।

"আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্।"

উদ্বোধন।—বণিক বিদেশে। অনেক দিন চিঠি পত্রাদি নাই। বণিক পত্নী চিন্তিত হইয়া প্রতিবাসী ভট্টাচার্য্য পুত্রের নিকট উপস্থিত—"ঠাকুরপো, আমায় একখানা পত্র লিখে দেবে? অনেক দিন ওঁর কোন খবর পাই না।" [এ যে কালের কথা, সে সময়ে ব্রাহ্মণ চণ্ডালে জাতিগত পার্থক্য থাকিলেও একটা স্নেহগত সম্পর্ক থাকিত।] ঠাকুরপো তখনই দোয়াত, কলম, কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলেন "বল, কি লিখ্‌তে হবে।" বণিক পত্নীর বক্তব্য শেষ হইলে ভট্টাচার্য্য-পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ বৌ দিদি, তোমার পত্র পদ্যে লিখ্‌ব না গদ্যে লিখ্‌ব?" [সেকালে পত্রাদি পদ্যে লেখাও রীতি ছিল—বিশেষতঃ স্বামীস্ত্রীর পত্র।] বণিক-পত্নী উত্তর করিলেন "এই দশজনে যেমন ক'রে লেখে তাই লেখ।"

ভট্টাচার্য্য-পুত্র।—দশজনে ত পদ্যেও লেখে গদ্যেও লেখে।

বণিক-পত্নী।—তবে তুমিও তাই লেখ।

ভট্টাচার্য্য-পুত্র।—মুখ্যুকে বোঝান দায়। বলি একি তোমার বেণেতী মস্লা যে পাঁচফোড়ন মিশিয়ে সম্ভারা দেব? হয় তোমার চিঠি পদ্যে লিখ্‌তে হবে না হয় গদ্যে লিখ্‌তে হবে—মিশিয়ে লেখা যায় না। এখন বল গদ্যে না পদ্যে?

বণিক-পত্নীর অভিমান হইল—"বুঝেছি ভাই, আমি মুখ্যুসুখ্যু বলে তুমি সংস্কৃমিরি (সংস্কৃত) দিয়ে আমায় ঠাট্টা কচ্ছ। তোমার ভাই পত্র লিখে কাজ নাই, আমি চল্লেম।

ভট্টাচার্য্য-পুত্র—আ ছিঃ বৌ দিদি, রাগ কর্‌লে। আমি তোমাকে বুঝিয়ে বল্লেই তুমি বুঝবে। এই যে রামায়ণ মহাভারত শুনে থাক, সে সব যেমন করে লেখা, তাকে বলে পদ্য; আর তুমি আমি যেমন করে কথা বলি তাকে বলে গদ্য।

বণিক-পত্নী।—ও হরি! এর নাম গদ্য পদ্য। আমি যে গদ্যে কথা বলি তা ত এতদিন জানতেম না। আমি মনে করেছিলাম তুমি বুঝি তোমার ব্যাকরণ ট্যাকরণের কি একটা ভয়ানক কথা বলে আমাকে ঠাট্টা কচ্ছ।

যাহা হউক, পত্রখানি শেষে গদ্যে লেখা হইল কি পদ্যে লেখা হইল, তাহা আমাদিগের জানিবার আবশ্যকতা নাই—কথা এই যে 'পদার্থ পরিচয়' নাম শুনিয়াই কেহ বণিক-পত্নীর মত রাগ করিয়া চলিয়া যাইও না। ভিতরে প্রবেশ কর, দেখিবে যাহা মনে করিয়া ভয় পাইতেছ তাহা নহে। "আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্"—যাহাকে অগ্নি বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, তাহা অগ্নি নহে, স্পর্শের যোগ্য রত্ন। তোমার পরিচিত পদার্থ ও তোমার পরিচিত বিষয় ছাড়া ইহাতে অন্য কোন অদ্ভুত বিষয়ের আলোচনা করা হয় নাই। দুই একটি নাম নূতন হইতে পারে কিন্তু বিষয় নূতন নহে।

আমার একথা বলিবার একটা হেতু আছে। যখন বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত পেড্‌লার সাহেব 'পদার্থ পরিচয়' শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া নূতন পাঠ্য তালিকা প্রকাশ করেন, তখন অনেকেই চমকিয়া উঠিয়াছিলেন—"কি সর্ব্বনাশ! ৫।৭ বৎসরের ছেলে, পড়্‌বে কিনা উদ্ভিদ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা!!!" কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই সে পাঠ্য তালিকার শিরোনাম ভিন্ন অন্য অংশ পড়িয়া দেখিলেন না। "গাছের এই অংশকে মূল, এই অংশকে কাণ্ড ও এই অংশকে পত্র বলে"—এই ত হ'ল উদ্ভিদবিদ্যা, আর "লবণ জলে গলিয়া যায়, বালি গলে না"—এই ত হল রসায়ন। এইরূপ অনেক বিষয়ের নাম শুনিয়াই আমরা ভয়ে পলায়ন করি, সাপ কি বেঙ তাহা ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি না। পেডলার সাহেবের সেই পাঠ্য তালিকা ভীষণ বিজ্ঞান বিজড়িত বলিয়া সকলে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কাজেই তাহার নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল—পূর্ব্ব তালিকা নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য বেশী দিন চলিল না।

পদার্থ পরিচয় কাহাকে বলে? তবে কি 'পদার্থ পরিচয়' বিজ্ঞান? 'পদার্থ পরিচয়' বিজ্ঞানশিক্ষার প্রারম্ভ হইতে পারে, কিন্তু 'পদার্থ পরিচয়' বিজ্ঞান নহে। বিজ্ঞান শিক্ষাদানে বিষয়ের পর বিষয়গুলি যে শৃঙ্খলাক্রমে শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানে সে শৃঙ্খলা অনুসরণ করা হয় না। বিজ্ঞান একটী বিশেষ বিষয় ধরিয়া, সেই বিষয়ের সমস্ত তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়; পদার্থ পরিচয় চতুর্দ্দিকস্থ সাধারণ পদার্থের সাধারণ পরিচয় পাইয়াই ক্ষান্ত হয়। বিজ্ঞানশিক্ষায় নানারূপ যন্ত্র ও নানারূপ আরকের আবশ্যকতা হয়, পদার্থ পরিচয় শিক্ষার যন্ত্র বালকের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, আর আরক বালকের পর্য্যবেক্ষণ লিপ্সা। কোনরূপ বিশেষ সূত্রের দ্বারা পদার্থ পরিচয়ের বিষয় ব্যাখ্যা করা শক্ত। 'পদার্থ পরিচয়'—পদার্থের পরিচয়—ইহাই ইহার সাধারণ সূত্র। যে সকল পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি আমাদিগের নিত্য সহচর, যে সকল বৃক্ষ লতা তৃণাদি আমাদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য, যে সকল প্রাকৃতিক ঘটনা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষের বিষয়, সে সমস্ত পদার্থ ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে সুখে বসবাসের ব্যাঘাত ঘটে। সকল বালক বালিকাই যে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কলেজের বিজ্ঞানাগারে প্রবেশ করতঃ

এ সকল বিষয়ের বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে ইহা আমরা আশা করিতে পারি না। কিন্তু এ সকল বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকাও আবার সকল বালক বালিকার পক্ষেই নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপ জ্ঞান উপার্জ্জনের পথ প্রদর্শন করাই পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের প্রধান কার্য্য। আর যদি এইরূপ শিক্ষাদানকে কেহ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকারভেদ বলিয়া মনে করেন, তবে তাহাতেই বা আপত্য কি? বিজ্ঞান বিনা যে জাতীয় উন্নতি কিছুতেই সম্ভবপর নয় তাহা কি এখনও বুঝিবার বাকী আছে?

পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য কি?— বালকের হৃদয়ে জ্ঞানার্জ্জন ইচ্ছা ও পর্য্যবেক্ষণ লিপ্সার বীজ রোপণ করা। পর্য্যবেক্ষণ শক্তি জাগ্রত ও উন্নত না হইলে, প্রকৃতি ও পদার্থের কার্য্যকলাপ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। এই প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ ফলেই আমরা সাংসারিক সুখের সমস্ত উপকরণ লাভে সমর্থ হইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল বিমান বিহারের যন্ত্রাদি নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা বিহঙ্গমগণের পক্ষ নির্ম্মাণ কৌশল পর্য্যবেক্ষণের ফল।* উদ্ভিদের পরপরাগ সঙ্গমে বীজের অধিকতর পুষ্টি সাধিত হয় দেখিয়া মানব সমাজ স্বগণ বা স্বগোত্র বিবাহ পরিত্যাগ

---

* বিমান বিহারের যন্ত্রাদি এখনও উত্তমরূপ কার্য্যোপযোগী হয় নাই। পতঙ্গাদির পক্ষ নির্ম্মাণ কৌশল পরীক্ষা করা হইতেছে:—

A study of the balooning powers of flying insects by Dr. Jousset Belleme in "La Nature":—Dr. Belleme's observations began with the Diptera, so called because of their two winged structure not unlike that of the Bleriot monoplane. But the Diptera carry besides their evident wings a little apparatus which represents the omitted second pair. They consist of two little rigid stalks ending in a rounded button, and are situated between the thorax and the abdomen. Numerous experiments made with regard to these organs, which are descri-

করিয়াছে। নাগা, কুকী প্রভৃতি অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে যাইবার নিমিত্ত দোলায়মাণ সেতু নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কে তাহাদিগকে এ কৌশল শিখাইয়া দিল। ক্ষুদ্রকীট ঊর্ণনাভ। ঊর্ণনাভ এক বৃক্ষ হইতে সূত্র উড়াইয়া দিল; সেই সূত্র বায়ুভরে দূরস্থিত অন্য বৃক্ষে সংলগ্ন হইল। সেই সূত্রের উপর গতায়াত করিয়া ঊর্ণনাভ বৃহৎ জাল প্রস্তুত করিয়া বসিল। কীটের এই কৌশল দেখিয়া এক নাগা এক পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ঘুড়ি উড়াইয়া দিল ও সেই ঘুড়ি দূরস্থিত অন্য পর্ব্বতশৃঙ্গে সংলগ্ন করিল। এই দ্বিতীয় শৃঙ্গ হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি সূত্র টানিতে আরম্ভ করিল। সূত্রের সঙ্গে প্রথমে সরু দড়ি সংলগ্ন করা হইল। তারপর ক্রমেই স্থূল হইতে স্থূলতর রজ্জু, শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বেতের ও বাঁশের অপূর্ব্ব দোলায়মান সেতু নির্ম্মিত হইল। যে আবিষ্কারে বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, সেই

---

bed as balancers, have convinced Dr. Belleme that if the insect is deprived of them it does not lose the power of flight, but it cannot properly preserve its direction, especially when descending, and when it therefore attempts to execute a "volplane" it almost certainly turns over. The flies, after experiencing the curious sensation of turning a somersault and alighting on their backs, presently relinquished the attempt to fly, and contented themselves with walking. If, however, forgetting, they ever attempted to resume their flying habit, the result was always the same. Dr. Belleme goes on to point out that, in order to guarantee stability in flight, it is important that, by some mechanism or other the centre of gravity should be immediately below or beneath the axis of suspension, that is to say, the wings should be able instantly to return there if displaced. In the case of the Diptera, where the centre of gravity is fixed, this requirement is fulfilled by the balancers; in the case of the Hymenopetra the centre of gravity is movable, owing to the facile movements of the legs and the inflections of the abdomen.

মাধ্যাকর্ষণশক্তি কিরূপ আবিষ্কৃত হইয়াছিল? বৃক্ষ হইতে একটী আপেল ফলের পতন দর্শনে। যে রেল ষ্টিমার প্রভৃতি গমনাগমনের ও বাণিজ্যের এত সুবিধা করিয়া দিয়াছে, সেই সকল বাষ্পযন্ত্র আবিষ্কারের মূল কোথায়? রন্ধন কালে রন্ধন পাত্র মুখস্থিত সরাবের নৃত্য দর্শন। যে জল বিহারিণী টরপেডো তরণী জল যুদ্ধের প্রধান অবলম্বন, তাহার নির্ম্মাণ কৌশল মিন দেহের গঠন পর্য্যবেক্ষণের ফল। প্রকৃতিই আমাদিগের প্রধান শিক্ষার স্থল। প্রকৃতির প্রকৃতি উত্তমরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে শিখিলে যেরূপ জ্ঞানলাভ হয়, সহস্র সহস্র গ্রন্থ পাঠে তাহার কণিকামাত্রও লাভ হয় না। একটি ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকার মধুচক্র দেখ—কত যে শিখিবার বিষয় আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

পাঠকের কৌতুহল নিবারণার্থ মধুচক্র নির্ম্মাণ কৌশলের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। কোন একটী গৃহের অভ্যন্তর যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের দ্বারা পূর্ণরূপে আবৃত করিতে হয় তবে তিন প্রকার ক্ষেত্রের দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারে; সমবাহু চতুর্ভুজ, সমবাহু ত্রিভুজ ও সমবাহু ষড়ভুজ। অন্য কোন প্রকার ক্ষেত্রের দ্বারা এই কার্য্য সম্ভবপর হয় না। অন্য কোন প্রকার ক্ষেত্রের দ্বারা আবৃত করিতে গেলে ক্ষেত্রের সংলগ্ন স্থানে ফাক থাকিয়া যাইবে। আর এই তিন ক্ষেত্রের মধ্যে সমবাহু ষড়ভুজের ব্যবহারই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। কারণ এই ক্ষেত্রের কোণগুলি প্রশস্ত—এই ষড়ভুজ ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে বৃত্তাকার ক্ষেত্র স্থাপন করিলে ষড়ভুজের কোণে কোণে খুব কম স্থানই পড়িয়া থাকে। আবার এই তিন ক্ষেত্রের মধ্যে ষড়ভুজ ক্ষেত্রেরই সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় গঠন। ইহার বহির্ভাগ বা অন্তর্ভাগ হইতে ক্ষেত্রের বাহুর উপর চাপ দিলে বাহু সহজে নমিয়া পড়িবে না কারণ ষড়ভুজের বাহু বিন্যাস অনেক পরিমাণে বৃত্তচাপ বা খিলানের মত। বৃত্তাকার ক্ষেত্রের চাপসহন শক্তি ষড়ভুজ অপেক্ষা অধিক বটে কিন্তু বৃত্তাকার ক্ষেত্রের দ্বারা কোন স্থান আবরণ করিতে গেলে বৃত্তসমূহের পরস্পর সংলগ্ন স্থানে যথেষ্ট ফাক থাকিয়া যায়। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষড়ভুজের দ্বারা ক্ষেত্র রচনা করিলে ক্ষেত্রগুলি গায় গায় লাগিয়া এরূপ সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত হয় যে কোথাও একটুও ফাঁক থাকে না। সুতরাং ষড়ভুজে দুই গুণই আছে। এইজন্য মধুমক্ষিকা তাহার চক্রের কক্ষগুলি ষড়ভুজাকৃতি করিয়া প্রস্তুত করে। স্বল্প

উপকরণে, স্বল্প সময়ে, সমস্ত স্থান পূর্ণ করিয়া সুদৃঢ়রূপে কক্ষ নির্ম্মাণ করিতে হইলে এইরূপ ক্ষেত্র ভিন্ন আর কোনরূপ সুবিধাজনক ক্ষেত্র কল্পনা করা যায় না। এই ত গেল মধুচক্রের কক্ষ প্রাচীরের কথা—ইহার ছাদ ও মেজেও খুব দৃঢ়ভাবে গঠিত। গণিত শাস্ত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে তিনটি সমতল-চতুর্ভুজ এক বিন্দুতে মিলিত করিয়া যে সকল ছাদ বা মেজে নির্ম্মাণ করা হয়, তাহারা যেমন সুদৃঢ় হইয়া থাকে আর কোনরূপ গঠন তদ্রূপ সুদৃঢ় হয় না। এই তিনটি চতুর্ভুজের মিলন স্থানে যে কোণ উৎপন্ন হইবে তাহার এমন একটা বিশেষ অবস্থা আছে যে কেবল মাত্র সেই অবস্থাতেই সমস্ত ক্ষেত্রটি সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় হইতে পারে ও সর্ব্বাপেক্ষা কম উপকরণে নির্ম্মিত হইতে পারে। মধুমক্ষিকা এরূপ ভাবে তিনটি চতুর্ভুজ ক্ষেত্র মিলিত করিয়া কক্ষের ছাদ ও মেজে নির্ম্মাণ করে যে সেই মিলিত বিন্দুতে উচ্চ বীজগণিত নির্দ্দিষ্ট ঠিক সেই কোণটিই * উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্বয়ং নিউটন যে মীমাংসা করিতে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, উচ্চ বীজগণিতের সেই জটীল সমস্যা একটী ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকা সমাধান করিতেছে—ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চর্য্য বিষয় হইতে পারে?

মৌমাছির চক্র-নির্ম্মাণ প্রক্রিয়া যে কি প্রকার অদ্ভুত তাহা এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতেই কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইবে। কিন্তু মৌমাছি যে ইহা অপেক্ষাও অত্যদ্ভুত কাণ্ড সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহা এ পর্য্যন্ত মানব বুদ্ধির অগোচর। মানুষ বুদ্ধির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেশের পশু-পক্ষী বা বৃক্ষলতার পরস্পর মিলনে উন্নত হইতে উন্নততর জীব বা উদ্ভিদ উৎপন্ন করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু মানুষ সহস্র কৌশল করিয়াও জন্মপ্রাপ্ত জীবের পুরুষত্বের বা স্ত্রীত্বের কোনরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতে পারে নাই। মৌমাছি এই অভাবনীয় ব্যাপার সংসাধন করিয়া থাকে।

মৌচক্রে তিন প্রকার মাছি থাকে। একটি মাদী মাছি (ইংরাজীতে ইহাকে Queen

---

* কোণিণ ও ম্যাকলরিণ নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন যে এই মিলিত বিন্দুতে স্থূল কোণটি ১০৯°২৮′ ও সূক্ষ্ম কোণটি ৭০°৩২′ হইলে খুব কম উপকরণ ও কম পরিশ্রমে ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। মারাল্ডি নামক অপর একজন বৈজ্ঞানিক মৌচক্র কক্ষের অভ্যন্তরে এই কোণ মাপিয়া দেখিয়াছেন যে স্থূল কোণটি প্রায় ১১০° আর সূক্ষ্ম কোণ ৭০°। মরদমাছার কক্ষগুলি প্রস্থে ৫/১৮ ও অন্যান্য মাছির কক্ষ প্রস্থে ১/৫ ইঞ্চ। কোণের ও কক্ষের এই মাপ সকল দেশে ও সকল সময়ে ঠিক একরূপ।

bee বলে), প্রায় দুই শত মর্দ্দা মাছি (Drone bee) আর সহস্র সহস্র মজুর মাছি (Worker bee)। মজুর মাছি ক্লীব। মাদী মাছিটি যদি হঠাৎ মরিয়া যায় তবে মাছিগুলি—যে পলু হইতে মজুর মাছি উৎপন্ন হইবে—তাহারই একটা পলু বাছিয়া লয়। তিনটি কক্ষ ভাঙ্গিয়া একটি বড় কক্ষ রচনা করে ; আর তন্মধ্যে ঐ ক্লীব পলুটিকে রাখিয়া তাহার উপরে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের মত গৃহ নির্ম্মাণ করে। নানারূপ অদ্ভুত খাদ্যে এই পলুর পরিপোষণ করে। এই সমস্ত প্রক্রিয়াতে পলুর ক্লীবত্ব লোপ পাইয়া স্ত্রীত্ব প্রকাশ পায়। পলু যখন মাছিতে পরিণত হয় তখন ক্লীব মজুর মাছি না হইয়া মাদী মাছি হয়।

পুস্তকাদির ব্যবহার এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে যে সাধারণের বিশ্বাস পুস্তক পাঠ ভিন্ন জ্ঞান উপার্জ্জনের আর অন্য কোন উত্তম উপায় নাই। এই বিশ্বাসই অনিষ্টের মূল। পুস্তকান্তর্গত বিষয় সমূহ বাহ্য বস্তুর বর্ণনা মাত্র। প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অন্য ব্যক্তি যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছেন, তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুস্তক পাঠ করিয়া যিনি তৎতৎ বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে চাহেন তিনি উচ্ছিষ্ট ভোজী বা পরান্নভোজী ব্যক্তির ন্যায় অনায়াস লব্ধ জ্ঞানান্ন লাভ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু যেমন পরান্নভোজীর আত্মচেষ্টা ও আত্মনির্ভরশীলতার শক্তি লোপ পাইয়া যায়, তাহার অদৃষ্টে যেমন স্বোপার্জ্জিত অন্নের উৎকৃষ্টতর আস্বাদ সংভোগ ঘটিয়া উঠে না, পুস্তক-পাঠকেরও তদ্রূপ আত্মচেষ্টাচালিত জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা নষ্ট হইয়া যায় আর তাহার অদৃষ্টে স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানের উৎকৃষ্টতর সুখ ও সমৃদ্ধির সংভোগ ঘটিয়া উঠে না। পুস্তক পাঠ 'লেখাপড়া' শিখিবার উত্তম উপায় বটে, কিন্তু পুস্তকপাঠ জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা নহে। প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ ভিন্ন প্রকৃত জ্ঞানলাভের আর অন্য কোন উৎকৃষ্টতর উপায় নাই।

প্রকৃতিই মানুষের অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, শিল্প বল, কারুকার্য্য বল—সমস্তই প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার হইতে গৃহীত।

"যত নীতি যত বিধি প্রাচীন নবীন,
প্রকৃতি জঠরে জন্ম প্রকৃতি অধীন।"

পদার্থ পরিচয় শিক্ষা যে কেবল বালকদিগকে সংসারসুখের উপকরণাদির উদ্ভাবন বিষয়ে সহায়তা করে তাহা নহে। পদার্থ পরিচয়ের শিক্ষা বালকগণকে দয়াধর্ম্মে দীক্ষিত করে, তাহাদিগের জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া

দিয়া তাহাদিগকে ভগবদ্ভক্ত করে। গো অশ্বাদির দ্বারা আমাদিগের যে উপকার হইতেছে তাহা বালকেরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছে, কিন্তু কাক শৃগাল প্রভৃতি পশুপক্ষী গৃহবহির্ভাগে পরিত্যক্ত গলিত শবাদি আহার করিয়া এবং ইন্দুর পিপীলিকা প্রভৃতি জীব গৃহাভ্যন্তরে পতিত চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্ছিষ্টকণা ভক্ষণ করিয়া যে দুর্গন্ধ নিবারণ করিতেছে ও স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়তা করিতেছে—ইহা জানিতে পারিলে কাহার হৃদয়ে না জীব জন্তুর প্রতি ভালবাসার উদ্রেক হইবে ও বিধাতার এই সমস্ত বিধান দেখিয়া কাহার হৃদয় না ভক্তিরসে আপ্লুত হইবে ?

পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানে লক্ষ্য।—আমরা ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া থাকি। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদিগের পদার্থ বা বিষয়ের বোধ জন্মে। জ্ঞানার্জ্জনের ইহাই প্রথম সোপান। এই বিষয়বোধের সহিত অভিনিবেশযুক্ত হইলে পর্য্যবেক্ষণের কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে। পর্য্যবেক্ষণ হইতে তুলনা ও তুলনা হইতে সমীকরণ বা শ্রেণীবিভাগ করিতে শিক্ষা লাভ হয়। এই শিক্ষার ফলে চিন্তা ও বিচার শক্তির উন্মেষ হইতে থাকে। ইন্দ্রিয় সমূহের সম্যক্ অনুশীলনই পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের প্রধান লক্ষ্য।

ইন্দ্রিয়াদি সর্ব্বদা নূতন নূতন জ্ঞান লাভের জন্য উন্মুখ—ইহা ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়শক্তি যতই বর্দ্ধিত হইবে জ্ঞানলাভ ততই সুলভ হইয়া আসিবে। বালকবালিকার শিক্ষায়—তাহাদিগের সমস্ত ইন্দ্রিয় যাহাতে সমবায় পুষ্টি লাভ করিতে পারে সেইরূপ চেষ্টা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়াদির পুষ্টি সাধন কেবল অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই অনুশীলনের ভার প্রধানতঃ শিশুগণের উপরই ন্যস্ত করিতে হইবে। তাহারা যাহাতে প্রথম হইতেই, পরের সাহায্য ব্যতিরেকে—কেবল নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া, সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে সেইরূপ ভাবে উৎসাহিত করিতে হইবে।

আমেরিকায় যে অভিনব শিক্ষাদান প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—যে পদ্ধতির শিক্ষায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই শিশুগণের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ লাভ করে, সে প্রণালীর মূলেও এই কথা অর্থাৎ শিশুগণকে আত্মনির্ভরশীল হইয়া আপন বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনার দ্বারা নিজ প্রশ্নের মীমাংসা নিজেই করিয়া লইবার চেষ্টায় উৎসাহিত করা। এই স্বাধীন অনুশীলনে বালকের বুদ্ধিবৃত্তি স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে।

১৩১৮ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্তা শোভনা রক্ষিত 'আমেরিকার নব শিক্ষা প্রণালী' প্রবন্ধে কয়েকটী শিশুর আশ্চর্য্য বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। নোবার্ট উইনার নামক একটী দেড় বৎসর বয়সের আমেরিকান বালক দুই দিনে সমস্ত বর্ণমালা শিখিয়া ফেলিয়াছিল। লিনা রাইট বার্লি নাম্নী একটী বালিকা তিন বৎসর বয়সে ইংরাজী, লাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় প্রার্থনা আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিল। এল্ডফ্ বার্লি নামক একটী বালক তের বৎসর ছয় মাস বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের তর্কসভায় যোগদান করিয়াছিল। উইনিফ্রেড্ ষ্টোণার নাম্নী একটী তিন বৎসরের বালিকা কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করে এবং নয় বৎসর বয়সে ৫টী ভাষায় কথা বলিতে শিক্ষা করে।

এইরূপ শিক্ষাদানের গূঢ় তত্ত্ব বিষয়ে উক্ত নোবার্টের পিতাকে (অধ্যাপক লিরো উইনার) প্রশ্ন করা হইয়াছিল। লিরো বলিয়াছেন "আমি যে কি প্রণালীতে শিক্ষাদান করিয়াছি তাহা এক কথায় বলা কঠিন। আমার বিশ্বাস পিতামাতা যতদূর মনে করেন শিশুরা স্বভাবতই তদপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহাদিগের এই স্বাভাবিক শক্তিকে সুকৌশলে পরিচালিত করিলে তাহারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রচলিত শিক্ষায় শিশুদের এই স্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে নিষ্পেষিত করিয়া দেওয়া হয়। ইহা না করিয়া সেগুলি পরিচালনার ভার

কতকটা তাহাদিগের উপর দিলে সুফলই ফলে। আপনাদের সম্বন্ধে তাহাদিগকে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে দেওয়া উচিত এবং বুদ্ধিমত্তায় তাহারা যাহাতে পিতা মাতার সমকক্ষ হইয়া উঠিবার জন্য প্রয়াসশীল হয়, সে জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করা উচিত। এইরূপে শিক্ষাদান করা যত কঠিন মনে হয়, বাস্তবিক তত কঠিন নয়। তবে এই প্রণালীতে শিক্ষা-দিতে হইলে সন্তানদিগের প্রত্যেক কথা ও কার্য্যের প্রতি পিতামাতার সতর্ক দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। শিশুদের সম্মুখে তাঁহাদের সর্ব্বদা বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলা উচিত। প্রয়োজনীয় বিষয়ে সদাসর্ব্বদা যে সমস্ত আলোচনা হয়, তাহাতে কোন প্রকার অসামঞ্জস্য থাকা উচিত নয় এবং প্রত্যেক আলোচনা যাহাতে যুক্তিসঙ্গত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। শিশুদিগের নিকট যে সকল প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় সেগুলি যাহাতে তাহাদিগের বোধগম্য হয় সেরূপ চেষ্টা করা আবশ্যক। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে—প্রথম হইতেই শিশুরা যেন আপনার চতুর্দ্দিকে তাহাদের জ্ঞানপিপাসা বাড়াইয়া তুলিবার উপকরণ দেখিতে পায়। ইঙ্গিত মাত্র লাভ করিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টায় সুন্দর শিক্ষা হয়। শিশুদিগকে ইঙ্গিতের এইরূপ ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।" (শ্রীযুক্তা শোভনা রক্ষিতের প্রবন্ধ হইতে)

পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের বিষয়।—পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের বিষয়ের অন্ত নাই। ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে সুবৃহৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই পদার্থ পরিচয়ের বিষয়। তবে পাত্র বিবেচনায় বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। ৫।৬ বৎসরের শিশুকে গ্রহ উপগ্রহের গতি বুঝাইতে পারা যায় না। আর ১০।১২ বৎসরের বালকের পক্ষে বিড়ালের পা গণনাও শোভা পায় না। বিষয়কেও আবার পাত্র বিবেচনায় পরিমিত করিতে হইবে। ৩।৪ বৎসরের শিশুর পক্ষে বিড়ালের পা গণনার আবশ্যকতা আছে। আবার ঐ বিড়ালের বিষয়ে উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ দিতে

হইলে মাংসাশী জন্তুর দন্ত, নখ, জিহ্বা প্রভৃতির বিশেষ আলোচনা করা যাইতে পারে। পাঁচ ছয় বৎসরের শিশুকে চন্দ্রের বিষয় শিখাইতে হইলে, চন্দ্র যে গোল থালার মত, কখনও বড় হয় আবার কখনও ছোট হয় ইহাই দেখাইয়া দিলে চলিবে কিন্তু উচ্চ শ্রেণীতে চন্দ্রের বিষয় শিখাইতে হইলে চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধির কারণ বুঝাইতে হইবে।

একবার কোন পাঠশালা পরিদর্শনের জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলাম। তখন বাঙ্গালা দেশে পেড্‌লার সাহেবের নূতন পাঠ্য তালিকা অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ঐ তালিকার নিম্ন শ্রেণীর পাঠ্যে "লবণ, চিনি প্রভৃতির স্বাদ"—একটি বিষয় ছিল। শিক্ষক এই স্বাদের বিষয়ে পাঠ দিতেছিলেন। বালকগণের বয়স ১২।১৩, কি কিছু কম। শিক্ষক প্রত্যেক বালকের মুখে লবণ ও চিনি দিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কোন্‌টি কি বস্তু ও কোন্‌টির আস্বাদ কিরূপ। ১২।১৩ বৎসরের বালককে লবণ ও চিনির লবণত্ব ও মিষ্টত্ব শিক্ষা দেওয়া—সময় নষ্ট করা মাত্র। তাহারা লবণ ও চিনি চেনে ও ইহাদের আস্বাদও উত্তম রূপ জানে। পাঠ্য তালিকায় লেখা আছে বলিয়াই কি ১২।১৩ বৎসরের ছেলেকে লবণ চিনি শিখাইতে হইবে? এ পাঠ তাহাদিগের জন্য নহে। যে শ্রেণীর জন্য এই পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উক্ত পাঠশালার সেই শ্রেণীর ছাত্রগণের বয়স শ্রেণীর পরিমাণে অনেক বেশী। ইহা বিদ্যালয়ের দোষ। এরূপ পাঠ বাদ দেওয়াই উচিত—আবশ্যক হইলে উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য তালিকা হইতে ঐ বয়সের বালকের উপযোগী পাঠ বাছিয়া লইয়া শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। আর নিতান্তই যদি পাঠ্য তালিকা অনুসরণ করা কর্ত্তব্য মনে হয়, তবে লবণ, সোডা, ফিটকারী প্রভৃতির স্বাদের তারতম্য শিখাইলেও কিছু উপকার হইবে। ফল কথা নূতন বিষয় শিখাইতে হইবে—যাহা জানে তাহা শিখাইয়া সময় নষ্ট করা অবিবেচনার কার্য্য।

যে সমস্ত পশু আমরা গৃহে পালন করিয়া থাকি, যে সমস্ত হিংস্র জন্তু হইতে আমাদিগকে সতত সাবধানে থাকিতে হয়, যে সকল পাখী আমরা পুঁষিয়া থাকি, যে সকল পাখী আমরা প্রত্যহ গৃহপ্রাঙ্গনে দেখিতে পাই, যে সমস্ত কীট পতঙ্গ আমাদিগের ইষ্ট বা অনিষ্ট করিয়া থাকে, যে সকল শস্য আমাদিগের নিত্য প্রয়োজন, যে সকল ফল আমরা সাধারণতঃ খাইয়া থাকি, যে সকল বৃক্ষের দ্বারা গৃহের আসবাব প্রস্তুত হয়, যে সকল

প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি—সেই সমস্তই পদার্থ পরিচয়ের উত্তম বিষয়।

বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। কোন্ শ্রেণীতে কি কি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে পাঠ্য তালিকায় তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকে। কিন্তু পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানে শিক্ষকের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। পাঠ্য তালিকা ভুক্ত সমস্ত বিষয়ই যে পড়াইতে হইবে বা পাঠ্য তালিকা বহির্ভূত অন্য কোন বিষয়ের যে আলোচনা করা যাইবে না তাহা নহে। আবশ্যক হইলে তালিকা নির্দ্দিষ্ট কোন কোন বিষয় বাদ দেওয়া যাইতে পারে এবং পাঠ্য তালিকা বহির্ভূত কোন কোন বিষয়ের আলোচনা করা যাইতে পারে। মনে কর তালিকায় 'হাতী' বিষয়ক পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিন্তু 'উট' বিষয়ে কোন পাঠ নাই। তোমার গ্রামে হাতী নাই কিন্তু উট আছে। এস্থলে তুমি হাতীর পাঠের পরিবর্ত্তে অবাধে উটের পাঠ দিতে পার। স্থান বিশেষে এক একটী জিনিষের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। কাছাড়ে চা, রঙ্গপুরে আলু, মালদহে আম ও শ্রীহট্টে কমলা লেবু প্রসিদ্ধ। পাঠ্য তালিকায় এ সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ না থাকিলেও, বালকগণকে নিজ নিজ জেলার শ্রেষ্ঠ জিনিষের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। পদার্থ পরিচয় সাপ্তাহিক বা বাৎসরিক পরীক্ষার বিষয় নহে। ইহা শিক্ষার বিষয়, পরীক্ষার নহে।

পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের উপকরণ।—পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের উপকরণ 'পদার্থ'। জল বিনা পিপাসাতুরের পিপাসা নিবারণের চেষ্টা ও পদার্থ বিনা পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা—উভয়ই সমান ফলপ্রদ। অনেক সময় শিক্ষকগণ প্রকৃত পদার্থের পরিবর্ত্তে চিত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু দুধে জলের পিপাসা মেটে না। মনে কর বিড়ালের বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে।

বিড়ালের জিহ্বা যে খস্‌খসে, বিড়ালের পা'র নীচে যে নরম গদি আছে, বিড়ালের নখ যে কোষে আবদ্ধ থাকে, বিড়ালের চক্ষু যে আলোতে ছোট হয় ও আঁধারে বড় হয়—তাহা চিত্রে কেমন করিয়া দেখাইবে? একটা পোষা বিড়াল সংগ্রহ কর—দুষ্প্রাপ্য নয়। অনেক বাড়ীতে বিড়াল পুষিয়া থাকে। এইরূপ গোরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, পায়রা, মোরগ, হাঁস, ব্যাঙ, ইঁদুর, মাছ প্রভৃতি সহজপ্রাপ্য জীব জন্তুর পাঠে সেই সকল জীব জন্তু সংগ্রহ করিতে হইবে। যে সকল জীব জন্তু সহজ প্রাপ্য নয় শিক্ষকগণ ইচ্ছা করিলে তাহার কোন কোনটীর মৃতদেহ শুষ্ক করিয়া রাখিতে পারেন। হাঁস, মুরগী, পায়রা মাংসের জন্য বধ করা হয়। ইহাদিগের ঠ্যাং ও ঠোঁট সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া রাখিলে বেশ থাকে। প্রজাপতি, ফড়িং প্রভৃতি নানারূপ পতঙ্গ শক্ত কাগজের গায় আলপিন বিদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। নানারূপ পাখীর পালক, নানাবিধ জন্তুর হাড় সহজ প্রাপ্য—একটু যত্ন করিলেই সংগ্রহ করা যায়। অনেক জিনিষ গ্রামের লোকজনের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া আনিতে পারা যায়। মনে কর ইঁট প্রস্তুতের প্রণালী দেখাইবে। একটু কাদা সংগ্রহ কর ও গ্রামের কোন লোকের নিকট হইতে ইঁট প্রস্তুতের ছাঁচ কর্জ্জ করিয়া আন।

যে সকল জিনিষ সংগ্রহ করা কঠিন বা যে সকল জিনিষ বিপদজনক, সেই সকল জিনিষের পুত্তল বা চিত্র আবশ্যক। কিন্তু যে জিনিষ সংগ্রহ করা যাইতে পারিবে, সে জিনিষের পরিবর্ত্তে কখনই নকল জিনিষ ব্যবহার করিবে না। চিত্র অপেক্ষা পুত্তল ভাল, কারণ পুত্তল অনেকটা প্রকৃত জিনিষের অনুরূপ। পুত্তলের অভাবে চিত্র। তবে চিত্র উত্তম হওয়া আবশ্যক। বিদ্যালয়ের উপযোগী চিত্রে এই সমস্ত গুণ থাকা চাই:—

(১) চিত্রখানি এত বড় হইবে যে দেয়ালে ঝুলাইয়া রাখিলে বালকেরা যেন তাহার প্রধান অংশগুলি উত্তম রূপে দেখিতে পায়।

(২) চিত্রাঙ্কিত পদার্থের অংশগুলিতে যেন স্বাভাবিক অনুপাত সুরক্ষিত হয়। চিত্র সুরঞ্জিত না হইলেও তত ক্ষতি হয় না কিন্তু চিত্রে যদি পদার্থের প্রতিকৃতি সামান্য পরিমাণেও বিসদৃশ হয়, তবে সে চিত্র অব্যবহার্য্য।

(৩) চিত্রে বালকের পরিচিত স্বদেশী পদার্থের প্রতিকৃতি থাকা আবশ্যক। বিলাতী চিত্রে যে সমস্ত মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে তাহা প্রায়ই তদ্দেশীয় জীব জন্তুর মূর্ত্তি। ব্যাঘ্র, সিংহ, গণ্ডার প্রভৃতির আকৃতি প্রায় সকল দেশেই এক প্রকার কিন্তু গোরু, কুকুর, বানর প্রভৃতি দেশ ভেদে নানা আকারের দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতী চিত্রে যে গোরু ও কুকুরের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে তাহা আমাদিগের দেশের অনুরূপ নহে।

যে সমস্ত জিনিষ সহজে সংগ্রহ করা যাইতে পারিবে, সে সমস্ত জিনিষের চিত্র সংগ্রহ করিবে না। চিত্র না থাকিলেই বা ক্ষতি কি? পদার্থের ত অভাব নাই। যদি এমন হয় যে পাঠ্য তালিকা নির্দ্দিষ্ট কোন জন্তু তুমি সংগ্রহ করিতে পারিলে না ও তোমার বিদ্যালয়ে সে জন্তুর চিত্রও নাই, তবে সে জন্তুর পাঠ দিও না। তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন জীবের বিষয় শিক্ষা দাও। যাহা হউক বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত পদার্থের চিত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে কাজের সুবিধা হইবে :—

১। ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী (যদি গ্রামে দেখিবার সুবিধা না থাকে), উষ্ট্র, ভল্লুক, বনমানুষ (নানা প্রকার), বানর (নানা প্রকার), সিন্ধুঘোটক, তিমি, বল্গাহরিণ, জেব্রা, জিরাফ, ঈগলপাখী, উটপাখী, ময়ূর, ক্যাঙ্গারু এবং নানা জাতীয় বিলাতী কুকুর।

২। চা গাছ (যদি জেলায় না থাকে), আপেল, ওক, পাইন (এ সমস্ত গাছের কথা বালকেরা প্রায়ই ইংরাজী পুস্তকে পড়ে), আঙ্গুর, রবার, সেগুণ, শাল।

৩। হিমালয় পর্ব্বত, কয়লার খনি, তাজমহল, পিরামিড।

৪। রেলগাড়ী ও ষ্টীমার (যদি প্রকৃত জিনিষ দেখিবার সুবিধা না থাকে)।

৫। রাজা ও রাণী।

পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানে ব্ল্যাক বোর্ডের মত আবশ্যক উপকরণ আর কিছু নাই। যদি শিক্ষকের চিত্রাঙ্কণে পারদর্শিতা থাকে, তবে ব্ল্যাক বোর্ডে চিত্রাঙ্কণ করিয়াই দুষ্প্রাপ্য সমস্ত জীবজন্তু বৃক্ষলতার বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন। চিত্র না কিনিলেও চলিতে পারে। আর বিদ্যালয়ে নানা রূপ চিত্র থাকিলেও, ব্ল্যাকবোর্ডে চিত্রাঙ্কণ করিতেই হইবে। জীবজন্তুর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের আভ্যন্তরিক অবস্থা, বৃক্ষলতাদির ব্যবচ্ছেদ. ভূস্তরের বিন্যাস ইত্যাদি অঙ্কণ করিয়া বুঝাইতে হইবে। ইহা ছাড়া ব্ল্যাকবোর্ডে পাঠনার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন শব্দ ও নূতন নূতন বিষয় লিখিয়া দিতে হয়। কেবল সাদা চক্ ব্যবহার না করিয়া নানা রঙের চক্ ব্যবহার করিলে বোর্ডের চিত্র চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে।

অতি সামান্য সামান্য পরীক্ষণের জন্য কয়েকটী বৈজ্ঞানিক যন্ত্র থাকিলে ভাল হয়। থারমমিটার সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইলে একটু পারদ ও একটা কাচের কুণ্ডযুক্ত নল আবশ্যক অথবা একটা তৈয়ারী থারমমিটার নিতান্তই আবশ্যক।

শিক্ষকেরা ইচ্ছা করিলে পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের উপযোগী অনেক জিনিষ বিনা পয়সায় সংগ্রহ করিতে পারেন, আর একটু শিল্প নৈপুণ্য থাকিলে অনেক জিনিষ তাঁহারা নিজে প্রস্তুত করিতেও পারেন।

পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের প্রণালী।—পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানে যে শিক্ষণীয় বিষয়ের পদার্থ আবশ্যক এ কথা বলাই বাহুল্য। আবার সেই পদার্থের পরিমাণ এত অধিক হওয়া আবশ্যক যে প্রত্যেক বালকই যেন নিজ হাতে সেই পদার্থের সমস্ত অংশ সুন্দররূপে পরীক্ষা করিতে পারে। মনে কর ফুলের অংশ শিখাইবে—প্রত্যেক বালকের হাতে একটা করিয়া ফুল দাও। তবে গোরু কি কুকুরের বিষয় শিক্ষা দিতে অবশ্য প্রত্যেক বালককে একটা করিয়া গোরু কি কুকুর দেওয়া

সম্ভবপর নহে। এমত অবস্থায় একটী গোরু সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বাঁধিয়া রাখ ও বালকগণকে সেই গোরুর চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া নিজ হস্তে তাহার সমস্ত অঙ্গ পরীক্ষা করিতে বল। ফল কথা যাহাতে বালকেরা নিজ হাতে দ্রব্যটীর সমস্ত অংশ পরীক্ষা করিতে পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্যবস্থা করিবে।

তার পর প্রধান কথা এই যে জ্ঞাতব্য বিষয় নিজে বলিয়া দিবে না— বালকগণের নিকট আদায় করিয়া লইবে। কিন্তু বালকগণকে বর্ণনা করিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়া বসিয়া থাকিলে, তাহারা কিছুই বলিতে পারিবে না। কি বলিতে হইবে, কেমন করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে ইহা তাহারা জানে না। উত্তমরূপ প্রশ্নের দ্বারা তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে হইবে। প্রশ্ন শুনিয়াই তাহারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে ও অনুসন্ধান করিয়া তোমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর করিবে। পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্যই বালকগণকে তাহাদিগের নিজ শক্তি প্রয়োগে পদার্থের গুণাগুণ নির্দ্ধারণে সক্ষম করা। সুতরাং যে শিক্ষক বালকগণকে জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া দিয়াই পদার্থ পরিচয় শিক্ষা সমাপ্ত করেন, তিনি পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের উপযোগী শিক্ষক নহেন। বালকেরা যাহাতে বিশুদ্ধ ভাষায় ও পূর্ণ বাক্যে প্রশ্নাদির উত্তর করে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের গৌণ উদ্দেশ্য বালকগণের বাক্য কথন উন্নত করা ও তাহাদিগের শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করা।

পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষণের আবশ্যক হয়। আলস্য বশতঃ অনেক শিক্ষক এই সমস্ত পরীক্ষণ অনাবশ্যক মনে করেন। মনে কর বালকগণকে আগুণের নিকট সাবধানে যাইবার জন্য উপদেশ দিতেছ। অসাবধানে গেলে যে কাপড়ে সহজে আগুণ ধরিতে পারে ইহা কেবল মুখে বলিয়া না দিয়া, এক টুকরা কাপড়ে আগুণ ধরাইয়া দেখাও যে কাপড়ে কেমন সহজে আগুণ ধরে।

তারপর পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানে সাদৃশ্য ও বিসাদৃশ্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয় অর্থাৎ এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া দেখাইতে হয়। বরফ সাদা, কাগজ সাদা, দুধ সাদা, রৌপ্য সাদা, চূণ সাদা কিন্তু এই সকল বস্তুই কি ঠিক এক রকমের সাদা? এই সকল জিনিষ না দেখাইলে বালকেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শ্বেতবর্ণের পার্থক্য বুঝিতে পারিবে না। বালকেরা ত এ সমস্ত জিনিষ দেখিয়াই থাকে; অতএব এ সকল দ্রব্য সংগ্রহ না করিলেও চলিবে—এইরূপ কল্পনা করিয়া যিনি কেবল বাক্যের সাহায্যে পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদান করিতে চাহেন, তিনি সুফল লাভ করিতে পারেন না।

পশুপক্ষী বৃক্ষলতা বিষয়ক পাঠ বালকগণের নিকট বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে, কারণ পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতার মানুষের মত জন্ম বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে এবং আরও অনেক বিষয়ে মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। এই সমস্ত পাঠে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত পশুপক্ষীর দেহের ও মানুষের আচার ব্যবহারের সহিত পশুপক্ষীর আচার ব্যবহার তুলনা করিয়া বুঝাইতে ও শিখাইতে হইবে। বৃক্ষলতারও যে আমাদিগের মত আহারের প্রয়োজন, আহার না পাইলে তাহারাও যে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখাইলে বালকেরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিবে। কিরূপে পদার্থ পরিচয়ের বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে, এই পুস্তকের পাঠে তাহারই আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে। এই আদর্শ দেখিয়া ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে কেবল এই সকল প্রশ্নই করিতে হইবে ও বালকের নিকট ঠিক এই সকল উত্তরই আদায় করিতে হইবেঁ। এ সমস্ত প্রশ্নোত্তরে শিক্ষাদানের আভাস মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুস্তক লিখিত পাঠে পদার্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে যে সমস্ত তত্ত্ব প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই কি সেই পদার্থের আলোচনা পক্ষে যথেষ্ট? নিশ্চয়ই নয়। প্রতি পদার্থেই এত তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে যে মানুষ জন্ম জন্মান্তর

আলোচনা করিয়াও তাহার শেষ করিতে পারিবে না। এই গ্রন্থে যে সমস্ত তত্ত্বের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে কেবল যে তাহাই শিখাইতে হইবে এমনও নহে। বালকের বয়স ও জ্ঞানের পরিমাণ বুঝিয়া তাহাকে আরও নূতন নূতন নানা তত্ত্ব শিখাইতে পার। শিক্ষকগণ একটু চিন্তা করিলেই এইরূপ শিক্ষাদান প্রণালীর মর্ম্ম সহজেই বুঝিতে পারিবেন। বালকগণের সহিত কথোপকথন করিয়া এই সকল বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে। বালকেরা যখন সাহিত্য গণিতাদি আলোচনা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, তখন পদার্থ পরিচয়ের পাঠ দিয়া তাহাদিগের ক্লান্তি দূর করিতে হইবে। পদার্থ পরিচয়—আমোদের সঙ্গে শিক্ষা। যদি পদার্থ পরিচয়ে বালকেরা আনন্দলাভ না করে, যদি এই পাঠের সময় তাহাদিগের বিশেষ উৎসাহ দেখা না যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে শিক্ষক পদার্থপরিচয়ের পাঠ দিতে জানেন না। পদার্থপরিচয় শিক্ষাদানের প্রাত্যাহিক সময়—নিম্ন দুই শ্রেণীতে ১৫।২০ মিনিট, মধ্য দুই শ্রেণীতে ২০।৩০ মিনিট ও উচ্চ দুই শ্রেণীতে ৩০।৪০ মিনিট।

প্রকৃতি পরিচয় (Nature Study) নামে একটী পৃথক বিষয় পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইয়া থাকে। প্রকৃতি পরিচয় ও পদার্থ পরিচয় (Object Lessons) প্রায় একরূপ বিষয়। তবে প্রকৃতি পরিচয়ে কেবল পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা মেঘ বৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়া থাকে আর পদার্থ পরিচয়ে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে ইঁট, কাঠ, তাপমান, ডাকঘর, বাজার, তাজমহল প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েরই আলোচনা করা হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন যে এ সমস্ত প্রকৃতি পরিচয়েরও অন্তর্গত। তাঁহাদিগের মতে প্রকৃতি পরিচয় ও পদার্থ পরিচয় প্রায় এক অর্থবোধক। যাহা হউক আমাদিগের নামের গোলমাল লইয়া কাজ নাই—বিষয় লইয়াই বিষয়; বিষয়ের আলোচনা হইলেই হইল।

এই পুস্তকের অন্তর্গত পাঠ দেখিয়া কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে প্রকৃতি পরিচয় বা পদার্থ পরিচয়ের সমস্ত পাঠই বুঝি কোন একটী প্রাণী বা বৃক্ষ বা তদ্রূপ অন্য কোন একটী বস্তু উপলক্ষ করিয়া দিতে হইবে। তাহা নহে। শিক্ষকগণ বালকগণকে সঙ্গে লইয়া নানা স্থানে বেড়াইয়া বেড়াইয়া অনেক বিষয় শিখাইতে পারেন। এইরূপ শিক্ষাকেই প্রকৃত প্রকৃতি পরিচয় বলে। এইরূপ শিক্ষাদানের একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

একবার একটী মণিপুরী বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষে শ্রীহট্ট জেলার অধীন মৌলভিবাজার মহকুমার অন্তর্গত কোন গ্রামে গিয়াছিলাম। যাইবার সময় সঙ্গে তিনটী মণিপুরী বালক ছিল। মাঠের মধ্য দিয়া রাস্তা। মাঠে খুব ধান হইয়াছে—এত ধান যে লোকে বলিল অমন ধান নাকি অনেক বৎসর হয় নাই। ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের কথা। ধান কতক পাকিয়াছে আর কতক পাকিতেছে। কিন্তু ধানে পোকা ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধানের পোকার গল্প করিতে করিতে চলিতেছি, এমন সময় দেখা গেল যে মাঠের এক অংশে টেলিগ্রাফের তারের উপর অনেকগুলি তিতির জাতীয় পাখী সারি ধরিয়া বসিয়া আছে। পাখীগুলির আকার অনেকটা দৈয়ালের মত। পিঠের উপর কাল কাল দাগ আর পেটের নীচে বেশ সাদা। দৈয়ালের লেজের চেয়ে ইহাদের লেজ একটু বেশী লম্বা। আর খঞ্জন পাখীর গলায় যেমন একটা কাল দাগ থাকে এ পাখীগুলির গলায় প্রায় সেইরূপ একটী কাল দাগ আছে। একটী বালক জিজ্ঞাসা করিল "মাঠের এক অংশে এত পাখী জমিয়াছে কেন?" আমি তাহাদিগকে কারণ অনুসন্ধান করিতে বলিলাম। বালকেরা মাঠের সেই অংশে গিয়া দেখিল যে ধানের পোকা হইতে যে গুটী হইয়াছে, সেই গুটী কাটিয়া ফড়িং বাহির হইতেছে আর পাখীগুলি উড়িয়া উড়িয়া সেই ফড়িং ধরিয়া খাইতেছে। মাঠের অন্য দুই এক স্থানেও পোকা ধরিয়াছে বটে কিন্তু সেখানে পোকাগুলি এখনও পলু

অবস্থায় আছে। পোকা যখন পলু অবস্থায় থাকে তখন তাহার গায়ের রঙ প্রায়ই সবুজ হইতে দেখা যায়। কাজেই পলু পাতার নীচে লুকাইয়া থাকিলে পাখী বুঝিতে পারে না। সেই জন্য সে দিকে কোন পাখী যায় নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এই পাখীগুলি ফড়িং খাইয়া আমাদিগের কি কোন উপকার করিতেছে?" একটী বালক বলিল "না, কোন উপকারই করিতেছে না—বরং পলুগুলি ধরিয়া খাইলেই উপকার হইত কারণ পলুতেই ধান নষ্ট করে। ফড়িং কোন অনিষ্ট করে না।" তারপর একটী ফড়িং ধরিয়া আনিয়া একটী পাতার উপর রাখি-লাম। দেখিতে দেখিতে ফড়িংটী অসংখ্য ডিম প্রসব করিল। প্রায় ৭ মিনিটের মধ্যে রৌদ্রের উত্তাপে সেই ডিমগুলি ফুটিয়া পলু বাহির হইতে লাগিল। ইহাই দেখিয়া একটী বালক বলিয়া উঠিল "আহা, ভগবানের কি আশ্চর্য্য বিধান! এই পাখীগুলি যদি ফড়িং ধরিয়া না খাইত, তবে এই সব ফড়িং উড়িয়া গিয়া চারিদিকে মাঠের ধানে পড়িত ও সেখানে এইরূপ অসংখ্য ডিম প্রবস করিত। সেই ডিম হইতে পলু বাহির হইয়া বোধ হয় দুই তিন দিনেই সমস্ত ধানের সর্ব্বনাশ করিত।" এইরূপ কার্য্যকারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে কাহার হৃদয় না ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া থাকিতে পারে? তারপর একটী বালক বলিল "দেখুন এই পাখীগুলি তারের উপর কেমন সমান ফাঁকে ফাঁকে বসিয়া আছে। মনে হয় যেন ইহারাও বুঝি ড্রিল করিতে শিখিয়াছে। আচ্ছা—এমন ফাঁকে ফাঁকে বসে কেন?" আমি কারণ অনুসন্ধান করিতে বলিলাম, কিন্তু তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। "দেখ, ফড়িং উড়িবামাত্রই পাখী গুলি উড়িয়া আসিয়া ধরিতেছে। এখন পাখীগুলি যদি গায় গায় লাগিয়া বসিয়া থাকিত, তবে ফড়িং উড়িবামাত্রই ছোঁ মারিতে পারিত না কারণ পাখা মেলিতে গেলে অপর পাখীর গায় লাগিয়া বাধা পাইত। এইজন্য এমন ফাঁকে ফাঁকে বসিয়া আছে যেন পাখা মেলিতে কাহারও গায় না

বাধে। দুইখানি পাখা মেলিলে প্রায় ৭ ইঞ্চ মত যায়গা লাগে, আর পাখীর শরীরও প্রায় ২ ইঞ্চ। তাই দেখ পাখীগুলি প্রায় ১০ ইঞ্চ ফাঁকে ফাঁকে বসিয়া আছে।" পাখীর এইরূপ শৃঙ্খলাবোধ দেখিয়া বালকেরা বড়ই আশ্চার্য্যান্বিত হইল। বালকেরা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া এই সমস্ত বিষয়ের গল্প করিতেছে এমন সময় একটী বালিকা জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা কত পাখী হবে?" একটী বালক উত্তর করিল "১০।২০ হাজার।" আমি এই বালকটীকে থামাইয়া বলিলাম "ওরূপ একটা যা তা উত্তর দিও না। আন্দাজকে বেআন্দাজী করিও না। আন্দাজেরও একটা পরিমাণ করিতে শিখিবে।" আমি তাহাকে এই পাখীর সংখ্যার একটা পরিমাণমত আন্দাজ করিবার পথ বলিয়া দিলাম। টেলিগ্রাফ তারের থামগুলি একমাইলে ২৪।২৫টী থাকে। তাহা হইলে ২ থামের মধ্যে ব্যবধান ৭০ গজ। ১০ ইঞ্চ ফাঁকে ফাঁকে পাখী বসিলে ৭০ গজ তারের উপর প্রায় ২৫০টী পাখী বসিতে পারে। তারের লাইন যখন দুইটী ছিল, তখন দুই থামের ব্যবধান স্থানে প্রায় ৫০০ পাখী ছিল বলিয়া মনে হয়। আমরা তিন থামের ব্যবধানে পাখী বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। কাজেই তারের উপর এক হাজার মত পাখী ছিল বলিয়া মনে হয়। খুব বেশী হইলে দেড় হাজার হইতে পারে। কিন্তু ১০।২০ হাজার যে নয় তাহা নিশ্চয়। যাহা হউক আমরা সে দিন অনেক সময় পাখী ও পোকার বিষয়ে নানা রূপ আলোচনা করিয়া বেশ আনন্দ পাইলাম।

পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানে নিম্নলিখিত চারিটী প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবে :—

১। **জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি।**—ইন্দ্রিয়াদির শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে ইহাদিগের উপযুক্ত ব্যবহার আবশ্যক। কেবল একটী ইন্দ্রিয়ের অপরিমিত ব্যবহারে কোন সুফল হইবে না। পদার্থ পরিচয়ের কোন কোন পাঠ এরূপ আছে যে তাহাতে কেবল এক একটী ইন্দ্রিয়েরই

ব্যবহার আবশ্যক হয়, যেমন রঙ পরিচয়ে চক্ষু, শব্দ পরিচয়ে কর্ণ ইত্যাদি। কিন্তু ক্রমাগতই যদি এইরূপ এক ইন্দ্রিয় পরিচালনার পাঠ দেওয়া যায় তবে সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি না হইয়া বরং তাহার শক্তির অবসাদ আসিয়া পড়ে। যেরূপ পদার্থ পরিচয়ে একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হয়, সেইরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবে। চক্ষু ও হস্তই দ্রব্যাদির গুণাগুণ পরীক্ষার প্রধান যন্ত্র।

২। **জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা বৃদ্ধি।**—পাঠনাকে বিশেষ সুখপ্রদ করিতে পারিলে, বালকগণের দ্বারা পদার্থ নিহিত নানারূপ বিস্ময়কর গুণাগুণ আবিষ্কার করাইতে পারিলে, তাহারা নূতন নূতন জ্ঞানলাভের জন্য উৎসুক হইয়া বিনা প্ররোচনায় নানারূপ তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। বালকের প্রাণে এইরূপ তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি বলবতী করিয়া দিতে পারিলেই পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

৩। **স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি বৃদ্ধি।**—বালকেরা স্বভাবতঃই স্বহস্তে সমস্ত কার্য্য করিতে ভালবাসে। নিজ হাতে ভাত খাইতে শিখিলে আর পরের হাতে ভাত খাইতে ভালবাসে না। কিন্তু আমরা অনেক সময় মূর্খতা বশতঃ বালকগণের এই স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে দমন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। প্রত্যেক কাজ যাহাতে তাহারা নিজ হাতে করিতে পারে সে বিষয়ের ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক। যতদুর সম্ভব পরীক্ষণের কার্য্য বালকগণের দ্বারা করাইয়া লইবে।

৪। **উত্তম ভাষায় মনোগত ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি।**—পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানে কথপোকথনের প্রণালী অবলম্বন করিবে। বালকগণকে সুচিন্তিত প্রশ্ন করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে পদার্থ নিহিত গুণাগুণের বর্ণনা আদায় করিবে। বালকেরা যাহাতে বিশুদ্ধ ভাষায় ও পূর্ণ বাক্যে উত্তর দেয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে। বালকেরা লিখিতে পারিলে, শিক্ষার সারাংশ লিখিয়াও প্রকাশ করিতে বলিবে।

পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানে প্রশ্ন।—পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে পদার্থ নিহিত গুণাগুণের বর্ণনা বালকগণের নিকট হইতে উত্তমরূপ প্রশ্ন করিয়া আদায় করিতে হইবে। কিন্তু প্রশ্ন করিবার কৌশল না জানিলে উপযুক্ত উত্তর আদায় করা যাইবে না। মনে কর গোরুর বিষয় শিক্ষা দিতেছ। বালকের নিকট হইতে গোরুর কাণের বর্ণনা আদায় করিবার ইচ্ছা করিয়াছ। যদি প্রশ্ন কর "গোরুর কাণের বর্ণনা কর"—বর্ণনাশক্তি-শূন্য বালক কিছুই বলিতে পারিবে না। মনে কর তার পর প্রশ্ন করিলে "গোরুর কাণ কেমন?"—বালক চুপ করিয়া থাকিল অথবা বলিল "গোরুর কাণ গোরুর কাণের মত"। এইরূপ প্রশ্নের দ্বারা তোমার ইপ্সিত উত্তর আদায় করা হইল না। সেই জন্য প্রশ্ন গঠনের কৌশল জানা আবশ্যক। পরিচিত দ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করিতে বলিলে বালক উত্তর করিতে পারিত। "তোমার কাণ বড়, না গোরুর কাণ বড়? তোমার কাণে বড় গর্ত্ত, না গোরুর কাণে বড় গর্ত্ত? তোমার কাণে বেশী পাক, না গোরুর কাণে বেশী পাক? তুমি যেমন হাত নাড়িতে পার, সেই মত কি কাণ নাড়িতে পার? গোরু কাণ নাড়িতে পারে কি না, দেখ ত।" ইত্যাদি রূপ প্রশ্ন করিয়া তাহার নিকট গোরুর কাণের বর্ণনা আদায় করিতে হইবে। পরিচিত পদার্থের সহিত তুলনা করিয়া প্রশ্নের পরিকল্পনা করিলে, বালক সেই পরিচিত পদার্থের সহিত তুলনা করিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে। মনে রাখিবে যে পদার্থ পরিচয় শিক্ষায় তুলনার ধারাই বিশেষভাবে অনুসৃত হইয়া থাকে।

উত্তম প্রশ্ন গঠন করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মনে রাখিবে ঃ—

(১)* প্রশ্নের বাক্যটী শুদ্ধ, সরল ও স্বল্প কথায় রচিত হইবে। "যদি বর্ষাকালের প্রথমে কোন গ্রামে বেড়াইতে যাও আর সেখানে যদি একটী পুষ্করিণী দেখ, তবে দেখিতে পাইবে যে একরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ঘাসের মধ্য হইতে জলে লাফাইয়া পড়িতেছে। ইহারা কি প্রাণী বলিতে পার?" এই

প্রশ্নটী শুদ্ধ ও সরল হইতে পারে কিন্তু স্বল্প কথায় রচিত নহে। অনেক অনাবশ্যক কথায় রচিত বলিয়া ইহাকে উত্তম প্রশ্ন বলা যায় না। "বৃক্ষাদি কি কি পদার্থ হইতে জীবনী শক্তি সঞ্চয় করে?" স্বল্প কথায় রচিত বটে কিন্তু বালকগণের পক্ষে সরল ও সহজ বোধ্য নহে।

(২) এরূপ ভাবে প্রশ্ন রচনা করিবে যে প্রশ্ন করিলেই যেন বালকেরা তোমার অভীপ্সিত উত্তরটী দিতে পারে। মনে কর তুমি আকাশের কথা জিজ্ঞাসা করিবে—প্রশ্ন করিলে "আমরা মাথার উপর কি দেখিতে পাই?" ইহার নানারূপ উত্তর হইতে পারে। মাথার উপর গাছ, পাখী, ঘরের ছাদ দেখিতে পাই। সুতরাং এরূপ প্রশ্ন উত্তম নহে। "আমরা চন্দ্র সূর্য্য কোথায় দেখিতে পাই?" এ প্রশ্নের উত্তর আকাশ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। প্রত্যেক প্রশ্নের যেন কেবল একটী মাত্র উত্তরই সম্ভবপর হয়।

(৩) যেরূপ প্রশ্নের উত্তরে চিন্তা শক্তির পরিচালনা হয় না—কেবল মাত্র একটা হাঁ বা না বলিলেই উত্তর শেষ হয় সেরূপ প্রশ্ন উত্তম নহে। "রাম কি পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য বনে গিয়াছিলেন?" একজন বালক বলিল "না"। যদি শিক্ষক এই উত্তর অগ্রাহ্য করেন তবে অপর বালকেরা বুঝিবে যে ইহার উত্তর অবশ্যই "হাঁ" হইবে। সুতরাং এইরূপ প্রশ্নের উত্তর না জানিয়াও দেওয়া চলে। এরূপ প্রশ্ন বর্জ্জনীয়।

(৪) প্রশ্নগুলি ঠিক একরূপ ভাষায় রচনা করিও না। "ভাত খাইলে কি হয়? স্নান করিলে কি হয়? রৌদ্রে বেড়াইলে কি হয়?" ইত্যাদি একঘেয়ে প্রশ্ন বিরক্তিকর।

(৫) প্রশ্নগুলি যেন ধারাবাহিক হয় অর্থাৎ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরগুলি পর পর একত্র করিলে যেন বিষয়টীর একটা ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায়।

শিক্ষকের প্রতি শেষ বক্তব্য।—বিষয়টী বেশ শৃঙ্খলার সহিত ভাগ করিয়া শিক্ষা দিবে। সুশৃঙ্খলাই পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের প্রাণ।

শিক্ষাদানে বালকগণের বয়স ও পূর্ব্বজ্ঞান বিবেচনা করিবে। বালকেরা যাহা বুঝিতে পারিবে না সে বিষয়ে পাঠ দেওয়া বৃথা, আবার বালকেরা যাহা উত্তমরূপ জানে সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া সময় নষ্ট মাত্র। শিক্ষা-দানের সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখিবে। অল্প সময়ে অধিক শিক্ষা দিলে কোন ফল হইবে না। আবার সময় হিসাবে কম শিক্ষা দেওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। তবে এ উভয় দোষের মধ্যে কম শিক্ষা দেওয়া বরং ভাল। বাড়ী হইতে উত্তমরূপ প্রস্তুত হইয়া না আসিলে পদার্থ পরিচয় শিখাইতে পারিবে না। নোট লিখিয়া আনিবে ও চিন্তা করিয়া প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া আনিবে। নোট লিখিবার আদর্শ 'কেঁচো' ও 'চূণ' পাঠে দেখিতে পাইবে। শিক্ষাদানে যে সমস্ত দ্রব্যের আবশ্যক হইবে তাহা পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিবে আর সুলভ হইলে ছাত্রগণকে সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিবে। নিজে সর্ব্বদা তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিবে। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক কার্য্যকরী। তোমাকে তত্ত্বানুসন্ধানে উৎসাহী দেখিলে বালকেরা আপনা হইতেই তোমার অনুকরণ করিবে। প্রকৃতি ও পদার্থ হইতে তত্ত্বানুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তম উত্তম বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিবে। বিজ্ঞানের মধ্যে পদার্থ বিদ্যা, রসায়ণ, উদ্ভিদ বিদ্যা ও শরীর তত্ত্ব—এই চারি বিজ্ঞানে প্রত্যেক শিক্ষকের সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আর শিল্পের মধ্যে চিত্রাঙ্কণ, মাটীর ফলফুল গঠন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠের দ্রব্য প্রস্তুতকরণ ও সামান্য টিনের ঝালাই কার্য্য জানা আবশ্যক। শিক্ষাদানে কঠিন ভাষা ব্যবহার করিবে না। বৈজ্ঞানিক জটিল শব্দ যত পরিত্যাগ করিতে পার ততই ভাল। বিষয় শিখাইবে—শব্দ নয়।

"Teach things, not words."

Pestolozi
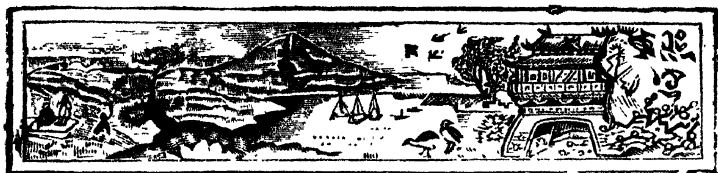
প্রথম প্রকরণ ।

(৪।৫।৬ বৎসরের শিশুগণের জন্য)

উদ্দেশ্য—পদার্থ পরিচয় করাইতে হইলে পদার্থের আকার প্রকার ও পদার্থের গুণাগুণের পরিচয় করাইতে হইবে। সেই জন্য প্রথমে বালকগণকে পদার্থের নানারূপ আকার ও পদার্থের নানারূপ গুণের বিষয় শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। পদার্থের নানা আকার আছে বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে তিন প্রকারের আকারই প্রধান। যথা—গোলক, বর্ত্তুল বা বলের ন্যায় আকার; ঢোল, স্তম্ভ বা বংশের ন্যায় আকাব ও বাক্স, ইট বা ছকের ন্যায় আকার। এই ত্রিবিধ আকারকে সাধারণতঃ **বল, ঢোল** ও **ছক** নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি গোল; তাল, বেল, কমলা, আতা প্রভৃতি ফল গোল। গাছের গুঁড়ি, ডাল, মানুষের হাত পা, পশু পক্ষীর দেহ প্রভৃতির আকার ঢোলের মত। বাক্স, টেবিল, চৌকি, পুস্তক, ইষ্টক, দালান, কোঠা প্রভৃতি ছকের আকার। [ছয় পার্শ্ব আছে যাহার, তাহার নাম ছক্] বস্তুর আকার ও বর্ণ পরিচয়ে বালক চক্ষুর (দর্শনেন্দ্রিয়ের) ব্যবহার করিবে। তারপর পদার্থের অন্যান্য গুণাগুণ : দ্রব্যের কোমলত্ব, কঠিনত্ব, কর্কশত্ব, মসৃণত্ব

প্রভৃতি গুণের পরিচয় করিতে হইলে বালকগণকে হস্তের (স্পর্শেন্দ্রিয়ের) ব্যবহার করিতে হইবে। দ্রব্যের আস্বাদ-গুণের (অম্লত্ব, মধুরত্ব প্রভৃতির) পরিচয় করিতে হইলে বালকগণকে জিহ্বার (রসনেন্দ্রিয়ের) ব্যবহার করিতে হইবে। দ্রব্যের সুগন্ধ, দুর্গন্ধাদির বিচারে বালকের নাসিকার (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের) ব্যবহার হইবে। দ্রব্যোৎপন্ন শব্দ বিচারে তাহার কর্ণের (শ্রবণেন্দ্রিয়ের) ব্যবহার আবশ্যক হইবে। সুতরাং পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদান করিতে হইলে বালকগণকে প্রথমে পদার্থের আকার প্রকার ও গুণাগুণের বিচার করিবার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিরূপে পদার্থের আকার প্রকার ও গুণাগুণ নির্দ্ধারণ প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে, প্রথম প্রকরণের কয়েকটী পাঠে তাহারই আদর্শ প্রদত্ত হইল। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর অন্তর্গত শিক্ষার ধারাও এইরূপ।

১। আকার (বল্)

উপকরণ—ছাত্রসংখ্যানুযায়ী কাঠের, মাটীর, রবারের বা চামড়ার বল্। নানা রূপ গোলাকার ফল, হাঁস বা মুরগীর ডিম। [দেশী মিস্ত্রীদিগের দ্বারা কাঠের বল্ প্রস্তুত করাইতে পারা যায়। যাহারা কাঠের লাঠিম প্রস্তুত করে, তাহারা এ সকল খেলনাও প্রস্তুত করিতে পারিবে। একটা লাঠিম ৵১০ দুই পয়সায় বিক্রয় হয়; ৮।১০টা কাঠের বলের দাম।০ কি।৵০ আনা লাগিবে। একবার সংগ্রহ করিলে অনেক দিন চলিবে। কাঠের বলের অভাবে মাটীর বল্ প্রস্তুত করিয়া পোড়াইয়া লইলেও চলিতে পারে। ছোট ছোট রবারের বল্ ৵০ আনা করিয়া বিক্রয় হয়। কলিকাতার মুরগীহাটা হইতে একসঙ্গে ১২টা বল্ আনাইলে ১ এক টাকাতেই পাওয়া যাইবে। চামড়ার বল্ দামী।]

শিক্ষাদানের ধারা—বালকদিগের প্রত্যেকের হাতে একটী করিয়া বল দাও ও তুমি নিজে একটা হাতে রাখ। তারপর জিজ্ঞাসা কর "আমার হাতে এটা কি ?" কেহ না পারিলে বলিয়া দাও "আমার হাতে একটা বল্"।

[কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে ভাঁটা, বর্ত্তুল প্রভৃতি বাঙ্গালা কথা না শিখাইয়া ইংরেজী বল্ কথা ব্যবহার করি কেন ? ব্যাট্‌বল্ খেলার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায় বল্ কথাটী এরূপ প্রচার হইয়া পড়িয়াছে যে ভাঁটা, বর্ত্তুল প্রভৃতি কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আর এক কথা— ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহারে দোষ কি ? ভাষার শব্দভাণ্ডার ত এই-রূপ করিয়াই বৃদ্ধি হয়। তবে যদি কাহারও বিশেষ কোন আপত্য থাকে তাহা হইলে তিনি ভাঁটা কথা ব্যবহার করিবেন।] প্রত্যেক বালক শিক্ষকের অনুকরণে বলিবে "আমার হাতে একটী বল"। "আমি বল্‌টী গড়াইয়া দিলাম, (গড়াইয়া দেওন) তোমরাও নিজ নিজ বল্ গড়াইয়া দাও"। (সকলের তদ্রূপ করণ)

[দ্রষ্টব্য—বালকগণকে এরূপভাবে এক লাইন করিয়া একটা ফাঁক যায়গায় দাঁড়া করাইবে যে সকলে যেন সম্মুখে বল্‌গুলি গড়াইয়া দিতে পারে। বালকগণের সম্মুখে ৮।১০ হাত যায়গা থাকিলেই হইবে।]

"বলগুলি আবার কুড়াইয়া আন" (বালকগণের তদ্রূপ করণ)

[এবারে মুখামুখী করিয়া তুই তুই জন বালককে দাঁড় করাও] "তুমি ওর কাছে বল্ গড়াইয়া দাও, ও তোমার কাছে বল্ গড়াইয়া দিউক।" (৩।৪ বার এইরূপ করণ)

এবারে এক এক জোড়া বালকের নিকট হইতে একটী বল্ ফিরাইয়া লও ও এক জনকে অপর জনের নিকট বল্‌টী উচু করিয়া ফেলিতে বল ও অপর বালককে সেই বল্ শূন্যে ধরিতে বল ; আবার তাহাকে এইরূপে ফেলিতে বল ইত্যাদি। ৩।৪ বার এইরূপ অভ্যাস করাও। বালক দুইটীর মধ্যে যেন ৩।৪ হাতের অধিক ব্যবধান না থাকে।

জিজ্ঞাসা কর "বলের আকার কেমন"। না পারিলে বলিয়া দাও "বলের আকার গোল"। বালকগণ বলিবে "বলের আকার গোল" জিজ্ঞাসা কর "আর কোন্ জিনিষের আকার গোল" ? এবারে বালকেরা

নানা জিনিষের নাম করিতে পারিবে, যথা—"লাড়ু, মুড়ির মোয়া,রসগোল্লা, ছানাবড়া"। ছেলেরা খাবার জিনিষই বেশী পছন্দ করে, সেই জন্য তাহারা সম্ভবতঃ এই সকল জিনিষেরই নাম করিবে। না পারিলে শিক্ষক এইরূপে আদায় করিতে চেষ্টা করিবেন।—

"খুব মিষ্টি, রসে ডুবান থাকে, গোল গোল কি খাবার নাম কর ত"?—রসগোল্লা। ইত্যাদি।

তারপর শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিবেন "বল ত, কি কি ফল বলের মত গোল"?—কমলালেবু। "কমলালেবু কি ঠিক এই বলের মত গোল"? (বালকের হাতে বল ও কমলালেবু দাও)

বালক।—কমলালেবুর দুইদিকে একটু গর্ত্ত আছে, বলের তা নাই। (যদি এই পাঠ দেওয়ার সময় কমলালেবু না পাওয়া যায় তবে কমলার কথা তুলিও না।)

একটা গাব দেখাও। আর বলের সহিত তুলনা করিতে বল। বালক।—গাব বেশ গোল, কেবল বোঁটার কাছে একটু গর্ত্ত। একটা বেল দেখাও। বেলের সহিত বলের আকারের তুলনা করিতে বল।

বালক।—বলটী বেশ গোল, বেল তেমন বেশ গোল নয়—মাঝে মাঝে উচু নীচু আছে। (বালক না বুঝিতে পারিলে শিক্ষক এই পার্থক্য বুঝাইয়া দিবেন) এই সকল ফলের মধ্যে যেগুলি সময় উপযোগী তাহা সংগ্রহ করিবে ও এক একটী করিয়া বলের সহিত তুলনা করাইবে:— সুপারী, তাল, নারিকেল, লেবু, কমলালেবু, গাব, বেল, বাতাবীলেবু (জাম্বুরা), জাম, কুল, ডুমুর, লীচু ইত্যাদি—(এই উপলক্ষে বালকগণকে অনেক গুলি ফলের নাম শিখান হইবে।)

এখন একটা হাঁসের বা মুরগীর ডিম দেখাও। "ডিমের আকার কি বলের মত গোল"? না, ডিম একটু লম্বা। ফলের মধ্যে যে গুলির ডিমের

মত আকার সে গুলি দেখাইতে বল ও নাম করিতে বল। কাগজীলেবু, নারকেলীকুল ও লিচুর আকার ডিমের মত। "আমাদের শরীরের কোন্ যায়গা গোল" ? "মাথাটা গোলাকার বটে, কিন্তু বলের মত গোল নয়"। খেলার মারবেল্, মটর, বন্দুকের গুলি, ঔষধের বড়ি প্রভৃতি গোল। আর যে সকল গোল জিনিষ দেখাইতে পার তাহা দেখাও ও তাহার পরিচয় করাও।

এই কবিতার আবৃত্তি করাও :—

১। রসগোল্লা, লালমো'ন, গোল ছানাবড়া,
মতিচুর, মিহিদানা, লাড়ু, রসকরা ॥
২। তাল, বেল, গাব গোল, গোল টোপাকুল,
কমলা, বাতাবী আর নাই-যার-ফুল ॥

('নাই-যার-ফুল'—অর্থাৎ ডুমুর। ডুমুরের ফুল, ফলের অভ্যন্তরে থাকে বলিয়া দেখা যায় না। তাই লোকে বলে—ডুমুরের ফুল নাই)

[একটা বিশেষ কথা—শিক্ষকেরা যেন ইহা মনে না করেন যে শিক্ষাদানে কেবল এই কয়েকটী মাত্র প্রশ্নই করিতে হইবে ও ঠিক এই প্রণালীই অবলম্বন করিয়া বালকের নিকট হইতে এইরূপ উত্তর আদায় করিতে হইবে। এই পাঠে শিক্ষাদানের আদর্শ দেখান হইয়াছে মাত্র। বালকগণের বয়স ও বুদ্ধিবৃত্তি বিবেচনায় প্রশ্নের অনেক তারতম্য ঘটিবে ও বিষয়টীকেও অপেক্ষাকৃত সরল বা শক্ত করিতে হইবে। শিক্ষকগণ চিন্তা করিলে কত নূতন নূতন ও সুন্দর পদ্ধতির আবিষ্কার করিতে পারিবেন। আর তাহাই চাই—পুস্তক দেখিয়া তোতা পাখীর মত পাখী পড়ান পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নয়।]

—o—

২। রঙ (সাদা ও কাল—চক্ষুর সাহায্যে)

উপকরণ—সাদা ও কাল রঙের দুইটী উলের বল, সাদা ও কাল রঙের কাপড়, কাগজ প্রভৃতি (যদি সাদা ও কাল রঙের উলের বল না জোটে, কেবল সাদা ও কাল কাপড়, কাগজ প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেই হইবে)।

বালকদিগের হাতে কাল সাদা উলের বল্ বা কাপড় কি কাগজের টুকরা দাও। ডান হাতে সাদা জিনিষটী ও বাম হাতে কাল জিনিষটী দিবে। বালকেরা ডান বাম না জানিলে এই পাঠ উপলক্ষে তাহাও শিখাইতে চেষ্টা করিবে। জিজ্ঞাসা কর—"যে হাতে সাদা বল্ (বা কাগজ কি কাপড়) আছে সেই হাত তোল।"

শিক্ষকের নিজের হাতেও সাদা ও কাল জিনিষ থাকিবে। তিনিও উপরোক্ত প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাত তুলিবেন। যে বালকেরা সাদা কাহাকে বলে জানে না, তাহারা শিক্ষকের হাতের জিনিষ দেখিয়া বুঝিতে পারিবে। "যে হাতে সাদা বল্ (কাগজ বা কাপড়) আছে সে হাত নামাও।" (বালকগণের তদ্রূপ করণ) "যে হাতে কাল বল্ (কাপড় বা কাগজ) আছে সেই হাত তোলা। ইত্যাদি।

"ডান হাত তোল"। শিক্ষক নিজেও তুলিবেন। "ডান হাতে কি রঙের কাগজ আছে ?

বালকগণ।—ডান হাতে সাদা রঙের কাগজ আছে। এইরূপে "বাম হাত তোল—বাম হাতে কি রঙের কাগজ আছে ?" ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে হইবে। তারপর "কাল কাগজ (বল্ বা কাপড়) টেবিলে (বা মাটীতে) রাখিয়া দাও।" "সাদা কাগজ মাটীতে রাখিয়া দাও।" "কাল কাপড় তুলিয়া লও।" "সাদা বল্ গড়াইয়া দাও।" ইত্যাদি রূপ প্রশ্ন করিতে হইবে। বালকগণকে কাগজ খণ্ড বা বল্ গুলি সম্মুখে রাখিতে বল। "চোখ বুজিয়া কাল কাগজ খানি উঠাও" (চোখ বুজিলে যে রঙ দেখা যায় না ইহাই বুঝান উদ্দেশ্য) "তবে আমরা কোন্ ইন্দ্রিয়ের

সাহায্যে রঙ চিনিতে পারি" ?—চোখের সাহায্যে রঙ চিনিতে পারি। (আকার ও বর্ণ দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়) "তোমাদিগের শরীরে কি কি কাল জিনিষ আছে ?" উত্তর—মাথার চুল, ভ্রূ, চোখের মণি, জুতা। "কি কি সাদা জিনিষ আছে ?" আঙ্গুলের নখ, দাঁত, চোখের মণিপাশ, কাপড়, জামা, চাদর। "এই ঘরে কি কি কাল জিনিষ আছে ?"—ছাতা, স্লেট, দোয়াত, কালি, বোর্ড, যতুর কোট, আমাদের পায়ের জুতা, ইয়াসিনের টুপি। "এই ঘরে কি কি সাদা জিনিষ আছে ?" কাগজ, কাপড়, চক্। "খাবার জিনিষের মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিষ সাদা ?"—ভাত, ময়দা, দুধ, ছানা, দই। "কোন্ কোন্ জিনিষ কাল ?" মাছের ঝোল, পুরান তেতুল, কাল জাম।

"কয়েকটা কাল পাখীর নাম কর" ? (এই উপলক্ষে কয়েকটা পাখীর নাম শিখাইতে পারিবে। কিন্তু কেবল নাম শিখাইলে হইবে না, পাখীগুলির পরিচয় করান আবশ্যক)—কাক, কোকিল, ফিঙ্গে। "কয়েকটা সাদা পাখীর নাম কর" ?—বক, রাজহাঁস, পায়রা। (হাঁস ও পায়রা যে কাল রঙেরও আছে, তাহা হয় ত কোন বালক দেখিয়া থাকিবে। কেহ না জানিলে বলিয়া দিবে।)

কালোপযোগী কতকগুলি সাদা ফুল সংগ্রহ করিয়া রাখিবে আর এই উপলক্ষে বালকগণকে কতকগুলি ফুলের নাম শিখাইবে। কাল জিনিষের মধ্যে আল্কাতরা সাধারণ ব্যবহারে লাগে। আর এই জিনিষ গাঢ় কাল। আলকাতরা দেখাও ও নাম শিখাও। উত্তম চূণ সাদা রঙের আদর্শ। তারপর অধিক কাল, অল্প কাল, অধিক সাদা, অল্প সাদা, তুলনা করিতে শিখাও। "মাথার চুল ও এই লোহার প্রেক্—কোন্‌টী বেশী কাল ? ধোয়া কাপড় ও ময়লা কাপড়—কোন্‌টী বেশী সাদা ?" এইরূপ ৫।৬টী প্রশ্ন দ্বারা গাঢ় রঙ ও পাতলা রঙের পার্থক্য করিতে শিখাও। এখন এই কবিতার আবৃত্তি করাও :—

১। দুধ, ভাত সাদা আর সন্দেশ মাখন।
দই, ছানা, খই, মুড়ি, ময়দা, লবণ॥
২। ভুরু, মনি, চুল যত কালো।
মুখখানি তত দেখতে ভালো॥
দাঁত, মনিপাশ সাদা হলে।
মুখের শোভা বাড়িয়ে তোলে॥
(চোখের সাদা অংশকে মণিপার্শ্ব বা মণিপাশ বলে।)

[মন্তব্য—বিজ্ঞানের মতে সাদা ও কাল কোন বিশেষ রঙ নয়। সাদা—সকল বর্ণের সমষ্টি ; আর কাল—রঙের অভাব মাত্র। এ সকল কথা বালকেরা বুঝিবে না। সাধারণ ব্যবহারে সাদা ও কাল—রঙ বলিয়াই প্রচলিত। বালকদিগকে এখন এই প্রচলিত অর্থই শিখাইবে।]

৩। তেল্‌তেলে ও খস্‌খসে (স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যবহার)

উপকরণ—কাঠের টুক্‌রা, স্লেট, টিন, শিরিষ কাগজ, আয়না, ডুমুরের পাতা, কচুর পাতা, পশমী র‍্যাপার কি কোট ও মখমলের বা সাটীনের কাপড় বা জামা ইত্যাদি নানারূপ খস্‌খসে ও তেল্‌তেলো জিনিষ।

বন্ধুর ও মসৃণ কথা ব্যবহার করিও না। খস্‌খসে তেল্‌তেলে কথা ব্যবহার কর। এই পাঠ দ্বিতীয়বার শিক্ষা দিবার সময় বন্ধুর ও মসৃণ শব্দ দুইটী ব্যবহার করিতে পার। অর্থাৎ যখন বালকেরা এই দুইটী শব্দ বানান করিতে ও লিখিতে পারিবে, তখন তাহাদিগকে শিখাইয়া দিবে। তেল্‌তেলে ও খস্‌খসে গুণ দুইটীর পরস্পরের তুলনায় শিখাইতে হইবে। প্রথমে খুব খস্‌খসে ও খুব তেল্‌তেলে দুইটী জিনিষ বালকগণের সম্মুখে রাখ। এখন প্রশ্ন কর "এই কাঠের টুক্‌রা ও এই স্লেট—হাত দিয়া দেখ ত কোন্‌টী তেল্‌তেলে আর কোন্‌টী খস্‌খসে ?" (বালকগণের পরীক্ষা-করণ) "এই শিরিষ কাগজ ও এই কাচ—কোন্‌টী তেল্‌তেলে ? এই

ডুমুরের পাতা ও এই কচুর পাতা—কোন্‌টী খস্‌খসে এই পশমী র‍্যাপার ও এই সাটীনের কোট—কোন্‌টী কেমন?" ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া তুলনা করিতে শিখাও। "আচ্ছা, তেল্‌তেলে ও খস্‌খসে জিনিষের কোন্‌টীর উপর হাত বুলাইলে আরাম বোধ হয়?" তেল্‌তেলে জিনিষের উপর হাত বুলাইলে বেশ ভাল বোধ হয়। "খস্‌খসে জিনিষের উপর জোরে হাত বুলাইলে (শিরিষ কাগজ বা খুব খস্‌খসে কাঠের উপর হাত বুলাইয়া পরীক্ষা করাও) কিরূপ বোধ হয়?"

হাতে ব্যথা লাগে। "আচ্ছা চোখ্‌ বুঁজিয়া বলিতে পার কোন্‌ জিনিষটী তেল্‌তেলে ও কোন্‌টী খস্‌খসে?"—পারি। (বালকগণ চোখ্‌ বুঁজিয়া পরীক্ষা করিবে) "আচ্ছা কোন্‌ জিনিষ তেল্‌তেলে ও কোন্‌ জিনিষ খস্‌খসে তাহা হাত না দিয়া বুঝিতে পারা যায় কি না?" বালক চোখ্‌ বুঁজিয়া থাকুক। বালকের গায় মখমল ও পশমী কাপড়, ডুমুরের পাতা ও কলার পাতা, শিরিষ কাগজ ও কাচ বুলাইয়া দেখাও।

"তা হলে আমরা শরীরের কোন্‌ জিনিষের দ্বারা তেল্‌তেলে ও খস্‌খসে বুঝিতে পারি?" আমাদিগের চামড়া দ্বারা। (দ্বিতীয় বার এই পাঠ দেওয়ার সময় বলিয়া দিবে চামড়াকে ভাল কথায় ত্বক্‌ বলে; ত্বক্‌ স্পর্শেন্দ্রিয়)।

৪। আস্বাদ (মিষ্টি ও টক্‌—জিহ্বার শিক্ষা)

উপকরণ—চিনি, মিশ্রি, গুড়, মধু প্রভৃতি মিষ্ট জিনিষ ও তেঁতুল, লেবু, কাঁচা আম বা শুক্‌না আম প্রভৃতি টক্‌ জিনিষ, একটু খুব পরিষ্কার মিশ্রির (সরবত) জল ও দুইটী গেলাস বা বাটী।

[মন্তব্য।—যাহারা চিনি, মিশ্রি, তেঁতুল প্রভৃতির আস্বাদ জানে তাহাদিগের জন্য এ পাঠ নয়, যে সকল ছোট ছোট শিশু জানে না অথবা সামান্যরূপ জানে, এই পাঠ তাহাদের জন্য।]

বালকদিগের মুখে একটু চিনি দাও। "কেমন লাগে?"—ভাল লাগে। "বল যে মিঠা লাগে—চিনি মিঠা।"—(বালকদিগের তদ্রূপ কথন)। একটু একটু লেবুর রস দাও। "কেমন লাগে?" টক্। কেহ না বলিতে পারিলে বলিয়া দাও—"লেবুর রস টক্"। এইরূপ গুড়, মিশ্রি, মধু খাওয়াও ও এই সকল জিনিষের নাম শিখাও। তেঁতুল, কাঁচা আম বা আমচুর খাওয়াও ও তাহাদের পরিচয় করাও। সকল বালককে এখন সমস্বরে বলাও "চিনি, মিশ্রি, মধু—মিঠা। লেবু, তেঁতুল, কাঁচা আম, আমড়া, কুল—টক্"। "চিনি যে মিঠা তা কি হাত দিয়া বুঝিতে পারা যায়?"—না। "গুড় যে মিঠা তা কি চোখ্ দিয়া দেখিয়াই বলিতে পার?" হাঁ পারি। এ যে গুড় তাহা জানি, আর এ যে মিঠা তাহাও জানি। "মিঠা যে তাহা কেমন করিয়া জান?" খাইয়া দেখিয়াছি। "তা হলে কোন জিনিষ মিঠা কি টক্ তাহা না খাইলে বুঝিতে পারা যায় না"। বালকগণের অসাক্ষাতে পূর্ব্বেই নিম্নলিখিতরূপে তিনটী গেলাস প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। এক গেলাসে খুব পরিষ্কার মিশ্রির সরবত, এক গেলাসে কেবল জল আর এক গেলাসে জলের সঙ্গে দুই এক ফোঁটা লেবুর রস। সাবধান বেশী রস দিও না, তাহা হইলে জল ঘোলা হইয়া যাইবে। এখন বালকগণের সম্মুখে এই তিনটী গেলাস রাখিয়া জিজ্ঞাসা কর। "এই তিনটী গেলাসে কি আছে?" জল। "জলের কোন স্বাদ আছে?"—না। এখন যে গেলাসে বিশুদ্ধ জল আছে তাহাই খাইতে দাও। "কি খাইলে"? জল খাইলাম। আচ্ছা এই দুই গেলাসে কি আছে?" জল আছে। "কিসে বুঝিলে?"—জলের মতই দেখাইতেছে। "আচ্ছা এই গেলাসের জল খাও। কেমন লাগে?" মিঠা। "এখন এই গেলাসের খাওঃ কেমন লাগে?" এ গেলাসের জল টক। "তা হলে এখন দেখ চোখ দিয়া দেখিয়া মিঠা কি টক্ তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তবে কেমন করিয়া বুঝিতে পারি?" খাইয়া বুঝিতে পারি। "হাঁ আমরা

জিহ্বার দ্বারা টক্, মিঠা বুঝিতে পারি।" বালকের অসাক্ষাতে একটু চিনির সহিত একটু লেবুর রস মিশাও আর মিশ্রির সরবতেও দুচার ফোঁটা লেবুর রস দাও। এখন বালককে চিনি দেখাও ও জিজ্ঞাসা কর "এই কাগজে কি আছে?" এ চিনি। "চিনি খাইতে কেমন লাগে?" চিনি মিঠা। "আচ্ছা এই চিনি খাইয়া দেখ"। ইহা মিঠা আর টক্ টক্। "তা কি চোখ দিয়া দেখিয়া বুঝিয়া ছিলে?" না চোখ দিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারি নাই, খাইয়া বুঝিলাম। "আচ্ছা এই গেলাসে কি আছে?" মিশ্রির সরবত। আর কিছু আছে? তা না খাইলে বলিতে পারিব না। "তবে খাইয়া দেখ? কি বুঝিলে?" মিশ্রির সরবতের সঙ্গে লেবুর রস আছে। বালকগণের দ্বারা সমস্বরে বলাও—

মধু, মিশ্রি, গুড়, চিনি খেতে লাগে মিঠা।
বেশী খেলে কৃমি হয় এই বড় লেঠা॥
আমড়া, তেঁতুল, কুল, কাঁচা আম টক্।
বেশী খেয়ে জ্বরে ভোগে অনেক বালক॥

নানাবিধ মিষ্ট খাদ্য দ্রব্যের নাম করিতে বল:—যথা—সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতাওয়া, ছানাবড়া, জিলাপি, (যে বালক যে কয়টা বলিতে পারে)। মিষ্ট ফলের নাম করিতে বল:—কলা, বেল, কাঁঠাল, পেঁপে, কিস্‌মিস্ ইত্যাদি। টক্ ফলের নাম করিতে বল:—তেঁতুল, লেবু, কুল, আমড়া, কামরাঙ্গা, জলপাই। (বালকেরা যে যে কয়টার নাম বলিতে পারে তাহাই পরীক্ষা করিবে। গ্রামে যদি আমড়া, কামরাঙ্গা প্রভৃতি অন্য প্রকার টক্ ফল থাকে ও বালকগণের পরিচয় করান সহজ হয় তবে তাহা শিখাইবে। যত লেখা হইল সবই যে শিখাইতে হইবে তাহা মনে করিও না) "আম, কমলা, আনারসের স্বাদ কেমন?"—মিষ্টি ও টক্ মিশান। (সুবিধা হইলে আম, কমলা কি আনারস সংগ্রহ করিয়া

রাখিবে। বালকেরা খাবার জিনিষ পাইলে খুব খুসী হয়। সুতরাং এইরূপ সামান্ত সামান্ত জিনিষ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের চিত্তাকর্ষণ করাই কর্ত্তব্য)

৫। নানারূপ শব্দ (কর্ণের সাহায্যে)

উপকরণ—কাঠের টুকরা, থালা, টাকা, ছেলেদের খেলার ঢোল, বাঁশী বা কোনরূপ তারের বাদ্যযন্ত্র। মাটীর হাঁড়ি দুইটা—ভাল ও ফাটা।

"কুকুর কেমন ক'রে ডাকে?"—ঘেউ ঘেউ করে ডাকে। "শেয়াল কেমন ক'রে ডাকে?"—ক্যাহুয়া, ক্যাহুয়া ক'রে ডাকে? "চোখে দেখিয়া শেয়াল, কুকুর চিনিতে পার?" হাঁ পারি। দুই জানোয়ারের দুই রকম চেহারা। "না দেখে চিনিতে পার?"—না, পারি না। "ডাক শুনিয়া চিনিতে পার?" হাঁ পারি। শেয়াল ডাকে ক্যাহুয়া ক্যাহুয়া আর কুকুর ডাকে ঘেউ ঘেউ। "সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিলে কোন্ কোন্ পাখীর ডাক শুনিতে পাও?"—কাকের, মোরগের, হাঁসের। "কেমন করিয়া বুঝিতে পার যে কাক কি মোরগ ডাকিতেছে?" শব্দ শুনিয়াই বুঝিতে পারি। কাক ডাকে কাকা আর মোরগ ডাকে কঁক্—কঁ, আর হাঁস টাঁ্যা টাঁ্যা করে। "আচ্ছা চোখ বোঁজ (একজন চোখ বন্ধ করিল। এখন এক একটী ছেলেকে কথা বলিতে বল ও যে চোখ্ বুঁজিয়াছে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর।)—কে কথা বলিল বল ত?"—যদু কথা বলিতেছে। "এবারে কে বলিল?" এবারে হরি কথা বলিল। "কেমন করিয়া বুঝিলে?"—দুই জনের আওয়াজ দুই রকম, শুনিয়াই বুঝিলাম। (এইরূপে সকল ছেলেকেই এক একবার পরীক্ষা কর) "তামাসা দেখ্‌লে তোমরা কি কর? হিহি করিয়া হাসি।" আর মার খেলে?" কাঁদি। "কোন্‌টী সুখের শব্দ?" হাসি। আর কোন্‌টী কষ্টের?" কান্না। "মা যখন 'আয় আয়, চাঁদ আয়' বলে খোকাকে

ঘুম পাড়ান, তখন তাঁর আওয়াজ কেমন শুনায়?" বেশ মিষ্ট শুনায়। "হাঁ একে বলে আদরের স্বর"। আর যখন মা রাগ করে দুষ্ট ছেলেকে 'পাজী গাধা' বলে গালাগলি দেন তখন তাঁহার কথা কেমন শুনায়?" ভাল শুনায় না। "হাঁ সে রাগের স্বর, ভাল শুনায় না।"

ঢোল বাজাও আর বাঁশী বা তারের কোন যন্ত্র বাজাও "কোন স্বর শুন্‌তে ভাল?" বাঁশীর স্বর। "হাঁ বাঁশীর স্বর মিষ্ট'। একজন যদি অনেক দূরে থাকে, তবে লোকে তাকে কেমন করে ডাকে?"—চেঁচাইয়া ডাকে। (একজন বালককে দূরে পাঠাইয়া অপর একজনের দ্বারা ডাকাও) "চেঁচাইয়া ডাকে কেন?" জোরে ডাকিলে অনেক দূর হইতে শুনা যায়। "তোমরা গান শুনেছ—রাস্তা দিয়া যখন কেউ গান করিতে করিতে যায়, তখন তোমরা বাড়ীতে বসিয়াই শুনিতে পাও। "সেই গানের শব্দ বড় না ছোট?"—সেই গানের শব্দ বড়। "আচ্ছা চেঁচানের শব্দ ও গানের শব্দের মধ্যে কোন্ শব্দ ভাল?"—গানের শব্দই ভাল। একটা লোহার প্রেক্ দিয়া কাঠে আঘাত কর, থালায় আঘাত কর, টাকায় আঘাত কর। জিজ্ঞাসা কর "তিন জিনিষের শব্দই কি এক রকমের?"—না, তিন রকমের—কাঠের শব্দ ঠক্ ঠক্, থালের শব্দ ঝন্ ঝন্, আর টাকার শব্দ টুন্ টুন্। "চোখ বুজিয়া বুঝিতে পার কি কোন্ জিনিষের শব্দ হইতেছে?" হাঁ, পারি। (কাঠ, থালা ও টাকায় শব্দ করিয়া বালকগণকে পরীক্ষা কর—তাহারা চোখ্ বুঁজিয়া শব্দ বুঝিতে পারে কি না), মাটীর ভাল হাঁড়ীটী বাম হাতে লইয়া তাহার গায়ে ডান হাত দিয়া বাজাও। তার পর ফাটা হাঁড়ীটীও বাজাও। দুইটীর আওয়াজের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

"ভাল হাঁড়ীর আওয়াজ কেমন?—টন্ টন্। ভাঙ্গা হাঁড়ীর আওয়াজ কেমন"?—খ্যান্ খ্যান। বালকদিগের হাতে হাঁড়ী দিয়া পরীক্ষা করিতে শিখাও। সুবিধা হইলে আরও দুই একটী কাঁসার, পিতলের বা চিনা-

মাটীর ফাটা বাসনের শব্দের পরীক্ষা দেখাইতে পার। এই কবিতা শিখাও :—

টাকা বাজে টুন্ টুন্
মল বলে ঝুন্ ঝুন্
থালা বাজে ঝন্ ঝন্
মাটী হাঁড়ী টন্ টন্
ফাটা হাঁড়ী খ্যান্ খ্যান্
ভাঙ্গা থাল ঝ্যান্ ঝ্যান্
মেকী টাকা টক্ টক্
কাঠ বলে ঠক্ ঠক্
হাত ঘণ্টা টঙ্ টঙ্
পেটা ঘণ্টা ঢঙ্ ঢঙ্
ঘড়ি বলে টিক্ টিক্
কর কাজ ঠিক ঠিক ॥

৬। সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ (নাসিকার ব্যবহার)

উপকরণ—একটু গোলাপজল বা অন্য কোনরূপ সুগন্ধি পদার্থ, চন্দন, নানারূপ সুগন্ধি ফুল (গোলাপ, বেল, জুঁই, চাঁপা, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধ, কেতকী, নাগকেশর প্রভৃতি যে যে ফুল সংগ্রহ করিতে পারা যায়) কেরোসিন তেল, গাঁদালের পাতা, গন্ধক, ধূপ, (যদি সংগ্রহ করিবার সুবিধা থাকে তবে শুকনা মাছ, পচা ডিম প্রভৃতি) তুলসার পাতা, পান কর্পূরের পাতা বা অন্য কোন সুগন্ধি পাতা, একটা দেশলাই।

এক পাত্রে একটু গোলাপজল রাখ, অন্য পাত্রে পরিষ্কার কেরোসিন তেল রাখ। জিজ্ঞাসা—কর দেখ ত কোন্ জিনিষের গন্ধ কেমন?" এইটার গন্ধ ভাল, এইটার গন্ধ খারাপ। "যেটার গন্ধ ভাল তাকে কি বলে জান?" কেহ বলিতে পারে ভাল, না জানিলে বলিয়া দাও।

গোলাপ ফুল দেখাও ও বলিয়া দাও যে "জলে এই ফুল ফেলিয়া রাখ্‌লেই এইরূপ গন্ধ হয়"। (গোলাপ জল প্রস্তুতের বিস্তৃত প্রণালী বলিবার দরকার নাই।) "যেটীর গন্ধ খারাপ সেটী কি জিনিষ জান?" জানি, কেরোসিন তেল। "এখন কোন্ জিনিষের কি রূপ গন্ধ তাহা গন্ধ লইয়াই বুঝিতে পারিবে কি না?"—হাঁ পারিব। গোলাপ জলের গন্ধ ভাল, কেরোসিনের গন্ধ খারাপ। (তারপর চন্দন ও গোবর দেখাও) "কোনটীর গন্ধ কেমন বল?" এইটীর গন্ধ ভাল আর এইটীর খারাপ। (কোনটী কি জিনিষ নাম জিজ্ঞাসা কর) বালকগণ সমস্বরে বলিবে "চন্দনের গন্ধ ভাল, গোবরের গন্ধ খারাপ"। একটু ধূপ জ্বালাও ও একটু গন্ধক জ্বালাও। "কোনটীর ধূমের গন্ধ ভাল?" এইটীর গন্ধ ভাল আর এইটীর খারাপ। জিনিষের নাম বলিয়া দাও। বালকগণ সমস্বরে বলিবে "ধূপের গন্ধ ভাল, গন্ধকের গন্ধ খারাপ। দুইটী পাতা লও—একটী পান-কর্পূরের (বা অন্য কোন সুগন্ধি পত্র) অন্যটী গাঁদালের। আগে পানকর্পূরের পাতা হাতে রগড়াও, তার পর গাঁদালের পাতা রগড়াইয়া ঐ উভয় রগড়ান পাতা বালকদিগের নাকের নিকট ধর। কোন্‌টীর গন্ধ ভাল আর কোন্‌টীর গন্ধ খারাপ জিজ্ঞাসা কর। পাতা দুইটীর নাম শিখাইয়া দাও। দুইটী ফুল লও, একটী সুগন্ধযুক্ত অপরটী গন্ধ বিহীন। জিজ্ঞাসা কর "এই ফুল দুইটীর কোন্‌টীর গন্ধ আছে, আর কোন্‌টীর গন্ধ নাই?"—তা দেখিয়া বলা যায় না। "কেমন করিয়া বুঝিতে পারা যায়?"—গন্ধ লইয়া বুঝিতে পারা যায়। (বালকদিগের হাতে ফুল দুইটী দাও; তাহারা গন্ধ লইয়া বলিবে কোনটীর সুগন্ধ আছে আর কোনটীর সুগন্ধ নাই) সুগন্ধি ফুলের নাম কর। নির্গন্ধ ফুলের নাম কর নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করাও :—

১। গোলাপ, চামেলী, চাঁপা, জুঁই, লেবুফুল,
কামিনী, কুটজ, কেয়া, কদম্ব, বকুল,

নাগেশ্বর, গন্ধরাজ, বেল, শেফালিকা,
সুগন্ধ রজনীগন্ধা, মালতী, মল্লিকা।

২। করবী, টগর, জবা, দোপাটী, ধুতুরা,
পদ্ম, বক, সূর্য্যমুখী, গাঁদা, কৃষ্ণচূড়া,
অতসী, অপরাজিতা, অশোক, রঙ্গন,
নির্গন্ধ শিমুল, কুন্দ, পলাশ, কাঞ্চন।

(সময় মত বিদ্যালয়ের বাগান বা অন্য কোন বাগান হইতে এই ফুলগুলি সংগ্রহ করিয়া পরিচয় করাও)

৭। আকার (বল্, ঢোল ও ছক)

উপকরণ—ঠাকুর গড়া মাটী ও কতকগুলি ধারাল বাঁশের চটা। যদি কাঠের বল্, ঢোল ও ছক সংগ্রহ করিতে পার তবে কাজের সুবিধা হইবে।

একটা মাটীর বল্ তৈয়ারী কর। বালকদিগকে জিজ্ঞাসা কর "এটা কি জিনিষ হ'ল?" এটা একটা বল্ হ'ল।

বালকদিগের হাতেও একটু করিয়া মাটী দাও ও বাম হাতের তালুর উপর মাটী রাখিয়া ডান হাতের তালু দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কেমন করিয়া বল প্রস্তুত করিতে হয় তাহা দেখাইয়া দাও। বালকেরা সকলেই একটী করিয়া বল্ গড়ুক।

"আমি এই বলের এইটুক কাটিয়া ফেলিলাম—তোমরাও এইটুক কাটিয়া ফেল।" বালকেরা নাও পারিতে পারে—হাত ধরিয়া দেখাইয়া দাও। তোমার মত সুন্দর না হইলে কিছু বলিও না। একদিনে সেরূপ হয়ও না। "আবার বলের ঠিক উল্টা দিক এই মত করিয়া কাট" (বালকদিগের তদ্রূপ করণ)। "এখন এটা কোন জিনিষের মত হইল?"—এটা একটা কাঠের ঢোলের মত হইল। "কোন্ দিকে বাজায়?" (বালকেরা দেখাইয়া দিবে) "যেদিকে বাজায় সেদিকে কি

দিয়া ঢাকা থাকে ?" সেদিকে চামড়া দিয়া ঢাকা থাকে। "আচ্ছা এখন ঢোলের এই পেটমোটা জায়গাটা টিপিয়া সমান কর।" (শিক্ষক নিজে করিবেন ও বালকেরা তাহার অনুকরণ করিবে।) "এখন কোন্ জিনিষের মত হইল ?"—এখন টিনের ঢোলের মত হইল। "হাঁ ঠিক কথা, কাঠের ঢোলের একটু পেটমোটা থাকে—টীনের ঢোলের তা থাকে না।"

"আচ্ছা আর কোন্ জিনিষের মত দেখাচ্ছে ?—বড় থামের মত, (যদি বালকেরা বড় থাম দেখিয়া থাকে) হাতীর পায়ের মত, গেলাসের মত, গলাভাঙ্গা বোতলের মত, কতকটা পাশবালিশের মত, বাঁশের চোঙ্গের মত ইত্যাদি।

এখন একটা বাঁশের চোঙ্গ, সুপারী গাছের একটী খণ্ড, এক পাঁপ আক্, একখণ্ড কলাগাছ, কোন বৃক্ষের কাণ্ডের এক অংশ বালকদিগের সম্মুখে উপস্থিত কর। জিজ্ঞাসা কর "এ সকল জিনিষ কোন জিনিষের মত ?"—ঢোলের মত। "মানুষের পা, মানুষের হাত, পশুর দেহ, সাপের শরীর, গাছের গুঁড়ি, গাছের ডাল প্রভৃতি যে ঢোলাকার তাহা প্রশ্ন করিয়া আদায় কর।"

"বলের কয়টা পাশ ?"—বলের একটা পাশ। "ঢোলের কয়টা ?"—ঢোলের তিনটা। "বল যেমন গড়ায়, ঢোল কি তেম্নি গড়াইতে পারে ?"—গোল পাশে গড়াইয়া দিলে বলের মত গড়াইতে পারে, কিন্তু চেপটা পাশে গড়াইলে চলিবে না। তার পর ঢোলের চারিধারে ছুরীর দ্বারা চার বার কাটিয়া ছক্ তৈয়ারী কর। "এবারে কোন্ জিনিষের মত আকার হইল ?"—বাক্সের মত আকার।

"এর কটা পাশ আছে গণ।" এর ছটা পাশ আছে। "হাঁ ঠিক কথা, এই জন্যই একে ছক্ বলে। ছক্ কি বলের মত বা ঢোলের মত গড়াইতে পারে ?"—না পারে না, ছকের একটা পাশও গোল নয়—ছটী পাশই চেপটা। "ছয় পাশ ওয়ালা আর একটা জিনিষের নাম

কর ত ?"—ইঁট। হাঁ, তুমি আর একটা বল।" পুস্তক। "আর দুচারটী বল।" টেবিল, বেঞ্চের পায়া, ঘরের বিম, বর্গা ইত্যাদি।

এখন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ শিখাও। তবে এই সকল শক্ত কথা এখন ব্যবহার করিও না। আগে ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ শিখাও "এই ঘরটা কি ঢোলের মত না ছকের মত ?" ছকের মত। "এই ঘরের যে পাশটা বড় তাকেই ঘরের লম্বা পাশ বলে—কোন্ পাশটা লম্বা দেখাও ত।" (বালকগণের প্রদর্শন) "আর যে পাশটা ছোট তাকে ওশার পাশ বলে—কোন্‌টা ওশার পাশ দেখাও ত।" তার পর ঘরের উচ্চতার কথা বল। এক খানা লাঠির দ্বারা ছাদ ছুঁইয়া "এই ঘরটা এত উঁচু।" এখন এক-খানা ইঁট আন। ইঁটের কোন্ পাশটা লম্বা, কোন্ পাশটা ওশার ও কোন্‌টা উঁচু পাশ (বা পুরু পাশ) তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া আদায় কর। এইরূপ বাক্‌স, পুস্তক, প্রভৃতি লইয়া বালকগণের পার্শ্বের জ্ঞান পরীক্ষা কর।

এই কবিতা আবৃত্তি করাও :—

১। বলের আছে একটী পাশ ;
তাই গড়গড়িয়ে চলে।
শুধু একটু ঠেলা পেলে ॥

২। ঢোলের থাকে তিনটী পাশ ;
দুই চেপ্‌টা দিকে বসে।
আর গড়ায় গোল পাশে ॥

৩। ছকের চ্যাপ্‌টা ছটী পাশ ;
ছয় পাশেই বেশ দাঁড়ায়।
ছক্ একটু নাহি গড়ায় ॥
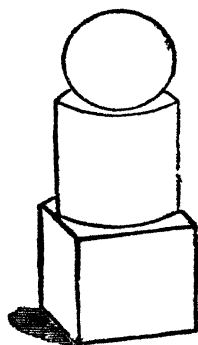
৮। রঙ (লাল, হলুদ, নীল)

উপকরণ—লাল, হলুদ ও নীল রঙের কাগজ, কাপড় ও ফুল। লাল, হলুদ ও নীল রঙের গুঁড়া। (এই সমস্ত গুঁড়া বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। দুচার পয়সার কিনিয়া রাখিলেই চলে। ম্যাজেণ্টার লাল রঙ নয়। ইহাতে বেশীর ভাগ লালের সঙ্গে একটু নীল মিশান আছে। প্রকৃত লাল রঙের গুঁড়া ভিন্ন জিনিষ। খুনখারাপি নামক এক প্রকার গুঁড়া বিক্রয় হয়, সে রঙ বেশ লাল। তাজা রক্তের রঙ, ডালিম ফুলের রঙ, চিনে জবার রঙ প্রকৃত লাল।)

লাল রঙের গুঁড়া কিনিয়া একটু জলে গুলিয়া দেখিবে যে ডালিম ফুলের রঙের সহিত মেলে কি না—যদি মেলে তবে ই বুঝিবে ঠিক লাল রঙের গুঁড়া হইয়াছে। কাঁচা হলুদের রঙ ঠিক হলুদ বর্ণ নয়—শুক্‌না হলুদের গুঁড়া হলুদ বর্ণ। কাঁচা হলুদের রঙ কমলা রঙের মত। ঝিঙে ফুলের রঙ প্রকৃত হলুদ বর্ণ। কনক-করবী, সর্ষপ প্রভৃতি ফুলের রঙও হলুদ। বাজারে পেউড়ি নামক এক প্রকার হলুদ রঙের গুঁড়া পাওয়া যায়। তাহা জলে গুলিয়া লইলেই হলুদ রঙ হইবে। নীল বড়ি কিনে একখান শ্লেটের উপর জলের সহিত ঘসিয়া লইলেই নীল রঙের কাজ চলিবে। খুব ঘন নীল রঙের ফুল বড় দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে অপরাজিতার দ্বারা কতকটা নীলের ভাব বুঝাইতে পারা যাইবে। নাল রঙের কাগজ, কাপড়, উল প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হইবে। পূজার সময় দর্জ্জির দোকানে গেলে নানা রঙের কাপড়ের ছাঁটি কুড়াইয়া আনিতে পারা যায়। একটু যত্ন থাকিলে, বিনা পয়সায়ও অনেক আবশ্যকীয় জিনিষ সংগ্রহ করিতে পারিবে। কয়েকটা তুলিও চাই। পাঁঠার ঘাড়ের লোম কাটিয়া তাহাতে তুলি প্রস্তুত করিবে। নিজে যদি না করিতে পার তবে গ্রামের ঠাকুরগড়া কুম্ভকার কি চিত্রকরের নিকট শিখিয়া লইবে।

৵১৫, ৴০ পয়সা করিয়া সাধারণ রকমের তুলি কিনিতেও পাওয়া যায়। তুলির আবার নম্বর আছে। সরু তুলির (৮।১০টী সরু স্চ একত্র করিলে যত মোটা হয় তত মোটা) নম্বর এক। ক্রমে যতই মোটা হইবে ততই নম্বর ২, ৩, ৪, করিয়া বাড়িয়া যাইবে। সাধারণ কাজের জন্য ৪।৫ নম্বরের তুলি আবশ্যক।

পূর্ব্বে যে কাল সাদা শিক্ষা দিয়াছ তাহার একবার পরীক্ষা কর। এখন কাল ও লাল রঙের কাপড় বা কাগজ একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা কর. "কোনটীর কি রঙ বল।"

বালকেরা কাল বলিতে পারিবে এবং সম্ভবতঃ লালও অনেক বালক বলিতে পারিবে। কারণ অতি শৈশবেই লাল রঙের প্রতি শিশুগণ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে 'লাল'—এই নামটী কেহ না জানিলে বলিয়া দাও "এই কাগজ কাল, এই কাগজ লাল।" বালকদিগের হাতেও টুক্‌রা টুক্‌রা কাগজ দিয়া এইরূপ বলাও। তার পর লাল ও কাল কাগজ খণ্ডগুলি একত্র করিয়া রাখ ও বালকগণকে "লাল কাগজ তোল, কাল কাগজ তোল" এইরূপ করিয়া পরীক্ষা কর। বালকের সম্মুখে ফুলের ডালি রাখ। লাল ফুলগুলি বাছিয়া লইতে বল। বালকের নিকট দর্জ্জির দোকানের ছাঁট রাখ ও তাহার মধ্য হইতে লাল কাপড় পৃথক করিতে বল।

এখন আবার একখণ্ড সাদা ও একখণ্ড হলুদ কাগজ লও। বালকগণকে পূর্ব্ববৎ পরীক্ষা কর। হলুদ রঙের নাম না জানিলে শিখাইয়া দাও। ফুলের ডালি হইতে হলুদ ও সাদা ফুলগুলি বাছিয়া বাহির করিতে বল। কাপড়ের ছাঁটের ভিতর যদি হলুদ কাপড় থাকে তবে তাহাও দেখাইতে বল।

এখন কাল ও নীল কাগজ দেখাও। এইবারে একটু বিশেষ যত্নে শিক্ষা দিবে। প্রথম প্রথম কাল ও নীল রঙে প্রায়ই গোলমাল করিবে। কাল কাপড় ও নীল কাপড় দিয়া পরীক্ষা কর। (আকাশের বর্ণ নীল বটে কিন্তু আকাশ খুব পরিষ্কার না থাকিলে তাহা বোঝা যায় না। আবার সে বর্ণও ঠিক নীল নয়, একটু পাতলা নীল। চিত্রকার্য্যে এ সমস্ত রঙের যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাই বলা হইতেছে। সাধারণতঃ আকাশকে নীল বলে কিন্তু চিত্রকর তাহাকে নীল না বলিয়া আসমানী বলে। পাতলা নীলের নামই আসমানী। 'আসমান' মানে আকাশ।)

এখন লাল, নীল ও হলুদ রঙের গুঁড়া আন ও জলে গুলিয়া লও। তুলির দ্বারা এক একটী রঙ লইয়া সাদা কাগজে দাগ দাও। কোন্‌টী কি

রঙ বালকগণকে জিজ্ঞাসা কর। বালকের হাতেও তুলি দাও, তাহাদিগকে ঐরূপ দাগ দিতে বল। "লালের দাগ দাও, নীলের দাগ দাও" ইত্যাদি। যদি চিত্র করিতে শিখিয়া থাক, তবে লাল রঙ দিয়া একটা সামান্য ফুল তৈয়ারী কর ও নীলের দ্বারা ডাল ও পাতা প্রস্তুত কর। এইরূপ দুই একটী চিত্র নিজে কর ও বালকগণকে শিখাইয়া দাও।

লাল রঙের মধ্যে আর একটু জল দাও। এখন দাগ দিয়া দেখাও যে লাল পাতলা হইয়া গিয়াছে। লাল পাতলা হইলে তাহাকে গোলাপী বলে।

একটা গোলাপের (গোলাপী রঙের গোলাপ) রঙের সঙ্গে মিলাইয়া দেখাও। হলুদ পাতলা করিয়া দেখাও—সুবিধা হইলে সর্ষপ ফুলের রঙের সঙ্গে মিল করাও। নীল পাতলা করিয়া আকাশের রঙের সঙ্গে মিলাও। একটু লাল রঙ পৃথক্ করিয়া লও ও তাহার মধ্যে আরও কিছু লাল গুঁড়া দাও। খুব ঘন লাল হইল। কাগজে দাগ দাও, জবা ও সিমুল ফুলের সঙ্গে রঙ মিলাও। এই ঘন লালকে হিঙ্গুল বলে। একটু নীল রঙের মধ্যে আর একটু নীল বড়ি ঘসিয়া লও। ঘন নীল হইল—কাগজে দাগ দাও—এই রঙের নাম নীলকান্ত। এইরূপে হলুদেরও পরীক্ষা দেখাও। তার পর নিম্নের ছড়া মুখস্থ করাও :—

ঘন হলে লাল রঙ হিঙ্গুল বলিবে।
পাতলা লালের নাম গোলাপী জানিবে॥
হলুদ হইলে ঘন পীত নাম তার।
পাতলা হলুদ রঙ বাসন্তী বাহার॥
নীলকান্ত ধরে নাম নীল ঘন হলে।
পাতলা হইলে নীল আসমানী বলে॥

৯। শক্ত ও নরম (হস্তের সাহায্যে)

উপকরণ—এক টুক্‌রা কাঠ, স্লেট, হাঁড়িভাঙ্গা, কাচ, পাকাকলা, কাঁচাকলা (বা কোনরূপ কাঁচা ও পাকা ফল) রবারের বল্, তুলার বালিশ, শুক্‌নামাটী, কাদামাটী, তিলের লাড়ু, ক্ষীরের লাড়ু (বা এইরূপ শক্ত নরম খাদ্য জিনিষ—খাদ্য জিনিষে বালকেরা খুব তুষ্ট) ইত্যাদিরূপ শক্ত ও নরম জিনিষ।

এক সঙ্গে দুইটী করিয়া জিনিষ পরীক্ষা করিতে দাও, কারণ শক্ত নরম আপেক্ষিক অর্থাৎ তুলনায় নির্দ্ধারণ করিতে হয়। যেমন পাকা কলার সহিত তুলনায় কাঁচা কলা শক্ত আবার কাঠের সহিত তুলনায় কাঁচাকলা নরম। কাঠ ও বালিশ বা রবারের বল্ বা কাপড়ের বল্ পরীক্ষা করিতে দাও। "এই দুইটী জিনিষ কি কি?"—একখান কাঠ আর একটা কাপড়ের বল্। "দুইটী জিনিষ টিপিয়া দেখ। কোন্‌টীতে টিপি বসে?" (কেমন করিয়া টিপিতে হইবে তাহা নিজেও দেখাও) এই কাঠে টিপি বসে না, কাপড়ের বলে টিপি বসে। "কোন্‌টী শক্ত, কোন্‌টী নরম?" (যদি বালকেরা শক্ত নরম কথা দুটী না জানে তবে এ প্রশ্ন করিও না। যেটায় টিপি বসে সেটা নরম আর যেটার টিপি বসে না সেটা শক্ত ইহাই বলিয়া দাও)। সকলে বল "কাঠ শক্ত, কাপড়ের বল্ নরম" (বালকগণের সমস্বরে কথন) এইরূপ স্লেট ও পুস্তক, কাচ ও সাবান, হাঁড়িভাঙ্গা ও কাদামাটী, কাচাকলা ও পাকা-কলা, তিলের লাড়ু ও ক্ষীরের লাড়ু পরীক্ষা করাও। তারপর তিনটী জিনিষ একখানে রাখ—ভাঙ্গাহাঁড়ী, শুষ্কমাটী ও কাদামাটী। জিজ্ঞাসা কর "ভাঙ্গাহাঁড়ী শক্ত না শুক্‌নামাটী শক্ত?" বালকেরা পরীক্ষা করিয়া উত্তর দিবে ভাঙ্গাহাঁড়ী শক্ত। তারপর জিজ্ঞাসা কর "শুক্‌নো মাটী শক্ত না কাদামাটী শক্ত? —শুক্‌না মাটী শক্ত। "এখন এই তিন জিনিষের মধ্যে কোনটীর চেয়ে কোনটী শক্ত দেখাও। এই কাদা মাটীর চেয়ে শুক্‌না মাটি শক্ত, আর এই শুকনা মাটির চেয়ে পোড়া মাটী শক্ত।

তারপর শুপারী, কাঁচা আম ও পাকা আম সাজাইয়া দাও, উক্তরূপ পরীক্ষা কর। 'নারিকেলের মালা, নারিকেল ও নারিকেলের ফোঁপড়া—কোনটা কার চেয়ে শক্ত ?' তোমার সুবিধামত ইত্যাদি রূপ পরীক্ষা করাও। এখন এক টুকরা কাঠ ও লোহার প্রেক আন। "কোনটী শক্ত, কোনটী নরম ?" বালকেরা এবারে উত্তর করিতে পারিবে না কারণ দুই জিনিষেই টিপি বসিবে না। পরীক্ষা করিবার প্রণালী শিখাও। (শিক্ষক নিজেও বালকের সম্মুখে পরীক্ষা করিবেন) "প্রেক দিয়া কাঠে দাগ দাও। দাগ বসিল ?" হাঁ, দাগ বসিল। "আবার কাঠ দিয়া প্রেকে দাগ দাও—দাগ বসে ?"—না এবারে দাগ বসিল না। "কোনটী শক্ত, কোনটী নরম বল।' প্রেক শক্ত, কাঠ নরম। এবার তিনটী জিনিষ আন—পয়সা, কাচ ও হাঁড়ীভাঙ্গা। "আচ্ছা, কাচ দিয়া ভাঙ্গা হাঁড়ীর উপর দাগ দাও। কি দেখিলে ?" ভাঙ্গাহাঁড়ীতে কাচের দাগ বসিল। "ভাঙ্গাহাঁড়ী দিয়া কাচে দাগ দাও—কি হল ?' দাগ বসিল না। "এখন বল কোনটী শক্ত কোনটী নরম ? কাচ শক্ত হাঁড়ী নরম। পয়সা দিয়া হাঁড়ীতে দাগ দাও, আর হাঁড়ীভাঙ্গা দিয়া পয়সায় দাগ দাও। কি দেখিলে ?" পয়সা দিয়া হাঁড়ীভাঙ্গায় দাগ দেওয়া যায় কিন্তু হাঁড়ীভাঙ্গা দিয়ে পয়সায় দাগ দেওয়া যায় না। "কোন্টী শক্ত, কোন্টী নরম ?"—পয়সা শক্ত, হাঁড়ী নরম। এইরূপ পয়সা দিয়া কাচ ও কাচ দিয়া পয়সায় দাগ দেও, পয়সায় দাগ বসিবে, কাঁচে বসিবে না। এখন কোনটী অপেক্ষা কোনটী শক্ত তাহা বলিতে বল। বালকেরা বলিবে "হাঁড়ীর চেয়ে পয়সা শক্ত, পয়সার চেয়ে কাচ শক্ত।" তারপর এই কবিতা আবৃত্তি করাও :—

১। নরম জিনিষ নুইয়ে পড়ে একটু টিপি পেলে।
শক্ত জিনিষ নোয়ায় নাকো হাজার টিপি খেলে॥

১০। দূর শব্দ ও নিকট শব্দ।

উপকরণ—দুইটী বাঁশের পাপ কাটিয়া লও। দুই দিকের গিরা ফেলিয়া দাও। খুব মোটা বাঁশ লইও না। কানে লাগাইলে কান ডুবিয়া যায়—এইরূপ মোটা হইলেই হইবে। সুপারীর খোলের উপর যে এক রকমের খুব পাতলা ছাল থাকে তাহাই তুলিয়া লও ও ঐ বাঁশের পাপ দুইটীর একমুখে ঐ ছাল দিয়া ঢাকিয়া সুতা দিয়া বাঁধ। ঐ ছালের মধ্যে সূঁচের দ্বারা ছিদ্র করিয়া, সুতা চালাইয়া দাও ও দুই পাপ এইরূপে সুতার দ্বারা সংযোগ কর। সুতা ২০।৩০ হাত লম্বা হইলেই হইবে। (২) একটী হাঁড়ী (৩) একটী পেঁপের ডাল (৪) শাঁখ।

এক একটী করিয়া বালকের চোখ বাঁধিয়া দাও আর শব্দের জ্ঞান পরীক্ষা কর। একটী বালককে ঘরের এক কোণে যাইতে বল। সেইখান হইতে সে চোখ বাঁধা বালককে ডাকিবে। জিজ্ঞাসা কর "কোন দিক হইতে ডাকিতেছে?" যদি বালকদিগকে দিক্ শিক্ষা দিয়া থাক তবে সেই দিকের নাম করিবে আর দিক্ শিক্ষা না হইয়া থাকিলে হাত দিয়া দেখাইবে 'এই দিক্ হইতে ডাকিতেছে।' আবার অন্যদিক হইতে আর এক বালক ডাকিল "এবার কোন দিক্ হইতে ডাকিতেছে?" এই দিক হইতে।

ঘরের ভিতর হইতে ডাকিতেছে না ঘরের বাহির হইতে ডাকিতেছে?" —ঘরের ভিতর হইতে। (একটী বালককে ইসারা করিয়া বাহিরে গিয়া ডাকিতে বল) "এবার কোন্ দিক হইতে—ঘরের ভিতর না বাহির?"—ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া শিক্ষা দাও।

তারপর একটী বালককে খুব দূরে যাইতে বল ও সেখান হইতে ডাকিতে বল "এবারে কোন দিক হইতে ডাকিতেছে? কোন্ জায়গা হ'তে?" বালক বলিবে অমুকের বাড়ীর নিকট, কি অমুক পুকুরের নিকট,—কি অমুক গাছের নিকট হইতে। শব্দ অনুসারে দূরত্বের আন্দাজ পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য। একজনকে নিকট হইতে খুব ছোট করিয়া ডাকিতে বল "এবারে কে কোথা হইতে ডাকিতেছে?" এক জনকে

নিকট হইতে মুখে হাত চাপা দিয়া ডাকিতে বল, একজনকে টেবিলের নীচ হইতে ডাকিতে বল, একজনকে পেঁপের ডালের ভিতর দিয়া ডাকিতে বল ও চোখ বাঁধা বালকগণকে পরীক্ষা কর। যাহারা এতক্ষণ ডাকিল এবারে তাহাদের চোখ বাঁধিয়া দাও আর যাহাদের চোখ বাঁধা ছিল তাহাদিগের চোখ খুলিয়া দাও। এবারে তাহারা আবার পূর্ব্বের মত ডাকিবে। দুইটী বালককে এক হাত দূরে দাঁড়া করাও। একজনকে খুব ছোট করিয়া কথা কহিতে বল—যেন অপরে না শুনে। যে শুনিল না, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর "কেন শুনিলে না?"—'খুব ছোট করিয়া বলিয়াছে।' যে বালক ছোট করিয়া কথা বলিয়াছিল তাহার হাতে পেঁপের ডাল দাও ও সেই ডাল নিজের মুখে ও অপর বালকের কাণে লাগাইয়া আবার সেইরূপ ছোট করে কথা বলুক। "এবারে শুনিতে পাইলে"—'হাঁ শুনা গেল'। সাধারণভাবে কারণ বলিয়া দাও "ছোট কথা বাতাসে উড়াইয়া নিয়া গিয়াছিল ব'লে শুনতে পাও নাই। এবারে শব্দটা পেঁপের ডালের ভিতর দিয়া তোমার কাণে গিয়া লেগেছে—তাই শুনতে পেয়েছ।" (ইচ্ছা করিলে কারণ নাও বলিতে পার; কিছুদিন পরে বালকেরা নিজেই অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবে) একজনকে ২০।৩০ হাত দূরে দাঁড় কর। সেখান হইতে সাধারণ সুরে কথা বলিতে বল। (এখান হইতে যেন না শুনা যায়)। এবারে সেই সুপারীর ত্বক বাঁধা বাঁশের পাপ আন। একজনকে একটার ভিতর দিয়া কথা বলিতে বল, অপর একজনকে আর একটায় কাণ লাগাইয়া শুনিতে বল। সুতা যেন বেশ টান থাকে। বালকেরা ইহাতে বেশ আমোদ পাইবে। এখন ইহার কারণ কিছু বলিবার দরকার নাই।
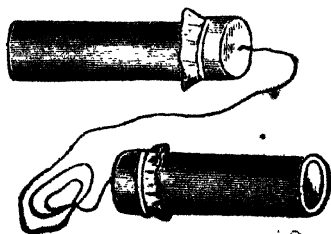
যখন কাণের পটহের কথা বুঝাইবে,

তখন আবার এই যন্ত্রের ব্যবহার দেখাইবে। যন্ত্র হ'লে ছোট কথাও দূরে যায় ইহাই দেখান হইল।

১১। স্বাদ (কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ)

উপকরণ—গোলমরিচ, লবঙ্গ, লঙ্কা, আদা, নিমপাতা, বেতের আগা, কুইনাইন, সুপারী, হরিতকী, লবণ, (যদি সুবিধা থাকে তবে সমুদ্রের জল) সৈন্ধব, লেবু, চিনি।

"সকলে চোখ বোঁজ"। (একটা করিয়া গোলমরিচ মুখে দাও)—"মুখে কি দিলাম (প্রথমে দাঁত দিয়া ভাঙ্গিতে নিষেধ কর) তাহার আকার কেমন?" ইত্যাদি প্রশ্ন কর। 'আকার গোল, গা খস্‌খসে', "কেমন করিয়া বুঝিলে?" জিভ্ দিয়া নাড়িয়াই বুঝিতে পারিলাম। হাঁ, স্পর্শের দ্বারাই আকার ঠিক করা যায়। ইহার স্বাদ কেমন বলিতে পার?"—(বালকেরা এবারে দাঁতে ভাঙ্গিয়া স্বাদ পরীক্ষা করিবে) 'খুব ঝাল'। 'কেমন করিয়া বুঝিলে?"—জিভের দ্বারা স্বাদ লইয়া বুঝিলাম। "হাঁ, ঠিক কথা, তাহ'লে এক জিভের দ্বারা কি কি করিলে?" জিনিষের আকার বুঝিলাম ও জিনিষের স্বাদ পাইলাম। "আর কোন্ কোন্ জিনিষ ঝাল?"—বালকেরা লঙ্কা, আদা, লবঙ্গ, পান প্রভৃতির নাম করিবে। না পারিলে শিক্ষক বলিয়া দিবেন ও সেই সকল জিনিষ দেখাইবেন। "গোলমরিচ কি কাজে লাগে?"—"ডাল তরকারীতে গোলমরিচ বাঁটিয়া দিলে ঝাল হয়। "লঙ্কায় কি হয়?" —মাছের ঝোলে লঙ্কা দেয়। "আদা কি কাজে লাগে?"—ছোট মাছের ঝোলে আদার রস দেয়—ডালেও দেয়।' (অপর একটী বালক বলিল 'পেট ফাঁপিলে আদা খায়') 'লবঙ্গ দিয়া কি করে?'—'পানের সঙ্গে খায়।' প্রত্যেক বালকের হাতে একটা করিয়া নিমপাতা বা পাট-পাতা দাও। কি পাতা জিজ্ঞাসা কর, না পারিলে বলিয়া দাও।

"চিবাইয়া দেখত কেমন লাগে?"—তিতে লাগে। "আর একটা তিতে জিনিষের নাম কর?"—'উচ্ছে তিতে'। উচ্ছে কি কাজে লাগে, তাহাও জিজ্ঞাসা কর। পল্‌তা, পাটপাতা ও চিরতা তিতে—পাটপাতা ও চিরতা ভিজান জল খেলে ক্রুমি সারে একথা বলিয়া দিবে। 'কুইনাইন কেমন লাগে দেখত?'—খুব তিতে লাগে। "কুইনাইন কি কাজে লাগে?"—'কুইনাইন খেলে জ্বর সারিয়া যায়।'

হরিতকী ভাঙ্গিয়া একটু একটু বালকগণের মুখে দাও। "কেমন লাগে?" সম্ভবতঃ বালকেরা এই রসের নাম বলিতে পারিবে না। "হরিতকী কষ কষ লাগে—হরিতকী কষায়।"

সুপারী খাইতে বল—সুপারীও কষায়। কাঁচা কলার টুকরা চিবাইতে দাও। কাঁচা কলাও কষায়। ইহার পর লবণ, সৈন্ধব, সমুদ্রজল প্রভৃতির পরীক্ষা করাও। "মাছের ঝোলে, কি ডা'লে লবণ বেশী হ'লে কি করে থাক?"—'তার ভিতর একটু লেবুর রস বা তেঁতুল দি।' অম্বল যদি খুব বেশী টক হয় তবে কি কর?—একটু নুন মিশাইয়া নি।' হাঁ ঠিক কথা টক কমে লবণে, আর লবণ কমে টকে।"

বালকগণের অসাক্ষাতে একটু লেবুর রস, একটু চিনি ও একটু লবণ মিশাইয়া রাখ। এখন পরীক্ষা করিতে দাও "কি কি রস আছে বল?" তারপর ইহাতে একটু লঙ্কা ঘষিয়া দাও। "এবারে কি কি রস আছে বল।"

[কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে এরূপ শিক্ষায় কি লাভ হইতেছে? লাভ এই যে বালকগণকে আহার্য্য পরীক্ষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আহারই জীবন রক্ষা করে সুতরাং সেই আহার্য্য দ্রব্যের স্বাদের পরিচয় লইতে শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। মা ছেলেকে মাছের ঝোল দিয়া, জিজ্ঞাসা করিতেছেন "মাছ কেমন হয়েছে?" হয়ত মাছ সেদিন ভাল হয় নাই। কিন্তু কেন ভাল হয় নাই—নুন বেশী, কি ঝাল বেশী, কি অন্য কোন মসলার কমি বেশী হইয়াছে, তাহা পুত্র বলিতে পারিল না। পুত্রকে এ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। সে খাইবার সময় গিলিয়া যায়, স্বাদ পরীক্ষা করে না বা করিতে জানে না। সুতরাং এ

শিক্ষা যে আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য। ইহা ছাড়া রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনায় স্বাদ পরিচয় আবশ্যক। অনেক জিনিষের আকার বর্ণ এক রকম, কেবল স্বাদ গ্রহণে পার্থক্য ঠিক করিয়া লইতে হয়। ডাক্তার কবিরাজ দিগকে অহরহঃ এই পরীক্ষা করিতে হয়]

আম, আনারস ও কমলালেবুতে কি কি রস আছে জিজ্ঞাসা কর। যদি কালজামের সময় হয়, তবে বালকদিগকে একটা করিয়া জাম খাইতে দাও। জামে যে মিষ্ট, অম্ল ও কষায় রস আছে তাহা আদায় কর। "পানের খিলিতে কি কি জিনিষ থাকে—কোন্‌টী কি রস?"—পানের রস ঝাল; সুপারীর রস কষায়, খয়ের রস তিতা, চুনের ক্ষার (এটী বালকেরা বলিতে পারিবে না—শিক্ষক বলিয়া দিবেন। ক্ষার জিনিষে জিভ্ পুড়িয়া যায়—পানে চুন বেশী হইলে জিভ্ জ্বালা করে)।

[আমাদের আহারের সময় সাধারণতঃ মিষ্ট, ঝাল লবণ ও অম্ল এই চার রসের ব্যবহার হইয়া থাকে। পানের সহিত কষায় ও তিতে রস যোগ থাকাতে পান সেবনে ছয় রস পূর্ণ হয়। তারপর পানের রস জীর্ণকারক। শুবারী ও খয়েরের রসে দাঁতের উপকার হয়। চুনও জীর্ণকারক। কিন্তু পান খাইয়া পানের ছিবড়া না ফেলিয়া দিলে বা বেশী পান খাইলে পানে অপকার হয়। এ সমস্ত কথা ছেলেদিগকে মোটামুটী বুঝাইয়া দিবে ও দিনে দুটীর অধিক পান খাইতে নিষেধ করিবে ও পান চিবাইয়া ছিবড়া ফেলিতে উপদেশ দিবে। ২৫।২৬ বৎসর পর্য্যন্ত জীর্ণশক্তি বেশ প্রবল থাকে, সে বয়সে পান না খাওয়াই ভাল।]

১২। ঘ্রাণ (ভিন্ন, ভিন্ন জিনিষের)

উপকরণ—নানারূপ খাদ্যদ্রব্য, মসলা, ফল, ফুল।

যদি আমের সময় হয় তবে আম সংগ্রহ কর। কাঁঠাল, আনারস, কলা, পেয়ারা, লেবু প্রভৃতি উত্তম গন্ধযুক্ত ফল। বালকগণকে চোখ বুঁজিতে বল। নাকের কাছে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি একটী একটী

করিয়া ফল ধর ও তাহারা কেবল গন্ধের সাহায্যে ফলের নাম করিতে পারে কিনা পরীক্ষা কর।

তারপর দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ, কর্পূর, মৌরী, জায়ফল, জিরা, মেথি, রন্ধনী, আদা ও লঙ্কা লইয়াও ঐরূপ পরীক্ষা কর। এ সমস্ত সাধারণ জিনিষ, নাম না জানিলে নামও শিখাইয়া দাও।

সুগন্ধী দ্রব্যের মধ্যে আতর, গোলাপজল, লেবুর তেল, ওডিকোলন ল্যাভেণ্ডার অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সহরের বিদ্যালয়ে এ সকল দ্রব্যের গন্ধের তারতম্য শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। গন্ধের দ্বারা নষ্ট দুধ ও ভাল দুধ, ভয়সা ঘি ও গাওয়া ঘি, ভাল ঘি ও খারাপ ঘি পরীক্ষা করিতে শিক্ষা দাও। বালিকাবিদ্যালয়ে বাসী ভাত ও ভাল ভাত, বাসী ডাল তরকারী ও ভাল ডাল তরকারীর গন্ধের দ্বারা ঠিক করিবার প্রণালী বলিয়া দিতে হইবে।

বাসী ভাত মাছ, খারাপ দুধ প্রভৃতির অম্ল গন্ধ দুই একবার পরীক্ষা করাইলেই বুঝিতে পারিবে। যদি দুই একবারে না বুঝিতে পারে তাহাতেও দুঃখিত হইও না ইহাতে আর কিছু হউক না হউক একটা অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা বলবতী হইবে; সেইটাই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ উপকার।

'পায়েসের মধ্যে কর্পূর দেয়, রসগোল্লায় আতর দেয়, তরকারীতে জিরা দেয়, মাংসে এলাচি দারুচিনি দেয় কেন?"—বালকেরা বলিতে পারিবে না। বলিয়া দাও গন্ধ ভাল হইলে খাইতেও ভাল লাগে। (আর বেশী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিও না)। ক্যাষ্টার অয়েল খাইবার সময় নাক ধরিয়া রাখে কেন?" বলিয়া দাও নাকে গন্ধ যায় বলিয়া। যেমন ভাল গন্ধ হইলে খাইতে ভাল লাগে তেমনি খারাপ গন্ধ হইলে খাইতে খারাপ লাগে—বমি আসে। তাই নাক ধরিলে ক্যাষ্টার অয়েলের খারাপ গন্ধ নাকে যায় না—খাইতে তত কষ্ট হয় না।

যে স্থান হইতে দুর্গন্ধ আসে তাহার নিকটে বসিয়া খাওয়া যায় না। এই জন্য রান্না ঘরের নিকট বাহ্যি প্রস্রাব করিতে নাই, কি তরকারীর টুকরা ও ভাতের মাড় ফেলিতে নাই—এই সকল কথা বালকদিগকে বুঝাইয়া দাও। ময়লা কাপড়ে দুর্গন্ধ হয়, ভাল করিয়া স্নান না করিলে গায় দুর্গন্ধ হয়। প্রাতঃকালে উত্তম করিয়া দাঁত পরিষ্কার না করিলে মুখে দুর্গন্ধ হয়। এই সমস্ত দুর্গন্ধে আহারের ব্যাঘাত করে, ভাল করিয়া খাইতে পারা যায় না।

[এই শিক্ষা যে কেবল বিদ্যালয় গৃহে শিক্ষককেই দিতে হইবে তাহা নহে। এ শিক্ষার উপযুক্ত স্থান গৃহ। ভাত কি নষ্ট দুধ উপলক্ষ করিয়া পিতা মাতা সন্তানকে গল্পচ্ছলে এই শিক্ষা দান করিলে বিশেষ ফলপ্রদ হইবে।]

১৩। রঙ—(সবুজ, কমলা ও বেগুনে)

উপকরণ—লাল নীল ও হলুদ রঙ এবং তুলি। সবুজ, কমলা ও বেগুনে রঙের কাপড়ের ছাঁট ও কাগজ। কচুর পাতা, পাকা কমলা বা কাঁচা হলুদ, কচি বেগুন ও বেগুনফুল ইত্যাদি

বালকগণের পূর্ব্বজ্ঞান পরীক্ষা কর। তাহাদিগের লাল, নীল ও হলুদের বোধ আছে কি না দুচারিটী প্রশ্ন করিলেই বুঝিতে পারিবে। কচুর পাতা, কলার পাতা, ঘাস প্রভৃতি দেখাইয়ে বল যে "পাতার রঙ সবুজ"! বৈশাখ মাসে যখন নূতন পাতা উঠে, তখন আম, জাম, বট, ছাতিম, কদম, শেফালিকা, আমড়া প্রভৃতি অনেক গাছের পাতার রঙ সবুজ হয়। (খুব কচি পাতা আর বুড়া পাতা সবুজ নয়। কচি পাতায় (বৃক্ষ অনুসারে) নানারূপ রঙ দেখিতে পাওয়া যায়। আর বুড়া পাতার রঙ, সবুজের সঙ্গে একটু কালো রঙ মিশাইলে যেরূপ হয় তাহাই, ঠিক সবুজ নয়) ডাবের রঙ, কাঁচা আমের রঙ, কাঁচা লেবুর রঙ সবুজ। এ সমস্ত দেখাও বা বালকগণের নিকট হইতে ইহাদের নাম আদায় করিতে চেষ্টা

কর। এখন একটু হলুদ রঙ একটা বাটীতে লও ও তাহার ভিতর একটু একটু করিয়া নীল রঙ ঢালিতে থাক আর তুলির দ্বারা সেই মিশ্রিত রঙ দিয়া সাদা কাগজে দাগ দিতে থাক। যখন দেখিবে যে তোমার রঙ কচুপাতার রঙের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে তখন থামিয়া যাইবে। বালকগণকে দেখাও যে "এই মিশান রঙ্ কেমন কচুর পাতার রঙের সঙ্গে মিলে গিয়াছে। কচুর পাতার কি রঙ?"—'সবুজ রঙ'। "এ মিশান রঙকে কি রঙ বলিবে?"—'সবুজ রঙ বলিব।'—"কি কি রঙে মিলাইয়া সবুজ রঙ তৈয়ারী করিলাম?"—"হলুদের সঙ্গে নীল রঙ মিশাইয়া সবুজ হইল।'

পাকা কমলালেবু, কাঁচা হলুদ আন। বলিয়া দাও যে "কমলা লেবুর রঙকে কমলা রঙ বলে।" হলুদ রঙের সঙ্গে একটু একটু করিয়া লাল রঙ মিশাইতে থাক আর পূর্ব্বের ন্যায় কাগজে দাগ দিয়া পরীক্ষা কর। যখন দেখিবে কমলা লেবুর রঙের মত রঙ হইয়াছে তখনই থামিয়া যাইবে। বালকগণকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্ন করিয়া কমলা রঙ শিখাও। সকলে সমস্বরে বলিবে "হলুদে ও লালে মিশাইলে কমলারঙ হয়।"

সাধারণ বেগুণের রঙ গাঢ় বেগুনে বা বঙ্গেশ। কচি বেগুনের রঙ বা বেগুণের বোঁটার কাছের রঙ কতকটা বেগুনে। এবারে বেগুণে রঙের কাগজ বা কাপড়ের সহিত মিল করিয়া বেগুনে রঙ প্রস্তুত কর। লালের মধ্যে একটু একটু নীল ঢাল ও বেগুনে কাগজের রঙের সহিত মিলাও। বালকগণকে শিখাইয়া দাও "লালে ও নীলে বেগুনে রঙ হয়"। সবুজ, বেগুনে ও কমলারঙের কাপড়ের ছাঁট ও কাগজের টুকরা বালকগণের সন্মুখে ছড়াইয়া দাও। তাহাদিগকে প্রশ্ন কর "সবুজ কাগজগুলি এক খানে রাখ, আমায় একটুকরা কমলা কাপড় দাও" ইত্যাদি।

কাগজে কচুপাতা ঘষিলে সবুজ রঙ্ হয়। জবাফুল ঘষিলে প্রথমে কাঁচা অবস্থায় বেগুনে রঙ হয়—রঙ শুকাইলে একটু নীল হয়। কাগজে

জবাফুল ঘষিয়া, পরে সেই কাগজের উপর লেবুর রস ছিটাইলে কাগজে লাল রঙের ছিট পড়ে ও মার্ব্বেল কাগজের মত দেখায়। বালকেরা এইরূপ রঙ্গিন কাগজ প্রস্তুত করিয়া পুস্তকের মলাট লাগাইতে পারে। তবে এই রঙ ৪।৫ দিন পরে বিশ্রী হইয়া যায়। পুঁই শাকের পাকা ফলে বেশ বেগুনে রঙ হয়। শেফালিকা ফুলের বোঁটা কাগজেঘষিলে কমলা রঙ হয়। হলুদের গুঁড়া জলে গুলিয়া লইলে হলুদ রঙের কাজ চলে।

[যে সকল শিক্ষকের এইরূপ রঙের পরীক্ষা করিয়া অভ্যাস নাই তাহাদিগের পক্ষে প্রথমে একটু বাধ বাধ হইতে পারে কিন্তু দুচার বার অভ্যাস করিলেই সহজ হইয়া আসিবে। বিদ্যালয়ে বালকগণের সম্মুখে পরীক্ষা করিবার পুর্ব্বে শিক্ষক বাড়ীতে দুচার বার পরীক্ষা করিয়া আসিবেন। কোন কোন শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে কি অনুপাতে মূল রঙ মিশাইলে মিশ্র রঙ প্রস্তুত হয়। অনুপাত নিম্নে লিখিত হইল কিন্তু এই অনুপাত ধরিয়া কাজ করিতে চেষ্টা করিবেন না। এই পাঠে যেমন এক রঙের মধ্যে অন্য রঙ একটু একটু করিয়া মিশাইয়া মিশ্র রঙ প্রস্তুত করিবার কথা লিখিত হইয়াছে, সেই রূপেই চেষ্টা করিবেন। একেত অনুপাতের পরিমাণ ঠিক করাই শক্ত তার পর মূল রঙর শক্তি অনুসারে তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সুতরাং অনুপাত ধরিয়া চেষ্টা করিতে গেলে সকল সময় সুবিধা হয় না। শিক্ষকগণের জ্ঞানার্থ নিম্নে অনুপাত দেওয়া হইল :—

৮ ভাগ নীল + ৫ ভাগ হলুদ = সবুজ
৩ „ লাল + ৫ „ „ = কমলা
সমান সমান নীল ও লাল = বেগুনে]

বালকগণের স্মরণ শক্তির সাহায্যার্থ তাহাদিগকে নিম্নের কবিতা মুখস্থ করাও :—

লাল নীল হলুদের বিচিত্র মিলন।
লালে নীল ঢেলে দিলে বেগুণে বরণ॥
হলুদে মিশিলে নীল সবুজ শোভন।
হলুদে ঢালিলে লাল কমলা সৃজন॥

[নিম্নের সঙ্কেতে শিক্ষকগণের স্মরণ শক্তির সাহায্য হইতে পারে :—

সহনী কলাহ।

বেলানী বুঝহ।।

'সহনা' অর্থাৎ সবুজ রঙ হলুদ ও নীলের মিশ্রনে (সবুজের স, হলুদের হ, ও নীলের নী =সহনী), 'কলাহ' অর্থাৎ কমলা রঙ লাল ও হলুদের মিশ্রনে, 'বেলানী, অর্থাৎ বেগুনে রঙ লাল ও নীলের মিশ্রনে হইয়াছে ইহাই 'বুঝহ' অর্থাৎ বুঝিয়া রাখ]

"বিবিধ বিধানের" ১৮২ পৃষ্ঠা পড়।

১৪। ভারী ও হালকা (গুরু ও লঘু)

উপকরণ—তুলা. কাপড়. কাগজ, পাখীর পালক, লোহা, কাঠ, পাথর, ইট, মাটী ইত্যাদি। দ্রব্যগুলি সমস্তই যেন এক পরিমাণের হয়।

একটী বালকের হাতে সমান পরিমাণে তুলা ও আর এক হাতে মাটী দাও। অন্য এক বালকের এক হাতে স্লেট ও অন্য হাতে তত বড় কাগজ দাও। অপর এক বালকের এক হাতে লোহা ও অপর হাতে ঠিক সেই পরিমান ইটের টুকরা দাও। এখন জিজ্ঞাসা কর "কাহার কোন হাতের জিনিষ ভারী ও কোন হাতের জিনিষ হালকা বল।" ছেলেরা বলিবে "তুলা হালকা, মাটী ভারী, কাগজ হাল্কা স্লেট ভারী ; ইট হাল্কা লোহা ভারী ইত্যাদি।" এখন আবার এই সমস্ত জিনিষ পরিবর্ত্তন করিয়া দাও, অর্থাৎ এক জনের হাতে কাগজ ও তুলা দাও, একজনের হাতে স্লেট ও লোহা দাও, এক জনের হাতে কাঠ ও পাথর দাও আর পুর্ব্বের ন্যায় প্রশ্ন কর। তারপর বালকগণকে সমস্তগুলি জিনিষ গুরুত্ব অনুসারে পর পর সাজাইতে বল। অর্থাৎ প্রথমে তুলা, তৎপর কাগজ,তারপর কাঠ ইত্যাদি।

সাধারণতঃ কোন্ কোন্ জিনিষকে আমরা হাল্কা বলিয়া থাকি ? তুলা, পালক, কাগজ। হাল্কা জিনিষ সহজেই বাতাসে উড়িয়া যায়। তোমরা সিমূলতুলা উড়িতে দেখিয়াছ ? (তুলা উড়াইয়া দেখাও)

পাখীর পালক উড়িতে দেখিয়াছ? ঘুড়ি কাগজ দিয়া প্রস্তুত করে কেন? টিনের ঘুড়ি উড়ান যায় না? কেন? কোন্ কোন্ জিনিষকে লোকে ভারী বলে। লোহা, পাথর। ওজনের বাটখারা কি দিয়া তৈয়ারী করে? (কতকগুলি বাটখারা দেখাও) হাতুড়ি কি দিয়া তৈয়ারী করে? (হাতুড়ী দেখাও)।

অনেকগুলি হাল্কা জিনিষ এক সঙ্গে রাখিলে ভারী হয়। (এক খানা ভারী পুস্তক দেখাও)। ভারী জিনিষের ছোট একটু টুকরা হইলে হাল্কা বোধ হয়। (সূঁচ দেখাও) হাল্কা জিনিষ সহজে তোলা যায়। (একটা বালিশ তুলিতে বল) ভারী জিনিষ সহজে তুলিতে পারা যায় না। (বালকের বয়স বিবেচনায় একটা একমনী কি আধমনী বাটখারা তুলিতে বল বা ভারী প্রস্তরখণ্ড তুলিতে বল)। এক বাটি জলের মধ্যে একটা পয়সা ও এক টুকরা কাগজ ফেলিয়া দাও—পয়সা ডুবিল, কাগজ ভাসিল, কোনটা ভারী?

১৫। শরীরের অঙ্গ। ১ম পাঠ।

উদ্দেশ্য—অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাধারণ নাম ও তাহাদিগের সাধারণ ব্যবহার শিক্ষা দান।

একটী ছেলের মাথায় হাত দিয়া জিজ্ঞাসা কর আমি যদুর কোন খানে হাত দিয়াছি? "আপনি যদুর মাথায় হাত দিয়াছেন।" আমাদের কটি মাথা, কখানা হাত ইত্যাদি প্রশ্ন কর। তারপর বালকগণকে এক লাইনে দাঁড়া করাও ও আদেশ কর—"সকলে মাথার উপর দুই হাত রাখ"। (বালকগণের তদ্রূপ করণ)। দুই চোখে দুই হাত দাও (বালকগণের তদ্রূপ করণ)। এইরূপ দুই কাণে দুই হাত দাও; দুই পায়ে দুই হাত দাও, পেটের উপর দুই হাত রাখ, দুই হাত ঘুরাইয়া পীঠে লও, দুই হাতে দুই হাত জড়াইয়া ধর ইত্যাদি।

তারপর দুইটী করিয়া বালককে মুখোমুখী করিয়া দাঁড় করাও। আদেশ কর—একজন আর একজনের মাথায় ডান হাত দাও (বালকদ্বয়ের তদ্রূপ করণ), একজন আর একজনের মাথায় বাম হাত দাও, একজন বাম হাতের দ্বারা অপরের ডান হাত ধর, আর ডান হাতের দ্বারা বাম হাত ধর, একজনের বামচরণের আঙ্গুলের সঙ্গে আর একজনের ডানচরণের আঙ্গুল লাগাও ও ডানচরণের আঙ্গুলের সঙ্গে বামচরণের আঙ্গুল লাগাও (চরণ কথার অর্থ শিখাইবার চেষ্টা করিওনা ; বালকেরা না বুঝিতে পারিলে তুমি হাত দিয়া একজনের চরণ দেখাইয়া দাও, তাহা হইলেই চরণ কাহাকে বলে বুঝিবে)।

আমরা হাত দিয়া কি করি ? আমরা হাত দিয়া জিনিষ ধরি। পা দিয়া কি করি ? পা দিয়া হাঁটি ও দৌড়াই। চোখ দিয়া কি করি ? আমরা চোখ দিয়া দেখি। কাণ দিয়া কি করি ? আমরা কাণ দিয়া শুনি। মুখ দিয়া ভাত খাই আর কথা বলি। (প্রথম দিন এ বিষয়ে আর বেশী শিখাইতে চেষ্টা করিও না) যাহার চোখ নাই তাহাকে কি বলে ? তাহাকে অন্ধ বলে। সে কি কোন জিনিষ দেখিতে পায় ? না, সে কোন জিনিষ দেখিতে পায় না। সে কেমন করিয়া চলে ? একজন তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। যে কাণে শুনে না তাহাকে কি বলে ? তাহাকে কালা বলে। তাহার সঙ্গে লোকে কেমন করিয়া কথা বলে ? তাহাকে হাত নাড়িয়া দেখায়। আসিতে বলিলে কেমন করিয়া হাত নাড়ে ? (বালকেরা দেখাইবে) যাইতে বলিলে কেমন করিয়া হাত নাড়িবে ? খাইতে বলিলে কেমন করিয়া দেখাইবে ? ইত্যাদি। যে কথা বলিতে পারে না তাহাকে কি বলে ? যে কথা বলিতে পারে না তাহাকে বোবা বলে। বোবা কেমন করিয়া শব্দ করে ? সে কেবল আঁ আঁ করিয়া শব্দ করে। যাহার এক পা ভাঙ্গা তাহাকে কি বলে ? তাহাকে খোঁড়া বলে। খোঁড়া কেমন করিয়া চলে। খোঁড়া লাঠী ভর দিয়া

চলে। তোমরা এক পায়ে চলত। বালকদের তদ্রূপ করিয়া চলন ও নিম্নলিখিত কবিতার আবৃত্তি কারণ :—

খোঁড়া ঠ্যাং ঠ্যাং ঠ্যাং
কার ঘরে ঢুকেছিলি, কে ভেঙ্গেছে ঠ্যাং ?

বলিয়া দাও যে শরীরের এই সকল অংশকে অঙ্গ বলে।

১৬। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। ২য় পাঠ।

উদ্দেশ্য—অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার।

তোমাদিগকে বলে দিয়েছি যে আমাদের শরীরের ছোট ছোট অংশকে অঙ্গ বলে। আচ্ছা গোপালের শরীরের অঙ্গগুলি দেখাও আর নাম কর।

'এইটী গোপালের মাথা, এই দুইটী চোখ, এই দুইটী কাণ, এইটী নাক, এইটী মুখ, এই দুই হাত, এই বুক, এই পেট, এই দুই পা।

হাঁ—ঠিক হয়েছে—এখন বলত আমরা কোন অঙ্গ দিয়া কি কাজ করি।

"চোখ দিয়া দেখি, কাণ দিয়া শুনি, মুখ দিয়া খাই ও কথা বলি, হাত দিয়া ধরি ইত্যাদি।"

আচ্ছা বেশ! এখন যদুর মুখের দিকে চাও। যদু হাঁ কর। তোমরা যদুর মুখের ভিতর কি দেখিতেছ। দাঁত আর জিভ্ দেখিতেছি। দাঁত দিয়া কি করে আর জিভ্ দিয়াই বা কি করে। দাঁত দিয়া আমরা কামড়াইয়া খাই আর জিভ্ নাড়িয়া কথা বলি। চোখের উপর এই কালো কালো লোমের রেখাকে কি বলে জান? ইহাকে ভ্রূ বলে।

'এই দুইটীকে চোখের পাতা বলে। আর চোখের পাতার পাশ দিয়া দিয়া যে কাল লোম আছে তাহাকে চোখের ভোমা বলে। চোখের পাতা ও ভোমা থাকাতে চোখে সহজে ধূলা যাইতে পারে না। এই যে

অঙ্গ তোমার ধড়ের সঙ্গে মাথা লাগাইয়া রাখিয়াছে তাহাকে কি বলে জান? তাহার নাম গলা। হঁা এই গলা থাকাতেই আমরা মাথাটা এদিক ওদিক ঘুরাইতে পারি। গলার দুই দিকে দুই কাঁধ, তারপর এই বুক, বুকের দুই দিকে হাত। একটা বাক্স দেখাও। এই বাকস্‌টী খোল। ডালাটা কোন্‌ জায়গায় ঘুরিতেছে। এই কব্‌জীর কাছে। হাঁ ঠিক কথা। আমাদের বাহুর কব্‌জী দেখাও। কয়টী কব্‌জী। কাঁধের কাছে একটা আর এই বাহুর মাঝে একটা আর এই হাতের কাছে একটা। আঙ্গুলে অনেকগুলি আছে। পায়েও অনেক কব্জী আছে। আমাদের শরীর কি দিয়ে ঢাকা? চামড়া দিয়া। চামড়ার নীচে কি আছে জান— চামড়ার নীচে মাংস আছে—তার নীচে হাড়। আর সমস্ত মাংসেই রক্ত আছে। (আপত্য না থাকিলে পাঁঠা, পাখী বা মাছ কাটিয়া দেখাইতে পার) রক্ত দেখেছ? রঙ্‌ কেমন? মাছের হাড়কে কি বলে? মাছের কাঁটা।

আমরা মুখ দিয়া খাইলে তাহা কোথায় যায়? তাহা পেটের ভিতর যায়। হঁা পেটের ভিতর একটা থলে আছে সেই থলেতে গিয়া জমা হয়। একটা থলের ভিতর চাল পুরিলে থলের চেহারা কেমন হয়? থলে ফুলিয়া মোটা হয়। থলেতে যদি খুব ঠাসিয়া ঠাসিয়া চাল পোরা হয় তবে থলের দশা কি হয়? থলে শীঘ্রই ফাটিয়া যায়। হঁা আমরা খাইলে পেটের থলে ফুলিয়া মোটা হয়। যাহারা খুব রাক্ষসের মত খায়, তাহাদের থলে শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। তোমরা খুব পেট ভরিয়া খাইও না। পেটুক ছেলের সর্ব্বদাই অসুখ হয়, আর পেটুকের বুদ্ধি মোটা হয়।

১৭। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। ৩য় পাঠ।

উদ্দেশ্য—শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশুদ্ধ নাম শিক্ষাদান।

সাধারণতঃ বালকদিগের একটা ডাক নাম ও একটা পোষাকী নাম থাকে। এইরূপ দুই নাম যুক্ত কোন বালককে জিজ্ঞাসা কর তোমার নাম কি? আমার নাম সুরেন্দ্র। "তোমাকে বাড়ীতে কি বলিয়া ডাকে?" আমাকে সুরেন বলিয়া ডাকে। যেমন তোমার দুই নাম আছে এমনি আমাদের শরীরের এই সব অঙ্গেরও (মস্তক, কর্ণ, চক্ষু প্রভৃতি দেখাইয়া) দুইটী তিনটী করিয়া নাম আছে। মাথার ভাল নাম কি জান? মাথার ভাল নাম মস্তক। (যদি কেহ না বলিতে পারে তুমি বলিয়া দিবে) "কাণের ভাল নাম কি? (কেহ না পারিলে বলিয়া দাও) কাণের ভাল নাম কর্ণ।" তোমরা সকলে এক সঙ্গে বল "কাণ কর্ণ"। এইরূপ চোখ চক্ষু, দাঁত দন্ত, নাক নাসিকা, হাত হস্ত, পা পদ, গাল গণ্ড, পীঠ পৃষ্ঠ ইত্যাদি। (এই সমস্তকে যে শরীরের অঙ্গ বলে, তাহা বলিয়া দাও) আবার কোন কোন ছেলের দুই নামও আছে। এইরূপ একটী ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর "তোমার নাম কি?" আমার নাম নিবারণ। বাড়ীতে তোমাকে কি বলে ডাকে? বাড়ীতে আমাকে শান্তি বলে ডাকে। এইরূপ আমাদের কোন কোন অঙ্গের দুই তিন নামও আছে। চুলের আর একটী নাম কি জান? (না পারিলে) চুলের আর এক নাম কেশ। সকলে বল "চুল কেশ।" এইরূপে "পেট উদর, কপাল ললাট, ইত্যাদি।" (বেশী শিখাইতে চেষ্টা করিও না)।

তারপর ১ম ২য় পাঠের অনুকরণে সমস্ত অঙ্গের ব্যবহারের কথা সাধারণ ভাবে জিজ্ঞাসা কর। এখন নিম্নলিখিত কবিতাটী শিক্ষা দাও।

এইটী মস্তক মোর, এ দুটী চরণ,
এইটী উদর মম, এ দুই নয়ন।

এই বক্ষ, এই নাভি, এই দুই উরু,
এই মোর কটিদেশ, এই দুই ভুরু।
ললাট, চিবুক, নাসা, কর দরশন,
এই দুই গণ্ড মম, এ দুই শ্রবণ।
অধর নীচের ঠোঁঠ, উর্দ্ধে তার ওষ্ঠ,
এই দুই জঙ্ঘা মম, এ দুই প্রকোষ্ঠ।
জানু, গুল্‌ফ, মণিবন্ধ, এ দুই কফোনি,
কনিষ্ঠা ও অনামিকা, মধ্যমা, তর্জ্জনী।
অঙ্গুষ্ঠ ইহার নাম, এই গ্রীবা দেশ,
দুই দিকে দুই কক্ষ, এই কৃষ্ণ কেশ।
জিহ্বা, দন্ত, দুই স্কন্ধ, এ দুই প্রগণ্ড,
দুই পার্শ্ব, এক পৃষ্ঠ, এক মেরুদণ্ড।
যকৃত দক্ষিণে আছে, প্লীহা থাকে বাম,
বক্ষ মধ্যে রক্তাধার, হৃদ্‌পিণ্ড নাম।
পাকস্থলী এইখানে, অন্ত্রযুক্ত তায়,
ফুস্‌ফুস দুই পাশে, মস্তিষ্ক মাথায়।
এই সব অঙ্গ মোর, যাঁহার রচনা,
দু'টা কর জুড়ি করি তাঁহারে বন্দনা।

এই কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বালকেরা দুই হস্তের দ্বারা প্রত্যেক অঙ্গ দেখাইবে।

১৮। ঠমক্ ও ঠুনক (ঘাতসহ ও ভঙ্গুর)

উপকরণ—স্লেট ভাঙ্গা, হাঁড়ি ভাঙ্গা, কাচ ভাঙ্গা, স্লেট পেনসিল, টিন, পিতল, লোহার প্রেক, চক ও একটা হাতুড়ী।

হাঁড়িভাঙ্গা দেখাইয়া—এই হাঁড়িটা কেমন করে ভেঙ্গেছে জান? বোধ হয় কাহারও হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গেছে। কোন বালকের ভাঙ্গা স্লেট থাকিলে তাহা দেখাইয়া 'এই স্লেট, কেমন করে ভেঙ্গেছে?

গোপালের হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গেছে। আচ্ছা এই স্লেটপেনসিলটা ফেলে দিলে ভাঙ্গিবে না আস্ত থাকিবে? ভাঙ্গিয়া যাইবে। এই লোহার স্ক্রেক্ ফেলিয়া দিলে কি হইবে? লোহার স্ক্রেক্ ভাঙ্গিবে না। এই টিনের উপর হাতুড়ী দিয়া ঘা মার—কি হইল? এই কাচের উপর ঘা মার, এবার কি হইল? সকলে বল কাচ, সেট, হাঁড়ি পড়িলেই ভাঙ্গিয়া যায়—ইহারা ঠুন্‌ক। লোহা, পিতল, টিন, পড়িলে ভাঙ্গে না—ইহারা ঠমক্। এক টুকরা চক্ হাতে দাও। চক্ ঠুন্‌ক না ঠমক্? চক ঠুন্‌ক। হাত দিয়া চক্ গুঁড়া করিতে পার? হাঁ পারি। চক নরম ও ঠুন্‌ক। হাত দিয়া কাচ গুঁড়া করিতে পার? না পারি না, কাচ শক্ত ও ঠুন্‌ক। তোমাদের বাড়ীতে পাথরের বাটী আছে? কাচের গেলাস আছে? কাচের বোতল আছে? মাটীর হাড়ি আছে? এসব জিনিস খুব সাবধানে রাখে কেন? আর কাঁসার গেলাস, পিতলের বাটী, লোহার কড়াই তেমন সাবধানে রাখে না কেন? কাল স্কুলে আসিবার সময় বাড়ী থেকে বা রাস্তা থেকে ২।৪টী ঠমক্ ও ঠুন্‌ক জিনিব কুড়িয়ে আনবে।

"এইটী মস্তক মোর"

দ্বিতীয় প্রকরণ।

(৬।৭।৮ বৎসরের শিশুগণের জন্য)

১। দ্রব্যের মাপ। ১ম।

উপকরণ—গজ কাঠী বা ফুট রুল ও একগাছি দড়ি। ও কয়েক খানি লম্বা কাঠী ও ১৮টী পয়সা।

যদি বালকেরা মাপিতে না জানে তবে তুমি প্রথমে দড়ি দিয়া মাপের প্রণালী দেখাও। একগাছি দড়ি মাপ—এক হাত, দুই হাত, তিন হাত, এই চার হাত। জিজ্ঞাসা করিয়া আদায় কর বা বলিয়া দাও—'এই দড়ি গাছি চার হাত লম্বা'। এইরূপ কাপড় মাপ এবং কয় হাত তাহা বল। বেঞ্চ মাপ, বেড়া মাপ ইত্যাদি। তারপর বালকগণকে নিজের নিজের হাত দিয়া দড়ি, টেবিল, বেঞ্চ, কাপড়, ছাতা প্রভৃতি মাপিতে বল। (এক কথা বলা আবশ্যক। সকল জিনিষ কিন্তু হাতে সমান ভাবে মিলিয়া যাইবে না অর্থাৎ কোন জিনিষ ৪॥০, কোনটী ৩৷৵০ হাত ইত্যাদি রূপ ভাঙ্গা মাপ হইবে। এইরূপ হইলে কেবল আন্দাজে একটা অর্দ্ধেক ধরিয়া লইবে অর্থাৎ ৪।০, ৪॥০, ৪৷৵০ প্রভৃতি সকল অঙ্ককেই ৪॥০ বলিয়া ধরিবে। পরে শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম হিসাব শিখাইবে।)

তার পর দেখাও যে সকলের হাত সমান নয়। কাহারও হাত বড় কাহারও ছোট। কাজেই যে জিনিষ ছোট হাতে ৩ হাত হইল, সে জিনিষ বড় হাতে হয়ত দুই হাত হইবে। এই জন্য একটা হাতের মাপ ঠিক থাকা দরকার। বলিয়া দাও যে ১৮টী পয়সা এক সারি করিয়া সাজাইলে যত লম্বা হয়, এক হাতকে তত বড় ধরা হয়। এখন এক খানি হাতের মাপকাঠী করিয়া দাও। বালকগণকে সেই মাপকাঠী দিয়া সকল জিনিষ মাপিতে বল। ঘরের পাশ মাপ, ঘরের বারান্দা মাপ, ঘরের বেড়া মাপ—কয় হাত লম্বা? এইরূপ ২।৩ দিন অভ্যাস করাইবে। তারপর জিনিষের মাপ আন্দাজ করিতে শিক্ষা দাও। "না মাপিয়া বলত এই বেঞ্চ খানা কয় হাত লম্বা?" বালকেরা একটা আন্দাজ করিবে, তারপর মাপিতে বল; দেখ কাহার আন্দাজ ঠিক। এইরূপে নানা জিনিষের আন্দাজ করিতে বল। মধ্যে মধ্যে এই পাঠের পুনরালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে বালকেরা জিনিষ দেখিয়া ঠিক আন্দাজ করিতে শিখিয়াছে। ইহার পর ইঞ্চ ও ফুট কথা বুঝাইয়া দাও। এক ইঞ্চের মাপ একটা পয়সার মাঝখানের (ব্যাসের) মাপের সমান। ১২ ইঞ্চিতে এক ফুট হয়। ফুট কথার মানে 'চরণ'। তোমার নিজের 'চরণ' কয় ইঞ্চ তাহা মাপিয়া দেখাও। যেমন নানা জনের হাত নানরূপ মাপের, তেমনি নানাজনেব পাও নানা মাপের। এইজন্য ১২ ইঞ্চিতে একটা ফুটের মাপ ঠিক করা হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রণালীমত বেঞ্চ, ডেস্ক, ঘর প্রভৃতি কত ফুট লম্বা, ইহার মাপ করাও ও এই সমস্ত জিনিষ মাপের পরিমাণ আন্দাজ করিতেও শিক্ষা দাও।

২। দ্রব্যের মাপ। ২ পাঠ।

(দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ)

উপকরণ—হাত কাঠী, ফুটরূল, দড়ি প্রভৃতি।

এই ঘরের কোন্ পাশ্‌টা বড়? সেই পাশটা মাপ। হাঁ, এইটীই ঘরের লম্বা পাশ।. ঘর এত হাত (বা ফুট) লম্বা। ঘরের ছোট পাশটা মাপ। কত হাত লম্বা? এই ছোট পাশকেই বলে ঘরের চওড়া। এক খান বড় কাঠী দাও। এই কাঠী দিয়া ঘরের খাড়াই মাপ। তার পর সেই কাঠী কত হাত লম্বা, তাহা মাপ। হাঁ, ইহাই ঘরের খাড়াই।

এইরূপে টেবিলের লম্বা পাশ, চওড়া পাশ ও খাড়াই (ফুটের দ্বারা) মাপিতে বল। বেঞ্চ, ডেস্‌ক, প্রভৃতিরও মাপ করিতে বল। পরে এক খানি বড় পুস্তক লইয়া (ইঞ্চের দ্বারা) তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ মাপিতে শিখাও।

ঘর, বেঞ্চ, টেবিল, পুস্তক প্রভৃতির দুইটী লম্বা পাশ যে এক মাপের ও দুইটী ওসার পাশও যে এক মাপের তাহা বালকগণকে দেখাইয়া দাও।

পথের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে, বেধ কি উচ্চতা নাই। ঘরের মেজের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে বেধ নাই। জমি মাপিতে কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপিলেই হইল।

কাপড়, কাগজ, চট, গালিচা, সতরঞ্চ, মাদুর প্রভৃতি জিনিষের ও কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপ করা হয়। ইহাদের বেধ খুবই কম বলিয়া মাপ করা হয় না। তক্তা মাপিতে হইলে অনেক সময় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ তিনই ধরিতে হয়। (দৈর্ঘ্য প্রস্থ, ও বেধ কথাগুলি শিক্ষককে বুঝাইবার নিমিত্ত এখানে লেখা হইল—কিন্তু শিক্ষক বালকগণকে প্রথমে এ সকল কথা শিখাইবেন না। লম্বা পাশ, চওড়া পাশ ও মোটা

পাশ প্রভৃতি প্রচলিত কথার দ্বারাই শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। তার পর ধীরে ধীরে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ প্রভৃতির ব্যবহার শিখাইতে হইবে।)

একটা মোটা গাছ মাপিতে বল। বলিয়া দাও যে গাছের গুঁড়ির চারিদিকে প্রথমে দড়ি দিয়া মাপ করিয়া, সেই দড়ি কয় ফুট বা কয় হাত তাহা মাপ করিতে হয়। এই মাপকে গাছের বেড় বলে। মোটা কাঠের মাপও এইরূপেই করে। কাঠ এত হাত লম্বা ও এত হাত বেড়। একটি ছক দেখাও—কি একটা বাক্‌স দেখাও। এই ছকের কয়টা পাশ গণিয়া দেখ। যে জিনিষের ছয়টা পাশই সমান তাহাকে ছক বলে। যে জিনিষের ছয় পাশের কেবল দুইটী করিয়া সমান তাহাকে ইঁট বলে। একখানি ইঁট মাপিয়া দেখাও। (ছয়টী পাশ সমান হইলে ছক বলে, ভাল কথায় 'সমঘন'। ছয়টী পাশের দুইটী করিয়া সমান হইলে ইঁট বলে—ভাল কথায় 'আয়তঘন'।)

বলের কয়টী পাশ? বলের এক পাশ বটে, কিন্তু বলের বেধ আছে। বলের বেধ কেমন করিয়া মাপে? একটা আলু বা কমলালেবু কাট ও ইঞ্চের কাঠী দ্বারা তাহার বেধ (ব্যাস) মাপ। এইরূপে বলের বেধ মাপে। ঢোলের কয়টা পাশ? ঢোলের তিনটী পাশ: উপর নীচে দুইটী সমান পাশ—আর ঢোলের চারিদিকে ঘুরিয়া আর একটী পাশ। যেমন করিয়া গাছ মাপে, তেমন করিয়া ঢোলের বেড় ও খাড়াই মাপে। মাপিয়া দেখাও। ঢোলের খাড়াই আর ব্যাস মাপিলেই হয়। দুধ মাপে কেমন করিয়া? চোঙ্গা বা ভাঁড়ে করিয়া। চাউল মাপে কেমন করিয়া? দাঁড়ি পাল্লা দিয়া।

৩। দ্রব্যের ওজন।

উপকরণ—দাঁড়িপাল্লা, বাটখারা ও দুধ মাপিবার ভাঁড় বা চোঙ্গা, চাল কি ধান বা বালি।

একজনকে দোকানী সাজাও। তাহার সম্মুখে দাঁড়িপাল্লা, বাটখারা ও ধামায় করিয়া চাউল রাখ। দুই তিন জনকে ক্রেতা ঠিক করিয়া তাহাদিগের নিকট এক সের ও দুই সের চাউল কিনিবার পয়সা দাও। দোকানে গিয়া তাহাদিগকে চাউল কিনিতে বল।

১ নং গ্রাহক। দোকানী ভাই দোকানী ভাই চাউল আছে কত ?

দোকানী। চাও যত দাম দিলে দিতে পারি তত।

১ নং গ্রাহক। এক সেরে কত দাম বল দেখি শুনি।

দোকানী। মোটা চাল দেড় আনা, সরু দুই আনি।

২ নং গ্রাহক।—একসের দাও মোরে নাও এক আনি।

দোকানী।—তোমার চালাকী শুধু কেনা নয় জানি।

৩ নং গ্রাহক।—আমি ভাই সোজা বুঝি দাও দুই সের।

দোকানী।—মোটা কি না সরু বল, নাই ফাউফের।

৩ নং গ্রাহক।—আনিয়াছি দুই আনি দেবে মোরে কত ?

দোকানী।—সরু চাল একসের মাপি রীতিমত।

দোকানী বালক দাঁড়ি পাল্লা লইয়া দাঁড়ির সূতা বামহাতে ধরিয়া—দাঁড়ির বামদিকের পাল্লার উপর একসের বাটখারা দিয়া (বালক একসেরের বাটখারা না চিনিলে শিক্ষক দেখাইয়া দিবেন) ডানহাতের দ্বারা ধামা হ'তে চাল তুলিয়া ক্রমে ক্রমে একসের ওজন করিবে। ঠিক ওজন কোন সময় হইবে শিক্ষক তাহা দেখাইয়া দিবেন। দোকানদারেরা এক না বলিয়া একে 'রাম' বলিয়া থাকে। বালকও তদ্রূপ গণিতে আরম্ভ করিবে :—

দোকানী।—রামে রাম, রামে রাম রামে রাম রাম।

এই নাও চাল তুমি দাও মোরে দাম॥

৪ নং গ্রাহক।—এই নাও দাম গণে যাই আমি বাড়ী।

দোকানী।—আমার দোকানে যেন এস দয়া করি।

২ নং গ্রাহক।—এই নাও তিন আনা দাও কত দেবে।

দোকানী। দুইসের মোটা চাল কিসে ক'রে নেবে?

২ নং গ্রাহক।—পেতেছি কাপড় মোরে দাও ঢেলে এতে।

দোকানী।—(মাপিতে মাপিতে)

রামে রাম এক সের, ধর ধুতি পেতে।

২ নং গ্রাহক।—এই হ'ল একসের আর সের দাও।

দোকানী।—(মাপিতে মাপিতে)

দুই এ দুই দুইসের এই দেখে নাও।

২ নং গ্রাহক।—গণিয়া এনেছি দাম তুমি গণ দেখি।

দোকানী।— (গণিতে গণিতে) এক, দুই, তিন আনা দুয়ানীটা মেকি।

২ নং গ্রাহক। মেকি তুমি কারে বল বুঝাইয়া দাও।

দোকানী।—দুয়ানীর পাশকাটা এই দেখে নাও।

২ নং গ্রাহক।—আমার নামেতে তবে লিখে রাখ বাকী।

দোকানী।—(খাতায় নামলিখিয়া) লিখিলাম নাম ভাই দিওনাক ফাকী।

১ নং গ্রাহক।—তিনটী পয়সা আছে মোটা চা'ল চাই।

দোকানী।—(মাপিতে মাপিতে) আধসের নাও আর বেচাকেনা নাই।

(শিক্ষক আধসেরের বাটখারা দেখাইয়াদিবেন)

আধসের ওজনের নীচের মাপ শিখাইবার দরকার নাই। একসেরের ও আধসেরের বাটখারা দুইটী বালকেরা হাতে লইয়া পরীক্ষা করিবে। এখন নানা দ্রব্যের ওজন আন্দাজ করিতে শিখাও। যে সমস্ত জিনিষ আধসের, একসের; দুইসের, তিনসের ওজনের হইতে পারে এমন দ্রব্য সংগ্রহ কর। যথা—মোটাপুস্তক, ইষ্টকখণ্ড, পাথর খণ্ড, বাটী বা গেলাস, বোতল ইত্যাদি। বালকগণকে হাতে করিয়া জিনিষের ভার আন্দাজ করিতে
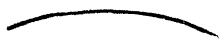
বল। মনেকর একখণ্ড ইষ্টকদিলে। এক বালক বলিল, আধসের অপর একজন দুই সের, অপর বালক দেড়সের ইত্যাদি। এখন ওজন করিয়া দেখাও কাহার আন্দাজ ঠিক। দেড়সের জিনিষকে দুইসের আন্দাজ করিলেও বালকের পক্ষে আন্দাজ একরূপ ঠিকই বলিতে হইবে। (অনেক বয়স্ক লোকের একবারেই আন্দাজ করিবার শক্তি নাই। তাহারা একসের জিনিষ হাতে করিয়া বলে পাঁচসের, পাঁচসের হাতে করিয়া বলে দশসের।) কিছু দিন অভ্যাস হইলেই দেখিতে পাইবে বালকেরা কেমন আশ্চর্য্য বোধ শক্তির পরিচয় দানকরে। দ্রব্যাদির পরীক্ষা করিতে হইলে এইরূপ একটা ওজনের আন্দাজ থাকা আবশ্যক।

তেল, ঘি, দুধ প্রভৃতি দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করা যায় না। এইজন্য ওজনের সময় প্রথমে একটা বাটি কি গেলাস, ইঁট পাথর প্রভৃতি দিয়া ওজন করিয়া দুই পাল্লা ঠিক করিয়া লয়। পরে বাম পাল্লায় বাটখারা দিয়া ডান পাল্লায় বাটিতে ঘি ঢালিয়া দেয়। এইরূপ ওজন করিয়া যত ঘি, দুধ বা তেল হয় তাহা একটা বাঁশের চোঙ্গা, মাটীর ভাঁড় কি পিতলের গেলাসে ঢালিয়া সেই পাত্রের যে পর্য্যন্ত ভরে, সেখানে একটা দাগ কাটিয়া রাখে। এইরূপ সুবিধা করাতে দুধ কি তেল বিক্রয়ের সময় ভারী ভারী দাঁড়ি পাল্লা না টানিয়া কেবল চোঙ্গা বা ভাঁড় লইয়া যায়। বালকগণকে একসের জল মাপিয়া দেখাও।

৪। রেখা।

উপকরণ।—তার, সূতা, বেত, বাঁশের কাঠি, কাগজ, বেগুনপাতা, লাউ পাতা, কাঁঠাল পাতা ইত্যাদি

এই কাগজের পাশ কেমন আর এই বেগুন পাতার পাশ কেমন? কাগজের পাশ সোজা, বেগুন পাতার পাশ এঁকাবেঁকা (বালকগণ

এসকল কথা না জানিলে শিক্ষক শিখাইয়া দিবেন)। এই পুস্তকের পাশ কেমন, এই টেবিলের কেমন? আবার এই লাউপাতা, গোলাপ পাতার পাশ কেমন? ইত্যাদি রূপে নানা জিনিষের সোজাপাশ, এঁকাবেঁকা পাশ দেখাইয়া দিবেন। বোর্ডের উপর একটী সোজা রেখা ও একটী এঁকা বেঁকা রেখা আঁক। জিজ্ঞাসাকর কোন্ টান্টী (বালকেরা রেখাকে টান বলে) সোজা আর কোনটী এঁকাবেঁকা?

সোজা টান

এঁকা বেঁকা টান

বেঁকা টান।

তারপর একটা কাঁঠাল পাতা কি কচুর পাতার পাশ দেখাও। ও তাহার সহিত কুমড়া পাতা, বেগুণপাতার কি উচ্ছে পাতার তুলনা করিতে বল। কচুপাতার পাশ কেবল বেঁকা কিন্তু উচ্ছে পাতার পাশ এঁকাবেঁকা। বোর্ডের উপর বেঁকা রেখা আঁকিয়া দেখাও।

দুইটী ছাত্রকে দাঁড় করাও ও তাহাদের হাতে একগাছ দড়ি দাও। দুইজনে দড়িগাছটী টান করিয়া ধরিলে যে সোজা রেখা হয়, আল ঢিল করিয়া ধরিলে যে বেঁকারেখা হয় তাহা বালকগণকে দেখাইয়া দাও। মাটীতে দড়িগাছটী সাপের মত এঁকাবেঁকা করিয়া রাখ। বালকগণকে জিজ্ঞাসা কর—দড়ি কোন্ টানের মত? প্রত্যেক বালকের হাতে একটু করিয়া লোহার তার দাও। আর সেই তারখণ্ডকে একবার বেঁকা, একবার এঁকাবেঁকা ও একবাব সোজা করিতে বল।

প্রত্যেক বালকের হাতে একটু করিয়া সূতা দাও ও সেই সূতাকে মাটী বা টেবিলের উপর সোজা, বেঁকা ও এঁকাবেঁকা করিয়া সাজাইতে বল।

'বালকগণকে স্লেটে সোজা টান, বেঁকাটান ও এঁকাবেঁকা টান আঁকিতে বল।

—— ——

৫। রেখা—(খাড়া, পড়া, তেড়া,)

২য় পাঠ।

উপকরণ—কাঠী, পেনসিল, বোর্ড, চক প্রভৃতি।

টেবিলের উপর কি মাটিতে একজন বালককে দাঁড়করাইয়া বল—"এই দেখ সুরেশ কেমন খাড়া হইয়া আছে। তোমরা সকলে খাড়া হও।" (বালকগণের দণ্ডায়মান হওন)। টেবিলের উপর একটা ছাতা খাড়া করিয়া ধরিয়া 'এই দেখ এই ছাতাটাকেমন খাড়া হইয়া আছে। ইহাকে খাড়া ছাতা বলে। তোমরা স্লেটের উপর তোমাদিগের পেনসিল খাড়া করিয়া ধর। (বালকগণ তদ্রূপ করিবে)। হাঁ ঠিক ইহাকে খাড়া পেনসিল বলে।" একটী বালককে টেবিলের উপর শুইতে বল। বালক শুইলে পর বল "এইদেখ গোপাল কেমন পড়িয়া আছে।" একটী ছাতা টেবিলের উপর শোয়াইয়া 'এই দেখ ছাতাটী কেমন পড়িয়া আছে। ইহার নাম পড়া ছাতা। তোমরা স্লেটের উপর পড়া পেনসিল দেখাও ত ?'

তারপর একটী ছাতা লইয়া গৃহের দেয়ালের সহিত হেলাইয়া রাখ। 'এই দেখ এবারে ছাতাটী কেমন তেড়া হইয়া আছে। ইহাকে বলে তেড়া ছাতা। তোমরা পেনসিল গুলিকে দেয়ালের গায় তেড়া করিয়া ধরত ?'

এখন বোর্ডে একটী খাড়া রেখা আঁক। বালকগণকে নিজ নিজ স্লেটে তাহার অনুকরণ করিতে বল। এইরূপে তেড়া রেখা ও পড়া রেখার অঙ্কন শিখাও। (বালকেরা প্রথমে রেখা কথা ব্যবহার করিবে না এই জন্য খাড়াটান, তেড়াটান ও পড়া টান কথা ব্যবহার যুক্তি সঙ্গত।)

তারপর ঘরের দ্রব্যাদির সহিত এই তিন টানের মিল দেখাও। বেঞ্চ, টেবিল প্রভৃতির চার পাশ চারটী পড়াটান বা রেখা। ঘরের আড়াও

পড়া রেখা। টেবিল, চেয়ার প্রভৃতির পায়া, ঘরের খুটী প্রভৃতি খাড়া রেখা। ঘরের চালের রুয়া তেড়া রেখা। কেবল রেখার দ্বারা ঘর আঁকিতে শিক্ষা দাও। প্রথমে একটী পড়া রেখা আঁক যথা (১); তার সহিত চালের দুইটী তেড়া রেখা মিলাও (২, ৩); তারপর দুইটী খুটী (খাড়া রেখা) লাগাও (৪, ৫); তারপর ঘরের মেজের রেখা দাও (৬); এখন দরজা আঁক। এই উপলক্ষ করিয়া ঘরের চাল, রুয়া, খুটী, বাতা,বেড়া, ও অন্যান্য উপকরণের ২।৪টী নাম শিখাইলে ভাল হয়। এই চিত্র বালকেরা কাঠী পাতিয়াও প্রস্তুত করিতে পারে। (বিবিধ বিধানের ১৯৫ পৃঃ পড়)।
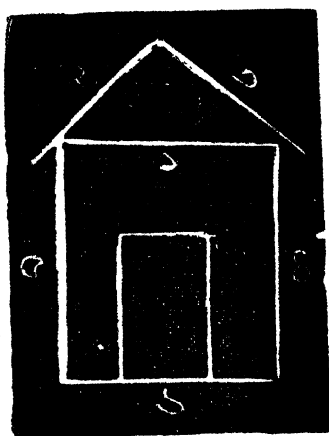
ঘরে—খুঁটী গুলি খাড়া।
চালে—রুয়া গুলি তেড়া॥
মাঝে—আড়া গুলি পড়া॥

৬। ক্ষেত্র ও কোণ।

উপকরণ—কাগজ, তার, কাঠী, চক, বোর্ড।

এইঘরের কয়টা কোণ আছে? ৪টী কোণ। কোণগুলি দেখাও। এই টেবিলের, এই পুস্তকের, এই স্লেটের, এই বোর্ডের কোণ দেখাও। যে জিনিষের চারটা পাশ তার কয়টা কোণ? চারটা কোণ। টেবিলের উপর কাগজ রাখ ও একটা আয়ত ক্ষেত্র আঁকিয়া বালকগণকে বল—

এই যেন আমাদের ঘরের মেজে। কোণগুলি দেখাও। এই নক্সার কোন্ কোণের সঙ্গে ঘরের কোন্ কোণের মিল? কাগজে একটা কোণ আঁক। দুইটা রেখা না হইলে একটা কোণ হয় না। একটা ত্রিভুজ আঁকিয়া তাহার কোণ দেখাইতে বল। 'ত্রিভুজ' নাম শিখাও। ত্রিভুজের তিনটী কোণ আর তিনটী বাহু বা পাশ।

একটী বর্গক্ষেত্র আঁক। চারি বাহু যে সমান তাহা মাপিয়া দেখাও। এক খানি পুস্তকের কোণের সহিত সমান করিয়া লোহার তার কি সরু-কাঠী দিয়া একটা কোণ প্রস্তুত কর। সেই কোণ দিয়া মাপিয়া দেখাও যে এই ক্ষেত্রের চার কোণ সমান। চার বাহু ও চার কোণ সমান হইলে তাহাকে বর্গ ক্ষেত্র বলে। ঘরের কোণ, টেবিলের কোণ, পুস্তকের কোণ গুলিকে সমকোণ বলে।

একটী স্থূল কোণ আঁক ও সমকোণের দ্বারা মাপ দিয়া দেখাও যে সে কোণটী সমকোণের চেয়ে বড়। একঠি সূক্ষ্মকোণ আঁক ও সমকোণ দিয়া মাপ দিয়া দেখাও যে সেটী সমকোণের চেয়ে ছোট। বড়কোণ, ছোট কোণ ও সমকোণ এই তিন রকম কোণ।

যে ক্ষেত্রের চারটী পাশের মধ্যে দুইটী করিয়া পাশ সমান আর কোণ-গুলি সমকোণ তাহার নাম আয়ত ক্ষেত্র। পুস্তক, স্লেট, টেবিল ও ঘরের মেজের উপরিভাগ আয়ত ক্ষেত্র।

যাহার চারদিকেই ঘেরা তাহাকে ক্ষেত্র বলে। দুইটী সোজা রেখা দ্বারা একটা ক্ষেত্র করা যায় না। পরীক্ষা করিতে বল।

একটা বেঁকা রেখা দিয়া কি এঁকাবেঁকা রেখা দিয়া একটা জায়গা ঘেরা যায়। আঁকিয়া দেখাও বা বালকগণকে আঁকিতে বল। বৃত্ত আঁক ও বৃত্তের নাম শিখাও। বৃত্তের কোন কোণ নাই।

আর অধিক ক্ষেত্রাদির পরিচয় করান অনাবশ্যক। বালকগণের দ্বারা এই সকল চিত্র (ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, বৃত্ত) অঙ্কন করাও।

প্রথম প্রথম অবশ্য বালকগণের চিত্রাদি সুন্দর হইবে না, কিন্তু বিরক্ত হইও না, কিছু দিন অভ্যাসের পর ঠিক হইয়া যাইবে।

বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে কোদালীর দ্বারা ৮×৪০ অথবা ১৬×২০ হাত একটী আয়ত ক্ষেত্র চিহ্নিত করিয়া রাখিবে। এক কাঠা জমি বলিলে কতটা জমি বুঝায় তাহা বালকেরা ধারণা করিতে শিখিবে। পরে কোন জমিতে লইয়া গিয়া কয় কাঠা জমি আন্দাজ করিতে বলিবে।

৭। খড়ের ঘর।

উপকরণ—খড়, বাঁশ, বাখারী, দেশলাই ইত্যাদি।

প্রথমে ঘরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরিচয় করাও। ঘরের চাল দেখাও। কয় খানি চাল? ঘরের বেড়া দেখাও। কয় খানি বেড়া? ঘরের চাল কি দিয়া তৈয়ার করিয়াছে? খড় ও বাঁশ দিয়া তৈয়ার করিয়াছে? আস্ত বাঁশ না ফাড়া বাঁশ বলত? এইগুলি আস্ত আস্ত বাঁশ—ইহাকে চালের রুয়া বলে। আর এইগুলি ফাড়া বাঁশ ইহার নাম বাখারী (দেশ ভেদে চালের এই সকল সাজের নানারূপ নাম আছে—যে জেলায় যেরূপ নাম বালকগণকে সেইরূপ শিখাইলেই চলিবে।) চালের উপর খড়গুলি কেমন করিয়া সাজায় জান? (এক খান ছোট চালে খড় সাজাইয়া দেখাও)। চালের নীচ দিক থেকে খড় সাজাইতে সাজাইতে উপরের দিকে ওঠে। (উল্‌টা মুখে খড় সাজাইলে যে বৃষ্টির জল খড়ের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে তাহা দেখাইয়া দাও) হাঁসের গায় পালক ও বিড়ালের গায় লোম কেমন করিয়া সাজান থাকে তাহা লক্ষ্য করিতে বল। পশু পক্ষীর গায় চালের খড়ের মত লোম সাজান আছে বলিয়া তাহাদের গায় জল বাধিয়া থাকে না। চালের খড় কেমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে? খড়গুলিকে বাখারীর সঙ্গে দড়ি (কি বেত) দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

চাল থাকাতে কি উপকার হয়? আমাদিগের গায় রৌদ্র বৃষ্টি লাগে না। ঘরের বেড়া কি দিয়া তৈয়ার করিয়াছে? (যে উপকরণে প্রস্তুত তাহার নাম আদায় কর) ঘরে বেড়া দেয় কেন? আমাদিগের গায় ঝড় বাতাস লাগিতে পারে না। শেয়াল কুকুর ঘরে ঢুকিয়া ঘরের জিনিষ নষ্ট করিতে পারে না। ঘরে জানালা রাখে কেন? ঘরে আলো ও বাতাস আসিবার জন্য জানালা রাখে। ঘরে দরজা রাখে কেন? ঘরের বাহির হইতে ভিতরে যাইবার জন্য ও ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার জন্য। ঘর খানি কোন জিনিষের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে? এই কয়টী বাঁশের (বা কাঠের) খুঁটীর (বা থামের) উপর। কয়টী খুঁটী আছে গণ।

তাহ'লে এখন বলিতে পার ঘর তৈয়ারী করিতে হইলে কি কি জিনিষ লাগে? বাঁশ, খড় ও দড়ি। যে সকল মজুর ঘর তৈয়ারী করে তাহা-দিগকে কি বলে? যাহারা ঘর তৈয়ারী করে তাহাদিগকে ঘরামী বলে।

আর কোন্ কোন্ জিনিষ দিয়া ঘর করিয়া থাকে? ইঁট দিয়া ঘর করে—তাহাকে পাকা ঘব (বা দালান) বলে। টিন দিয়া ঘর করে—তাহাকে টিনের ঘর বলে। (যদি নিকটে খোলার কি রাণীগঞ্জ টালীর ঘর থাকে, তবে তাহা দেখাইয়া খোলার ঘর ও টালীয় ঘরের পরিচয় করাইবে)

খড়ে আগুন লাগাইয়া দেখাও। খড় খুব সহজে পুড়িয়া যায় বালকগণকে সাবধান করিয়া দাও—খড়ের ঘরের নিকট অসাবধানে আগুন লইয়া আসা উচিত নয়। ঘরে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গেলে যে কিরূপ কষ্ট ও ক্ষতি হয় তাহা সামান্য ভাবে বুঝাইয়া দাও।

৮। বেঞ্চ বা তক্তপোষ।

উপকরণ—কাঠ, করাত, লোহা, তক্তা, রাঁদা, হাতুড়, বাটাল।

এই বেঞ্চখানি কি দিয়া তৈয়ার করিয়াছে? বেঞ্চখানি কাঠ দিয়া তৈয়ার করিয়াছে। কাঠ কোথায় পায়? বড় বড় গাছ কাটিলে কাঠ

পাওয়া যায়। কি দিয়া গাছ কাটে? কি দিয়া গাছ চেরে? যদি নিকটে কোথাও করাতীর কাজ দেখাইতে পার তবে বালকগণকে সেখানে লইয়া যাও। সে সুবিধা না হইলে একখান ছোট করাত দিয়া একটু কাঠ চিরিয়া দেখাও। এইরূপ চেরা কাঠকে তক্তা বলে। বেঞ্চের উপর কয়খানি তক্তা আছে? একখান তক্তা। কয়টা পা আছে? তক্তাখানিকে কেমন করিয়া পায়ার সঙ্গে আঁটিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিতে বল। তক্তাখানিকে কেমন করিয়া পালিশ করিয়াছে? 'র‍্যাদা ঘষিয়া পালিশ করিয়াছে। একটা' র‍্যাদা দিয়া এক টুকরা কাঠ পালিশ করিয়া দেখাও।

[কোন কোন শিক্ষক হয়ত মনে করিতেছেন যে বিদ্যালয়ে বুঝি সূত্রধরের সমস্ত অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। তাহা নহে। গ্রামের কাহারও নিকট হইতে এ সমস্ত জিনিষ কর্জ্জ করিয়া আনিয়াই বালকগণকে দেখান যাইতে পারে। পদার্থ পরিচয় শিক্ষায় এইরূপে অনেক জিনিষ গ্রামের লোকের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া আনিতে হইবে। বিদ্যালয়ে সংসারের সমস্ত জিনিষের সংগ্রহ রাখা অসম্ভব।]

এই দেখ এই তক্তার ভিতর খানিকটা কাটিয়া পায়া পরাইয়া দিয়াছে। কেমন করিয়া ও কি দিয়া কাঠ কাটে জান? এই দেখ—এই বাটালির দ্বারা, এইরূপে কাঠ কাটে। ইহার নাম হাতুড়ী—ইহা দ্বারা বাটালির উপর ঘা দিতে হয়। তারপর যাহাতে পায়াগুলি খুলিয়া না যায় সেজন্য এই দেখ লোহার প্রেক আঁটিয়া দিয়াছে।

এই ঘরে আর কি কি কাঠের জিনিষ আছে? যাহারা কাঠের জিনিষ তৈয়ার করে তাহাদিগকে ছুতার (বা ভাল কথায় সূত্রধর) বলে।

আমরা বেঞ্চেতে বসি কেন? মাটীতে বসিলে ঠাণ্ডা লাগে। আমরা তক্তপোষে শুই কেন? আমরা বাক্সে কাপড় রাখি কেন? তোমার স্লেটের চারিধারে কাঠ লাগাইয়াছে কেন? ইত্যাদিরূপ প্রশ্ন করিয়া কাঠের অন্যান্য আসবাবের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দাও।

৯। ফল।

উপকরণ—নানা প্রকারের ফল ও সেই সকল ফলযুক্ত বৃক্ষের পাতা।

শিক্ষক। তোমরা কে কি কি ফল খাইয়াছ—একে একে বল।

বালকেরা যে যাহা খাইয়াছে তাহার নাম করিবে ও শিক্ষক নিজে একটী একটী করিয়া বোর্ডে লিখিবেন। তারপর ছাত্রগণকে নিম্নলিখিত কবিতাটী শিখাইবেন।

আম, জাম, আনারস, লিচু, লেবু, কুল।
কাঁঠাল, বাতাবী, লেবু, আমড়া, তেঁতুল॥
পেয়ারা, সুপারী, আতা, কামরাঙ্গা, কলা।
জলপাই, জামরুল, ডালিম, কমলা॥
চাল্‌তে, গোলাপজাম, তাল, নারিকেল।
নোনা, ফুটি, তরমুজ, পেঁপে, শশা, বেল॥

এখন রস অনুসারে ফলগুলি ভাগ করিতে বল। (শিক্ষক যে ফলগুলি সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাহা টেবিলের উপর এক স্থানে রাখিয়া দিবেন। বালকেরা ফলের আস্বাদ অনুসারে পৃথক পৃথক করিয়া ভাগ করিবে)।

টক্‌ফল	মিষ্টিফল	টক্‌ ও মিষ্টি (অম্ল মধুর)
আমড়া	আতা	আম
তেঁতুল	কলা	আনারস
কামরাঙ্গা	কাঁঠাল	
জলপাই	নারিকেল	কুল (নারকেলী)
চাল্‌তে	নোনা	কমলা
কুল	ফুটি	
বাতাবীলেবু	তরমুজ	
	পেঁপে	
	বেল	

টক্‌, কষায় ও মিষ্ট	তিক্ত ও মিষ্ট
জাম	তাল
পেয়ারা	
জামরুল	
গোলাপ জাম	
ডালিম	

(এই তালিকা যে রস অনুসারে নির্ভুল হইয়াছে তাহা নহে। কেবল বালকগণের একটা মোটামুটি রসের বোধ পরীক্ষা করাই এই তালিকার উদ্দেশ্য। নানাবিধ রস শিক্ষাদানের পরে এই পাঠ শিক্ষণীয়। এই পাঠ শিক্ষাদানে শিক্ষক অনেক রকম ফল সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবেন। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে এই পাঠ দেওয়া সুবিধা)। যে সকল ফল সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার বিষয় কিছু কিছু শিক্ষাদান করিতে হইবে :—

এই আমটী লও। ইহার উপরের খোঁসা (বা চোঁচা বা ছাল) ফেলিয়া দাও। মধ্যে কি রকম দেখিতেছ? কমলা রঙের মত কতক খানি নরম জিনিষ। হাঁ, ঠিক কথা, ইহাকেই শাঁস বলে, আর কি আছে দেখ? একটু একটু আঁইশ আছে। ঠিক বলিয়াছ, এখন খাইয়া দেখ। কেমন লাগে? একটু টক্‌ ও মিষ্টি। আচ্ছা শাঁসের পর কি আছে দেখ। শাঁসের পর একটা শক্ত আঁটী। ঠিক কথা। এই ছুরি দিয়া আঁটী কাটিয়া দেখ। কি আছে বল? আঁটির ভিতর শাদা একটা জিনিষ—একটু শক্ত। হাঁ,—আঁটীর উপরের ভাগকে আঁটীর খোসা বলে। খোসার মধ্যে যে শাদা জিনিষ দেখিতেছ উহাকে আঁটীর সার বা বীজ বলে। এখন এই বীজটী বেশ করিয়া দেখ—একটা দাগ দেখিতে পাইতেছ? এই দাগ বরাবর ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিলে দেখিবে যে বীজটী বেশ সমান দুই ভাগে ভাগ হইয়া গেল (একটা ছোট আমের চারা উঠাইয়া দেখাও যে বীজ কেমন দুই ভাগে ভাগ হইয়া গিয়াছে)।

এই পেঁপেটা কাট। ইহার মধ্যে কি? ছাড়াইয়া দেখ। আমের মত পেঁপের খোঁসা হাত দিয়া ছাড়ান যায় না। ছুরি দিয়া ছাড়াইতে হয়। পেঁপের মধ্যের শাঁস বেশ নরম—গাঢ় কমলা রঙ। আঁইশ নাই। পেঁপের মধ্যভাগ ফাঁপা—আমের আঁটির মত—আঁটি নাই। অনেকগুলি কাল কাল ছোট ছোট আঁটি (বা বীজ) পেঁপের গায় লাগিয়া আছে।

এখন একটা বিচি কলা লও। কলার উপরের খোসা বেশ হাত দিয়াই ছাড়ান যায়। ভিতরের শাঁস বেশ নরম—পেঁপের মত। কিন্তু পেঁপের মত ভিতর ফাঁপা নয়—বিচিগুলি শাঁসের মধ্যে লাগিয়া থাকে।

কলার পাতা, পেঁপের পাতা ও আমের পাতা দেখাও। কলার পাতা খুব বড় ও তার শিরাগুলি বেশ সোজা সোজা, আমের পাতা ছোট আর তার শিরাগুলি জালের মত। পেঁপের পাতা কেমন—হাতের মত—পাতার পাঁচটী মাথা যেন পাঁচটী আঙ্গুল।

বালকগণকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ফলের পাতা সংগ্রহ করিতে বলিবে ও প্রত্যহ বিদ্যালয়ে আসিয়া দেখাইতে বলিবে। মধ্যে মধ্যে বালকগণকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে বেড়াইতে বাহির হইবে অথবা বিদ্যালয়ের ছুটীর কিছু পূর্ব্বে বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া বালকগণের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইবে আর আম, জাম, কাঁঠাল, সুপারী, তাল, নারিকেল, তেঁতুল, আনারস প্রভৃতি নানারূপ ফলের গাছ দেখাইবে ও পাতা দেখিয়া যাহাতে গাছ চিনিতে পারে তাহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দিবে। ইচ্ছা করিলে কতকগুলি শুষ্ক ফলের নাম শিখাইতে পার; এইরূপ ফলকে 'মেওয়া' বলে।

কিস্‌মিস্ আকরোট মনক্কা আঙ্গুর।
বেদানা বাদাম পেস্তা খুরমা খেজুর॥

১০। তরকারী।

উপকরণ—নানারূপ তরকারী—পাতা সমেত। পাতা দেখিয়া যাহাতে বালকেরা গাছ ও ফলের নাম করিতে পারে সেরূপ শিক্ষাদান উদ্দেশ্য।

শিক্ষক। তরকারীর নাম কর—কে ক'টী বলিতে পারে দেখা যাউক। বালকেরা আলু, বেগুণ, লাউ প্রভৃতি নানারূপ নাম করিবে। তারপর নিম্নলিখিত কবিতাটী শিখাও :—

কুমড়া, বেগুণ, লাউ, ধুঁদল, পটোল,
আলু, সীম, কচু, মূলা, উচ্ছে, ঝিঙ্গে, ওল।
কাঁকরোল, কাঁচাকলা, করলা, কাঁকুড়,
বরবটী, শালগম, ঢেঁড়স, ডুমুর ॥

(শীতকাল এই পাঠের উপযোগী)

বেগুণ কাটিয়া দেখাও—বিচিগুলি কেমন ছোট ছোট। সিম খুলিয়া দেখাও—দুইটী খোঁসার (বা শুটীর) ভিতর কেমন বিচিগুলি সাজান আছে। পটোলের মধ্যে কেমন ফাঁপা—পেঁপের মত। বরবটী, কড়াইশুঁটী প্রভৃতি সিমের মত—খোঁসার ভিতর দানা। আলু কাটিয়া দেখাও—এর মধ্যে বিচি নাই। আলু ফল নয়। মূলা, কচু, ওল কাটিয়া দেখাও—এগুলিও ফল নহে। মাটীর নীচে জন্মে। তারপর জিজ্ঞাসা কর কোন গাছগুলি লতাইয়া উঠে, আর কোনগুলি লতায় না। বলিয়া দাও যে, যে সকল গাছ লতায় না আর খুব বড়ও হয় না তাহাদিগকে গুল্ম বলে। কোন্ তরকারী গাছে হয়, কোন্‌টী বা লতায় হয় আর কোন্‌টী গুল্মে হয় তাহা ভাগ করিয়া দেখাইয়া দাও। বেশীর ভাগ তরকারী লতায় জন্মে :—

লতা	গুল্ম
কুমড়া	বেগুণ
লাউ	আলু
ধুঁদুল	ওল

পটোল	ঢেঁড়স
সিম	বিলাতি বেগুণ
উচ্ছে	বৃক্ষ
ঝিঙ্গে	ডুমুর
কাঁকরোল	কলা
করলা	
কাঁকুড়	
বরবটী	

আবার দেখাও যে লতার মধ্যে লাউ গাছ কেমন করিয়া আঁকৃড়ী (বা আকর্ষি) দিয়া কঞ্চি জড়াইয়া ধরে, কিন্তু সিম গাছ কঞ্চি জড়াইয়া জড়াইয়া উঠে—সিম গাছের আঁকড়ী নাই। ডুমুর ভাঙ্গিয়া দেখাও—বিচিগুলি কেমন ছোট ছোট। ডুমুরের ফুল ফলের মধ্যে থাকে বলিয়া কেহ দেখিতে পায় না—তাই লোকে বলে 'ডুমুরের ফুল হয় না'।

ভিন্ন ভিন্ন লতার পাতাগুলি দেখাও ও পাতা দেখিয়া যাহাতে সাধারণ তরকারীর গাছ চিনিতে পারে সেরূপ শিক্ষা দাও। আমরা যে সকল ছোট ছোট গাছের পাতার তরকারী খাই তাহাদিগকে শাক বলে। নিম্নলিখিত শাকের নাম শিখাও, ইহার কতকগুলির পরিচয় করাও :—

পুঁই, নটে, ডেঙ্গো, কপি, বেথুয়া, পালঙ্।
গুলুপা, হেলঞ্চা, পাট, কলমী, ছালন্॥

(বলিয়া দাও যে আমরা লাউ কুমড়ার পাতারও শাক খাইয়া থাকি)।

১১। শস্য।

উপকরণ—নানাবিধ শস্য (আস্ত ও ভাঙ্গা)। কতকগুলি ছোট ছোট শিশিতে নানা শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলে অনেক দিন থাকিবে আর এই সমস্ত বিষয়ক পাঠ দিবারও সুবিধা হইবে।

শিক্ষক। আমরা যে ভাত খাই, তা কেমন করিয়া হয় বলিতে পার?

ছাত্র। জলে চা'ল সিদ্ধ করিলে ভাত হয়। (এই চা'ল—চা'ল দেখাইয়া)

শিঃ। চা'ল কেমন করিয়া হয়?

ছা। ধান জলে সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া লয়—তারপর ঢেঁকিতে ভা'নয়া চা'ল করে। (এই ধান)

অপর ছাত্র। জলে সিদ্ধ না করিয়াই শুকাইয়া লয়। তারপর ঢেঁকিতে ভানে।

শিঃ। হাঁ, দুই জনের কথাই ঠিক। ধান জলে সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া যে চা'ল করে, তাহাকে সিদ্ধ চা'ল বলে। আর ধান কেবল রৌদ্রে শুকাইয়া যে চা'ল করে তাহাকে আতপ চাউল বলে। (যদি বালকেরা বুঝিতে পারে মনে কর তবে 'আতপ' কথা বুঝাইয়া দিবে)। আচ্ছা, ময়দা দেখেছ?

ছা। হাঁ দেখিয়াছি, ময়দায় রুটী আর লুচী হয়।

শি। ময়দা কেমন করিয়া হয়?

ছা। ময়দা গম হইতে হয় (এই ময়দা) গম জাঁতায় পিষিয়া ময়দা করে। (এই গম)

শিঃ। ঠিক বলেছ। আমরা যেমন রোজ ভাত খাই আর মধ্যে মধ্যে সখ করিয়া রুটী কি লুচী খাই, হিন্দুস্থানীরা এইরূপ রোজ রুটী খায় আর মাঝে মাঝে সখ করিয়া ভাত খায়। সাহেবেরাও রুটী খায় আর মাঝে মাঝে ভাত খায়। যব দেখেছ?

ছা। হাঁ যবও দেখিয়াছি (এই যব) যবের ছাতু হয় (এই ছাতু)। (এই পাঠ দিবার পুর্ব্বে শিক্ষক ফুলের টবে বা বাগানের এক কোণে ধান, গম, যব প্রভৃতি বপন করিয়া রাখিবেন ও পাঠদান কালে

বালকগণকে ভিন্ন ভিন্ন গাছের পরিচয় করাইবেন। বর্ষাকাল এই পাঠের সময়)

শিঃ। কয় রকমের ডা'লের নাম করিতে পার।

ছা। মুগ, মটর, মসুরী, ছোলা, খেসারী, কলাই, অড়হর।

শিঃ। তেল কেমন করিয়া হয়?

ছা। কলুরা সরিষা লইয়া ঘানীগাছে ঢালিয়া দেয়। গোরুতে ঘানী টানে—তাহার চাপে তেল হয়। এই সরিষা।

(নিকটে কোন কলু বাড়ী থাকিলে বালকগণকে তেল প্রস্তুতের প্রণালী দেখাইবে)

শিঃ। আর কোন্ কোন্ শস্যের তেল হয়?

ছা। তিলের, তিসির, নারিকেলের।

শিঃ। ভুট্টা দেখেছ—এই দেখ ইহাকেই ভুট্টা বলে—ইহার এই দানাগুলি পিষিয়া বেশ ময়দার মত ছাতু হয়। আমাদের দেশে যেমন ভাত খায়—তেমনি অনেক দেশে ভুট্টা খায়। ভুট্টার আর এক নাম মকাই।

নিম্নলিখিত কবিতা শিখাও ও নানারূপ শস্যের গাছের পরিচয় করাও :—

ধান, গম, তিসি, তিল, মসুর, মটর।
সরিষা, কলাই, মুগ, ছোলা, অড়হড়॥
খেঁসারি, কাঁওন, চীনা, যই, ভুরা, রাই।
বাজরা, জোয়ার, যব, মাড়ুয়া, মকাই॥

শিক্ষকেরা ইচ্ছা করিলে কবিতার দ্বিতীয় দুই চরণ বাদ দিতে পারেন কারণ ইহাতে বালকের অপরিচিত অনেক শস্যের নাম করা হইয়াছে। বলিয়া দাও যে ধান, গম, যব প্রভৃতি গাছ তৃণ জাতীয়, আর মুগ. খেঁসারি, অড়হড় প্রভৃতি গুল্ম।

এখন উদ্ভিদের চারিজাতির পুনরালোচনা কর।

আম, কাঁঠাল—বৃক্ষ।

বেগুণ, সরিষা—গুল্ম

লাউ, কুমড়া—লতা

ধান, গম—তৃণ

এই সমস্তকেই উদ্ভিদ বলে।

১২। গাছ।

উপকরণ—নানারূপ কাঠের খণ্ড। দুইটী ছোট চারা গাছ—একটী আমের, একটী সুপারীর বা বেতের।

একটী ছোট গাছ তুলিয়া আন। গাছটীর ডাল, পাতা, মূল প্রভৃতি যেন আস্ত থাকে। মূল ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লও। জিজ্ঞাসা কর:—

গাছের কোন্ অংশ মাটীর উপরে থাকে আর কোন অংশ নীচে থাকে? নীচে যে অংশ থাকে তাহার নাম কি? শিকড় (বা মূল)। শিকড়ের রঙ কেমন? একটু মেটে মেটে সাদা। গাছের যে অংশ উপরে থাকে, তাহাকে কি বলে? গাছের গুঁড়ি। হাঁ মূলের উপর হইতে ডাল পালার নীচ পর্য্যন্ত যে অংশ তাহাকেই গুঁড়ি বলে (দেখাইয়া দাও)। গাছের ডাল দেখাও। সকল গাছেই কি অনেক ডাল হয়? সুপারী গাছের ডাল কোথায়? গাছের মাথায়। আম গাছের ডাল কোথায়? গাছের গুঁড়ির উপর থেকে গাছের মাথা পর্য্যন্ত। হাঁ তাল, সুপারি, নারিকেল, খেজুর প্রভৃতি গাছের ডাল খুব কম, আর সব ডাল গাছের মাথায়; আম, জাম, কাঁঠাল, তেঁতুল প্রভৃতি গাছের ডাল অনেক আর ডাল গুলিও বড় বড়। তাই দেখ বৃক্ষ দুই জাতীয়—এক আম জাতীয় আর এক তাল জাতীয়। পাতা দেখাও। গাছের পাতার রঙ

কেমন ? পাতার রঙ্ সবুজ। গাছের গুঁড়ির রঙ্ কেমন ? একটু সাদা সাদা একটু সবুজ সবুজ। হাঁ সাদা সবুজে মিশান। ফুল দেখাও, ফল দেখাও।

গাছ আমাদের কি কাজে লাগে ? গাছে ফল হয়—সেই ফল আমরা খাই। গাছের গুঁড়ি দিয়া কি করি ? গাছের গুড়িতে তক্তা হয়। হাঁ বড় বড় গাছের গুড়িতে তক্তা হয়, ছোট গাছের গুড়িতে জ্বালানী কাঠ হয়। কেমন করিয়া তক্তা তৈয়ারী করে জান ? (বালকেরা না জানিলে বলিয়া দিবে বা বিদ্যালয়ে কি কাহার বাড়ীতে ছোট করাত থাকিলে সেই করাত দিয়া কাঠ চিরিয়া দেখাইবে) গাছের পাতায় কি কাজ হয় ? গাছের পাতা গরু ছাগলে খায়। হাঁ আর আমরা কোন্ কোন্ গাছের পাতা খাই। শাকের পাতা, পান। গাছের পাতা দিয়া ঘর ছাইয়া থাকে। খড়ত ঘাসের পাতা। (গাছের পাতায় যে ঔষধও হয় তাহা বলিয়া দাও। ছোট ছোট ছেলের কাশি হইলে তুলসী পাতার রস খাওয়ায় ; কৃমি হইলে আনারসের পাতার রস খাওয়ায় ইত্যাদি।

গাছের ফুল আমাদের কি কাজে লাগে ? গাছের ফুল দিয়া হিন্দুরা পূজা করে। আমরা বকফুল, সরিষাফুল, কপিফুল (ফুলকপি) কুমড়া-ফুল খাই। (সুগন্ধ ফুল হইতে যে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়, বলিয়া দাও)। গোলাপ হইতে গোলাপজল ও আতর হইয়া থাকে। (একটু গোলাপ জল ও আতর দেখাও)।

গাছের শিকড় আমাদের কি কাজে লাগে ? অনেক গাছের শিকড় আমরা খাই—যেমন, মূলা, শালগম, গাজর, ডেঙ্গোশাকের শিকড়, পালঙের শিকড়। (শিকড় হইতেও ঔষধ হয়—বালকেরা জানে, এরূপ দুই একটী ঔষধের নাম বলিয়া দাও)।

কতকগুলি বড় বড় গাছের নাম শিখাও ও তাহার মধ্যে যত গুলির পার পরিচয় করাও :—

অশ্বথ, রবার, বট, ছাতিম, কাঁঠাল।
গামার, চাম্বল, নিম, আম, জাম, শাল ॥
নাগেশ্বর, পিতরাজ, কদম, বকুল।
বাব্‌লা, খদির, শিশু, সেগুণ, শিমূল ॥
দেবদারু, ঝাউ, পেঙ্গে, হিজল, জারুল।
চাল্‌তে, চন্দন, চাঁপা, তমাল, তেঁতুল ॥

বলিয়া দাও যে কাঁঠাল, জারুল, গামার, সেগুণ, শিশু ও শাল কাঠের ভাল তক্তা হয়। এই সকল ও অন্যান্য কাঠের দুই একটি আসবাব দেখাইয়া দাও।

১৩। পশু।

উপকরণ—নানা প্রকার পশুর চিত্র।

আমাদিগের কয় খানি পা? আমরা পা দিয়া কি করি? আমাদিগের কয় খানি হাত? হাত দিয়া কি করি? গরুর কয় খানি পা? গরুর হস্ত আছে? গরুর হস্ত নাই, তাহার চারি খানিই পা; চার পায়ের উপর ভর করিয়াই চলে। তোমরা বানর দেখেছ? বানরের কয় পা? কয় খানি হাত? বানরের দুই পা, আর দুই খানি হাত। না, তা ঠিক নয়। বানরের চার খানিই হাত। আমরা কি পা দিয়া কোন জিনিষ ধরিতে পারি? কিন্তু বানর পা দিয়াও জিনিষ ধরিতে পারে। (ছবি দেখাইয়া) এই দেখ এই বানরটী কেমন পা দিয়া কলা ধরিয়াছে—এটী কেমন পা দিয়া ডাল জড়াইয়া ধরিয়াছে। কাজেই বানরের চার খানিই হাত। আমরা হাতের তালু মুঠা করিয়া জিনিষ ধরি কিন্তু পা গুটাইয়া তেমন করিয়া জিনিষ ধরিতে পারি না। বানর হাত পা সব দিয়াই মুঠা করিয়া জিনিষ ধরিতে পারে।

গরু ছাড়া আরও চার পা জানোয়ারের নাম কর? ঘোড়া, মহিষ, ছাগল, কুকুর, বিড়াল। গরু কি কাজে লাগে? গরু দুধ দেয় ও লাঙ্গল চালায়। ঘোড়া কি কাজে লাগে? ঘোড়ায় চড়িয়া লোকে অল্প সময়ে অনেক দূরে যায়। আর ঘোড়া গাড়ী টানে। কুকুর কি কাজ করে? কুকুর রাত্রিতে বাড়ী পাহারা দেয়। হাতী কি কাজ করে? হাতী পাহাড় হইতে বড় বড় কাঠ টানিয়া নামায়। আর হাতী চড়িয়া লোকে যাতায়াত করে। ভেড়ার লোমে কি হয়? কম্বল তৈয়ারী হয়। গাধা কি করে? গাধা বোঝা বয়। শেয়াল কি করে? শেয়াল রাত্রিতে পচা মড়ি খাইয়া আমাদিগকে পচা গন্ধ হইতে বাঁচায়। বাঘ কি কাজ করে? বাঘ বনের অনেক পশু খাইয়া কমায়। তাহা না হইলে বনের পশু এত বেশী হইত যে আমাদের থাকিবার জায়গা পাইতাম না।

(সাধারণ চতুষ্পদ জন্তু সম্বন্ধে এইরূপ দুচারটী কথা শিখাইয়া দাও) এই কবিতা মুখস্থ করাও ও বালকগণকে প্রত্যেক জন্তুর ছবি দেখাও :—

গরু, ঘোড়া, হাতী, ভেড়া, ছাগল, শৃগাল।
হরিণ, মহিষ, গাধা, কুকুর বিড়াল।
শূকর, সজারু, বাঘ, গণ্ডার, ভালুক।
জেব্রা, জিরাফ, উঁট, সিংহ, মধুভুক॥

জানোয়ারদিগের মাঝে কোন্‌গুলি খুব বড় বড়, নাম কর? হাতী, উঁট, জিরাফ। কোন্‌গুলি ছোট? বিড়াল, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, শেয়াল। কোন্‌গুলি মাঝারী? গরু, ঘোড়া, মহিষ, গণ্ডার।

———

১৪। পাখী।

উপকরণ—নানারূপ পাখীর ছবি।

পাখীর কয় পা? পাখীর হাত নাই? আচ্ছা হাতের বদলে পাখীর কি অন্য কোন অঙ্গ আছে? হাঁ আছে, হাতের বদলে পাখীর দুই পাখা আছে। পাখীর পাখা কি কাজে লাগে? পাখী পাখা মেলিয়া উড়িয়া যায়। পা দিয়া কি করে? পা দিয়া মাটীর উপর হাঁটে। হাঁ ঠিক কথা, পা দিয়া মাটীর উপর হাঁটে আর পাখা দিয়া আকাশে হাঁটে। ধরতে গেলে পাখীর পাখাও তার পার কাজ করে। মাটীর উপর পা দিয়া যেমন এক থান থেকে অন্য থানে যায়—পাখী পাখা দিয়াও তেম্‌নি আকাশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়।

পাখী আমাদের কি কাজে লাগে? ইহারা পোকা, ফড়িং, পচা জিনিষ, আস্তাকুঁড়ের ভাত মাছ, তরকারী খাইয়া সব পরিষ্কার করিয়া দেয়। কাক শালিক না থাকিলে আস্তাকুঁড়ের জিনিষ পচিয়া পচা গন্ধ বাহির হইত। শকুণ না থাকিলে মাঠে মাঠে মরা গরু পচিয়া দুর্গন্ধে অস্থির করিত।

গরমের দিনে মাঝে মাঝে যে পিপ্‌ড়ে ও উঁই উড়ে তা দেখেছ? হাঁ, পিপ্‌ড়ের ও উঁইর পাখা উঠিলে উড়িয়া যায়। তখন ঘর বাড়ী সব পোকায় ভরিয়া যায়। সে সকল পোকার দশা কি হয় জান? হাঁ দেখেছি, কাক, শালিক, চিল, ফিঙ্গে, চামচিকে সে পোকাগুলিকে খাইয়া ফেলে। হাঁ ইহারা অন্য সময়েও মাটীতে পোকা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়। তাই দেখ পাখীরাও আমাদের কত উপকার করে। চড়ুই, বাবুই, পায়রা কি খায় জান? ইহারা মাটীতে ধান, চা'ল ঘাসের দানা খুঁটিয়া খায়। হাঁ ইহারা যদি ঘাসের দানা (বিচি) না খাইত তবে চারিদিকে অনেক ঘাস জঙ্গল হইয়া যাইত। বক, চিল, মাছরাঙ্গা কি খায় জান? ইহারা মাছ ও

ব্যাঙ খাইয়া জল পরিষ্কার করে। বড় বড় পাখীর নাম কর। শকুণ, হাড়গিলে, রাজহাঁস, ময়ূর। ছোট ছোট পাখীর নাম কর? টুনি, বুলবুল, দৈয়ল, খঞ্জন, চড়ুই, বাবুই, ভরুই (বগড়ী), মনুয়া। মাঝারী পাখীর নাম কর? কাকাতুয়া, বক, পায়রা, হাঁস, পেঁচা ইত্যাদি।

কোন কোন পাখীকে উত্তমরূপ শিখাইলে বেশ পড়িতে পারে।

কি কি পাখী পড়া শেখে জান? ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া, শালিক, হিরামন, লালমন। পাখীকে কেমন করিয়া পড়া শেখায়? কি কি বুলি শেখায়?

এখন নিম্নলিখিত কবিতা মুখস্থ করাও।

(প্রথম ছয় লাইনে সাধারণ পরিচিত পাখীর নাম আছে। প্রথমে এই ছয় লাইন মুখস্থ করাইবে, পরে অবশিষ্ট ছয় লাইন। বালকেরা লোকালয়ে পশু অপেক্ষা পাখী অধিক দেখে বলিয়া পাখীর তালিকা বড় হইল।)

কাক, ফিঙ্গে, কাকাতুয়া, ময়ূর মোরগ।
চড়ুই, বাবুই, টিয়া, হাড়গিলা, বক্॥
ময়না, শালিক, হাঁস, হল্‌দে, কোকিল।
পায়রা, শকুণ, পেঁচা, মাছরাঙ্গা, চিল॥
ঘুঘু, বউকথাকও, দৈয়াল, খঞ্জন।
বুল্‌বুল, চোখগেল, টুনি, হিরামন॥
ডাহুক, সারস, বাজ, চখা, হাঁড়িচাচা।
কাঠঠোকা, পানকৌড়, কোঁক, কাদাখোঁচা॥
তিতির, চাতক, শ্যামা, ধনেশ, মনুয়া।
সুঁইচোরা, ছাতারিয়া, ভরুই, পাপিয়া॥
হরিয়াল, হট্‌টিটি, শ্রী, মানিকজোড়।
গোচোরখে, ভীমরাজ, গুড়গুড়ি, কৌড়॥

কবিতা মুখস্থের সঙ্গে সঙ্গে বালকগণকে অনেক পাখীর পরিচয় করাইবে। আসত পাখী না দেখাইতে পারিলে সেই পাখীর ছবি দেখাইবে। ছবি না পাইলে বোর্ডে আঁকিয়া দেখাইবে।

১৫। মাছ।

উপকরণ—নানারূপ মাছের ছবি। ২।৩টী তাজা মাছ (খলিশা, কই, পুঁটী বা অন্য কোন ছোট মাছ) ও এক বাটি জল।

পশু মাটিতে হাঁটিয়া বেড়ায়, পাখী আকাশে ওড়ে, বল ত জলে সাঁতারায় কোন জীব? মাছ, ব্যাঙ। মাছের নাম কর। ইলিশ, রুই, কাতলা, কই ইত্যাদি।

তোমাদের মধ্যে কে সাঁতরাইতে পার? সাঁতার দিবার সময় কেমন করিয়া হাত নাড়িয়া থাক, দেখাও। কেবল কি হাত নাড়িয়া সাঁতার দেওয়া যায়? কেউ কেউ পা নাড়িয়া সাঁতরায়। আচ্ছা হাত পা দুইই না নাড়িয়া সাতরাণ যায় কিনা? না, হাত পা না নাড়িলে চলা যায় না—একখানে ভাসিতে পারা যায়। (একটা কই মাছ কি অন্য কোন মাছ দেখাও) এই মাছের ত হাতও নাই পাও নাই, মাছ তবে কেমন করিয়া সাঁতরায়? মাছের দুই পাশে—এই যে ডানা (দেখাইয়া) আছে তাহাই নাড়িয়া চলে। (একটা কই, খলিসা কি পুঁটী মাছ এক বাটি জলের ভিতর ছাড়িয়া দাও ও মাছ কেমন করিয়া ডানা নাড়িয়া সাতরায় তাহা দেখাও) আর লেজ নাড়িয়া চলে। মাছ কি খায় জান? জলে যে সকল ছোট গাছ হয় তাহাই খায়। হাঁ, আর জলে যত ময়লা জমে তাহাও খায়। মাছ না থাকিলে জল কত অপরিষ্কার হইত। আবার জলে যে ছোট ছোট পোকা জন্মে তাহাও মাছ খাইয়া ফেলে। বড় বড় মাছের নাম কর? রুই, টাঁই, বোয়াল, কাতলা, মিরগেল, ভেটকী। ছোট ছোট

মাছের নাম কর। মরুলা কই, পুটী, খলসে, বাঁশপাতা। মাঝারী মাছের নাম কর। ইলিশ, রিটে, শোল, বাচা, বাম।

কোন্ মাছের গায় আঁইস আছে? ইলিশ, রুই, কাতলা, মিরগেল। কোন্ কোন্ মাছের গা তেলতেলে? বোয়াল, রিটে, বাঁশপাতা, মাগুর।

নিম্নলিখিত কবিতা শিখাও ও মাছগুলির পরিচয় করাও। যদি সুবিধা থাকে তবে বালকগণকে একদিন হাটে বা বাজারে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন মাছের পরিচয় করাইতে পার। (বর্ষায় নদীতে বা খালে বিলে লোকে মাছ মারে। সে সময়ে এই পাঠের ব্যবস্থা করিলে সুবিধা হইবে।)

কই, পুঁটী, বাঁশপাতা, পাবদা, ইলিশ।
মাগুর, মোরুলা, রিটে, পাঙ্গাস, খলিশ॥
শিঙ্গী, শোল, চাঁদা, চেলা, মিরগেল, রুই।
বাচা, বাম, কুঁচে, চ্যাঙ্গ, খয়রা, ফলুই॥
চিঙড়ী, টাাঙড়া, বেলে, তপসী, কাতল।
ভেদা, ফেশা, ডানকানা, ভেটকী, চিথল॥
আইড়, এলঙ্গ, ট্যাঁই, বাঊশ, বোয়াল।
সুবর্ণ খড়িকা, বাটা, কাঁক্‌লে, গজাল॥

কেমন করিয়া মাছ মারে? জাল দিয়া মাছ মারে। (জাল দেখাও) কাপড়ে মাছ মারিবার অসুবিধা কি? জল বাধিয়া যায়। জালে জল বাধে না। কিন্তু মাছ বাধে। ছিপ বড়সী দিয়া মাছ ধরে। পলো দিয়া মাছ ধরে। কেহ কেহ হাত দিয়াও মাছ ধরিতে পারে।

১৬। আকাশ।

উপকরণ—বাটি, বাতি, দেশলাই, বোড, চক।

তোমরা মাথার উপরে আকাশ দেখিতে পাইতেছ! অন্য গ্রামের ছেলে মেয়েরা এখন আকাশ দেখিতে পাইতেছে কিনা বলত? হাঁ, তাহারাও দেখিতে পাইতেছে। সকল দেশ থেকেই আকাশ দেখা যায়।

আকাশের রঙ কেমন? আকাশের রঙ নীল। সকল সময়েই কি নীল দেখায়? না, যখন আকাশে মেঘ থাকে না তখন নীল দেখায়। সাদা মেঘ থাকিলে আকাশ সাদা দেখায়। কাল মেঘ হইলে আকাশ কাল দেখায়।

আকাশের আকার কেমন? বাটির মত, ঢাকনার মত, (টেবিলের উপর একটা বাটি বা গাম্‌লা উপুড় করিয়া রাখ; এই বাটি যেন আমাদের আকাশ। আকাশের কোন্ অংশ খুব উচু? যে অংশ আমাদের মাথার উপর। কোন্ অংশ খুব নীচু? যে অংশ মাটির সঙ্গে মিলিয়াছে (বাটির ধার যেমন টেবিলের উপর মিশিয়াছে) সেই অংশই খুব নীচু। হাঁ, যেখানে আকাশ ও মাটি মিলিয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেই গোলাকার স্থানকে চক্রবাল বলে।

আকাশে দিনের বেলা কি কি দেখিতে পাও? সূর্য্য, মেঘ পাখী। হাঁ সূর্য্য অনেক দূরে থাকে। মেঘ অল্প দূরে থাকে। এইজন্য মেঘ হইলে সূর্য্য ঢাকিয়া ফেলে। (এক হাতে একটা পয়সা বা টাকা, আর এক হাতে একখানা পুস্তক লইয়া, সেই পুস্তক দিয়া টাকাটা ঢাকিয়া দেখাও যে) এইরূপে সূর্য্য দূরে, আর মেঘ নিকটে থাকাতে মেঘের দ্বারা সূর্য্য ঢাকা পড়িল। আবার মেঘ অপেক্ষা পাখী আমাদের নিকটে। তাই মেঘ পাখীকে ঢাকিতে পারে না।

রাত্রিতে আকাশে কি দেখা যায়? চন্দ্র, নক্ষত্র। রাত্রিতেও মেঘ দেখা যায় কিন্তু মেঘের রঙ বুঝিতে পারা যায় না। সবই কাল বলিয়া

বোধ হয়। রাত্রির অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না বলিয়া আমাদিগের ভয় করে, দিনের আলোকে সকল জিনিষ দেখা যায় বলিয়া আমরা খুব আনন্দিত হই। সূর্য্য আলোক ও উত্তাপ দিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করিতেছে। সূর্য্যের বর্ণ হলুদ—একটা খুব বড় আগুণের বল্ বলিয়া মনে হয়। সূর্য্যের আকারের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। চন্দ্রের আকারের পরিবর্ত্তন হয়। চন্দ্র প্রথমে একখানি কাস্তের (কাচী) মত দেখায়। তারপর বাড়িতে বাড়িতে আধখান লুচির মত হয়। তারপর ক্রমে বড় হইয়া একখান থালার মত (পূর্ণচন্দ্র) হইয়া থাকে। চন্দ্রের রঙ সাদা। বোর্ডে চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির চিত্র আঁকিয়া দেখাও। দ্বিতীয়া, অষ্টমী ও পূর্ণচন্দ্রের চিত্র হইলেই হইবে।

সূর্য্যের আলোকে তাপ আছে, চন্দ্রের আলোকে তাপ নাই।
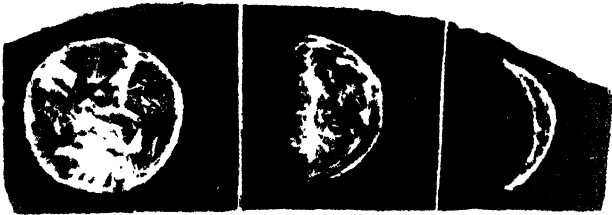
পূর্ণচন্দ্র। অষ্টমী। দ্বিতীয়া।

আকাশে কত তারা আছে, গণিতে পার? না, গণনা করা যায় না। অনেক তারা আছে। তারাও আমদিগকে একটু একটু আলো দেয়। মেঘলা রাত্রিতে তারা থাকে না বলিয়া খুব আঁধার হয়। তারাগুলি সব এক আকারের নয়। কতকগুলি বেশ বড় বড় আর কতকগুলি খুব ছোট ছোট। দিনের বেলায়ও আকাশে তারা থাকে। সূর্য্যের আলোকে দেখা যায় না। (দিনের বেলায় একটা প্রদীপ জ্বালিয়া দেখাও যে দূর হইতে সেই প্রদীপের আলো দেখা যায় না।)

১৭। সূর্য্য।

উপকরণ—টেবিলের উপর চিত্রের অনুরূপ করিয়া এক টুকরা তার বা বেত গোল করিয়া আটিয়া দেও। একটা কাঠির মাথায় একটা ছোট আলু বিদ্ধ করিয়া রাখ।

সূর্য্য সম্বন্ধে বালকেরা যাহা যাহা জানে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া আদায় কর। সূর্য্য দিনে আলো দেয়। সূর্য্য গোল। সূর্য্যের আলো গরম। সূর্য্য কতক্ষণ আলো দেয়? প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।

সূর্য্যের পরিষ্কার আলোককে কি বলে? সূর্য্যের পরিষ্কার আলোকে রৌদ্র বলে। প্রত্যেক দিনই কি আমরা রৌদ্র দেখিতে পাই? না, মেঘলা দিনে সূর্য্যের অল্প অল্প আলো থাকে—রৌদ্র থাকে না। মেঘলা দিনে সূর্য্য দেখা যায় না কেন? মেঘে সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখে। কেমন করিয়া ঢাকিয়া রাখে দেখাও? (একখানি পুস্তক দিয়া একটা দোয়াত বা এক টুকরা ইঁট ঢাকিয়া দেখাও) তাহা হইলে সূর্য্য উপরে না মেঘ উপরে? সূর্য্য উপরে, মেঘ নীচে।

প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় সূর্য্যকে লাল দেখায়। তখন সূর্য্যের দিকে একটু চাওয়া যায়। কিন্তু দুপুর বেলা সূর্য্যের দিকে তাকানো যায় না, চোখ ঝল্‌সিয়া যায়। দুপুরের সময় সূর্য্যের রঙ হলুদবর্ণ।

সূর্য্য কোন্ দিক দিয়া ওঠে? হাঁ, এই দিককে পূর্ব্ব দিক বলে। সূর্য্য কোন্ দিকে ডুবিয়া যায়? এই দিক্‌কে পশ্চিম দিক বলে। পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে, পশ্চাতে পশ্চিম দিক থাকে। ডান হাতের দিকে দক্ষিণ দিক ও বাম হাতের দিকে উত্তর দিক। এই কবিতা শিক্ষা দেও (ভঙ্গী সঙ্গীতের প্রণালী অনুসারে)।

যে দিকেতে সূর্য্য উঠে পূর্ব্ব তারে বলি।
পশ্চিম দিকেতে সূর্য্য অস্ত যায় চলি॥
পূর্ব্বদিকে মুখ করি দাঁড়াইলে পর।
ডাহিনে দক্ষিণ থাকে, বামেতে উত্তর॥

রাত্রিতে সূর্য্য কোথায় যায়? টেবিলের উপর তার বা বেত গোল করিয়া বাঁধ আর একটা কাঠির মাথায় একটা আলু বিদ্ধ করিয়া সেই তার বা বেতের গা ঘেঁষিয়া চালাইয়া লও। বুঝাইয়া দাও যে এইরূপে সূর্য্য নীচ হইতে উপরে উঠিয়া আবার নীচে নামিয়া পড়ে (টেবিলের) পৃথিবীর নীচে যায়। টেবিলের নীচে সূর্য্য গেলে, এই টেবিলের উপর যে পুতুল
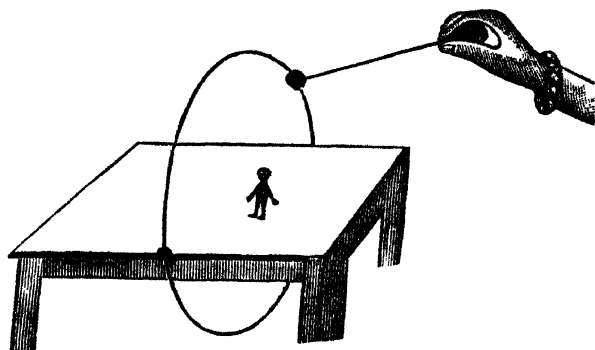
আছে সে তখন সূর্য্য দেখিতে পাইবে না। এই সময়ে পুতুলের রাত্রি হইল। আবার নীচ দিয়া ঘুরিয়া ঠিক সেই পূর্ব্বদিকেই সূর্য্য উঠে। যদি নীচ দিয়া এইরূপ ঘুরিয়া না আসিত, তবে কি হইত? একদিন পূর্ব্বদিকে উঠিত, পরদিন পশ্চিমদিকে উঠিত।

তারের গায় এই আলু ধরিয়া দেখাও—কখন প্রাতঃকাল, দুপুর ও কখন সন্ধ্যা হয়?

প্রাতঃকাল থেকে সূর্য্য একটু একটু করিয়া উপরে উঠিতে থাকে। দুপুর বেলাতে খুব উপরে উঠে। তারপর আবার একটু একটু করিয়া নামিতে আরম্ভ করে। সন্ধ্যা বেলায় যেন মাটীর সঙ্গে লাগে বলিয়া মনে হয়। যে স্থানে আকাশ ও মাটি মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহাকে চক্রবাল বলে। চারিদিকেই চক্রবাল আছে—চক্রবাল গোল। টেবিলের উপর একটা বাটি উপুর করিয়া রাখিলে যেমন হয়, আকাশ যেন ঠিক

সেইরূপ ভাবে মাটীর উপর উপুর হইয়া আছে। আমরা সকলে যেন সেই বাটির নীচে আছি।

১৮। আলো ও ছায়া।

উপকরণ—বাতি, কাচ, শ্লেট।

ঘর অন্ধকার কর বা রাত্রিতে এই পরীক্ষা দেখাও। একটা বাতি জ্বাল। বাতির সম্মুখে একখানি পুস্তক বা শ্লেট ধর। দেয়ালের উপর পুস্তকের (বা শ্লেটের) ছায়া পড়িয়াছে। ছায়ার আকারকেমন? পুস্তকের মত। পেনসিলের ছায়া দেখ, ছাতার ছায়া দেখ—আকার কেমন? যে জিনিষের ছায়া, ঠিক সেই জিনিষের মত। একখান কাচ ধর—দেয়ালে কাচের ছায়া পড়িল না—কেন? কাচের ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারে বলিয়া। স্লেটের ভিতর দিয়া আলো যায় না—তাই দেয়ালে স্লেটের ছায়া পড়িয়াছে। যেখানে আলোক যাইতে পারে না সেখানেই ছায়া থাকে।

একটী বালককে দাঁড় করাও। তাহার পার নিকট আলোক রাথ। মাটীতে বালকের ছায়া পড়িল। ছায়ার আকার কেমন? বালকের মত। কত বড়? বালকের চেয়ে অনেক বড়। (এখন একটু একটু করিয়া বাতিটী উঠাইতে থাক) ছায়ার আকার কিরূপ হইতেছে? ছায়ার আকার ক্রমে ছোট হইয়া আসিতেছে। (আস্তে আস্তে বাতিটী বালকের মাথার উপরে ধর) এখন ছায়া কোথায় এবং তাহার আকারই কত বড়? বালকের পায়ের নীচে আর আকার খুব ছোট। (এখন আবার বাতিটী ক্রমে নীচে নামাইতে আরম্ভ কর) এখন ছায়ার আকার কিরূপ হইতেছে? ক্রমে একটু একটু করিয়া বড় হইতেছে।

তাহা হইলে বুঝা গেল যে বাতি যতই উপরে উঠান যায় ছায়াও তত ছোট হইতে থাকে, আর যত নীচে নামান যায় ছায়াও তত বড় হইতে থাকে।

এখন বালকগণকে ঘরের বাহিরে লইয়া এস (বা অন্য এক দিন) প্রাতঃকাল, দ্বিপ্রহর ও বৈকালে তাহাদিগকে ছায়ার পরিবর্ত্তন দেখাও। প্রাতঃকালে তোমার ছায়া কত বড় দেখায়? খুব বড়। কেন? সূর্য্য তখন খুব নীচে থাকে বলিয়া। দুপুর বেলা তোমার ছায়া কত বড় হয়? খুব ছোট হয়। সূর্য্য তখন মাথার উপরে আসে বলিয়া। এই হেঁয়ালীর অর্থ জিজ্ঞাসা কর :—

আলোকে জনম তার আঁধারে মরণ।
যেমন জিনিষে জন্ম আকার তেমন॥
কখন রাক্ষস মূর্ত্তি কখন বামন।
চলিতে পারে না থাকে সাথে সর্ব্বক্ষণ॥
ধরিতে পারে না কেহ দেখে সর্ব্বজন।
বল শিশু কোন্ বস্তু অদ্ভুত এমন॥

১৯। সূর্য্যোদয়।

উপকরণ—বাতি, দেশলাই, বোর্ড।

প্রত্যেক মাসের ১লা কি প্রথম সপ্তাহের কোন দিন এই পরীক্ষা করিবে। মনে কর আষাঢ় মাস হইতে পরীক্ষা আরম্ভ করিলে (এই মাসে সূর্য্যের গতি শেষ বলিয়া) আষাঢ় মাসের প্রথম দিন (সেদিন স্কুল বন্ধ থাকিলে বা আকাশ মেঘে ঢাকা থাকিলে ২রা, ৩রা ৪ঠা যে কোন দিনে) বালকগণকে প্রাতঃকালে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে বা কোন নিকটবর্ত্তী মাঠে একত্র কর। সূর্য্য কোন দিক হইতে উঠে

তাহা লক্ষ্য করিতে বল। যেখান হইতে উঠিল সেইখানে যে গাছ, বাড়ী, মন্দির পুকুর বা যাহা কিছু থাকে তাহা বালকেরা নিজ নিজ খাতায় লিখিয়া রাখিবে। যথা "১লা—আষাঢ়ের প্রাতঃকালে সূর্য্য হরি ঘোষের বাড়ীর আম গাছের নিকট দিয়া উঠিল।"

আবার এইরূপ শ্রাবণ মাসের ১লা তারিখে কোন্ খান দিয়া সূর্য্য উঠে তাহা দেখাও। বালকেরা বেশ বুঝিতে পারিবে যে এমাসে সূর্য্য ঠিক সেই আমগাছের নিকটদিয়া না উঠিয়া কিছু দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে। এমাসে যেখানদিয়া সূর্য্য উঠিল, তাহা বালকেরা খাতায় লিখিয়া রাখিল। এইরূপে বার মাসের হিসাব হইলেই তাহারা বুঝিতে পারিবে সূর্য্য ঠিক

এক স্থান দিয়া উঠে না—কখন উত্তরে কখন দক্ষিণে সরিয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্ব দিকেই থাকে।

আর এক কথা, পরীক্ষা করিবার সময় প্রত্যেক মাসে বালকগণকে ঠিক এক সময়ে ও একই নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে সূর্য্যের স্থান লক্ষ্য করিতে বলিবে। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে লক্ষ্য করিলে—কিছুই ঠিক করিতে পারিবে না।

শীতকালে সূর্য্য কোন্ দিকে যায়? শীতকালে অনেক দক্ষিণে সরিয়া যায়। শীতকালের দুপুরবেলা সূর্য্য ঠিক মাথার উপরে আসে না, একটু দক্ষিণে থাকে। শীতকালের দুপুর বেলা যে ছায়া পড়ে, গ্রীষ্মকালের দুপুর বেলার ছায়া অপেক্ষা সেটা বড়। কেন? প্রদীপদিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখাও।

সূর্য্যের অস্তগমনও এইরূপে লক্ষ্য করিতে বল। গ্রীষ্মকালে বা আষাঢ় শ্রাবণমাসে সূর্য্য যে গাছের কাছে অস্ত যায়, পৌষ মাঘ মাসে সেখানে অস্ত যায় না, একটু দক্ষিণে সরিয়া অস্ত যায়।
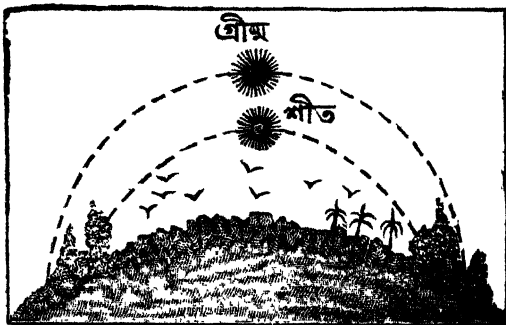
বোর্ডে চিত্রের অনুরূপ চিত্র অঙ্কণ করিয়া বুঝাইয়া দাও। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের পথ খুব বড়—তাই গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকে খুব ভোরে উঠিতে হয় আর বৈকালের অনেক পরে অস্ত যাইতে হয়। দিন তখন বড় হয় আর রাত্রি ছোট হয়। শীতকালের সূর্য্য অনেক দেরী করিয়া উঠে—আর শীঘ্র শীঘ্র অস্ত যায়। শীতকালে সূর্য্যের পথ ছোট। শীতকালে দিন ছোট, রাত্রি বড়।

২০। সময়।

উপকরণ—ঘড়ি, পঞ্জিকা।
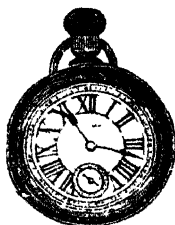
বালকগণকে ঘড়ির ব্যবহার শিখাইতে হইবে। কোন্ কাঁটা কোথায় থাকিলে কয়টা বাজে তাহা ঘড়ির সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। বা একখান শক্ত কাগজ গোল করিয়া কাটিয়া লও ও তাহাতে ঘড়ির অনুকরণে I. II. III. প্রভৃতি লিখিয়া লও। বাঁশের বাঁখারীদিয়া দুইটী কাঁটা প্রস্তুত কর—একটা ছোট ও একটা বড়। সেই দুই কাঁটার এক মাথা তীরের মত সরু কর। অপর মাথায় ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রে সূতা পরাও সেই সূতা গোল কাগজ খণ্ডের কেন্দ্রে বাঁধিয়া রাখ। এমন করিয়া বাঁধ যে কাঁটা দুইটী যেন বেশ সহজে ঘুরিতে পারে। এই নকল ঘড়ির সাহায্যে সময় ঠিক করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দাও।

এক দিনের সূর্য্যোদয় হইতে তারপর দিনের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যে সময় তাহাকে ২৪ ঘণ্টায় ভাগ করা হইয়া থাকে। বেলা দুপুর হইতে রাত্রি দুপর পর্য্যন্ত একভাগ, আর রাত দুপুরের পর হইতে বেলা দুপুরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর একভাগ। এই এক এক ভাগে ১২ ঘণ্টা সময়। এইজন্য তোমরা দেখ যে দুপুরবেলা ১টা বাজিল অর্থাৎ দুপুর হইতে গণনা আরম্ভ হইল।

ঘণ্টাকে যে ৬০ মিনিটে ভাগ করিয়া থাকে, তাহা বালকগণকে দেখাইয়া দাও ও বুঝাইয়া দাও। একমিনিট যে কত সময় তাহার একটু জ্ঞান দাও। যে সকল পকেট ঘড়িতে ছেকেণ্ডের কাঁটা আছে, সেইরূপ একটা ঘড়ি সংগ্রহ কর। কোন বালককে এক মিনিট নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিতে বল। এক মিনিট যে কত সময় তাহা বালকেরা বেশ বুঝিতে পারিবে।

বারের নাম, মাসের নাম, ও ঋতুর নামগুলি শিখাইয়া দাও। ৭ দিনে এক সপ্তাহ, ৩০ দিনে এক মাস, বারমাসে বা ৩৬০ দিনে এক বৎসর ইহাও বলিয়া দাও।

ঘড়ি দেখা শিখিয়া থাকিলে বালকগণকে শীতের (পৌষের ও মাঘের) ও গ্রীষ্মের (জৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসের) দিন ও রাত্রির বিষয় বুঝাইয়া দাও। পৌষমাসে সূর্য্য প্রায় ৬৷৷০ টার সময় উঠে ও ৫ টার সময় অস্ত যায়। আর আষাঢ়মাসে প্রায় ৪৷৷০ টার সময় উঠে ও ৬৷৷০ টার সময় অস্ত যায়। পৌষমাসের দিন প্রায় ১০ ঘণ্টা ও রাত্রি ১৪ ঘণ্টা, আর আষাঢ় মাসের দিন প্রায় ১৪ ঘণ্টা আর রাত্রি ১০ ঘণ্টা। আশ্বিন মাসে আর চৈত্রমাসে দিবারাত্রি সমান থাকে। (বালকগণকে ইংরেজী মাসের নাম শিখাইয়া দিতে হইবে কারণ ইংরাজী মাসের হিসাবে বিদ্যালয়ে বেতনাদি দিতে হয়, ইংরেজী মাসের দিন ধরিয়া অনেক অঙ্ক কষিতে হয়, আর গভর্ণমেণ্টের কার্য্য ইংরেজী মাসের তারিখ অনুসারেই বিজ্ঞাপিত হয়।)

বারের কথা।

রবিবার ছুটী পাই খেলিবার তরে
সোমবারে পড়া শিখি মনোযোগ করে
মঙ্গলে আঁকের দিন কত আঁক শিখি
বুধবারে বই দেখে হস্তাক্ষর লিখি
বৃহস্পতিবারে শিখি কবিতা শুনিয়া
শুক্রবারে ছবি আঁকি কাগজ ভরিয়া
শনিবারে কড়া গণ্ডা, নামতা দেড়িয়া
শিখি সবে এক সাথে ডাকিয়া ডাকিয়া।

মাসের কথা।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে ঋতু গ্রীষ্ম নাম তার।
আষাঢ় শ্রাবণে করে বর্ষা অধিকার॥
ভাদ্র ও আশ্বিনে হয় শরৎ শোভার।
কার্ত্তিক অগ্রহায়ণেতে হেমন্ত সঞ্চার॥
পৌষ মাঘেতে শীত দুরন্ত দুর্ব্বার।
ফাল্গুণ চৈত্রেতে কাল বসন্ত বাহার॥

ঋতু সাধারণতঃ দুইটি। শীত ও গ্রীষ্ম। বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস গ্রীষ্মকাল, আর কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস শীতকাল। বর্ষা ও শরৎ কাল গ্রীষ্মের অংশ আর হেমন্ত ও বসন্তকাল শীতের অংশ।

ইংরাজি মাসের নাম।

জানুয়ারী এক মাস, দুই ফেব্রুয়ারী।
মার্চ্চমাস তিন মাস, এপ্রিলেতে চারি॥
মেতে হ'ল পাঁচ মাস, জুন মাসে ছয়।
জুলাই মাসেতে সাত, আগষ্টে আট হয়॥
সেপ্টেম্বর নয় মাস, অক্‌টোবর দশ।
নভেম্বর একাদশ ডিসেম্বরে দশ॥

ইংরাজি মাসের দিন।

"তিরিশ দিবস আছে মাস সেপ্‌টেম্বরে।
এরূপ এপ্রিল জুন আর নভেম্বরে॥
আটাশ দিবসে মাস ফেব্রুয়ারি ধরি।
আর সাত মাস গণি একত্রিশ করি॥

(বালকগণের আবৃত্তি বা অভিনয়ের নিমিত্ত ষড়্‌ঋতু বিষয়ক একটী কবিতা "বিবিধ বিধানের" শিশুশিক্ষা বিষয়ক দ্বিতীয় প্রকরণে লিখিত হইয়াছে)

তৃতীয় প্রকরণ।

(৮।৯।১০ বৎসরের বালক বালিকার জন্য)

১। বিড়াল।

উপকরণ—একটা পোষা বিড়াল ও একটুকু দুধ।

শিক্ষক। এই বিড়ালটীর গায়ে হাত বুলাও, দেখ লোমগুলি কেমন নরম।

ছাত্র। হাঁ লোমগুলি বেশ নরম।

শি। কোন্ জিনিষের মত নরম?

ছা। মখমল কাপড়ের মত নরম।

[শিক্ষক দর্জ্জির দোকান হইতে একটুকরা মখমল কাপড়ের ছাঁট সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন]

শি। বিড়ালের গায়ের রঙ কেমন?

ছা। সাদা (বা অন্য যে রঙের)

[নানা রঙের বিড়াল আছে—কে কি রঙের বিড়াল দেখিয়াছে জিজ্ঞাসা কর। কোন কোন বিড়ালের গায় বাঘের মত ডোরা ডোরা দাগ আছে]

শি। বিড়ালের কয় খানি পা ?

ছা। বিড়ালের চার খানি পা।

শি। তোমার কয় খানি পা ?

ছা। আমার দুই খানি পা।

শি। বিড়ালের পায়ে কয়টা নখ আছে ?
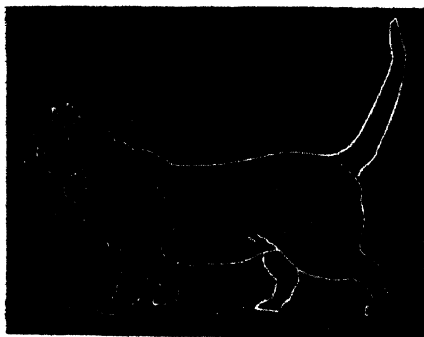
বিড়াল।

ছা। (গণিয়া) সামনের পায়ে পাচটী করিয়া আর পেছনের পায়ে চারিটী করিয়া নখ।

শি। আচ্ছা— পেছনের পায়ের নখ আর সামনের পায়ের নখ কি এক রকমের ?

ছ। সামনের পায়ের নখগুলি পেছনের পায়ের নখচেয়ে একটু বেশী লম্বা ও ধারাল।

[যদি ছাত্রেরা নিজে এই তুলনা করিতে না পারে, তবে শিক্ষক তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। যদি ছাত্রগণ অতি অল্প বয়স্ক হয়, তবে এইরূপ তুলনা শিখাইবার আবশ্যকতা নাই।]

শি। সামনের পায়ের নখ বড় কেন ?

ছা। (নিরুত্তর)

শি। কোন্ পা দিয়ে বিড়াল ইঁদুর ধরে ?

ছা। সামনের পা দিয়ে—সেইজন্য সামনের পায়ের নখ বড় ও ধারাল।

শি। কোন্ পার উপর ভর দিয়া গাছে উঠে ?

ছা। সামনের পার উপর ভর দিয়া গাছে উঠে।

শি। নখের মাথা কেমন দেখত ?

ছা। বড়সীর মত একটু বাঁকান।

শি। [একটা বড়সীতে কোন জিনিষ বিদ্ধ করিয়া টানিয়া দেখাইবেন যে সে জিনিষ সহজে ছাড়ান যায় না। একটা সুঁচে কোন জিনিষ বিদ্ধ করিয়া টানিয়া দেখাইবেন যে সে জিনিষ সহজে খুলিয়া যায়।]

বিড়ালের নখের মাথা অমন বাঁকান কেন ?

ছ। ইঁদুর ধরিলে সে ইঁদুর সহজে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না।

শি। বিড়াল নখ দিয়া আর কি করে ?

ছা। বিড়াল নখ দিয়া আঁচড়ায়।

শি। কি কি জিনিষ আঁচড়ায় ?

ছা। মাটী আঁচড়ায়, বিছানা আঁচড়ায় আর রাগলে মানুষের গা আচড়াইয়া দেয়।

শি। [যদি কাহারও গায়ে বিড়ালের আঁচড়ের দাগ থাকে, তবে তাহা দেখাইতে বলিবেন] বিড়ালের নখ কি সকল সময়ই বাহির হইয়া থাকে ?

ছ। না, সকল সময় বাহির হইয়া থাকে না।

শি। কখন্ বাহির করে ?

ছা। যখন কোন জিনিষ ধরিতে চায় কি যখন আঁচড়াইতে চায়।

শি। নখগুলি কোথায় লুকাইয়া রাখে ?

ছা। (নিরুত্তর)

শি। এই দেখ এই সমস্ত খাপের (বা কোষের) মধ্যে লুকাইয়া রাখে।

[কোন খাবার জিনিষ বিড়ালের সম্মুখে ধরিলে বিড়াল নখ বাহির করিবে, আবার খাবার জিনিষ বিড়ালের পার নীচে গদি।

সরাইয়া লইয়া গেলে কি বিড়ালের গায়ে হাত বুলাইলে নখগুলি কোষের মধ্যে সরাইবে। কেহ তরবারীর কোষ দেখিয়া থাকিলে তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন] বিড়ালের পায়ের নীচে কেমন নরম হাত দিয়া দেখ।

ছা। বেশ নরম, গদীর মত।

শি। কয়টা ছোট ছোট গদি আছে গণিয়া দেখ। গদীর রঙ কেমন? গদীতে কি লোম আছে?

ছ। গদীগুলির রঙ একটু কাল কাল। গদীতে লোম নাই।

শি। তোমাদের হাতের ও পায়ের নীচে লোম আছে?

ছা। না আমাদের হাতের ও পায়ের নীচে লোম নাই।

শি। পায়ের নীচে এই নরম গদী থাকাতে হাঁটিবার সময় বিড়ালের পায়ের শব্দ হয় না। [কুকুর, গরু, ঘোড়ার পায়ের শব্দের সঙ্গে তুলনা কর] এইজন্য ইঁদুর—বিড়ালের চলাফেরা টের পায় না। তাই বিড়াল সহজেই ইঁদুর ধরে।

[শিক্ষক ইচ্ছা করিলে "বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার গল্প" বলিতে পারেন। কিন্তু ছোট ছোট ছেলেরা এই গল্পের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেনা]

শি। বিড়াল আর কি ধরে?

ছা। বিড়াল পাখী ধরে।

শি। তোমরা কেউ পাখী ধর্‌তে দেখেছ?

ছা। আমি দেখেছি—সেই দিন ননীদের ময়নাটীকে বাহিরে রেখে, ননীর দাদা খাঁচা ছাপ কচ্ছিল, আর বুধুদের বিড়াল এসে এক লাফে পাখীটাকে নিয়ে গেল।

শি। বিড়াল শিকার ধরিবার সময় কেমন করে বসে দেখাওত।

ছা। (তদ্রূপ করণ)

শি। বিড়াল রাগ্‌লে কেমন করে শরীর ফুলায় ও লেজ নাড়ে জান?
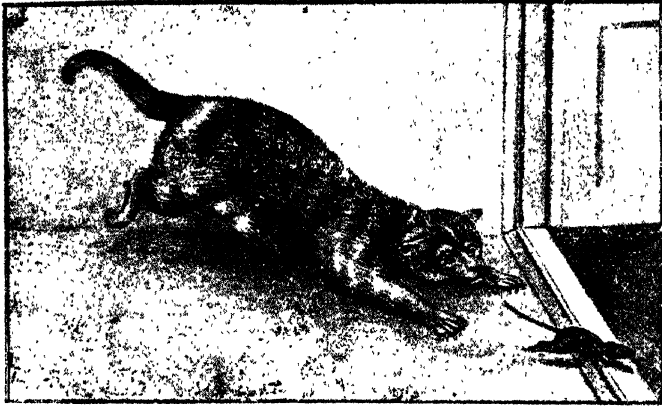
বিড়ালের ইঁদুর ধরা।

ছা। বিড়াল খুব ঘন ঘন লেজ নাড়ে—আর এমনি করে গা ফুলাইয়া উঁচু হয় [মাটীর উপর তদ্রূপ ভঙ্গী করণ]

শি। বিড়াল রাগ্‌লে কেমন করে ডাকে ?

ছা। খুব চেঁচাইয়া ম্যাও ম্যাও করে, আর ফঁচ্ ফঁচ্ করে।

শি। আর কেমন করে ডাকে ?

ছা। বিড়াল কেবল ম্যাও ম্যাও করে ডাকে—রাগ্‌লে খুব জোরে ম্যাও ম্যাও করে আর অন্য সময় আস্তে আস্তে ম্যাও ম্যাও করে।

শি। হাঁ ঠিক কথা। বিড়াল যখন কিছু চায় বা যখন কেউ তাকে মারে তখন ম্যাও ম্যাও করে। আর যখন বেশ আরাম বোধ করে তখন পরর্ পরর্ করে।

ছা। হাঁ, বিড়াল ঘুমাইবার আগে পরর্ পরর্ করে।

শি। বিড়ালের দাঁত দেখ। সবগুলিই কেমন ধারাল—আর তার মধ্যে এই চারিটী আবার একটু বড় ও তাদের মাথা সরু

আমাদের কতকগুলি দাঁতের মাথা মোটা। বিড়াল দাঁত দিয়ে

বিড়ালের দাঁত

মাংসের টুকরা ছিঁড়ে গিলে খায়। আমাদের মত চিবাইতে পারে না। বিড়াল জিভ দিয়ে কেমন করে দুধ খায় দেখ [বিড়ালের সামনে দুধের বাটী দিয়া] এই দেখ জিভের মাথা কেমন বাঁকাইয়া চাম্‌চের মত করিয়া দুধ তুলে নিচ্ছে। বিড়াল কেমন করে গা পরিষ্কার করে জান ?

ছা। জিভ দিয়া গা চাটিয়া পরিষ্কার করে।

শি। বিড়ালের চখের মণি সব সময় গোল দেখা যায় না—এই দেখ এখন কেমন দেখাইতেছে।

আলোতে বিড়ালের চোখ।

ছ। এখন একটা দাগের মত দেখাচ্ছে।

শি। [বিড়ালটীকে একটু অন্ধকার স্থানে লইয়া গিয়া] এখন দেখত কেমন দেখায় ?

ছা। এখন বেশ গোল দেখাচ্ছে।

অন্ধকারে বিড়ালের চোখ।

শি। বিড়ালের চোখে আলো সয় না। তাই বিড়ালের চোখের মণির দুই ধারে দুইটী ছোট পরদা আছে। আলোর সময় সেই পরদা দুইটী সরাইয়া আনিয়া চোখের মণি ঢাকিয়া রাখে। কেবল দেখিবার জন্য একটু ফাঁক রাখে। রাত্রে পরদা সরাইয়া রাখে। বিড়াল অল্প আলোতে বেশ দেখিতে পারে। তাই রাত্রে ইঁদুর ধরিবার সুবিধা পায়। বিড়ালের গোঁপ দেখেছ ?

ছা। এইত গোঁপ। গোঁপ দিয়ে কি করে ?

শি। আচ্ছা যদি খুব অন্ধকারে এক কামরা হ'তে আর এক কামরায় যেতে হয় তবে তুমি কি কর ?

ছা। আমি হাত বাড়াইয়া দেয়াল, দরজা ঠিক করি, আর চলি।

শি। ঠিক। অন্ধলোকেরা কেমন করে চলে ?

ছা। তাহারাও হাত কি পা বাড়াইয়া বাড়াইয়া বা লাঠিদিয়া পথ ঠিক করিয়া চলে।

শি। বিড়াল খুব অন্ধকারে এই গোঁপ দিয়া পথ ঠিক করে। মনে কর ঘরের চালে উঠে ইঁদুর ধরতে হবে—ইঁদুর চালের এক কানাচের মধ্যে লুকাইয়া আছে। বিড়াল আগে সেই কানাচ বা গর্ত্তের মুখে মাথা দেয় ; যদি দেখে যে তার গোঁপ দুই দিকে বাধে না, তবেই বুঝল যে তার সমস্ত শরীরটা সেই গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিতে পারিবে। কিন্তু যদি দেখল যে গোঁপ দুই দিকে বাধে, তবে আর সে গর্ত্তে ঢুকতে চেষ্টা করে না। বিড়ালের গোঁপ আর গার লোমে হাত দিয়ে দেখ।

ছা। গোঁপ শক্ত কিন্তু গাঁর লোম বেশ নরম আর গরম।

শি। [অনেক দুষ্ট বালক বিড়ালের লেজ কাটিয়া দেয়, বস্তায় পুরিয়া মার পিঠ করে; এই সমস্ত নিষ্ঠুর আচরণ অতি গর্হিত—ইহা বলিয়া দিবে।] বিড়ালের কথা আর কেউ কিছু জান ?

ছা। [যদি ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ বিড়ালের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারে তাহা বলিবে। যথা—বিড়াল মাছ খাইতে ভালবাসে, বিড়ালকে খাইতে না দিলে চুরি করিয়া খায়—ভাল বিছানায় শুইতে ভালবাসে——জল ভালবাসেনা—স্নান করে না, গরম স্থান ভালবাসে—উনুনের পাশে শুইয়া থাকে, পচা জিনিষ খায় না, বিড়ালকে পেট ভরিয়া খাইতে না দিলে সে ইঁদুর ধরিতে চেষ্টা করে না—বিড়াল ইঁদুর ধরে খেলা করিবার জন্য ও খাইবার জন্য ইত্যাদি।]

শি। [বিড়াল বিষয়ক কোন ছড়া বা কবিতা "ভঙ্গী সঙ্গীতের" প্রণালীতে আবৃত্তি করাইবেন]

যথাঃ—

মিনি বলে ডাক্‌লে পরে অম্‌নি মিনি আসে।
আমার কোলে শুতে মিনি বড্ড ভাল বাসে॥
পা গুঁটিয়ে ছোট্ট হ'য়ে কোলে মাথা গুঁজে।
পরর্‌ পরর্‌ ডাকে মিনি চক্ষু দুটী বুঁজে॥

দ্রষ্টব্য—[প্রথম বর্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। বিড়াল বিষয়ক অন্যান্য কথা দ্বিতীয় বর্ষে শিক্ষণীয়। "বিড়াল ও কুকুর" বিষয়ক পাঠ দেখ। বরং বালকগণের বয়স ও অভিজ্ঞতা দৃষ্টে শিক্ষক কিছু কমাইয়াও শিক্ষা দিতে পারেন।]

২। কুকুর।

উপকরণ—একটা পোষা কুকুর—এক টুকরা মুড়ির চাক্‌তি (মুড়ির মোয়া) বা বিসকুট। নানাপ্রকার বিলাতী কুকুরের ছবি যথাঃ—টেরিয়ার, হাউণ্ড, বুলডগ, সিপডগ, স্পেনিয়েল, নিউফাউণ্ডলেণ্ডডগ, সেণ্টবারনার্ডডগ্‌ ইত্যাদি।

আকার প্রকার।—সকল গুলির ছবি দেখাও। আকারে ভিন্ন হইলেও সকল গুলিই কুকুর। জিজ্ঞাসা কর কুকুরগুলির চেহারায়

পয়েণ্টার।

অমিল কিসে কিসে? কতকগুলি ছোট আর কতকগুলি বড়। কুকুরের গায় কি দেখিতেছ? লোম। আচ্ছা এই কুকুরটার (সেণ্টাবর্ণাড) গায়ের লোম কেমন? কোঁকড়ান, কোঁকড়ান। আর এই টার (দেশী কুকুর)? ছোট আর খাড়া খাড়া। এইটার (নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড)? সোজা সোজা ও বড় বড়। আর এটার (সিপডগ্)? ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ও খুব বড় বড়।

সেণ্টবারনার্ড।

এই চারটার (টেরিয়ার, পয়েনণ্টার, বুলডগ্ ও হাউণ্ড)? খুব ছোট ছোট। সকল কুকুরের রঙ্ই কি এক রকমের? না—তবে অনেক-গুলিই কাল। কতকগুলি বাদামী রঙের (বুলডগ, হাউণ্ড)। কতক-গুলির রঙ্ সাদা। আবার কতকগুলির গায় সাদার উপর কাল কাল

চাকার মত দাগ। আচ্ছা সকল গুলি কুকুরের মাথাই কি একরকমের?
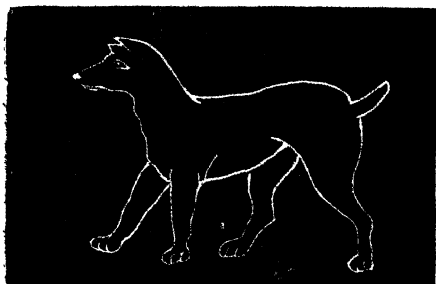
টেরিয়ার।

না—এইটার (বুলডগ্) গোল, আর এইটার (দেশী কুকুর, টেরিয়ার, পয়েণ্টার, হাউণ্ড, সিপডগ্) মুখ লম্বা। এই দুইটার (নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ড ও সেণ্টবার্নাড) মুখ মাঝারী রকমের, কাণ খাড়া—আর প্রায় বিলাতী কুকুরের কাণই ঝোলা। কুকুরের পায়ের নখ দেখ। কুকুরের পায়েও বিড়ালের মত নখ আছে। বিড়াল নখগুলি লুকাইতে পারে, কুকুর পারে না। কুকুরের নখ বিড়ালের নখের মত ধারালও নয়।

ব্যবহার।—তোমাদের কাহারও বাড়ীতে পোষা কুকুর আছে? লোকে কুকুর পোষে কেন? কুকুর পাহারাওলার কাজ করে। কেমন করে পাহারা দেয়? যখন কোন লোক আসে তখন ঘেউ ঘেউ করে ডাক্‌তে আরম্ভ করে। তোমরা তখন কি কর? আমরা বেরিয়ে দেখি
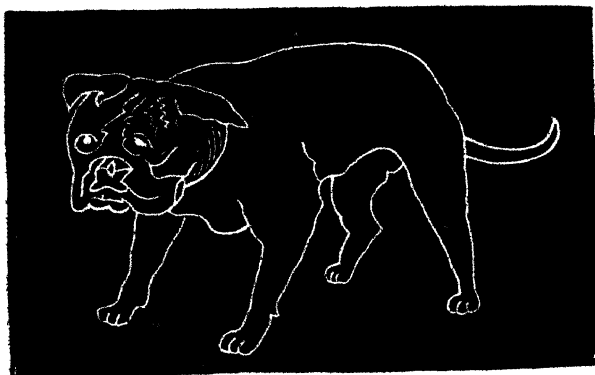
বুলডগ্।
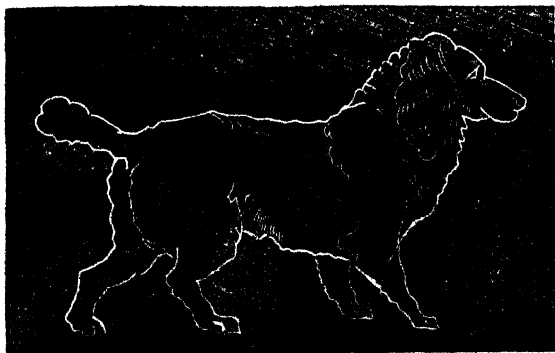
স্প্যানিয়েল।

কে এসেছে। যদি বেরিয়ে না যাও, তবে? কুকুর তাকে বাড়ী ঢুকতে দেয় না—বেশী রাগী কুকুর হ'লে তাকে কামড়াইয়া দেয়। তোমার বাবা কি দাদা বাড়ী এলেও কি তোমাদের কুকুর ঘেউ ঘেউ করে? না, তারা বাড়ীর লোক চেনে। হাঁ, ঠিক কথা, কুকুর পরিচিত ও অপরিচিত
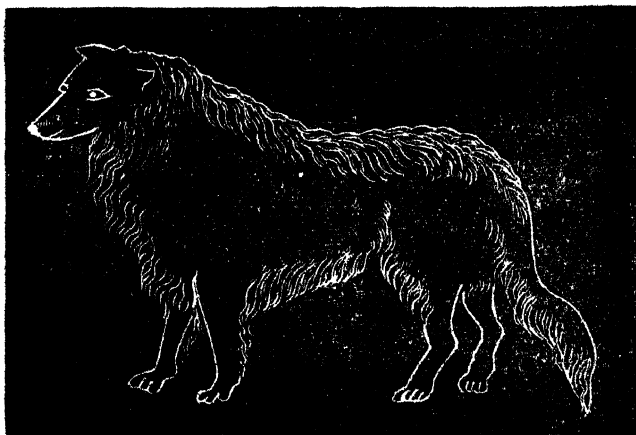
সিপডগ।

লোক চিনিতে পারে। কোন পরিচিত লোক কাছে গেলে কুকুর কি করে? কুকুর আনন্দে লেজ নাড়িতে থাকে। আর কুকুর কি কাজ করে? বাড়াতে শেয়াল ঢুকতে দেয় না। শেয়াল কুকুরকে খুব ভয় করে। কুকুর মেটে ইঁদুর ধরে খায়।
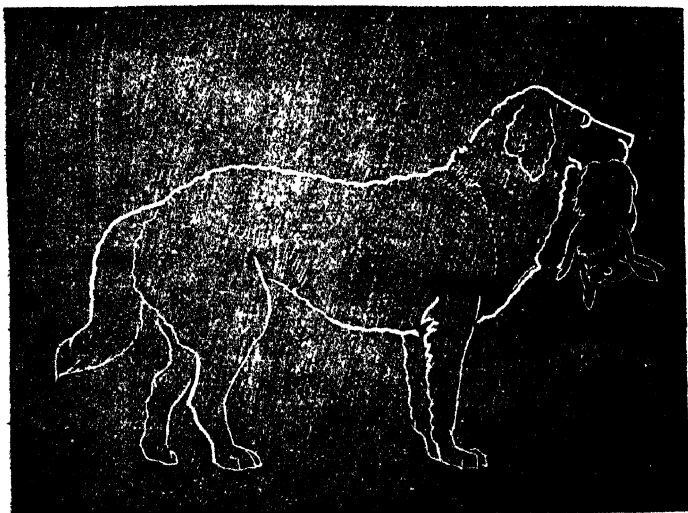
রিটে ভার।

আচ্ছা এখন এই বিলাতী কুকুরগুলির কথা বলি শুন। এই বুলডগ খুব রাগী কুকুর। বাড়ী পাহারায় ইহার মত ভাল কুকুর আর নাই। চোরের সাধ্যও নাই যে—বাড়ীতে এই কুকুর থাকতে ঢুকিতে পারে। এই টেরিয়ার কুকুরগুলি ছোট ছোট বটে—কিন্তু এরা ইঁদুর ধরার যম। এই লম্বা লম্বা হাউণ্ড কুকুর খুব শিকারী। এরা খরগোস, পাখী, শেয়াল, হরিণ প্রভৃতি শিকার করে। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি খুব বেশী, অনেক দূরের জিনিষের গন্ধ পায়—শ্রবণশক্তিও খুব বেশী—অনেক দূরে ছোট একটু শব্দ হইলেই টের পায়। এই জন্য কুকুর বেশ শিকারী হয়। নিউফাউণ্ড-

ল্যাণ্ড কুকুরগুলিকে জাহাজের কি নদীর ধারের লোকে পোষে। জলে কোন জিনিষ কি মানুষ পড়িয়া গেলে ইহারা ডুব দিয়া তুলিয়া আনে। সেণ্টবারনার্ড—পাহাড়ে-কুকুর। যে সকল পর্ব্বতে খুব বরফ পড়ে—আর লোকজন সেই বরফের উপর চলতে চল্‌তে অবশ হয়ে পড়ে—সেই খানে এই কুকুর সেই সমস্ত লোককে পিঠে করিয়া বাড়ী নিয়ে আসে। ইহাদের গায় খুব জোর। খুব শীতের জায়গায় বাস করিতে হয় ব'লে এদের গায়ের লোম খুব বড় বড়। এই সিপডগ্ (সিপ মানে ভ্যাড়া) ভ্যাড়ার রাখালকে খুব সাহায্য করে। ভ্যাড়াগুলি খুব বোকা কিনা—রাস্তা ভুলে অন্যদিকে চলে যায়। এই কুকুর সব ভ্যাড়াগুলি তাড়াইয়া একখানে ক'রে রাখে। আর বাঘ কি শেয়ালে যাতে ভ্যাড়া কি ভ্যাড়ার বাচ্ছা নিয়ে যেতে না পারে, সে দিকেও চোখ রাখে।

গ্রে হাউণ্ড।
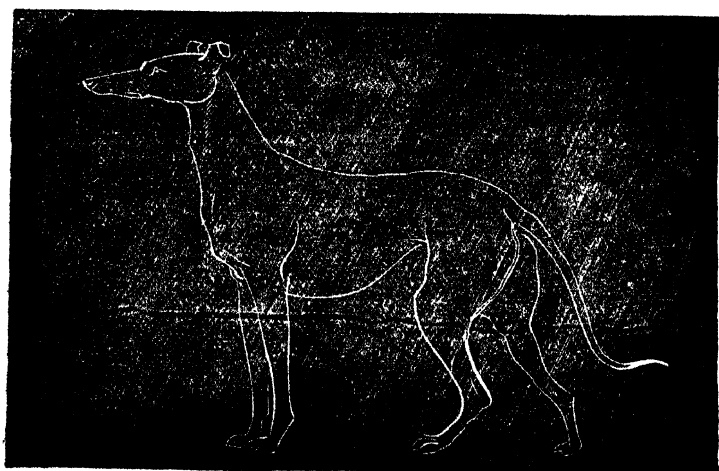
কুকুর বিষয়ে বালকেরা আর যাহা যাহা জানে তাহা বিবৃত করিবে যথা—কুকুর ছাইএর মধ্যে শুইয়া থাকিতে ভালবাসে—কুকুর দিনে চুপ

করিয়া থাকে। রাত্রে খুব লাফালাফি করে—কুকুর গরম দিন ভালবাসে না—স্নান করিয়া থাকে—রৌদ্রের সময় জিব বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে ইত্যাদি।

কুকুর কেমন করে শক্ত জিনিষ খায় দেখ। (বিসকুট বা মুড়ির চাকৃতি কুকুরকে খাইতে দাও) আমাদের মত এপাশ ওপাশ করিয়া মাঢ়ি নাড়িতে পারে না, তাই মাঝে মাঝে মুখ উচু করিয়া বিসকুটের টুকরা মাঢ়ির কাছে নিয়ে যায়। কুকুরের দাঁতগুলি ঠিক বিড়ালের দাঁতের মত।

কক্ হাউণ্ড।
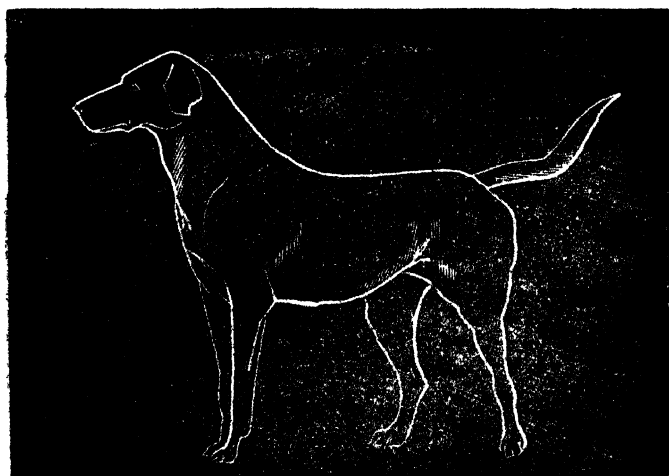
কুকুরের প্রভুভক্তির গল্প বল [এক বণিক ঘোড়ায় চড়িয়া টাকা আদায় করিতে গিয়াছিল। টাকা আদায় করিয়া ফিরিবার সময় গাছের নীচে টাকার থলে রাখিয়া বিশ্রাম করিতে বসিয়াছিল—বিশ্রামের পর ঘোড়া চড়িবার সময় টাকার থলে নিতে ভুলিয়া যায়; কুকুর সঙ্গে ছিল; সে বণিককে সেই কথা জানাইবার জন্য ডাকিতে ডাকিতে পিছু পিছু চলিল; সময় সময় ঘোড়ার পায় কামড়দিয়া ঘোড়া থামাইবার চেষ্টাও করিল,

বণিক মনে করিল কুকুর ক্ষেপিয়াছে, গুলি করিল, কুকুর গুলি খাইয়া অতি কষ্টে সেই টাকার থলের কাছে ফিরিয়াগেল—শেষে টাকার কথা মনে হইলে বণিক ফিরিয়া আসিল ও দেখিল কুকুর টাকার থলির নিকট শুইয়া আছে, কুকুর একটু পরেই মরিয়াগেল—বণিক হায় হায় করিয়া কাঁদিতে লাগিল ইত্যাদি]

বাৎস্যায়ণ মুনি কুকুরের এই সমস্ত গুণের উল্লেখ করিয়াছেন :—

বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ ষড়েতে বৈ শুনোগুণাঃ॥

অর্থ—অনেক খাইতে পারে কিন্তু অল্প খাইলেও সন্তুষ্ট ; খুব গাঢ়নিদ্রা যায়, কিন্তু অতি সামান্য শব্দ হইলেই জাগিয়া উঠে। প্রভুর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত এবং খুব সাহসী। এই ছয়টী কুকুররর বিশেষ গুণ।

ছাগল।

উপকরণ। একটা পোষা ছাগল ও কিছু কাঁঠালের পাতা বা ঘাস।

আকার প্রকার।—এই ছাগলটা দেখ—এর আকার কোন্ জন্তুর মত? কুকুরের মত। মুখের আকার বিড়ালের মত গোল না কুকুরের মত লম্বা। মুখের আকার লম্বা। ছাগলের চোখ হলুদরঙের, তার মধ্যে চোখের মনি একটা দাগের মত। ছাগলের ঝোলা কাণ দেখেছ? হাঁ রামছাগলের কাণ ঝোলা। আর কোন তফাৎ আছে? কুকুরের কাণ সম্মুখে ফিরাণ, ছাগলের কাণ নীচে ফিরাণ। আবার ছাগল ইচ্ছামত সেই কাণ সম্মুখের দিকে ও পাছেরদিকে ফিরাইতে পারে। ছাগলের কাণ নাড়া দেখিয়াছ? তুমি তোমার কাণ নাড়িতে পার? ছাগলের এতে কি সুবিধা হইয়াছে জান—খুব দৌড়াইবার সময়ও পশ্চাৎ হইতে কেহ আসিতেছে কি না ছাগল তাহা বুঝিতে পারে।

কুকুরের সঙ্গে আর কি তফাৎ? কুকুরের মুখে ছোট ছোট গোঁফ আছে আর ছাগলের মুখে লম্বা দাড়ী; কুকুরের শিং নাই—ছাগলের ছোট ছোট শিং আছে। দাঁত দেখেছে? এই দেখ ছাগলের উপর পাটীর সামনে দাঁত নাই। তবে মাড়ি খুব শক্ত। ছাগল কেমন করে ঘাস খায় এই দেখ (ছাগলকে ঘাস
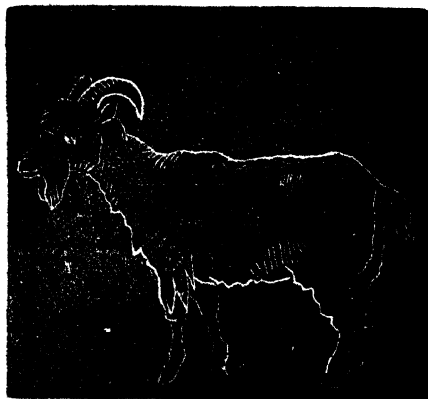
ছাগল।

পাতা খাইতে দাও)। ছাগলের গলা কেমন, আর লেজ কেমন? গলা বেশ লম্বা আর লেজ খুব খাট। ছাগলের পা দেখ। পা চারিখানি সরু হইলেও খুব শক্ত—এই জন্য ছাগল খুব দৌড়াইতে পারে আর লাফাইতে পারে। ছাগলের ক্ষুর কি ঘোড়ার ক্ষুরের মত না গোরুর ক্ষুরের মত?—মাঝখানে কাটা, গোরুর ক্ষুরের মত। ছাগল যে খুব কম জায়গায় দাঁড়াতে পারে তা দেখেছ? হাঁ দেখেছি—সে এক বানরওলার ছাগল, ছোট্ট একখানি ৪ আঙ্গুল টুলের উপর দাঁড়াইল। [ছাগল যে পাহাড় পর্ব্বতে চড়িতে বড় পটু তাহা বলিয়া দাও]

ব্যবহার।—ছাগলের দুধ বেশ মিষ্ট—শিশুর ও রোগীর পথ্য। রামছাগল ছেলেদের ছোট ছোট গাড়ী টানিতে পারে। হিন্দু মুসলমানে ছাগলের মাংস খায়। ছাগলের চামড়াদিয়া ঢোল, ঢাক, তবলা তৈয়ারী করে। ছাগলের চামড়াদিয়া বই বাঁধে (চামড়ায় বাঁধান বই দেখাও) ছাগলের লোমে তুলি প্রস্তুত করে (একটা তুলি দেখাও)। কাশ্মীরের ছাগলের লোমে শাল, আলোয়ান প্রস্তুত হয়।

ছাত্রদিগের নিকট হইতে অন্যান্য কথা আদায় কর। যথা—হিন্দুরা ছাগলবলি দেয়—"পাগলে কিনা কয়, ছাগলে কিনা খায়" —ছাগল সব রকম ঘাস পাতা খায়। কিন্তু গোরু, ঘোড়া বাছিয়া খায়। ছাগল খুব নিরীহ। তবে শিংওয়ালা পাঁঠা ঢিপ্ মারে। ছাগলের মেয়ে পুরুষের দাড়ী আছে। ছাগলকে ভাল কথায় ছাগ ও মেয়ে ছাগলকে ছাগী বলে। ছাগীর ২টী স্তন।

যদি বালকেরা লিখিতে শিখিয়া থাকে তবে বোর্ডে এই অংশ লিখিয়া দেও। শূন্য স্থান বালকেরা পূরণ করিবে।—

ছাগলের দুইটী—ং আছে। কাশ্মীরি ছগেলের লোমে—ল তৈয়ারী হয়। ছাগলের উ—পাটীর সামনে—ঁ ত নাই। ছাগল রৌ—ভালবাসে, বৃ—ভালবাসে না।

ভ্যাড়া।

উপকরণ—একটা পোসা ভ্যাড়া ও কিছু ঘাস। কম্বল, উলসূতা, ফ্লানেল।
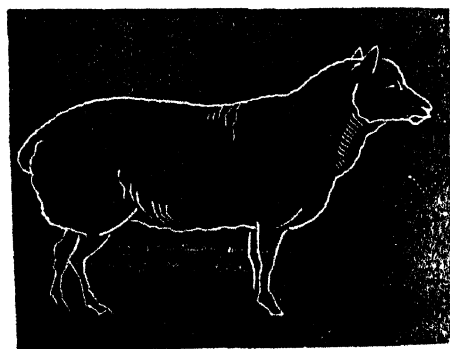
আকার প্রকার।—(যদি একটা মেষ পাওয়া না যায়, তবে মেষের ছবি দেখাইতে পার) এই ভ্যাড়ার মাথাটা কেমন? কোন জন্তুর মত? কতকটা ছাগলের মত তবে ছাগলের মুখের সামনের ভাগচেয়ে ভ্যাড়ার মুখের আগা সরু। চোখ কেমন? ছোট ছোট আর দেখিলেই বোধ হয় যেন খুব শান্ত। ভ্যাড়ার

শিং কেমন? ছাগলের মত নয়, এর শিং খুব বাঁকান। ভ্যাড়া

শিং দিয়ে কি করে? কেহ উৎপাত করিলে তাহাকে গুঁতামারে। আবার ভ্যাড়ায় ভ্যাড়ায়ও খুব ঢিপ্‌খেলে। ভ্যাড়ার শিং থাকে কিন্তু ভেড়ীর শিং থাকে না। ভ্যাড়ার কাণ? কাণ ছোট ছোট। দাঁত? ছাগলের মত উপর পাটীর সামনে দাঁত নাই। গায়ের লোম কেমন? খুব ঘন কোঁকড়ান আর বেশ নরম। ভ্যাড়ার পার ক্ষুর কেমন— গোরুরমত না ঘোড়ার মত? ভ্যাড়া নানা রকমের আছে—দুম্বা ভ্যাড়া ব'লে এক রকমের ভ্যাড়া আছে, তার লেজের কাছে খুব বড় একটা মাংসের থলে নামে। সেটা সময় সময় এত বড় হয় যে সেইটা টানিবার জন্য ভ্যাড়ার পাছে একটা ছোট গাড়ী বাঁধিয়া দিতে হয়। এই লেজের মাংস খুব সুখাদ্য।

ব্যবহার।—ভ্যাড়া মাঠে ঘাস খায়। ভ্যাড়া খোলা মাঠেই পড়িয়া থাকে; গায় খুব ঘন লোম আছে, সেইজন্য ঠাণ্ডা লাগেনা। লোকে ভ্যাড়া পোষে কেন? ভ্যাড়ার মাংস খাইবার জন্য। আর কি জন্য? ভ্যাড়ার লোমের জন্য। এই লোমে কম্বল তৈয়ারী করে। ভ্যাড়ার গায়ে কি সব সময়েই বড় বড় লোম থাকে? না, গরমের সময়ে ভ্যাড়ার গা থেকে লোম কাটিয়া নেয়। লোম কাটিলে আবার লোম বড় হইতে থাকে। তোমার চুল কটেিলে কি চুল ছোট থাকিয়া যায়? না একটু একটু করে আবার বড় হয়। ভ্যাড়ার লোমেরও তাই হয়। লোম কাটিবার আগে কি করে? ভ্যাড়াগুলিকে পুকুর কি নদীতে নামাইয়া তাদের গার লোম-গুলি বেশকরে সাবানদিয়া ছাপ করে। তারপর সেগুলি কাটিয়া নেয়। ভ্যাড়ার লোমে কম্বল ছাড়া আর কি তৈয়ারী হয়? উলস্থতা। হাঁ, ফ্লানেল কাপড়ও ভ্যাড়ার লোমে প্রস্তুত করে। উলস্থতায় কি কি তৈয়ারী হয়? মোজা, জামা, গলাবন্ধ ইত্যাদি। ভ্যাড়ার চামড়ায় দস্তানা তৈয়ারী করে। ভ্যাড়ার চামড়াদিয়া বাদ্যযন্ত্রের ছাউনী হয়। ভ্যাড়ার চামড়ায় পার্চমেণ্ট নামক এক প্রকার শক্ত কাগজ

হয়। ভ্যাড়াকে ভাল কথায় মেষ বলে। মেষ ও মেষশাবক খুব নিরীহ।

[ছাত্রগণকে অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করিতে বল] ভ্যাড়াকে ম্যাড়াও বলে। হিন্দুরা কোন কোন ঠাকুরের কাছে ম্যাড়াবলি দেয়। ভ্যাড়ার দাড়ী নাই। ভ্যাড়ার বাচ্চা খুব শান্ত কিছুই বলে না। ভ্যাড়ার বাচ্চাকে ভাল কথায় কি বলে জান? মেষশাবক।

বলিয়া দাও—বিলাতের লোকে ভ্যাড়ার মাংস খুব ভালবাসে। বিলাতের কোন কোন দেশে (ইংলণ্ডে) এক এক দলে ২০০ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত ভ্যাড়া পোষে; আর কোন কোন দেশে (অষ্ট্রেলিয়ায়) এক এক দলে ১০০০ এক হাজার হইতে ২০০০ দুই হাজার পর্য্যন্ত ভ্যাড়া পোষে। ইহারা ভ্যাড়ার মাংস বিদেশে পাঠায়। ভ্যাড়ার লোমে উলসূতা, ফ্লানেল, কম্বল তৈয়ারী করিয়া বিদেশে চালান দেয়।

৫। গোরু।

উপকরণ—একটা গোরু ও ঘাস। [শ্রেণী কক্ষে গোরু আনয়ন করা সুবিধাজনক না হইলে, বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে গোরু বাঁধিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ছাত্রগণকে সমবেত কর। কিন্তু সাবধান গোরুটী যেন বেশ নিরীহ হয়।]

বিলাতি গোরু।

আরম্ভ।—এই গোরুটার গায়ে হাত দাওত। গোরুটী কিছু বলে কি? না, কিছুই বলে না, গোরুটা বেশ শান্ত। সব গোরুই কি এমনি শান্ত? না দুই একটা গোরু আছে খুব দুষ্ট, ঢুঁস মারিতে আসে। সে সকল গোরু কি সকলকেই ঢুঁস মারে? না, যারা রোজ রোজ ঘাস দেয়, তাদের কিছু বলেনা। হাঁ, ঠিক কথা কে ভালবাসে না বাসে গোরুও তাহা বুঝিতে পারে। তোমরাও যদি তাকে রোজ রোজ খেতেদাও, তবে আর তোমাদেরও ঢুঁস মারবে না।
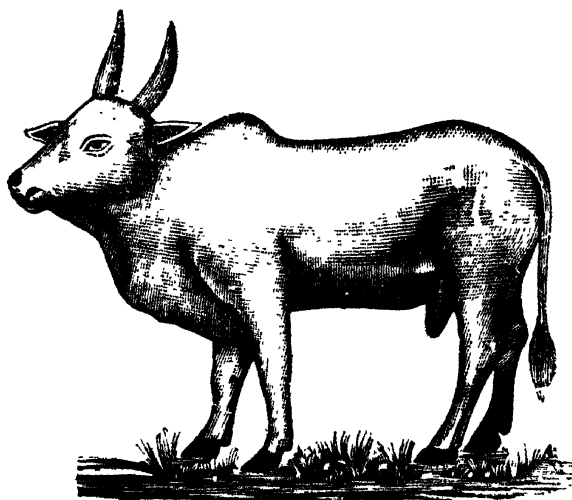
আহার।—গোরু কোথায় থাকে?—দিনে গোরু মাঠে ঘাস খায়? যখন ঘাস খায় তখন দাঁড়িয়ে খায় না শুয়ে খায়? দাঁড়িয়ে ঘাস খায়। গোরু ঘাসের উপর শুয়ে কি করে দেখেছ? কি যেন চিবায়। হাঁ, ঠিক কথা, গোরু যখন ঘাসখায় তখন চিবায় না কেবল গিলিয়াফেলে, তারপর সেই ঘাস পেটের ভিতর থেকে (বমির মত করে) টেনে আনে। আর চিবাইয়া খুব নরম করিয়া, আবার গিলিয়া

ফেলে। ইহাকেই 'জাবর কাটা বলে। যারা গোরুর জন্য ঘাস আন্‌তে যায়, তারা কি খালি হাতে যায় না কোন অস্ত্র নিয়ে যায়? তারা ঘাস কাটে না ছেঁড়ে? অস্ত্র থাকিলে ঘাস কাটে, না থাকিলে ছেঁড়ে। গোরু কেমন করে ঘাস খায় দেখেছ? তার লম্বা জিভদিয়ে ঘাস জড়াইরা ধরিয়া দুই মাড়ির মাঝে আনে। তারপর খুব জোরে এক হ্যাঁচ্‌কা টানদিয়ে ছেঁড়ে।

দাঁত।—দাঁতের কথা বল—গোরুর মুখ ফাঁক করিয়া (গোরুর একটী করোটী সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়) দেখাও যে নীচের মাড়ির সম্মুখে ৬টী ধারাল দাঁত (কর্ত্তন দন্ত) উপরের মাড়ির সম্মুখে দাঁত নাই, সে জায়গা শক্ত রবারের মত। প্রত্যেক মাড়ির পাশে দাঁত আছে ৬টা করিয়া, ৪ পাশে ২৪টা দাঁত। এই দাঁত গুলির মাথা মোটা (চর্ব্বন দন্ত)। ছাগল ও ভ্যাড়ার দাঁতও এই রকমের।
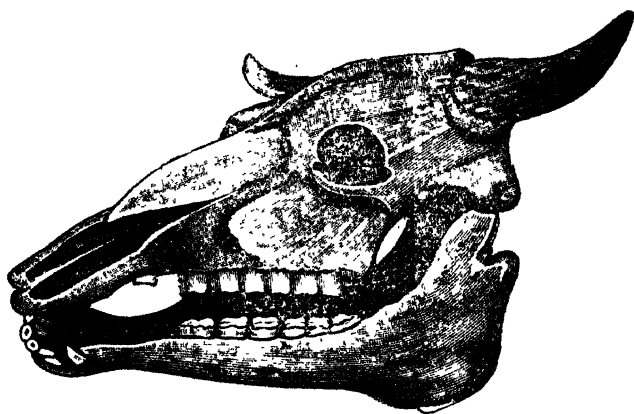
গলা।—গোরুর গলা লম্বা কেন? গলা লম্বা না হইলে মাথা নামাইয়া মাটিতে ঘাস খাইতে পারিত না।

শিং।—গোরুর কয়টা শিং? শিং দিয়া গোরু কি করে? নিজকে রক্ষা করে।

লোম।—ছোট ছোট। এই জন্ত মশা ও ডাঁসে গোরুকে বড় উৎপাত করে। গোরুর লোমের তুলনায় ছাগলের লোম বড়। ভ্যাড়ার লোম খুব বড়।

লেজ।—মশা, মাছি কেমন করে তাড়ায়? সব দিকে লেজ ঘুরাইতে পারে।

পা।—খাট খাট, শরীর আন্দাজে।

ক্ষুর।—চেরা। ঘোড়ার কেমন? ছাগলের কেমন?
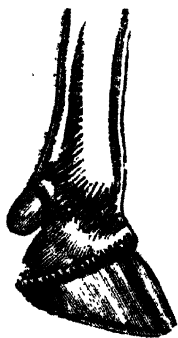
কান।—গোরুর কান সাম্‌নে ফিরান। ছাগলের কোন দিকে? গোরু বেশ কান নাড়িতে পারে—কোন দিকে শব্দ হইলে সেই দিকে কাণ ফিরায়। কিন্তু ছাগলের মত পাছের দিকে ফিরাইতে পারে না।

চক্ষু।—গোরুর চোখ বেশ বড় বড়।

এখন বালকগণের নিকট হইতে প্রশ্ন করিয়া গোরুর বিষয় অন্যান্য কথা আদায় কর; যথা—আমরা গোরুর দুধ খাই গোরুর চামড়ায় জুতা প্রস্তুত হয়। গোরুর গোবরে জমির সার হয়। গোরু দিয়া জমিতে লাঙ্গল চালায়। গোরু গাড়ী টানে। গোরু কলুর ঘানি চালায়। মুসলমাম ও খৃষ্টান জাতী গোরুর মাংস খায়।
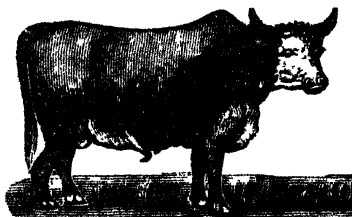
বিলাতি গরুর পীঠ সোজা, দেশী গরুর পীঠ একটু বেঁকা।

অন্যান্য কথা।—গোরু সকল দেশেই পাওয়া যায়। আমাদের দেশে পশ্চিম প্রদেশের গোরু খুব বড় হয়। এমন গোরু আছে যে প্রত্যহ আধমণ দুধ দেয়। বাঙ্গালা দেশের গোরু ৪।৫ সেরের বেশী দুধ দেয় না। আসামের গোরুর দুধ আরও কম হয়। যে গোরু প্রত্যহ ১০ দশ সের বা তাহার অধিক দুধ দেয় তাহাকেই কপিলা গাই বলে। বিলাতে এমন গাই আছে যে প্রত্যহ ১/ এক মণ দুধ দেয়। বিলাতের লোকে গোরুকে খুব যত্ন করে। খুব যত্ন না করিলে গোরুর বেশী দুধ হয় না। 'গোরুর দুধ মুখে' একথার অর্থ কি? গোশালা পরিষ্কার রাখার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দাও।

যে গোরু সকল সময়েই দুধ দেয় অর্থাৎ যে গোরুর অপরিমিত দুধ হয় তাহাকে কামধেনু বলে। ইন্দ্রের গোরুর নাম 'সুরভি।'

গোরুর চারিটী স্তন। পুরুষ জাতীয় গোরুকে ষাঁড়, ষণ্ড, বলদ বা বৃষ বলে।

মহিষ।

উপকরণ।—একটা পোষা মহিষ অথবা মহিষের একটা ছবি। (মহিষ অতি সহজেই উত্তেজিত হয়, সেই জন্য বিশেষ রূপ জানা মহিষ না হইলে তাহার নিকট বালক বালিকাদিগকে লইয়া যাইবে না।)

আকার।—গোরুর চেয়ে মহিষের আকার বড়। নানা রঙের গোরু দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু মহিষের রঙ্ প্রায়ই কাল। সাদা মহিষ খুব কম। মহিষের গায়ের লোম গোরুর লোমের চেয়ে বড়—কিন্তু গোরুর লোম ঘন, চামড়া দেখা যায় না। মহিষের লোম পাতলা, চামড়া দেখা যায়। গোরুর শিং বড় না মহিষের শিং বড়? মহিষের চোখ বড় বড়, কিন্তু গোরুর চোখের মত শান্ত ভাবের নয়—চোখ দেখিলেই খুব রাগী বলিয়া বোধ হয়। দাঁত, পা, ক্ষুর, লেজ গোরুর মত।

প্রকার।—আমাদের দেশের মহিষ প্রায় সকল স্থানেই এক রকমের। মণিপুরে অনেক মহিষ পাওয়া যায়। মণিপুরী মহিষ খুব বড় বড়।
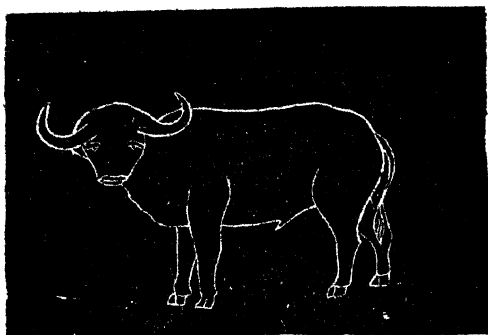
মহিষ।

ব্যবহার।—মহিষের দ্বারা জমিতে লাঙ্গল চালান হয়। মণিপুর ও আসামের গোরুর গায় তেমন জোর নাই। সেই জন্য এই দুই দেশে প্রায়ই মহিষের দ্বারা লাঙ্গল চালায়। দুইটা গোরুর কাজ একটা মহিষে করে। প্রায়ই একটা মহিষ দিয়ে লাঙ্গল চালায়। মহিষ বড় দুর্দ্দান্ত বলিয়া সময় সময় মহিষের নাকের ভিতর ছিদ্র করিয়া (লাগামের মত) দড়ি পরাইয়া দেয়। বেশী দুষ্টামী করিলে ঐ দড়ি ধরিয়া টানে, তাহাতে নাকে (কোমল স্থান বলিয়া) খুব ব্যাথা লাগে। ব্যথা পাইয়া থামিয়া যায়।

বালকদিগের নিকট হইতে আদায় কর :—মহিষের দুধ ও গোরুর দুধে তফাৎ কি? (মহিষের দুধ ঘন ও খুব সাদা—গোরুর পাতলা ও একটু হল্‌দে.) মহিষের দুধের দই হয়, ঘি হয়। গাওয়া ঘি ও ভঁয়সা ঘিতে তফাৎ কি? মহিষ গাড়ী টানে। মহিষ রৌদ্র ভালবাসে কি না? খুব রৌদ্রের সময় মহিষ কি করে? মহিষ কেমন করিয়া জলে গা ডুবাইয়া

থাকে? মহিষ খুব সহজে রাগে—কাল ছাতা কি লাল কাপড় দেখিলে ভয় পাইয়া গুতাইতে আসে। গোরুর গাড়ী দিনে ভাল চলে, গোরু ঠাণ্ডা ভাল বাসে না; মহিষের গাড়ী রাত্রিতে ভাল চলে। কিন্তু গোরু বেশ শান্ত,—তাইতে গোরুর গাড়ীতে চড়ায় তেমন ভয় নাই। মহিষের গাড়ীতে অনেক সময় বিপদ হয়। মহিষকে যত্ন করিলে সহজেই পোষ মানে। একটা গোরুর দাম কত? একটা মহিষেয় দাম কত? (স্থানীয় অবস্থানুসারে দাম বলিয়া দাও) মহিষের চামড়ায় জুতা, পেটারা, জিন প্রস্তুত হয়।

ঘোড়া।

উপকরণ—একটী শান্ত ঘোড়া। বালকেরা যেন ঘোড়ার পশ্চাৎ দিকে না দাঁড়ায়। (অভাব পক্ষে ঘোড়ার পুতুল বা চিত্র)

পর্য্যবেক্ষণ।—(ঘোড়া বা ঘোড়ার চিত্র দেখাইয়া উহার আকৃতি বর্ণনার সাহায্য কর) ঘোড়া—গোরু, মহিষ অপেক্ষা বড় (গোরু মহিষের মত ছোট ঘোড়াও আছে) গায়ের চামড়া পুরু—গায়ের লোম ছোট
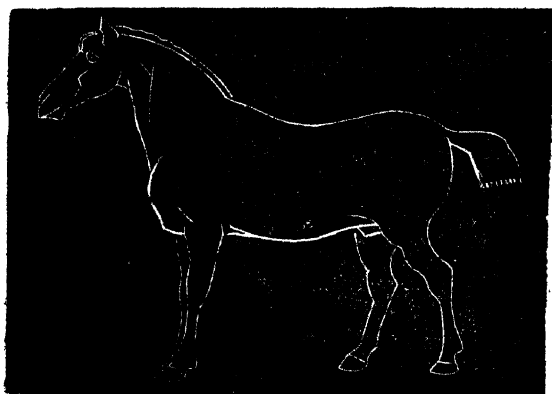
ছোট কিন্তু বেশ চক্‌চকে। ঘাড়ের লোম বড় বড়, আর লেজেও খুব বড় বড় ও শক্ত লোম। (আকৃতির সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া দাও) ঘোড়া দেখিতে বেশ সুন্দর (উট বিশ্রী); গলা লম্বা; পাগুলি সরু হইলেও বেশ শক্ত ও সুন্দর। পায়ের ক্ষুর একেবারে নিরেট, গোরুর ক্ষুরের মত কাটা নয়। ঘোড়ার ক্ষুরের নীচে লোহার নাল লাগাইয়া দেয়। (একখান নাল দেখাও। জুতার নীচে কেন লোহা লাগায়?) ঘোড়ার পায় নাল লাগায় কেন? পিঠের মধ্যভাগ নীচু, সোয়ারের বসিবার বেশ সুবিধা হয়। (দাঁত দেখাও) সম্মুখের দাঁত ও কষের দাঁতের মধ্যে ফাঁক—উপরপাটী ও নীচের পাটীতে এক রকমের। এই ফাঁকের মধ্যে লাগামের বিট পরাইয়া দেয়। (লাগামের বিট দেখাও।)

আদান প্রদান।—(বালক যাহা জানে তাহা প্রশ্ন করিয়া আদায় কর ও যাহা সে জানে না তাহা বলিয়া দাও)—ঘোড়া কি কাজে লাগে? ঘোড়া বোঝা বয়, গাড়ী টানে, মানুষকে পিঠে চড়াইয়া দূরদেশে লইয়া যায় (বলিয়া দাও বিলাতে ঘোড়া দিয়া লাঙ্গল চালায়) ঘোড়ার পা ও হাতীর পা তুলনা কর? ঘোড়ার পা সরু কিন্তু বেশ শক্ত, হাতীর পা মোটা কিন্তু তেমন
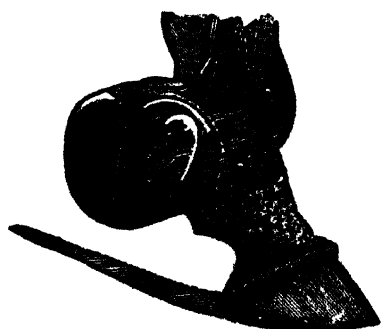
শক্ত নয়। কে বেশী দৌড়াইতে পারে—হাতী না ঘোড়া? তাড়াতাড়ি দৌড়াইতে হইলে আর ভারী বোঝা টানিতে হইলে আমাদের পায়ের তলা কেমন হইলে সুবিধা হয়—কুকুর বিড়ালের মত পায়ে অনেক আঙ্গুল থাকিলে আর পায়ের তলা বেশ নরম হইলে? না পায়ের তলা

ঘোড়ার ক্ষুরের মত খুব শক্ত হইলে ও পায়ের অঙ্গুল গুলি জুড়িয়া এক হইয়া গেলে ?
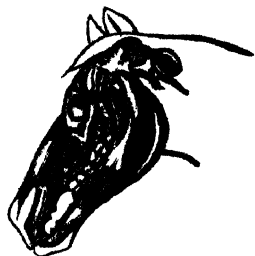
ঘোড়া দ্বারা আমাদের ইচ্ছামত কাজ করাইতে হইলে আমরা প্রথমে কি করিয়া থাকি ? ঘোড়ার মুখে বিট লাগাই। তার পর কেমন করিয়া ঘোড়াকে চালাই ? লাগাম ধরিয়া। লাগাম কোথায় লাগান থাকে ? বিটের সঙ্গে (একটা পেনসিল বিটের মত করিয়া কামড়াইয়া ধর ও জিজ্ঞাসা কর) বিট্ লাগাইলে ঘোড়ার মুখ এম্নি ফাঁক হইয়া থাকে না কেন ? আমাদিগের দাঁতের মাঝখানে ফাঁক নাই—ঘোড়ার দাঁতের মাঝে ফাঁক আছে—সেই ফাঁকের মাঝে বিট্ লাগাইলে মুখ বন্ধ করিবার অসুবিধা হয় না (ঘোড়ার মুখ ফাঁক করিয়া দেখাও বা চিত্র আঁকিয়া দেখাও)।

ঘোড়ার প্রকৃতি।—ঘোড়া সহজে পোষ মানে—বেশ শান্ত আর বেশ অনুগত। আচ্ছা মানুষের গায়ে বেশী জোর না ঘোড়ার গায়ে বেশী জোর ? ঘোড়ার। তবে, কে কাহাকে চালায় ? মানুষই ঘোড়াকে চালায়।

খুব ছোট ছোট ছেলেরাও কেমন ঘোড়ার গাড়ী চালায়, দেখেছ ? ঘোড়ার বেশ স্মরণশক্তি আছে—ঘোড়া বাড়ী চেনে—সোয়ার চেনে। যাহারা রোজ রোজ গাড়ী করিয়া স্কুলে আসে তারা জানে যে স্কুলের কাছে আসিয়া আর ঘোড়াকে থামাইতে হয় না—সে আপনি থামিয়া যায়। ঘোড়াকে যত্ন করিলে ও ভালবাসিলে সে বেশ অনুগত হয়। আর তাহাকে বিরক্ত করিলে সে লাথি মারে। ঘোড়া কেমন করিয়া লাথি মারে ? পেছনের পা ছুড়িয়া। এই জন্য ঘোড়ার পেছনে দাঁড়াইতে নাই। ঘোড়ার পিঠে কেমন করিয়া চড়ে ?—গদি বা জিন লাগাইয়া

(জিন দেখাও, রেকাবি দেখাও, কেমন করিয়া পেটি দিয়া জিন বাঁধে তাহাও দেখাও)। ঘোড়া কি খায়? ঘাস আর ছোলা।

প্রকার।—ঘোড়া নানা প্রকারের আছে। আরবী ঘোড়াগুলি খুব বড় বড়। আমাদের দেশে ভুটানে ও মণিপুরে ঘোড়া পাওয়া যায়। সে গুলি আরবী ঘোড়ার মত বড় বড় নয় বটে—কিন্তু খুব পরিশ্রমী। লোকে চড়িবার জন্য এই সকল ঘোড়া কিনিয়া আনে। একটা ভাল ঘোড়ার দাম ৫০৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত। একটা আরবী ঘোড়ার দাম ৪।৫ শত টাকা। যে সকল ঘোড়া মোট বয়—তাহাদের নাম বল্‌দে ঘোড়া। একটার দাম ১৫৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

(আরব দেশের সেই বন্দী ও তাহার ঘোড়ার গল্প বল—ঘোড়া তাহার প্রভুকে কেমন ভালবাসে এই গল্পে বালকেরা তাহার একটা দৃষ্টান্ত পাইবে। প্রতাপসিংহের ঘোড়া চৈৎকের গল্প বল।)

জেব্রা।—ঘোড়া, গাধা প্রভৃতির মত একপ্রকার জন্তু। অফ্রিকার জঙ্গলে থাকে। শরীরে বড় বড় কাল ডোরা থাকাতে জেব্রা দেখিতে খুব সুন্দর, কিন্তু পোষ মানে না। লেজ ঘোড়ার মত নয়—গাধার মত। ঘাড়ের লোম গুলি ছোট ছোট ও খাড়া খাড়া।

জেব্রা।

উট।

উপকরণ—উটের পুতুল বা ছবি, উটের চুলের তুলি ও ভূমণ্ডলের মানচিত্র।

আকার।—(চিত্র বা পুতুল দেখাইয়া)—প্রায় ৭।৮ ফুট উচ্চ। মানুষ কয় ফুট উচ্চ? মানুষ প্রায় ৬॥ ফুট উচ্চ—৭ ফুট লম্বা মানুষও

উট।

দেখিতে পাওয়া যায়। উটের গায় লম্বা লম্বা চুল আছে—তার কতক মোটা আর কতক বেশ সরু। মোটা চুলে এক রকম খসখসে কাপড় হয়—সরু চুলে ছবি আঁকিবার বেশ ভাল তুলি হয় (তুলি দেখাও)। গায়ের রঙ্ পিঙ্গল—পোড়া মাটীর মত। উটের গলাটা কেমন দেখত? ঘোড়ার গলার চেয়ে লম্বা না খাট? বাব্‌লা গাছের, খেজুর গাছের কচি পাতা খেতে ভালবাসে। লম্বা গলায় কি সুবিধা হয়? উট জাবর কাটে (গোরুর দাঁতের কথা মনে করাইয়া দাও) উটের কিন্তু উপর মাড়ির সম্মুখে ছেদন দন্ত আছে—গরুর নাই। (রোমন্থনকারী জন্তুর পাকস্থলীর বর্ণনা আদায় কর) উট তাহার দ্বিতীয় পাকস্থলীতে জল রাখিতে পারে। এই জন্য অনেক দিন জল না খাইয়া থাকিতে পারে—যখন পিপাসা হয় ঐ পাকস্থলীর জল বমি করিয়া খায়। উটের পিঠে একটা বড় কুঁজ আছে। ঐ কুঁজে কেবল চর্ব্বি। উট যখন খাইতে না পায় তখন ঐ কুঁজের চর্ব্বিই তাহার শরীর পোষণ করে—অনেক দিন না খাইলে কুঁজ ছোট হইয়া যায়। আবার খাইতে পাইলেই কুঁজ ক্রমে বড় হইতে

থাকে। উটের পায়ের নীচে খুব বড় বড় মাংসের গদি আছে। (পায়ের ছবি আঁকিয়া দেখাও)।

উট চড়িয়া লোকে মরুভূমির মধ্যে যাতায়াত করে। মরুভূমির বর্ণনা কর—কেবল বালি—রৌদ্রে অত্যন্ত গরম হয়—আমাদের দেশেও গ্রীষ্ম-কালের দ্বিপ্রহরে নদীর চরে হাঁটিলে পায় ফোস্‌কা পড়ে—শাহারার কথা বল, সেখানে এত গরম যে দেশলাইর কাটি মাটীতে পড়িলেই জ্বলিয়া উঠে—হাঁড়িতে জল ও মাস দিয়া শাহারার বালিতে রাখিয়া দিলে সিদ্ধ হয়)।

উটের পায় নীচে গদি আছে বলিয়া উটের পা বালির ভিতর বসিয়া যায় না কি তেমন গরম বোধ করে না। উটকে 'মরুতরী' বলে—কেন? খুব ধুলা উড়লে আমাদের চোখের অবস্থা কেমন হয়? মরুভূমিতে খুব বালি উড়ে। উটের চোখের পাতা খুব বড় ও ঝুলান আর তাহাতে চুলও আছে। ইহাতে তাহার কি সুবিধা হয়? উটের নাকও বেশ লম্বা আর তাহা বন্ধ করিবার উপায় আছে—কাজেই নাকেও সহজে বালি ঢুকিতে পারে না।

প্রকার।—আবার আর এক রকমের উট আছে—তার পিঠে দুইটা কুঁজ। এইগুলি বাক্‌টিয়ার উট (ম্যাপে দেখাও)। আরবের উটের পিঠে একটা কুঁজ। রাজ-পুতনা, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশে অনেক উট আছে। উট গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করে।

উট।

ব্যবহার।—বণিকেরা উটের পিঠে জিনিষ বোঝাই করিয়া দেশ বিদেশে যাতায়াত করে। উট ৪ মণ বোঝা লইয়া ঘণ্টায় ৫।৬ মাইল চলিতে পারে। মথুরা হইতে ভরতপুর

বাইবার জন্য উটের গাড়ী আছে। গাড়ীগুলি আবার দোতালা। উটের দুধ বেশ মিষ্ট। আরবেরা উটের মাংস খায়। পিঠে বোঝা চাপাইবার সময় উটকে হাটু পাতিয়া বসান হয় (হাতীর বসা কেহ দেখিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা কর)। উট খুব শান্ত নয়—উটে উটে খুব ঝগড়া হয়—অনেক সময় পা না বাঁধিলে পিঠে বোঝা চাপান যায় না—খুব দুষ্টামী করে।

জিরাফ।—জাবর কাটা জন্তুদিগের মধ্যে জিরাফই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাদের গলা খুব লম্বা—শরীর যত লম্বা গলাও প্রায় তত লম্বা। গার উপরে কাল কাল চক্র আছে। সম্মুখের পা বড়, পিছনের পা ছোট। একটা জিরাফ প্রায় ১২।১৪ হাত উচু হয়। উটের মত ইহারাও গাছের কচিপাতা খায়। ইহাদের জিভ্ খুব লম্বা, প্রায় এক হাত। জিরাফের মাথার তিনটা শিং (চিত্র দেখাও)।

হাতী।

উপকরণ—হাতীর পুতুল বা ছবি। দুই টুকরা বেত—একখান এক হাত আর একখান ৪ অঙ্গুল। আর আধখানা ইঁট, তার মধ্যে এমন একটা ছিদ্র, যেন বেত ঢুকিতে পারে।

আকার।—(চিত্র বা পুতুল দেখাইয়া) এই জন্তুর নাম কি জান? তোমাদের মধ্যে কে কে হাতী দেখেছ? কোথায় দেখেছ? এটার আকার কেমন? খুব বড়। (সুবিধা থাকিলে অন্যান্য জন্তুর ছবি দেখাইয়া তাহাদিগের আকারের সহিত তুলনা করা কর্ত্তব্য) ইহার মাথাটা কত বড়? খুব বড় মাথা। কাণ? কাণও খুব বড়। চোখ? চোখ দুইটী মাথার তুলনায় ছোট। নাক কৈ? হাঁ, ঐ শুঁড়টা ইহার নাক। শুঁড়কে ভাল কথায় শুণ্ড বলে। শুঁড়টা খুব লম্বা। শুঁড় দিয়া কি করে? ইহার খাবার তুলিয়া খায়—শুঁড় দিয়া জল শুষিয়া লয় ও শুঁড়
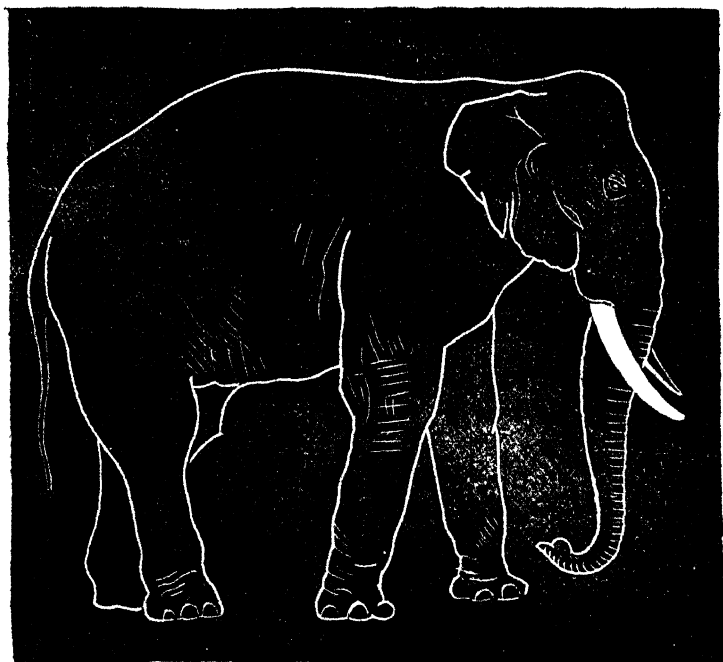
হাতী।

বাঁকাইয়া সেই জল গলার ভিতর দেয়। হাতীর ঘাড় কত বড়? খুব ছোট—নাই বলিলেও হয়। (ঘোড়া, গোরু প্রভৃতির ঘাড় লম্বা বলিয়া মাটীতে মাথা নামাইয়া ঘাস খায়) হাতী মাটীতে মুখ দিয়া ঘাস খাইতে পারে না কেন? ঘাড় ছোট বলিয়া। ঘোড়া, গোরু পারে কেন? ঘাড়ের অভাবে হাতীর অসুবিধা হয় না কেন? শুঁড় আছে বলিয়া। (একখান এক হাত কাঠির মাথায় এক খান ইঁট বাঁধ। বালককে কাঠি ধরিয়া ইঁট তুলিতে বল। কাঠির গোড়ায় ধরিলে ইঁট খুব ভারী বোধ

হইবে—কিন্তু ইটের নিকট কাঠি ধরিলে তত ভার বোধ হইবে না। এখন হাতীর ঘাড় ছোট হইবার কারণ জিজ্ঞাসা কর।)

শুঁড়ের আগায় দেখ কেমন সরু সরু দুইটী আঙ্গুল আছে—ইহার দ্বারা হাতী খুব ছোট জিনিষ (সিকি, দুয়ানী) তুলিতে পারে। হাতীর ভাল নাম হস্তী। হাতীর নূতন রকমের হস্ত আছে বলিয়া ইহার নাম হস্তী হইয়াছে। হস্তী সকলদিকেই শুঁড় ঘুরাইতে পারে—উঁচু গাছের ডাল ভাঙ্গে। হাতীর গায়ের চামড়া খুব পুরু—বন জঙ্গলের ঘষায় চামড়ার ছাল যায় না। হাতীর দুইটী বড় বড় দাঁত আছে—এই দুইটী উপরের মাড়ি থেকে বাহির হয়। ইহাকেই সাধারণতঃ গজদন্ত বলে। ইহা দিয়া কৌটা, চিরুণী, চুড়ি ও নানারূপ খেলনা তৈয়ারী হয় (হস্তীদন্তের কোন জিনিষ দেখাও)। হাতীর মাড়িতে কেবল পেষণ দন্ত আছে—ইহাদের ছেদন দন্ত নাই। ইহারা ঘাস পাতা খাইয়া থাকে। কলাগাছ বটপাতা ও ছোট ছোট ডাল, ধান, খড়, চাউল প্রভৃতি ইহার প্রিয় খাদ্য। হাতীর লেজ শরীরের তুলনায় ছোট। হাতীর পা কেমন? খুব মোটা ও খাট—এক একটা থামের মত। সরু পা হ'লে কি অসুবিধা হইত? এত বড় শরীর তার উপর থাকিতে পারিত না। হাতীর পার তলা শক্ত নয়—ইহার সম্মুখের পায়ে ৫টী করিয়া ও পশ্চাতের পায়ে ৪টী করিয়া নখ আছে। হাতী চলিবার সময় পায়ের তেমন শব্দ হয় না। ঘোড়ার পায়ে কেমন শব্দ হয়?

হাতী প্রায় ৬।৭ হাত (৯।১০ ফুট) উঁচু হয় (দেয়ালে কি থামে ৬।৭ হাত মাপিয়া দেখাও—হাতী কত উঁচু বুঝিতে পারিবে) একটা হাতীর ওজন ১০।১২ শত মণ—একটা ঘোড়া প্রায় ২৫।২৬ মণ—মানুষ ২ মণ। হাতীর বড় দাঁত দুইটী এক মণের বেশী। স্থলচর জন্তুর মধ্যে হাতীই বড়, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে তিমি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।)

প্রকার।—আমাদের দেশের অনেক পাহাড়ে হাতী পাওয়া যায়। ইহারা বনে জঙ্গলে জলের ধারে বাস করে—এক এক দলে ৩০।৪০ টা থাকে। খাসিয়া জয়ন্তিয়া, গারো ও নাগা পাহাড়ে হস্তী আছে (মানচিত্রে দেখাও)। পাহাড়ের মধ্যে কোন জায়গায় মোটা মোটা কাঠ দিয়া খুব বড় খোয়াড় করে—একদিকে দরজা রাখে—খোয়াড়ে হাতীর খাবার দেয়—একটা পোষা হাতী বুনো হাতীর দলকে ভুলাইয়া সেই খোয়াড়ে আনে। খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়—কিছুদিন উপবাসে দুর্ব্বল হইলে তাহাদের বাঁধিয়া আনে। হাতী ধরা বড় বিপদজনক—অনেক লোক মারা যায়। আফ্রিকায়ও অনেক হাতী পাওয়া যায়—তাহাদের কাণ আরও বড় কিন্তু পা এত মোটা নয়—দেখিতেও আমাদের হাতীর মত সুন্দর নয়। আফিকার মাদী হাতী ও মর্দ্দা হাতীর বড় বড় গজদন্ত হয়—আমাদের কেবল মর্দ্দা হাতীরই গজদন্ত থাকে।

ব্যবহার।—হাতীতে চড়িয়া মানুষ নানাস্থানে যাতায়াত করে—হাতী অনেক ভারী জিনিষ বহন করিতে পারে—শুঁড় দিয়া বড় বড় কাঠ তুলিয়া সেতু নির্ম্মাণে সাহায্য করে—যুদ্ধের সময় খুব ভারী ভারী কামান পাহাড়ে টানিয়া তুলে। মাথা দিয়া ঠেলিয়া বড় বড় নৌকা ও জাহাজ জলে ভাসায়। হাতীতে চড়িয়া লোকে বাঘ শীকার করে। হাতীর খুব বুদ্ধি (দুই একটী গল্প বল—সেই দর্জ্জির দুর্দ্দশার কথা বল)। একটা বড় হাতীর দাম হাজার টাকা। আফ্রিকার হাতী সহজে পোষ মানেনা ও কোন কাজেও লাগে না। শিকারীরা তাহাদিগকে মারিয়া দাঁত লইয়া আসে।

(প্রায় ১৷৹ কি ১৸৹ দুই বৎসর গর্ভধারণের পর হস্তিনী ১টী শাবক প্রসব করে) হাতী সাধারণতঃ ৫০।৬০ বৎসর বাঁচে।)

গাধা।

উপকরণ—একটী পোষা গাধা (গাধা বড় অশান্ত—বালকগণ যেন গাধার নিকটে বা পশ্চাতে না দাঁড়ায়) বা গাধার ছবি।
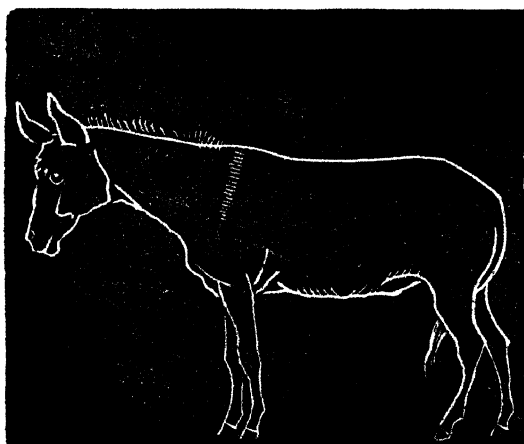
গাধা।

আকার।—ঘোড়ার সহিত গাধার আকারের তুলনা কর। ঘোড়া বড়, গাধা ছোট। মণিপুরি ঘোড়া গাধার চেয়ে অল্প বড়। গাধার রঙ্ ছাইর মত। ঘোড়ার রঙ্ সাদা, কাল, কটা, ছাই। ঘোড়ার মত গাধার দাঁতের ভিতর ফাঁক আছে। সেই ফাঁকের ভিতর বিট লাগাইয়া লাগাম পরায়। তবে প্রায়ই গাধার গলায় দড়ি (গোরুর মত) লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখে। গাধার ক্ষুর ঘোড়ার মত। গাধা বেশ উচ্চ পাহাড় পর্ব্বতে উঠিতে পারে—একবারও পড়িয়া যায় না। ঘোড়ার মত গাধার ঘাড়ে লোম আছে তবে খুব ছোট ছোট। গাধার কাণ খুব বড় বড়। গাধার লেজ ঘোড়ার মত কেবল চুলের গোছা নয়। গাধার লেজ কতকটা গোরুর লেজের মত—লেজের মাথায় চুল আছে।

ব্যবহার।—গাধার পিঠে কাপড়ের বোচকা চাপাইয়া ধোপারা বাড়ী বাড়ী কাপড় দিয়া বেড়ায়। দোকানীরা গাধার পিঠে বোঝা চাপাইয়া হাটে হাটে জিনিষ বিক্রয় করে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে গাধার দুধ খাইতে দেয়। গাধার দুধ অনেকটা মানুষের দুধের মত।

লোকে ঘোড়াকে যেমন যত্ন করে গাধাকে তাহার অর্দ্ধেক যত্নও করে না। যে বাড়ীতে ঘোড়া ও গাধা দুইই আছে, সেখানে, ঘোড়া যে ঘাস খাইতে না পারিয়া ফেলিয়া দেয়, গাধাকে তাহাই খাইতে দেওয়া হয়। অতি সামান্য ও অপরিষ্কৃত ঘাস ভিন্ন গাধাকে বিশেষ ভাল জিনিষ খাইতে দেওয়া হয় না।

গাধার আস্তাবল একখানি অতি জঘন্য ভাঙ্গা ঘর। আর ঘোড়ার আস্তাবল কেমন সুন্দর। একটা গাধা সাধারণতঃ ৪ মণ জিনিষ সহজে টানিতে পারে, কিন্তু চালকেরা তার পিঠে ৬।৭ মণ জিনিষ চাপায়। আবার তাড়াতাড়ি না চলিতে পারিলে খুব মারপিট করে। এই সমস্ত কারণে গাধা অশান্ত হইয়া উঠে (অসৎ ব্যবহার করিলে মানুষও যে দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে তাহা বুঝাইয়া দাও ও সকলের প্রতি যে সস্নেহ ব্যবহার আবশ্যক তাহা বলিয়া দাও।) গাধাকে ভাল খাওয়াইলে, ভাল স্থানে রাখিলে, তার পিঠে বেশী বোঝা না চাপাইলে ও তাহাকে মারপিট না করিলে গাধাও গোরু ঘোড়ার মত শান্ত হইবে।

গাধার ডাক বড়ই কর্কশ। খুব উচ্চরবে ডাকিতে আরম্ভ করিয়া আস্তে আস্তে স্বর নামাইতে থাকে। আমাদের দেশে সিন্ধু প্রদেশে বন্য গাধা আছে।

মোরগ।

উপকরণ—একটী মোরগ বা মুরগী।

পর্য্যবেক্ষণ—গায়ে পালক—পশুর গায়ে লোম। মানুষের গায়েও লোম আছে। ঠোঁঠ খুব শক্ত—পাখীর ঠোঁটে ও আমাদের ঠোঁটে (ওষ্ঠ) তফাৎ কি? আমাদের ঠোঁট নরম, পাখীর ঠোঁট খুব শক্ত। আমাদের দাঁত আছে, পাখীর দাঁত নাই। ঐ শক্ত ঠোঁট দিয়া খাবার জিনিষ (শক্ত হইলে) ঠোক্‌রাইয়া ভাঙ্গে। পা দুখানি লম্বা আর তাহাতে

মোরগ।
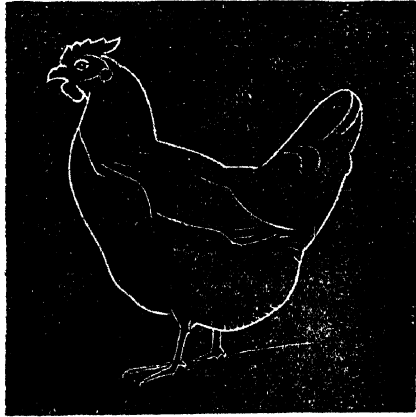
৪টী আঙ্গুল আছে। আঙ্গুলের মাথায় খুব শক্ত নথ। মোরগের মাথায় কেমন সুন্দর লাল ঝুঁটী আছে। (মোরগবাহার ফুলের ঐরূপ নাম কেন হইল জিজ্ঞাসা কর—ফুল দেখাইয়া) মুরগীর মাথায় ঝুঁটী নাই। মোরগের গায়ের রঙ বড়ই সুন্দর—মুরগীর রঙ তেমন ভাল নয়।

কাকের সহিত তুলনায় (পাখী আন্দাজে) মোরগের পাখা খুব ছোট। মোরগের ঠোঁট সরু—হাঁসের ঠোঁট চ্যাপ্‌টা। পাখী দ্বিপদ। পশু চতুষ্পদ।

আদায় কর।—যে সকল পাখী খুব উড়িতে পারে তাদের পোষা সহজ, না যে সকল পাখী খুব কম উড়িতে পারে তাদের পোষাই সহজ? (যাহারা কম উড়িতে পারে) কম উড়িতে পারে এমন আর কতক গুলি পাখীর নাম কর? (বেলে হাঁস, রাজ হাঁস, পেরু) আচ্ছা এ সকল

পাখী অনেক দুরে উড়িয়া যাইতে পারেনা কেন? (শরীর খুব ভার কিন্তু সে আন্দাজে পাখা ছোট)। মোরগ উড়িয়া অনেক দূর যাইতে পারে না, তবে কেমন করিয়া চলে? (আমাদের মত হাঁটিয়া বেড়ায়) হাঁ এইজন্য মোরগ "ভ্রমণকারী" পাখী। হাঁস কি? (সন্তরণকারী) আর যে সকল পাখী খুব উড়িয়া বেড়ায় আর গাছের ডালে বসিয়া থাকে? (দণ্ডবিহারী) মোরগ নখ দিয়া মাটী ও গোবরের ঢিব্ আচড়ায় কেন জান? (খাবার জিনিষ খুঁজিয়া বাহির করে)

মোরগের পার নখ।

মাটীতে চাউল ছড়াইয়া দাও—মোরগ কেমন করিয়া ঠোঁট দিয়া খুঁটিয়া খায় তাহাই দেখাও। সরু ঠোঁট কি কাজে লাগে? (খুব ছোট ছোট দানা খুঁটিয়া নিতে পারে)

প্রদান।—এক বৎসরে একটা মুরগী প্রায় ২।৩ শত ডিম পাড়ে। মুরগী যখন ডিমে তা দিতে বসে, তখন প্রায় এক অবস্থায় ২০।২২ দিন বসিয়া থাকে—যে পর্য্যন্ত ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির না হয় সে পর্য্যন্ত উঠে না। তখন মুরগী আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায়। পরে যখন বাচ্ছা চলিতে আরম্ভ করে তখন তাহাদিগকে নিজের পাখা দিয়া ঢাকিয়া নিয়ে বেড়ায়—পাছে বাজ বা চিল ছোঁ দিয়া লইয়া যায়। মা মাটী খুঁড়িয়া দানা, বীজ বাহির করিয়া দিয়া কোঁক্ কোঁক্ করিয়া বাচ্চাগুলিকে ডাকে—তাহারা আসিয়া খুঁটিয়া খায়। (এই সকল বিষয় এরূপ ভাবে বিবৃত করিবে যেন বালকেরা মাতৃস্নেহ উপলব্ধি করিতে পারে)।

হাঁস।

উপকরণ।—একটা বেলে হাঁস ও এক গামলা জল।

সূচনা।—তোমাদের মধ্যে কে কে ইহার পূর্ব্বে হাঁস দেখেছিলে? কোথায় দেখেছিলে? কি করিতে দেখেছিলে?
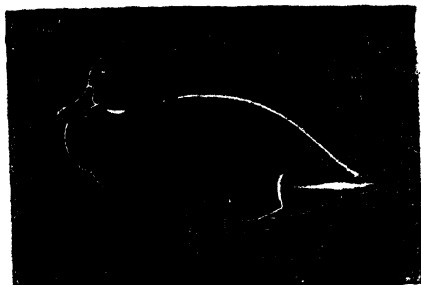
হাঁস।

হাঁসের পা।—মোরগের পা, শরীরের একটু সম্মুখের দিকে—হাঁসের পা একটু পশ্চাতের দিকে। মোরগের পা লম্বা—হাঁসের পা খুব খাট। হাঁসের পায় কয়টা নখ? ৩টা বড় ও একটা ছোট। নখগুলি কি মোরগের মত আল্‌গা? না, তিনটী লিপ্ত একটী আল্‌গা।

হাঁসের পা।

হাঁস কেমন করে জলে সাঁতরায়? লিপ্ত পা দিয়া জল ঠেলিয়া দেয়—দাঁড়ের কাজ করে। তোমরা কেমন করে সাঁতার দেও? সাঁতার দিবার সময় হাতের আঙ্গুল কি ফাঁক করিয়া রাখ? হাঁস ভাল হাঁটিতে পারে না। পা ছোট ও শরীর ভার। হাঁস কেমন করিয়া হেলিয়া দুলিয়া হাঁটে তাহা কোন বালককে নকল করিতে বল।

দেহ।—হাঁসের পালক দেখ—বেশ ঘন ও নরম। পালক কেমন চক্‌চকে। নানা রঙের হাঁস দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সাদাই বেশী। হাঁসকে ঠোঁট দিয়া গা খুঁটিতে দেখেছ? হাঁসের পালকে খুব ছোট ছোট থলে আছে—তার মধ্যে তেলের মত একটা জিনিষ থাকে। হাঁস ঠোঁট দিয়া সেই থলে ভাঙ্গিয়া তেল বাহির করে। সেই তেল গায় মাখে বলিয়া, হাঁসের গা জলে ভিজে না। মোরগ কি কাকের গায় জল লাগিলে কেমন দেখায়? আমরা যখন বিনা তেলে স্নান করি তখন গায় জল বসিয়া সর্দ্দি হয়।
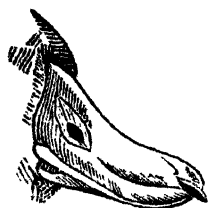
ঠোঁট।—মোরগের ঠোঁট ও হাঁসের ঠোঁটে তুলনা কর। মোরগের ঠোঁটের আগা খুব সরু—হাঁসের চেপ্‌টা। মোরগ ছোট ছোট দানা খুঁটিয়া খায়—হাঁস জল কাদার মাঝ থেকে খাবার খুজিয়া লয়। সেইজন্য হাঁসের ঠোঁট চেপ্‌টা। আবার হাঁসের ঠোঁটের দুই পাশে চিরুণীর মত শক্ত পর্দ্দা আছে। ইহার ভিতর দিয়া জল ও কাদা ছাঁকিয়া লয়। হাঁস—গুগলী, কেঁচো, পোকা, চা'ল ও ছোট ছোট নরম গাছ পাতা খায়।

হাঁসের ঠোঁট।

ডিম।—হাঁসের ও মুরগীর ডিম ভাল খাদ্য। মুরগী যেমন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ২০।২২ দিন ডিমে তা দেয়, হাঁসও তাহাই করে। তবে বাচ্ছা বাহির হইলে আর হাঁস তাদের তেমন যত্ন করে না। সেইজন্য হাঁসের বাচ্ছা মুরগীর বাচ্ছার পালে মিশাইয়া দেওয়া হয়। মুরগী সকল-গুলি বাচ্ছাকেই সমান সাবধানে রাখে।

প্রকার।—ছোট ছোট হাঁসকে বেলে হাঁস বলে। বড় বড় হাঁসকে রাজহাঁস বলে। হাঁসের পাখা ছোট বলিয়া বেলে হাঁস ও রাজহাঁস ভাল উড়িতে পারে না। শীতকালে বড় বড় বিলে এক রকম হাঁস ঝাঁকে

ঝাঁকে আসিয়া পড়ে। এদের নাম বিলে হাঁস। এদের পাখা বড়—এরা খুব উড়িতে পারে।

পায়রা।

উপকরণ।—একটী পোষা পায়রা ও এক মুঠা চাউল।

আকার দেখাও। পায়রা—চড়াই, বুলবুল অপেক্ষা বড় কিন্তু হাঁস, মোরগ অপেক্ষা ছোট। এই দেখ পায়রার পাখা দুখানি শরীর আন্দাজে কেমন বড় বড়।
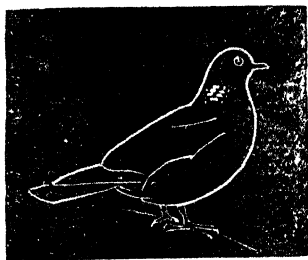
পায়রা।

পায়রা অনেক রঙের ও অনেক আকারের আছে। দুচার রকম পায়রার নাম করত? গৃহবাজ, লোটন, গোলা, শেরাজ, লক্কা, মুক্ষী (নানারূপ পায়রার ছবি দেখাও বা বর্ণনা কর)। পায়রার ঠোঁট কেমন সরু। কেমন করিয়া চা'ল তুলিয়া খায় দেখ। মোরগের পা দুখানি মোটা মোটা ও খস্‌খসে, পায়রার পা কেমন সরু ও চক্‌চকে। পায়রা কেমন করে ডাকে? পায়রার মত আর একটা পাখীর নাম করত? (ঘুঘু)।

জিজ্ঞাসা কর।—বড় বড় পাখা আর ছোট শরীর হলে কি সুবিধা হয়? খুব উড়িবার সুবিধা হয়। পায়রার কোন্ জিনিষ নৌকার দাঁড়ের মত? পাখা। আর নৌকার হা'লের মত? লেজ। মোরগের পা গোদা গোদা কেন? মোরগ মাটিতে হাঁটিয়া বেড়ায়। পায়ের নখগুলি কেমন হইলে গাছের ডালে বসার সুবিধা হয়? নখগুলি এমন হওয়া আবশ্যক যে, ডালে বসিলে যেন নখগুলি ডাল জড়াইয়া ধরিতে পারে। পায়রার নখ এমন যে ডালে বসিলে নখগুলি বেশ ডাল জড়াইয়া ধরে।

আবার পায়রা মাটিতে হাঁটিতেও পারে। বুনো পায়রা কোথায় বাসা করে? ঘরের কোণে, প'ড়ো দালানে, খালি ঘরে। পোষা পায়রা কোথায় থাকে? ছোট ছোট কাঠের খোপে। এই কাঠের খোপ উঁচুতে রাখে কেন? বেজী কি বিড়ালে পায়রা মারিয়া ফেলিতে পারে না।

বলিয়া দাও।—পায়রা একবারে ছুইটী ডিমের বেশী তা দেয় না। পায়রার ছুই ডিমে—একটা পারা ও একটা পারী হয়। পায়রার বাচ্চা দেখিতে বিশ্রী। (কাহাকেও বর্ণনা করিতে বল)। প্রায় ছুই তিন দিন বাচ্চা কিছুই খায় না—মার ডানার নীচে লুকাইয়া থাকে। তিন দিন পরে মাতা বাচ্চার মুখে দইর মত এক রকম জিনিষ দেয়। এই দই মার শরীরেই তৈয়ারী হয়। তারপর ৮।৯ দিন পরে মা নিজের মুখের মধ্যে দানা ভিজাইয়া তাহাই বাচ্চাকে খাওয়ায়। শালিকের বাচ্চা দেখেছ? মা ফড়িং ধরিয়া আনিয়া বাচ্চার মুখে দেয়। শালিকের মাকে পায়রার মার মত এত কষ্ট কর্‌তে হয় না।

পায়রার ভাল নাম কপোত। কপোত নিজের বাড়ী খুব চেনে। অনেক দূরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিলে—কপোত ক্রমে উড়িয়া খুব উঁচুতে উঠিতে থাকে। তারপর নিজের গ্রামের বা বাড়ীর নিকটের কোন বড় গাছ কি পাহাড় দেখিয়া চিনিতে পারে ও সেইদিকে উড়িয়া আসে। কপোতকে তেমন করিয়া শিখাইলে ডাকহরকরার কাজ করান যায়। মনে কর তোমার কোন দূরস্থ বন্ধুর বাড়ীতে কপোত আছে। একটা কপোত তোমার বাড়ীতে লইয়া আইস। সেই কপোতের লেজের একটা পালকের সঙ্গে খুব পাতলা কাগজে একখানি ছোট পত্র সরু সূতার দ্বারা বাঁধিয়া দাও। এখন কপোত ছাড়িয়া দাও। সে উড়িয়া তাহার নিজ বাড়ী যাইবে। তোমার বন্ধু ঐ পত্র খুলিয়া পড়িবে। কপোতকে বহুদূরে লইয়া গেলেও সে বাড়ী চিনিয়া আসিতে পারে—ইহাই দেখিয়া মানুষ কপোতের দ্বারা হরকড়ার কাজ করাইয়া লয়।

ইঁদুর।

উপকরণ :—একটা তাজা বা মরা ইন্দুর। ইঁদুর মারা কল—তিন রকম—জাঁতিকল, খাঁচাকল ও বাক্সকল।

একটা মরা ইঁদুর, কি কলে আবদ্ধ একটা তাজা ইঁদুর দেখাও। ইঁদুরের গায়ের রঙ্ কেমন?—মেটে রঙ্। মাথার আকার কেমন? ছুঁচাল, নাকের দিক খুব সরু। পায় কয়টা করিয়া নখ?—সম্মুখের পায় ৫টী ও পশ্চাতের পায় ৪টী। আবার দেখ নেঙ্টে ইঁদুরের সম্মুখের পায় ৪টী ও পশ্চাতের পায় ৫টি। বিড়ালের কোন্ পায় কয়টা নখ? নেঙ্টে ইঁদুর গুলি

ইঁদুর।

ছোট। ইঁদুরের লেজে লোম নাই—নেঙ্টে ইঁদুরের লেজে লোম আছে। দাঁত দেখ (কিছু খাইতে দিলেই দেখা যাইবে) উপর চোয়ালে সম্মুখে দুইটী ও নীচ চোয়ালে সম্মুখে দুইটী, বাটালের মত ৪টী দাঁত—খুব ধার। এই দাঁতের পাশে আর দাঁত নাই। মাঢ়ীর কোণে আরও কয়টী দাঁত আছে। তাহাই দিয়া চিবাইয়া খায়। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় ইঁদুরের বুঝি ৪টী মাত্রই দাঁত। হাত দিয়া ইঁদুর ধরিতে চেষ্টা করিও না। ইঁদুরের খুব রাগ—রাগিলে তোমার হাত কাটিয়া দিবে। খরগোষ ও কাঠবিড়ালীর দাঁতও এইরূপ। সম্মুখের দুইখানি পা দিয়া খাবার জিনিষ ধরিতে পারে। পেছনের দুই পার উপর ভর করিয়া বসিতে পারে। ইঁদুরের কাণ দেখ—কাণগুলি হাঁ করা—ইঁদুর খুব ছোট শব্দও শুনিতে পারে। ইঁদুরের চোখ দুইটী গোল গোল, দুইটী বড়ির মত। খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—বিড়ালের মত অল্প আঁধারেও দেখিতে পারে। বিড়ালের

মত গোঁফ আছে। এই গোঁফ দিয়া অন্ধকারে রাস্তা ঠিক করে। ইঁদুর লেজ দিয়াও জিনিষ চিনিতে পারে। ইঁদুর লেজ জড়াইয়া আকগাছ ও ধানগাছে উঠে। নেঙটে ইঁদুর লেজ জড়াইতে পারে না।

ইঁদুর কোথায় থাকে? গর্ত্তের ভিতর। বিড়াল, কুকুর কাক, চিল, পেঁচা প্রভৃতি ইঁদুরের প্রধান শত্রু। ইঁদুরের গায়ের রঙ মেটে মেটে বলিয়া শত্রুরা মাটীতে বা গর্ত্তের ভিতর ইঁদুরকে সহজে দেখিতে পায় না। তারপর ইন্দুর খুব দৌড়াইতে পারে, শীঘ্র শীঘ্র গাছে উঠিতে পারে, অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পারে, অতি সামান্য শব্দ শুনিতে পারে। অনেক দূরের গন্ধ বুঝিতে পারে। এই সকল শক্তি আছে বলিয়া সে বাঁচিয়া যায়। মাথাটা ছুঁচাল বলিয়া চট্ করিয়া গর্ত্তে ঢুকিতে পারে।

বড় বড় ইঁদুর কাঠ, এমন কি সিসা পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলে। নেঙটে ইঁদুর বাক্সে ঢুকিয়া কাপড়, কাগজ কাটিয়া বড়ই অনিষ্ট করে। ইঁদুর চাল, ডাল, মাছ, মাংস, ফল, চিনি, আলু প্রভৃতি সকল জিনিষই খায়। অনেক সময় মাঠের ধান কাটিয়া বড়ই ক্ষতি করে।

ছুঁচা ও ইঁদুরের মত ছোট। তোমরা শুনিয়াছ যে ছুঁচার চোখ নাই, কাণ নাই। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। ছুঁচার খুব ছোট ছোট দুইটা চোখ ও দুইটা ছোট ছোট কাণ আছে। এগুলি সর্ব্বদা লোমে ঢাকা থাকে বলিয়া আমরা দেখিতে পাই না।

ইঁদুর যেমন অনিষ্ট করে আবার ইষ্টও করে। আমরা যে ভাত ডাল ফেলিয়া দিয়া থাকি তাহার কতক অংশ দিনের বেলা কাক, কুকুরে খাইয়া পরিষ্কার করে, আর যাহা কিছু থাকে রাত্রিতে শেয়াল ও ইঁদুরে খায়। এইরূপে পরিষ্কৃত না হইলে পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইত।

তিন রকম ইঁদুর মারা কল দেখাও। খাঁচাকল ও মাছ মারিবার চারো এক রকম। ইঁদুর বেশ সহজে খাঁচায় ঢুকিতে পারে কিন্তু কেন সহজে বাহির হইতে পারে না—বালকগণকে বুঝাইয়া দাও। বাক্সকলের

ভিতর যেখানে খাবার গাঁথিয়া দেয়, সেই স্থানের সঙ্গে বাক্‌সের সন্মুখের কবাটের কেমন যোগ আছে তাহা বুঝাইয়া দাও। খাবার ধরিয়া টানিলেই কবাট পড়িয়া বাক্‌সের মুখ বন্ধ করিয়া ফেলে। ইঁদুর আর বাহির হইতে পারে না। জাঁতিকল পাতিবার সময় অসাবধান হইলে নিজের হাত কাটিয়া যাইতে পারে। জাঁতিকলে কিরূপ করিয়া খাবার দিতে হয়, কিরূপ করিয়া জাঁতির দুই পাটি ফাঁক করিয়া, জাঁতির নীচে আঙ্গুল দিয়া, খিল আঁটিয়া দিতে হয় তাহা দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দাও। বালকগণকে সাবধান করিয়া দাও যে, কখনই যেন তাহারা জাঁতিকলের উপরে হাত না দেয়। জাঁতিকলে কেমন করিয়া ইঁদুর আটকাইয়া যায়, তাহা—একটা পেনসিল বা কাটি দিয়া খাবার রাখিবার আসনের উপর ঠোকা দিয়া দেখাও। জাঁতির দাঁতগুলি কিরূপে পেনসিল কামড়াইয়া ধরে তাহা দেখিলেই বালকেরা এই কলের ব্যবহার বিষয়ে সাবধান হইবে।

মাকড়সা।

উপকরণ।—ব্লাকবোর্ড, মাকড়সা, ও তাহার জালের চিত্র। সম্ভবপর হইলে একটী জীবন্ত মাকড়সা।

শিক্ষক—মহম্মদ ও তাঁহার সঙ্গীগণ যে কেমন করিয়া শত্রুদের হাত থেকে পলাইয়া গেলেন, তাহা সেদিন তোমাদিগকে বলিয়াছি। তাঁহারা কোথায় গিয়া লুকাইয়া ছিলেন ?

ছাত্র—তাঁহারা একটা গহ্বরে লুকাইয়া ছিলেন।

শি—শত্রুগণ সেই গহ্বরের ভিতর অনুসন্ধান করিল না কেন ?

ছা—শত্রুরা দেখিল যে গহ্বরের মুখেই একটা মাকড়সা জাল পাতিয়া আছে, আর নিকটেই, একটা ঘুঘু তার বাসায় বসিয়া আছে; এই সকল দেখিয়া তাহারা মনে করিল এইখানে নিশ্চয়ই লোক নাই।

শি—আচ্ছা, আজ তোমাদিগকে এই মাকড়সার কথাই বলি। এই মাকড়সাটা দেখ—বোর্ডে মাকড়সার ছবিও দেখ। মাকড়সার কি কি দেখিতেছ বল?

মাকড়সা।

ছা—এটা একটা ছোট প্রাণী। ইহার শরীরটার দুইভাগ, মাথা আর ধড়। এক এক দিকে ৪ খান করিয়া ৮ খান পা আছে। দুইটা হুল আছে, আর বড় বড় দুইটা চক্ষু আছে।

শি—হাঁ, সবই ঠিক হইয়াছে কেবল হুল ও চোখের কথা ছাড়া। যে দুটাকে হুল মনে করিয়াছ, সেগুলি খুব শক্ত ছোট ছোট নখের মত, আর যেটাকে একটা চোখ মনে করিয়াছ, তাহা একটা চোখ নয়, ৬টা কি ৮টা। যদি এক দিকেই ৬টা চোখ থাকে, তবে দুই দিকে কটা?

ছা—দুইদিকে তবে ১২টা চোখ, কি আশ্চর্য্য!

শি—আবার কোন কোন মাকড়সার ১৬টা চোখও থাকে। এতগুলি পা ও চোখ দিয়া মাকড়সা কি করে?—মাকড়সা কি খায় জান?

ছা—মাকড়সা কীট পতঙ্গ খায়।

শি—হাঁ। কেমন করে কীট পতঙ্গ ধরে?

ছা—জাল দিয়া ধরে।

শি—মাকড়সা কেমন করে জাল বোনে জান? জান না? তবে শোন। এটা খুব একটা চমৎকার কথা। আচ্ছা গোপাল, মাকড়সার ধড়টা আমায় দেখিয়ে দাও ত?

এই ধড়ের নীচে চারটা ছোট ছোট নল আছে, আর প্রত্যেক নলের নীচে প্রায় ১০০ ছোট ছোট ছিদ্র আছে।

মাকড়সা, মুখের লালার মত এক রকম রসের দ্বারা সুতা তৈয়ার করিয়া এই সকল ছিদ্র দিয়া বাহির করে। সেই সুতা, বাতাস লাগিবা-মাত্র, শুকাইয়া শক্ত হয়। মাকড়সার পিছনের পা দুখানির অগ্রভাগ চিরুণীর মত। এই দুই পা দিয়া সেই সব সুতাগুলি একত্র করিয়া ও পাকাইয়া মোটা সুতা তৈয়ারী করে। সেই সুতা দিয়া জাল বোনে। তোমরাও ত মাকড়সার জাল দেখেছ? সুতাগুলি বেশ সরু না মোটা?

ছা—খুব সরু, ভাল রেশমের মত।

সি—সরু বটে কিন্তু সেই একগাছির মধ্যে আবার কত গাছি আরও সরু সুতা আছে। আচ্ছা সেই একটা নলের ভিতর কতগুলি ছিদ্র আছে?

ছা—এক হাজার ছিদ্র।

শি—কয়টা নল আছে বল ত?

ছা—৪টা নল।

শি—আচ্ছা যদি প্রত্যেক ছিদ্র দিয়াই এক এক গাছ সুতা বাহির হয়, তবে সর্ব্বসমেত কতগাছি সুতা হয়?

ছা—চার হাজার সুতা। কি ভয়ানক!

শি—তাই এখন দেখ জালের এক এক গাছি সুতা, ৪০০০ গাছি সরু সুতা পাকাইয়া প্রস্তুত করিয়াছে। কেমন কারিকর দেখ। জেলের জালের চেয়েও কত বেশী কারিকরী। বোর্ডে চিত্র আছে; তাহা দেখিয়া মাকড়সার জালটার একটা বর্ণনা কর।

ছা—গাড়ীর চাকার শলাকার মত, মাঝখান থেকে কতকগুলি সুতা জালের বাহিরের দিকে গিয়াছে, সেগুলি আবার অন্য সুতার সঙ্গে নানা স্থানে বাঁধা, এই শলাকাগুলির উপর দিয়াই ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সুতা বাঁধিয়া গিয়াছে।

শি—যখন ফড়িং উড়িয়া যাইতে যাইতে এই জালে বাধিয়া পড়ে, তখন মাকড়সা কি করে?

ছা—মাকড়সা দৌড়িয়া গিয়া পোকাটাকে ধরে।

শি।—এখন বুঝিতে পারিতেছ যে মাকড়সার ৬ খানি পা, আর ১২টী চক্ষুর দরকার কি? চারিদিকে চোখ রাখিতে হয়, পোকা ফড়িং পড়িলেই দৌড়িয়া গিয়া ধরিতে হয়, তা না হইলে তাহারা পলাইয়া যাইবে বা জাল ছিঁড়িয়া উড়িয়া যাইবে। (মিসেস্ ব্র্যাণ্ডারস্ কৃত ইংরাজী পদার্থ পরিচয় হইতে গৃহীত।)

কৈমাছ।

উপকরণ।—একটী জীবন্ত কৈমাছ, জল, বাটি, বালতী, কাচের বড় বোতল ব গেলাস, ছুরি।
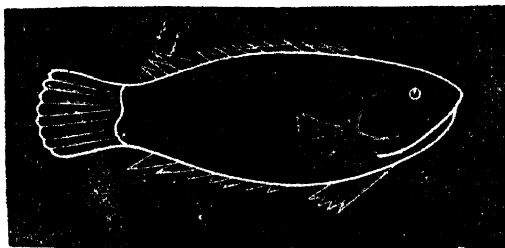
কৈমাছ।

কৈমাছের রঙ কেমন? প্রায়ই কাল, কেবল পেটের নীচে একটু হলদে মত। কৈমাছ কত বড় দেখেছ? খুব বড় হইলেও আধ হাতের বেশী বড় দেখা যায় না। কৈমাছ কোথায় পাওয়া যায়? পুকুর, ডোবা, নালা, খাল, বিল প্রভৃতি আবদ্ধ জলে। নদীর স্রোতজলে কৈমাছ থাকে না।

মাছের নানা অঙ্গের পরিচয় করাও। মাছের মুখ দেখাও।—মাছের মাথাকে মুড়ো বলে। হাঁ করাইয়া দেখাও। দুই ঠোঁটের উপর নীচে কেমন করাতের মত ধার। মাছের চোয়াল দেখাও। ইহাকে চোবড়া বলে। চোবড়া তুলিয়া দেখাও—ইহার নীচে যে লাল ফুলের মত জিনিষ দেখিতেছ ইহাকে ফুলকা বলে। তারপর এই চোয়ালের নিকট যে দুই-খানি ছোট ছোট পাখ দেখিতেছ ইহাই মাছের ডানা। মাছের পীঠের উপর ও পেটের নীচে কাঁটা আছে। আর এই কাঁটার পরেই একটা ফ'ড়ে আছে। মাছের মুড়োর নীচে, পেটের দিকেও দুইটী ফ'ড়ে আছে। মাছের লেজকে ল্যাজা বলে। গায়ে আঁইশগুলি কেমন সাজান দেখ। ঘরে যেমন করিয়া টালি সাজায়। আঁইশ একদিকে আঁটা। যদি উল্টা দিকে আঁটা হইত তবে মাছ চলিতে গেলে আঁইশে জল বাধিয়া যাইত। মাছের মাথা সরু। নৌকার মাথাও সরু। কেন? জলের ভিতর সহজে চলিবার জন্য।

মাছটী বাটির জলে ছাড়িয়া দাও। মাছ কেমন করিয়া সাঁতরায় দেখ। সাঁতরাইবার সময় মাছ কোন্ কোন্ অঙ্গ নাড়িতেছে দেখ। দুই পাশের দুই ডানা ঠিক একসঙ্গে চলিতেছে। হাঁ, যখন নৌকা চালায় তখন তোমরা দেখিয়াছ মাঝিরা ঠিক একসঙ্গে দাঁড় ফেলে। এই দুইটী ডানাই মাছের দুই প্রধান দাঁড়। ইহা নাড়িয়াই সে জলে দ্রুত চলিতে পারে। মাছটী আর কোন্ কোন্ অঙ্গ নাড়িতেছে দেখত? দেখ লেজটী ডাহিনে বামে কেমন নাড়িতেছে। তোমরা হয়ত দেখিয়াছ যে মাঝিরা কেবল একটা হা'ল এদিক ওদিক চালাইয়া ছোট ছোট নৌকা বাহিয়া নেয়। মাছটী যে কেবল ডানা নাড়িয়াই চলে তাহা নয়—প্রধানতঃ লেজের জোরেই চলে। তারপর মাছটী এই কাচের গেলাসের ভিতর ছাড়িয়া দাও। গেলাসটী উঁচু করিয়া ধরিয়া দেখ। মাছটী উপ-রের দিকে উঠিবার সময় কোন্ অঙ্গ নাড়ে। মুড়োর নীচেঁর যে দুইটী ফ'ড়ে

থাকে, তাহাই চালাইয়া উপরে উঠে। নৌকা জলে ডুবিয়া গেলে, তাহাকে দাঁড়ের সাহায্যে উপরে তোলা যায় না। দাঁড়ের সাহায্যে কেবল জলের উপর সোজাভাবে চালান যায়। মাছকে জলে সোজা চলিতে হয় ও উপরে উঠিতে হয়—তাই দুই পাশে দুইটী দাঁড় (ডানা) ও উপরে উঠিবার জন্য পেটের নীচে আরও দুইটী দাঁড় (ফ'ড়ে)। আবার দেখ মাছের পিঠের উপর কাঁটার কাছেই আরও দুইটী ফ'ড়ে আছে। যখন লেজ নাড়িয়া খুব দ্রুত চলিতে হয়, তখন পিঠের ও পেটের নীচের এই দুই ফ'ড়ে দিয়া হা'লের কাজ চালায়—অর্থাৎ যেদিকে চলিতে হইবে সেই দিক ঠিক রাখে। তারপর দেখ ভাসিবার সময় পিঠের কাঁটাগুলি কেমন পড়িয়া আছে। কিন্তু মাছটীর গায় হাত দেও কি মাছটী জল হইতে উঠাইয়া আন, এই দেখ পিঠের ও পেটের কাঁটা কেমন খাড়া হইল। কেন? এই কাঁটা দিয়া শত্রুকে ভয় দেখায়। কৈমাছ কেমন কাঁটা বিঁধাইয়া দেয় তাহা তোমরা জান।

এখন দেখ কৈমাছটী যেন হাঁ করিয়া জল খাইতেছে। কিন্তু তাহা নয়। জলের সঙ্গে যে বাতাস মিশান আছে—ফুল্কা দিয়া সেই বাতাস লইতেছে। উহাদের এইরূপ শ্বাস চলে।

কৈমাছের চোয়ালের ধারে করাতের মত ধার। এই ধারাল চোয়াল মাটীতে বাধাইয়া দিয়া কৈমাছ মাটীতেও বেশ উঠিতে পারে ও চলিতে পারে। মাটীতে ছাড়িয়া দিয়া দেখ—কেমন কাত হইয়া মাটীর উপর চলিতেছে। কৈমাছ খুব লাফাইতে পারে। বালতির ভিতর কৈমাছটী ছাড়িয়া দাও। তোমরা লাফ দিবার সময় কি করিয়া থাক? খানিক দূর পিছনে সরিয়া, দৌড়াইয়া গিয়া লাফ দেও। দেখ কৈমাছ কি করে। নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে—তারপর ঐ দেখ লেজের উপর ভর দিয়া কেমন চট্ করিয়া লাফ দিয়া উঠিয়া গেল। কৈমাছ নাম হ'ল কেন? এক বুড়ি বাজার থেকে মাছ কিনে এনে রেখেছিল, তারপর

বেটার বৌকে বলিল—বৌ মাছ কাট। বৌ দেখে মাছ নাই—মাছ কৈ ? বুড়ি বলে মাছ কৈ ? শেষে তাদের ছেলে এসে দেখে মাছ তালগাছে উঠিয়াছে। মাছ অবশ্য গাছে উঠিতে পারে না, তবে ছোট গাছের ডালে চোয়ালের করাত বাধাইয়া ঝুলিয়া থাকিতে পারে। কৈ কৈ করিতে করিতে সে মাছের নামও কৈ হইল।

এখন এক কাজ কর—প্রথমে মাছের ডানা দুইটি কাটিয়া জলে ছাড়িয়া দেও। দেখ মাছ চলিতেছে বটে কিন্তু পূর্ব্বের মত আর জোরে চলিতে পারে না। তারপর নীচের ফ'ড়ে দুইটী কাটিয়া দাও। দেখ এবারে মাছ সোজাসুজি উপরে আসিতে পারিতেছে না, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে। তারপর ল্যাজা কাটিয়া দাও—দেখ এবারে মাছটি ভাসিতেছে আর শরীর নাড়িয়া অতি আস্তে আস্তে চলিতেছে।

মাছ জলে ভাসে কেন ? তুমি কি জলে ভাসিতে পার ? মাছের পেট কাট—এই দেখ মাছের পেটের ভিতর হাওয়া পোরা ফোঁপড়া আছে। যদি কলসী থাকে, তবে হাত পা না নাড়িয়াও আমরা ভাসিতে পারি—কলসীতে হাওয়া থাকে তাহাতেই কলসী ভাসে, আর কলসী ধরিয়া আমরাও ভাসিতে পারি। মাছের পেটের ভিতর এই ফোঁপড়া থাকে বলিয়া মাছ বেশ ভাসিতে পারে। মাছের যখন জলের নীচে যাইবার ইচ্ছা হয়, তখন পেটের চাপে ফোঁপড়া ছোট করে।

কৈমাছ সহজে মরে না। ডোবা, নালার উপর জল শুকাইয়া গেলেও তাহার নীচে সামান্য কাদা থাকে—তাহার ভিতরই কৈমাছ মরার মত হইয়া সমস্ত শীতকাল বাস করে। বর্ষার জল পাইলে আবার তাজা হইয়া উঠে।

চাউল।

উপকরণ।—ধান, চাউল, ধানের গাছ।

প্রত্যেক বালকের হাতে অল্প অল্প করিয়া চা'ল দাও। এগুলি কি? চা'ল। ইহাদের রঙ কেমন? রঙ সাদা। আকার কেমন? আকার লম্বা—পুলি চুষির মত। কতকগুলি চাউল জলে ধুইয়া দেখাও—জলের কি রঙ্ হইল? সাদা রঙ্। হাঁ, চা'ল ধোয়া জল সাদা।

চা'ল কেমন করে তৈয়ারী করে জান? ধান রৌদ্রে শুকাইয়া, ঢেঁকিতে ভানিলে চা'ল হয়। হাঁ, আবার আর এক রকমে চা'ল তৈয়ারী করে। প্রথমে ধান জলে সিদ্ধ করিয়া লয়—তারপর সেই ধান রৌদ্রে শুকাইয়া ঢেঁকিতে ভানে। কেবল রৌদ্রে শুকাইয়া যে চা'ল করে তাহাকে আতপ চা'ল বলে। (বালকেরা বুঝিতে পারিলে, আতপ কথার অর্থ যে রৌদ্র তাহা শিখাইতে পার) আর ধান সিদ্ধ করিয়া যে চা'ল করে তাহাকে সিদ্ধ চাউল বলে। (দুই প্রকারের চাউল খাইতে দাও) দুইটীর স্বাদ এক রকম না পৃথক্? (বোর্ডে আতপ চা'ল ও সিদ্ধ চা'ল নাম দুইটী লেখ)।

এই ধান লও। ধানের রঙ্ কেমন? হল্‌দে। ধানের ভিতর থেকে চা'ল বাহির কর। চা'ল ধানের খোসার সমস্ত স্থান জুড়িয়া আছে। তোমরা যেমন খুঁটিয়া খুঁটিয়া চা'ল বাহির করিলে, সব চা'ল কি এমনি করে বাহির করে? না, ঢেঁকিতে ধান ভানিয়া চা'ল বাহির করে। একটা ঢেঁকি আঁক। ঢেকির কাত্‌লা, গড়, চূরণ দেখাইয়া দাও। কোথায় পা রাখে ও কোথায় ধান দেয় তাহাও দেখাও। বলিয়া দাও যে ঢেঁকিতে পাড় দিতে হইলেও হিসাব মত পাড় দিতে হয়। বেশী জোরে পাড় দিলে ধান গুড়া হইয়া যায় আর অল্প জোরে পাড় দিলে ধানের খোঁসা ছাঁড়ে না। ধানের খোঁসাকে কি বলে? তুষ। (ইচ্ছা

করিলে শিক্ষক উদ্‌খলের বর্ণনাও করিতে পারেন। অনেক জেলায় ঢেঁকির পরিবর্ত্তে উদ্‌খলে ব্যবহার আছে।) ধান ভানার কল আছে। তাহাতে অল্প সময়ে অনেক ধান ভানা হইয়া থাকে।

ধানগাছ দেখাও। (শিক্ষক এই পাঠ জৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে দিবেন। চৈত্র মাসে স্কুলের বাগানে ধান লাগাইতে আরম্ভ করিবেন ও ৬।৭ দিন পর পর নূতন করিয়া ধান বুনিবেন। বালকদিগকে তাহা হইলে ধান গাছের সকল রকম অবস্থাই এক সঙ্গে দেখাইতে পারিবেন)। ধানের পাতা কেমন?—ঘাসের পাতার মত। হাঁ, এই দেখ পাতার বোঁটা নাই —পাতাটী কেমন গুঁড়ির গায় জড়াইয়া আছে। তারপর গুঁড়িটা দেখ —মাঝে মাঝে গিরা আছে। এমনতর গিরা আর কোন গাছে আছে জান? বাঁশগাছে, আকগাছে। ঘাসেও এইরূপ গিরা আছে। পাতাগুলি এই গিরা থেকেই উঠে। গুঁড়িটা কাটিয়া দেখ—ভিতর ফাঁপা —বাঁশের মত। বাঁশ, ঘাস, আক, ধান এক রকমের গাছ। এই দেখ ধানগুলি কেমন থোপা হইয়া ধরিয়াছে। যে ডগায় ধান ধরিয়াছে, তাহাকে ধানের শিষ বলে। একটা শিষে কয়টা ধান আছে গণিয়া দেখ। একটা শিষে ২০০।৩০০ ধান ধরিয়া থাকে। ধান বুনিলে ৪।৫ দিনে গাছ বাহির হয়। গাছ বড় হইলে তাহার গোঁড়া থেকে আরও ৪।৫টা গাছ বাহির হয়। (বাঁশ ও কলা গাছেরও যে এইরূপ পোয়া বাহির হয়—বলিয়া দাও) এ সকল গাছেরও শিষ হয় ও সেই শিষে ধান ধরে। তাই দেখ একটা ধান থেকে কতটা ধান পাওয়া যায়।

ধান কি মাসে বোনে? বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে বোনে। হাঁ, দুই রকম ধান বোনে—এক রকম ধান খুব শীঘ্রই জন্মে, তাই এই ধানকে আশু (আশু মানে শীঘ্র) বা আউশ ধান বলে। তিন মাসেই ধান হয়।

আউশ ধানের চাষ
লাগে তিন মাস।

আউশের চা'ল খুব মোটা—একটু লাল রঙের। আর যে ধান অগ্রহায়ণ পৌষমাসে কাটে তাহাকে আমন ধান বলে। আমনের চা'ল সরু (বোর্ডে আউশ ধান ও আমন ধান লিখিয়া দাও)। বালাম, দাদ-খিনি চা'ল—আমন ধানের চা'ল।

ধান কেমন করিয়া বোনে? জমিতে চাষ দিয়া তার উপর ধান ছিটাইয়া দেয়। হাঁ, আবার এক জায়গায় ধানের চারা করিয়া, সেই চারা তুলিয়া মাঠে লাগায়। এইরূপ ধান বোনাকে 'রোপা' বলে।

ধানের গাছ কত বড় হয়? ডেঙ্গা জমিতে প্রায় মানুষের সমান উঁচু হয়, কিন্তু বিলে জমিতে ১০।১২ হাত উঁচু হয় (একটা মানুষ কয় হাত উঁচু হয় জিজ্ঞাসা কর)। ধান কখন কাটে? যখন ধান পাকে। ধান পাকা কিরূপে বুঝিতে পারা যায়? যখন ধানের ও গাছের রং হল্‌দে হয় তখন ধান পাকে। ধান পাকিলে গাছ মরিয়া যায় (কলা পাকিলে কলাগাছ মরিয়া যায় কিন্তু আম জাম পাকিলে সে সকল গাছ মরে না) যে সকল গাছ একবার ফল দিয়াই মরিয়া যায় তাহাদিগকে ওষধি বলে। কেমন করিয়া ধান কাটে? কাস্তের বর্ণনা কর—করাতের সহিত তুলনা কর—করাত সোজা ও কাস্তে বেঁকা কেন? ধান কাটিয়া কি করে? কেমন করিয়া গাছ থেকে ধান ছাড়াইয়া লয়? ধানের শুক্‌না গাছকে খড় বলে। খড় কি কাজে লাগে? চা'ল কি কি কাজে লাগে? চা'ল জলে সিদ্ধ করিলে ভাত হয়। দুধে সিদ্ধ করিলে পায়েশ হয়। চা'লের গুঁড়া দিয়া রুটী ও পিঠা তৈয়ারী করে। চা'লের মাড় দিয়া কাপড় পালিস করে। চা'ল দিয়া এক রকম পাতলা অথচ শক্ত কাগজ তৈয়ারী করে।

মটর।

উপকরণ—মটরের গাছ, মটরশুঁটী, মটরের ফুল ইত্যাদি।

বালকগণের হাতে একটা করিয়া মটরশুঁটী দাও (এই পাঠ শীত-কালের জন্য)। এগুলি কি? মটরশুঁটী। কি রঙ্? সবুজ। আকার কেমন? কোনদিকে টিপিলে শুঁটী সহজে খুলিবে? খুলিয়া দেখ। মটরগুলি কি (ধানের ভিতরে চালের মত) সমস্ত শুঁটী জুড়িয়া আছে? না, শুঁটীর এক পাশে লাগিয়া আছে। হাঁ, মটরগুলি মটরফলের বিচি। মটরফলে (আম, জাম প্রভৃতি ফলের মত) সার নাই। উপরে এক জোড়া খোসা—ভিতরে ৪।৫টা বিচি। বিচিগুলি খাইয়া দেখ। কেমন লাগে? বেশ নরম। একটু মিষ্টি মিষ্টি। ভাঙ্গিয়া দেখাও যে বেশ দুই খণ্ডে ভাঙ্গা যায়।

কতকগুলি শুক্‌না মটর দাও। এগুলি কি? এগুলি শুক্‌না মটর। নরম না শক্ত? এগুলি বেশ শক্ত। এগুলি কেমন করিয়া ভাঙ্গে? জাঁতায় ফেলিয়া ভাঙ্গে।

মটর ভাঙ্গিলে তাহাকে কি বলে? মটরের ডা'ল বলে। ডা'লের কি রঙ্? বেশ হল্‌দে রঙ্। উপরের কাল খোসা কি হয়? জাঁতার ঘষায় সে খোসা ডা'ল থেকে খুলিয়া যায়। ডা'লের খোসাকে কি বলে? ভুষি।

মটরের গাছ দেখাও। এই দেখ গাছগুলি কেমন ছোট ছোট। ডগাগুলি সরু আর নরম। তাই গাছগুলি ঠিক দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। বড় (পাটনাই) মটরের গাছ বুনিলে তার কাছে কাঠী পুতিয়া দিতে হয়। মটরের গাছ থেকে আঁকড়ী (আকর্ষী) বাহির হইয়া এই কাঠি জড়াইয়া ধরে। (লাউ, কুমড়া, শশাগাছের সহিত তুলনা কর) ফুল দেখাও। সাদা সাদা—যেন এক একটা সাদা প্রজাপতি পাখা মেলিয়া

আছে। (বকফুলের সঙ্গে তুলনা কর) পাতা দেখাও ও তাহার আকার বর্ণনা করিতে বল। পাতাগুলি ডগার গায় কেমন করিয়া লাগিয়া থাকে তাহা লক্ষ্য করিতে বল। পাতার বোঁটা আছে কিন্তু যেখান থেকে মটর ডাল বাহির হইয়াছে সেখানে পাতা অন্যরূপ—বোঁটা নাই, আর পাতাদুটী যেন ডালটাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কার্ত্তিকমাসে মটর বোনে। পৌষ মাসে শুঁটী ধরিতে আরম্ভ করে। চৈত্রমাসে ফল পাকিয়া উঠে আর লতা শুকাইতে আরম্ভ হয়। তখন কাটিয়া আনিয়া দানা সংগ্রহ করে। মটরের গাছও ধানের মত ফল দিয়াই মরিয়া যায়।

মটর কি কাজে লাগে? আমরা মটরের ডা'ল জলে সিদ্ধ করিয়া খাই। আর কি কি ডা'ল খাই? মটর দিয়া আর কি তৈয়ারী করে? মটরের ডা'ল পাটায় পিষিয়া বড়ি তৈয়ারী করে। তরকারীতে মটরের ডা'লের বড়ি খাইতে বেশ লাগে। কাঁচা মটরের বেশ তরকারী হয়। গোরুকে মটর সমেত গাছগুলি খাওয়াইলে তাহার খুব দুধ হয়।

আলু।

উপকরণ—নানাপ্রকার আলু, আলুর গাছ (আলু সমেত)।

টেবিলের উপর ছোট বড়, গোল লম্বা, নূতন পুরাতন—অনেকগুলি আলু রাখিয়া দাও। বালকগণকে বর্ণনা করিতে বল। আলুর আকার কেমন? প্রায়ই গোল, মাঝে মাঝে লম্বা আকারেরও আছে। আলুর আর কি নাম আছে? গোল আলু ও বিলাতী আলু। গোল বলে কেন? প্রায় আলুর আকারই গোল বলিয়া। বিলাতী আলু বলে কেন? এই আলু আমাদের দেশে ছিল না—প্রায় ১০০ একশত বৎসর হইল এদেশে আসিয়াছে। সাহেবেরা এই আলু তাহাদের দেশ হইতে

আনিয়াছে বলিয়া বিলাতী আলু বলে। রঙ্ কেমন? কটা কটা। কতকগুলি আবার একটু লাল লাল। আলুর খোসাছাড়ায় কেমন করিয়া? ছুরি কি বঁটি দিয়া ছাড়ায়। হাঁ, পুরাতন আলুর খোসা ছাড়াইতে হইলে তাহাই করে বটে কিন্তু নূতন আলুর খোসা চটের উপর ঘষিয়াই ছাড়ান যায়। (পরীক্ষা করিতে বল) আলু কাট। ভিতরের রঙ্ কেমন? খুব পাতলা হলুদ। কাটা আলুতে হাত দিয়া দেখ? খুব ঠাণ্ডা ও ভিজা ভিজা। দুই খানা কাটা আলু একবাটী জলের ভিতর ঘষ। জলের রঙ্ কেমন হইল? সাদা। আর কোন্ জলের এরূপ রঙ্ দেখেছ? চা'লধোয়া জলের। ঠিক কথা, চা'লের ভিতর যে সার জিনিষ আছে, আলুতেও তাহাই আছে।

আলুর গাছ দেখাও। পাতার বর্ণনা কর। ডগা কেমন নরম। কিন্তু তাই বলিয়া মটরের গাছের মত হেলিয়া পড়ে না। ফুল দেখাও—৫টী পাঁপড়ি—রঙ্ কটা কটা কিন্তু ফুলের মধ্যভাগ হলুদ। এখন মাটী খুঁড়িয়া আলু দেখাও। আলুগাছের সরু সরু মূল হইতে আলু যে পৃথক তাহা দেখাইয়া দাও। আলুগাছের গুঁড়ি দুইদিকেই বাড়ে—মাটীর উপরে বাড়ে আর মাটীর নীচেও বাড়ে। গুঁড়ির যে ভাগ মাটীর নীচে সে ভাগ আলো পায় না বলিয়া তাহার রঙ্ সাদা বা কটা হয়। আলুটাও গাছের গুঁড়ি—ফুলিয়া ফুলিয়া মোটা হইয়াছে। আলু—গাছের শিকড় নয়। আলুর মত আর কোন্ তরকারী মাটীর নীচে জন্মে? মূলা, শালগম, লাল আলু। হাঁ, ঠিক কথা, মূলা, শালগম কিন্তু কাণ্ড নয়—শিকড়। এই আলুর গায় দেখ চোখ আছে—এই চোখ সমেত আলু কাটিয়া মাটীতে লাগাইলেই এই চোখ থেকে গাছ ও শিকড় বাহির হইবে। গোলাপ গাছের গায়, গোলাপের ডালে, পাতাবাহারের ডালে, বেলফুলের ডালে, এই রকম চোখের দাগ আছে। চোখ সমেত ডাল মাটীতে পুঁতিলেই গাছ হয়। কিন্তু কোন গাছেরই শিকড় লাগাইলে গাছ হয় না। মূলা,

শালগম কাটিয়া লাগাইলে গাছ হয় না। তাই মূলা মূল, কাণ্ড নয়। রাঙ্গা আলু, শাঁক আলুও কাণ্ড—আলু লাগাইলেই গাছ হয়।

গোলাপী রঙের আলুর (রঙ্গপুরের আলু) শাঁস আঠা আঠা, আর কটা আলুর শাঁস (নাইনিতালের আলু) বালি বালি। আলু তরকারীর মধ্যে উত্তম—একে খাইতে ভাল, আবার সব সময়ই পাওয়া যায়। আলু যে বার মাস জন্মে তাহা নয়—যত্ন করিয়া রাখিলে আলু অনেকদিন ভাল থাকে। আলু দিয়া কি কি তরকারী হয়? আলুসিদ্ধ, আলুভাজা, আলুর দম উত্তম খাদ্য। আবার মাছের ঝোলে, মাংসে ও নিরামিশ তরকারীতেও আলু উত্তম তরকারী। আলু প্রায় সব জেলাতেই জন্মে। তবে রঙ্গপুর ও খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ে প্রচুর জন্মে।

সরিষা।

উপকরণ—সরিষা ও সরিষার গাছ (ফুল সমেত), মুলার ফুল ও মুলার গাছ।

বালকগণের হাতে অল্প অল্প সরিষা দাও। এগুলি কি? সরিষা। রঙ্ কেমন? কতকগুলি লাল—কতকগুলি কাল কাল। আকার কেমন? গোল আর খুব ছোট। ভাঙ্গিয়া দেখ—ভিতরে কি রঙ্? ভিতরের রঙ্ হলুদ।

সরিষার গাছ দেখাও—পাতা ও ডাল পরীক্ষা করিতে বল। ফুলগুলির পাপড়ি গণিতে বল। ফুলের রঙ্ কেমন? পাতলা হলুদ—বাসন্তী রঙ। মুলার ফুলের সহিত তুলনা কর। সরিষা ক্ষেতের সুন্দর শোভার দিকে বালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ কর। কেমন সুন্দর বাসন্তী রঙ্—মধ্যে মধ্যে সবুজের আভা—যেন কেহ মাঠে তুলি দিয়া বাসন্তী রঙে চিত্রিত করিয়াছে আর তার মাঝে একটু একটু সবুজ রঙ্ বুলাইয়া দিয়াছে। সরিষার ফুলের বেশ গন্ধ।

ফল দেখাও। ফল ভাঙ্গিয়া দেখ, একটা ফলে কয়টা দানা আছে গণ। একটা ফলে ৬।৭টা দানা আছে। মূলার ফলের সহিত তুলনা করিতে বল—মূলার ফলে কয়টা দানা থাকে? সরিষা কি কাজে লাগে? সরিষা হইতে তেল হয়। কেমন করিয়া তেল বাহির করে? সরিষাগুলি ঘানির মধ্যে দেয় আর ঘানির চাপে তেল বাহির হইয়া পড়ে। একটা ঘানিগাছ দেখাও বা তাহার চিত্র অঙ্কিত করিয়া বর্ণনা কর। কোথায় সরিষা দেয়, কোন্ দিক দিয়া তেল বাহির হয়, কোন্‌খানে কেমন করিয়া চাপ লাগে, গোরু দিয়া কেমন করিয়া ঘানি চালায় সমস্ত বুঝাইয়া দাও।

সরিষা তেল আমাদের কি কাজে লাগে? আলু, বেগুন, মাছ ভাজিতে সরিষার তেল লাগে। ডাল, তরকারী রান্না করিতেও এই তেল লাগে। আমরা স্নানের পূর্ব্বে এই তেল গায় ও মাথায় মাখি। এই তেল প্রদীপেও জ্বালায়। তেল বাহির করিয়া লইলে ঘানিগাছে যে ছোবড়া পড়িয়া থাকে তাহাকে খৈল বলে। এই খৈল গোরুর উত্তম খাদ্য। জমিতে খৈল দিলে জমির খুব জোর হয়, শস্য ভাল জন্মে। খৈল দিয়া বেশ গা পরিষ্কার করা যায়। স্ত্রীলোকেরা অনেক সময় খৈল দিয়া চুল পরিষ্কার করে। আর কোন্ কোন্ জিনিষের তেল হয়? তিসির তেল হয়। কি কাজে লাগে? তিসির তেল দিয়া রঙ্ তৈয়ারী করে। আর কি তেল আছে? তিলের তেল হয়। তিলের তেল মাথায় মাখে আর তিলের তেল দিয়া রান্নাও করে (মধ্যপ্রদেশে, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে তিলের তেলই রান্নায় ব্যবহৃত হয়—সে সকল প্রদেশে সরিষা জন্মে না) আর কি তেল দেখেছ? নারিকেলের তেল। নারিকেলের তেল মাথায় মাখে, এই তেলে প্রদীপ জ্বালায় আর এই তেল রান্নায় ব্যবহার করে (মান্দ্রাজ ও সিংহলে নারিকেল তেলেই রান্না করে)। এরণ্ডের (বা ভেরেণ্ডার) তেল হয়। অপরিষ্কার তেলে বাতি জ্বালায়—ইহাকে সাধারণতঃ

রেড়ীর বা এঁড়ির তেল বলে। আর খুব পরিষ্কার করিলে ইহাই ক্যাস্‌টর অয়েল হয়—ক্যাস্‌টর অয়েল জোলাপের ঔষধ। সরিষা কার্ত্তিক মাসে বোনে। পৌষ মাঘ মাসে সরিষার ফুল ধরে, ফাল্গুনে ফল পাকে, চৈত্রে গাছ কাটিয়া শুঁটী সংগ্রহ করে। তারপর মাড়াইয়া বা লাঠী পিটিয়া শুঁটী হইতে সরিষা বাহির করিয়া লয়।

আম।

উপকরণ—ছোট আমের গাছ, আম, আমের অাঁটী (জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের পাঠ)।

একটা বড় আমগাছের নীচে বালকগণকে একত্র কর। কোন্ পর্য্যন্ত আম গাছের গুঁড়ি, দেখাও? এই শিকড়ের উপর হইতে ডাল পালার নীচ পর্য্যন্ত। গুঁড়িটা কয় হাত উঁচু, মাপ। (একখানা কাঠীর দ্বারা গুঁড়ির মাপ লইবে। সেই কাঠী মাপিলেই গুঁড়ির উচ্চতা জানা যাইবে) গাছটী কত মোটা মাপ? (এক গাছি দড়ি দিয়া গাছের চারি-দিক জড়াইয়া মাপ লও, পরে সেই দড়ি কয় হাত হয় মাপ) গাছের বাকল দেখাও? (দা দিয়া এক অংশের একটু বল্কল তুলিয়া দেখাইবে) আমের গুঁড়ি শক্ত না নরম? খুব শক্ত। এই গুঁড়ি কাটিয়া তক্তা তৈয়ারী করে—সেই তক্তা দিয়ে আমরা কপাট, চৌকাঠ, জানালা, তক্তপোষ তৈয়ারী করি। গুঁড়ি কেমন-করিয়া কাটে? কুড়ালি দিয়া (শিকড়ের উপরে) গুঁড়ি কাটিতে থাকে। গাছ পড়িয়া গেলে ডালপালাও কুড়ালি দিয়া কাটিয়া ফেলে। ডালপালায় জ্বালানি কাঠ হয় আর গুঁড়ি চিরিয়া তক্তা করে। কেমন করিয়া বড় করাত দিয়া গুঁড়ি চেরে তাহা বুঝাইয়া দাও।

একটা গাছে কত ডাল হয় দেখ। গুঁড়ির উপর থেকে যে সকল বড় বড় ডাল বাহির হইয়াছে, সেইগুলিকেই ডাল বা শাখা বলে; আর

এই সকল বড় বড় ডাল থেকে যে সকল ছোট ছোট ডাল বাহির হইয়াছে তাহাকে পালা বা প্রশাখা বলে। মোটা মোটা ডালেও তক্কা হয়।

গাছের পাতা দেখ। পাতাগুলির আকার কেমন? পাতার দুই মাথা সরু আর মাঝখানে চওড়া। কোন্ জিনিষের মত? ডিঙ্গি নৌকার মত। পাতার রঙ্ দেখ? খুব কচি পাতা বেগুণে, মাঝারি পাতা সবুজ, বুড়া পাতা একটু কাল মিশান সবুজ। আমের ফুলকে কি বলে? আমের বোল বা মুকুল। দেখ একটা বোঁটায় কত ফুল হইয়াছে—ফুলগুলি কত ছোট। কি মাসে আমের মুকুল দেখা যায়? মাঘ ফাল্গুন মাসে এই দেখ সকল ফুল থেকে ছোট ছোট আম জন্মিয়া থাকে। এই সকল আম বড় হইলে, এক এক বোঁটায় কত আম ঝুলিবে গণিয়া দেখ। একটা বড় বোঁটার সঙ্গে আবার ছোট ছোট বোঁটা থাকে—সেই ছোট ছোট বোঁটায় আম লাগান থাকে।

কাঁচা আমের রঙ্ কেমন? সবুজ। পাকা আমের? হল্দে, লাল, কমলা। কোন কোন আম পাকিলেও সবুজ থাকে—এই আমকে 'বর্ণ চোরা' আম বলে। কাঁচা আমের মধ্যে কি রঙ্? সাদা। পাকা আমের? ঘন কমলা। কাঁচা আমের খোসা কি হাত দিয়া ছাড়ান যায়? না, ছুরি দিয়া ছাড়াইতে হয়। পাকা আমের? পাকা আমের খোসা হাত দিয়াই ছাড়ান যায়। খোসার নীচে কি দেখিতেছ? আমের শাঁস। কাঁচা আমের শাঁস খাইতে কেমন লাগে? বড় টক্। পাকা আমের? মিষ্টি ও টক্ মিশান (অম্লমধুর কথাটি শিখাইতে পার) আমের শাঁস পরীক্ষা কর—কাঁচা আমের শাঁস শক্ত, পাকা আমের শাঁস নরম। কোন কোন আমের শাঁসে সূতার মত আঁস আছে। শাঁসের পরে কি? আমের আঁটী। আঁটী ভাঙ্গিয়া দেখ—আঁটীরও আবার একটা খোসা আছে আর তার ভিতর সাদা শাঁস আছে।

আম কত বড় হয়? কোন্ আম খুব বড় হয়? ফজলি আম। আরও ২।৩ প্রকার ভাল আমের নাম কর। ন্যাঙড়া, গোপালভোগ, লম্বা-ভাদুড়ী, বোম্বাই।

আমের গাছ কত উঁচু হয়? ৪০।৫০ হাত। (যদি গ্রামে কোন বাড়ীতে দ্বিতল, ত্রিতল, পাকা বাড়ী থাকে তবে তাহার উচ্চতার সঙ্গে তুলনা কর) আর দুচারিটা উঁচু গাছের নাম কর? বট, অশ্বত্থ, ঝাউ, তাল। হাঁ, আসামে রবারের গাছও খুব বড় হয়। শাল, সেগুণ, দেবদারু গাছও খুব বড়। (রবারের গাছ বটগাছের মত,—রবার দেখাও)। অষ্ট্রেলিয়া নামক একটা দেশ (দ্বীপ) আছে। সেখানে ইউকালিপটাস নামে এক প্রকার গাছ জন্মে। এই গাছ ৩০০ হাত উঁচু হয়। এর চেয়ে আর উঁচু গাছ নাই।

আক।

উপকরণ—আক, বাঁশ, ধান, বেত প্রভৃতি।

বালকগণের হাতে এক এক পাপ আক দাও। এগুলি কি? আক। এটা কি গাছের ফল, ডাল না গুঁড়ি? রঙ্ কেমন? হলুদ ও গিরার কাছে একটু সবুজ মত। (নানা রঙের আক আছে, শিক্ষক বালকগণকে যেরূপ আক দিবেন তাহারই বর্ণনা আদায় করিয়া লইবেন। সাধারণতঃ যাহাকে বোম্বাই বা গোলাপী গ্যাণ্ডারী আক বলে এখানে সেই আকের কথা বলা হইয়াছে)।

আক শক্ত না নরম? খুব শক্ত। কেমন করিয়া খাইবে? উপরের শক্ত বাকল ফেলিয়া দিতে হইবে। কেমন করিয়া ফেলিবে? দাঁত দিয়া বা ছুরি দিয়া গিরা কাটিয়া ফেলিলেই লম্বা লম্বা ছাল উঠিয়া যাইবে। সকলে পরীক্ষা কর। উপরের বাকল ফেলিয়া দিলে, নীচে

কেমন—শক্ত না নরম? নীচে বেশ নরম। খাইতে কেমন লাগে? মিষ্ট। আকের ভিতরের শাঁস খাইতেছ কি? না, শাঁস চিবাইয়া রস খাইতেছি। ছিবড়া ফেলিয়া দিতেছি। আম, কলা, পেঁপের মত ইহার শাঁস নাই। মূলার কি আলুর মতও ইহার শাঁস নাই। কেবল মিষ্ট রস। এই আক থেকে কেমন করে গুড় করে জান? আক কাটিবার কথা বল, তারপর সাধারণ আকমাড়া কলের বর্ণনা কর। যদি নিকটে আকমাড়া কল থাকে তবে বালকগণকে সঙ্গে লইয়া গিয়া দেখাইয়া আন। অভাবপক্ষে দুইটী বাঁশের চোঙ্গা সংগ্রহ কর ও তাহা পাশাপাশি ঘুরাইবার ব্যবস্থা কর এবং এই দুই চোঙ্গার সন্ধিস্থলে একখানি আক দিয়া চাপিয়া দেখাও যে এইরূপে লোহার কি কাঠের দুইটী রোলারের মধ্যে চাপা দিয়া আকের রস বাহির করে। আকের রস জ্বাল দিলে গুড় হয়। (অল্প আকের রস কি খেজুরের রস জ্বাল দিয়া দেখাইতে পার) এই গুড় থেকে আবার চিনি হয়। কেমন করিয়া চিনি করে বলিতে পার? একটা হাঁড়িতে ছিদ্র করে—তার মধ্যে দানাদার গুড় (দানাদার গুড় ও ঝোলা গুড়ে পার্থক্য কি তাহা দেখাইয়া দাও বা বুঝাইয়া দাও) রাখে ও ইহার উপরে পাটা শেওলা (পুকুর থেকে পাটা শেওলা সংগ্রহ করিয়া দেখাও) চাপায়। এই শেওয়ালার গরমে, গুড় থেকে অপরিষ্কার ঝোলা গুড় (বা চিটে গুড়) হাঁড়ির ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। ইহার মধ্যের গুড় পরিষ্কার হইয়া চিনি (অবশ্য মোটা চিনি) হয়।

আকের গাছ দেখাও। পাতাগুলি কেমন আকের গায় জড়াইয়া থাকে—বোঁটা নাই। পাতা বেশ সবুজ। শুষ্ক পাতার রঙ্ কটা। পাতা প্রত্যেক গিরা থেকে বাহির হয়। পাতার লম্বাদিকে শিরগুলি কেমন পাশাপাশি সাজান। আমপাতা, বটপাতার শিরগুলি এলোমেলো ভাবে জালের মত সাজান। (ঘাস, ধান, বাঁশের সহিত

তুলনা কর)। আকের ফুল দেখাও—কেমন চামরের মত। আকের গিরা কাটিয়া লাগাইলে তাহা হইতে নূতন গাছ বাহির হয়। (গিরাতে চোখ দেখাও) আকের আগা বুনিলেও বেশ গাছ হয়। আক প্রায় বারমাসই লাগান যায়।

যেমন আকের রসে গুড় আর চিনি হয়—এমন আর কোন রসে হয় কি না? খেজুরের রসে খেজুরেগুড় হয়। তালের ও নারিকেলের রসেও গুড় হয়। বলিয়া দাও যে তাল, খেজুর, নারিকেল গাছেরও (আকের মত) উপরে শক্ত। ভিতরে নরম। বিলাতে পালঙ শাকের মত এক রকম শাক হয়। সেই শাকের নাম বিটপালঙ। সেই গাছের শিকড় থেকে উত্তম চিনি তৈয়ারী হয়। বিলাতি চিনি—এই বিটপালঙের চিনি।

কার্পাস।

উপকরণ—কার্পাসের গাছ, ফুল, ফল, তুলা, কাপড়ের টুকরা।

প্রত্যেক বালকের হাতে এক এক টুকরা ছেঁড়া কাপড় দাও। (শিক্ষক নিজের হস্তস্থিত ছেঁড়া কাপড় হইতে এক গাছি সূতা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন) এই গাছি কি জিনিষ? সূতা। তোমরাও এক এক গাছি সূতা বাহির কর। কাপড় কি দিয়া তৈয়ারী হয়? সূতায় তৈয়ারী হয়। (শিক্ষক ২।৪ গাছি সূতা পিঁজিয়া তুলায় পরিণত করিবেন) এই সূতা ছিঁড়িয়া কি তৈয়ারী করিলাম? তুলা। তোমরাও এইরূপ ২।৪ গাছি সূতা পিঁজিয়া তুলা তৈয়ারী কর।

এই তুলা কোথায় পাওয়া যায় জান? শিমূলগাছে (অনেক বালক কার্পাসের গাছ চেনে না। শিমূলগাছ অনেকে দেখিয়া থাকিবে)। হাঁ, শিমূলগাছে তুলা পাওয়া যায়। কিন্তু সে তুলায়

সূতা হয় না। শিমূল তুলায় বালিশ আর গদি তৈয়ারী করে। (শিমুল তুলায় যে সূতা হয় না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাও। কার্পাস তুলাতে যে সূতা তৈয়ারী হয় তাহাও এই সঙ্গে দেখাইতে হইবে।) কোন তুলায় সূতা তৈয়ারী হয়? কার্পাসের তুলায়। তোমরা কেহ কার্পাসের গাছ দেখিয়াছ? (যদি গ্রামে কোথাও কার্পাসের গাছ থাকে তবে শিক্ষক সেই গাছ দেখাইবেন। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসে এই পাঠ দিলে ভাল হয়। কারণ সে সময়ে কার্পাসের ফুল, ফল ও তুলা সমস্ত দেখাইতে পারা যাইবে) কার্পাসের গাছ ২।৩ হাত উচু হয়। ধান, মটর, কলাগাছের মত কার্পাসের গাছ এক বার ফল দিয়াই মরিয়া যায় না। একবার লাগাইলে অন্ততঃ ৪।৫ বৎসর তাহাতে ভাল তুলা পাওয়া যায়।

পাতাগুলি ঠিক স্থলপদ্মের পাতার মত, আর ফুল ঢেড়স ফুলের মত। ফুলের রঙ ফিকে হলুদ আর ফুলের মাঝখানে পাটল। একটা গাছে প্রায় ২০।৩০ টা ফল হয়। শিমুল ফলের মধ্যে ৫ কোঠা আছে (শিক্ষক একটী শিমুল ফল ভাঙ্গিয়া দেখাইবেন—শিমুল ফল পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে) কার্পাস ফলে ৩ কোঠা আছে। তবে কার্পাসের ফল শিমুল ফলের মত বড় নয়—একটা বড় লিচুর মত। ফল পাকিলে ফাটিয়া তুলা বাহির হয়। শিমুলের তুলায় আঁইশ বা আঠা (তুলার আঁইশ বা আঠা কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া দাও) নাই, তাই ঝড়ের সময় সমস্ত তুলা উড়িয়া যায়। কার্পাসের তুলায় আঁইশ বা আঠা আছে বলিয়া ফল ফাটিলেও তুলা উড়িয়া যায় না। ফল ফাটিয়া গেলে তাহার ভিতর হইতে তুলা খুলিয়া আনে। এমনি করে অনেক তুলা সংগ্রহ করা হইলে, সেই তুলায় গাঁট বাঁধিয়া—যেখানে কাপড়ের কি সূতার কল আছে সেখানে চালান দেয়। তুলায় বিচি থাকে—এই বিচি কলে ছাড়ায়। আমাদের দেশের লোকে কাঠ কি বাঁশ দিয়া বিচি ছাড়ান

কল তৈয়ারী করে। (যদি এইরূপ বিচি ছাড়ান কল দেখাইতে পার তবে ভাল হয়। না দেখাইতে পারিলে ইহাই বলিয়া দাও যে সে সকল কলের ছোট ছোট ছিদ্র দিয়া তুলা চলিয়া যাইতে পারে কিন্তু বিচি যাইতে পারে না। ছিদ্রগুলি বিচির চেয়ে ছোট)।

তুলা থেকে কেমন করে সূতা তৈয়ারী করে দেখাও। চরখায় সূতা কাটিয়া দেখাইতে পার। অথবা পৈতা তৈয়ারী করা দেখাইলেও বালকেরা তুলা হইতে সূতা তৈয়ারীর ব্যাপার বুঝিতে পারিবে।

তারপর কেমন করিয়া সূতা সাজাইয়া কাপড় তৈয়ারী করে তাহা বুঝাইয়া দাও। যদি চাটাই বুনন শিখাইয়া থাক তবে তাহার আলোচনা কর। 'টানা' (লম্বা দিকের সূতা) 'পড়েন' (পাশের দিকের সূতা) কথা দুইটী বুঝাইয়া দাও।

কাপড়—সূতার চাটাই। যদি নিকটে কোন তাঁতি বা জোলা থাকে তবে তাঁহার বাড়ীতে নিয়া গিয়া বালকগণকে কাপড় তৈয়ারীর কৌশল মোটামুটি রকমে বুঝাইয়া দিবে।

মেঘ।

উপকরণ—(এই পাঠ বর্ষাকালের উপযোগী) জল, পিতলের বাটি, আগুন, শ্লেট।

আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ছাড়া আর কি কি দেখিতে পাওয়া যায়? আকাশে মেঘ দেখা যায়। মেঘের রঙ কেমন? কাল আর সাদা। (বালকগণকে বলিয়া দাও যে বৈকালে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া মেঘে নানা রূপ রঙ হয়—সে সময়ে মেঘের খুব শোভা হয়) কোন্ মেঘে বৃষ্টি হয়? খুব কাল মেঘে বৃষ্টি হয়। কোন্ কোন্ দিকে মেঘ উঠিলে প্রায়ই বৃষ্টি হইয়া থাকে? দক্ষিণে আর পশ্চিমে কি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মেঘ উঠিলে প্রায়ই বৃষ্টি হয়।

খুব কাল মেঘের নাম 'ঝড়োমেঘ'। ভাল কথায় বলে 'বৃষ্টিপ্রদ

মেঘ'। যখন বৃষ্টি থাকে না, বেশ রৌদ্র হয়, তখন আকাশে সাদা সাদা পেঁজা তুলার মত মেঘ দেখা যায়। ইহাকে সাধারণ কথায় 'তুলা মেঘ' বলে, ভাল কথায় 'তুলাস্তূপ বা স্তূপ মেঘ' বলে। আবার সন্ধ্যায় সকালে সময় সময় চক্রবালের কাছে (যেখানে মাটীর সহিত আকাশ মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয়) টানা টানা মেঘ দেখা যায়। ইহাকে সাধারণ কথায় টানামেঘ ও ভাল কথায় 'স্তর মেঘ' বলে। আবার খুব পরিষ্কার নীল আকাশে যে একটু একটু ছাকড়া মেঘ ভাসিয়া বেড়ায় তাহাকে ছাকড়া মেঘ বলে। ভাল কথায় 'অলক মেঘ' বলে। (শিক্ষক এই সমস্ত মেঘের চিত্র দেখাইবেন আর আকাশেও এই সকল মেঘ দেখাইয়া দিবেন। অবশ্য যে দিন এই পাঠ দেওয়া হইবে সেই দিনেই যে আকাশে সকল মেঘ দেখাইতে হইবে, এমন কথা নহে। কথা এই যে, এই পাঠের সময় চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দিবেন। পরে যে দিন যে মেঘ চোখে পড়ে তাহা দেখাইয়া দিবেন)

মেঘ যে কেমন করিয়া হয় তাহা হয়ত তোমরা জান না। আচ্ছা, আমি তোমাদিগকে একটু মেঘ তৈয়ার করিয়া দেখাইতেছি।

(শিক্ষক এই পাঠ শিখাইবার পূর্ব্বে ঘরের বাহিরে বা কক্ষান্তরে এক হাড়ি আগুনের উপর, একটা পিতলের বাটিতে জল দিয়া চড়াইয়া দিয়া রাখিবেন। এই সময়ে সেই হাড়ি সমেত জলের বাটি ঘরের ভিতর লইয়া আসিবেন)

আচ্ছা, এই বাটির উপর হইতে ধোঁয়ার মত যে একটা জিনিষ উঠিতেছে তাহা দেখিতে পাইতেছ? এ জিনিষটা কি? এ জিনিষ ধোয়া বলিয়া মনে হয়।

আচ্ছা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক যে এই জিনিষটা ধোঁয়া কি না। এই আগুনের মালসা হইতেও ধোঁয়া উঠিতেছে (যদি না ওঠে, তবে মালসায় এক টুকরা ছেঁড়া কাগজ ফেলিয়া দিয়া ধোঁয়া করিয়া লও)

তাহার উপর এই সেট(ঠাণ্ডা স্লেট আবশ্যক) খানি ধরা যাউক। (স্লেট সরাইয়া দেখাও যে স্লেটে ধোঁয়ার কোন চিহ্ন নাই) তারপর এই বাটি হইতে যে ধোঁয়া উঠিতেছে তাহার উপর এই সেট ধরা যাউক। এবারে দেখ স্লেটের গায় জল লাগিয়া গিয়াছে।

বাটির গরম জল ধোঁয়ার মত হইয়া উড়িয়া যায়। তাই দেখ বাটির জলও কমিয়া যাইতেছে। আবার এই গরম ধোঁয়ার গায় স্লেট কি ঠাণ্ডা থাল লাগাইয়া যদি ঠাণ্ডা করা যায়, তবে সেই ধোঁয়া আবার জল হইয়া যায়। গরম জলের এই ধোঁয়াকে ভাল কথায় বাষ্প বলে। বাষ্প বাতাসের চেয়ে হালকা বলিয়া উপরে উঠিয়া যায়।

ভিজা কাপড় রৌদ্রে দিলে জল কোথায় যায়? রৌদ্রের তাপে কাপড়ের জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। সূর্য্যের তাপে এইরূপে প্রত্যহ দিঘী, নদী, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতি হইতে যে কত বাষ্প উপরে উঠিয়া যাইতেছে তাহার হিসাব করাও শক্ত। এই বাষ্পই মেঘ।

যেমন আমরা ঠাণ্ডা থালা বা স্লেট ধরাতে বাষ্প জল হইয়া গেল, তেমনি আকাশের মেঘে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে মেঘ জল হইয়া যায়। জল হইলে বাতাসের চেয়ে ভারী হয় আর মাটীতে পড়িয়া যায়। এই রকমে বৃষ্টি হয়।

বৃষ্টির জল আবার কোথায় যায়? কতক জল মাটীর নীচে চলিয়া যায় (বালি মাটিতে জল ঢালিয়া দেখাও) আর কতক জল নালা দিয়া বহিয়া নদীতে পড়ে। (যে দিন খুব বেশী বৃষ্টি হইবে সেই দিন বালকগণকে নালার ধারে লইয়া গিয়া দেখাইবে কেমন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলের ধারা নালায় পড়িয়া নালার জল বাড়াইয়া দেয় আবার কেমন করিয়া অনেক নালার জল একত্র হইয়া বড় ছড়া হইয়া নদীতে পড়ে। এই জলে নদীর জল বাড়িয়া যায়। বর্ষাকালে নদীর জল কেন বাড়ে? বর্ষাকালেই বেশী বৃষ্টি হয়।

আর কতক জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। বৃষ্টির পরে খুব রৌদ্র উঠিলে সহজেই এই ব্যাপার দেখান যাইতে পারে। খুব রৌদ্র হইলে টিনের ঘরের ভিজা ছাদ হইতে বাষ্প উঠে—এই বাষ্প বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

[একটী কথা বালকগণকে আপাততঃ না বলিলেও চলিতে পারে কিন্তু শিক্ষকগণের জানিয়া রাখা আবশ্যক। সাধারণতঃ যাহাকে বাষ্প বলা যায়, সে পদার্থ অদৃশ্য ও বায়বীয়। বায়ুতে সর্ব্বদা বাষ্প বিদ্যমান কিন্তু আমরা দেখিতে পাই না। যখন শৈত্য সংস্পর্শে বাষ্প ঘনীভূত হয় তখনই কুয়াসা বা মেঘরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। হাঁড়ি হইতে যে গরম ধূমামার বাষ্প নির্গত হয়, তাহাকে ষ্টীম বলে।]

এই কবিতার অর্থ কর :—

একদিন, সাগর জলের কয়েক ফোটা
করল মনে সাধ
আকাশ উঠে দেখ্‌বে তারা
কতই আছে চাঁদ।
সাদা মেঘ গাড়ি হ'ল
হাওয়া হ'ল ঘোড়া
আকাশ ঘুরে দেখে তারা
চাঁদে জগৎ জোড়া॥

যেমন, একে একে অনেক ফোটা
উঠ্‌ল গাড়ি ভ'রে
মেঘের গাড়ি ভেঙ্গে গেল
পড়্‌ল মাটীর প'রে।
ভুঁয়ে পড়ে ফোটা গুলি
যাচ্ছে গড়াগড়ি
এমন সময় নদী এসে
নিয়ে গেল বাড়ী॥

নদী।

উপকরণ—শ্লেট, বোর্ড, চক, জল, গেলাস, বালি, মাটী।

বর্ষার প্রারম্ভে কয়েক গাড়ী মাটী (বালিমিশ্রিত হইলেই ভাল হয়) সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের এক কোণে স্তূপ করিয়া রাখ। যদি এই মাটীর সঙ্গে ভাঙ্গা পাথর, ইঁট, ঝামা বা ভাঙ্গা হাঁড়ি মিশাইয়া দিতে পার তবে আরও ভাল হয়। এই স্তূপের চারিদিকে একটা বেড়া দিয়া রাখ; তাহা না করিলে গোরু ছাগলে স্তূপটী ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। এই স্তূপের উপর বৃষ্টি পড়িয়া স্তূপের গায় কিরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলের নালার সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেই সমস্ত ধারা মিলিত হইয়া কেমন করিয়া একটা বৃহৎ ধারায় পরিণত হয়, সেই ধারা কেমন করিয়া নালায় পড়ে ও নালার জল কেমন করিয়া নদীতে পড়ে তাহা বালকগণকে দেখাইয়া দাও। যদি স্তূপের উপর ঘাস বা ২।১টী গাছ জন্মিয়া থাকে, তবে দেখাও যে, যে স্থানে ঘাস বা গাছ আছে সে স্থানের মাটী ভাঙ্গে নাই। এইরূপ পাথর, ইঁট প্রভৃতিও মাটী রক্ষা করে ইত্যাদি।

খুব ঘন বৃষ্টির পরে বালকগণকে সঙ্গে করিয়া কোন উচ্চ রাস্তার উপর লইয়া যাও। সেই রাস্তর দুই ধারে নর্দ্দমা থাকিলে ভাল। কেমন করিয়া রাস্তার দুই ধার দিয়া জল গড়াইয়া নর্দ্দমায় পড়িতেছে তাহা দেখাও। পল্লীগ্রামে এইরূপ উচ্চ রাস্তা প্রায়ই থাকে না। সেখানে পূর্ব্বোক্ত কৃত্রিম পাহাড় (মাটীর ঢিপি) কাজে লাগিবে। কেমন করিয়া এই পাহাড়ের দুই ধার দিয়া জল গড়াইতেছে, গাছের গুঁড়ি বা ইঁট পাথরে বাধা পাইয়া জলের ধারা কেমন করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিতে বল। পাহাড়ের গা হইতে কেমন খরস্রোতে জল নামিয়া আসিতেছে, পাহাড়ের নীচে আসিয়া সেই জলের বেগ কেমন কমিয়া গিয়াছে—ইহাও দেখাও। পাহাড়ের গা হইতে

জল নামিবার সময় পাহাড় হইতে বালি, পাথর বা ইঁটের টুকরা খড় কুটা প্রভৃতি কত জিনিষ জলের স্রোতে নীচের দিকে টানিয়া আনিতেছে।

একখানি স্লেটের উপর একটু জল ঢালিয়া দেখাও। স্লেটখানি যখন সমতল ভাবে থাকে তখন জলও ঠিক থাকে কিন্তু স্লেট একটু হেলাইয়া ধরিলেই জল চলিতে আরম্ভ করিবে। শ্লেট যতই হেলাইয়া ধরিবে জল ততই বেগে চলিতে থাকিবে। এখন বলিয়া দাও যে পাহাড়ের গা খুব খাড়া বলিয়া পাহাড় হইতে খুব বেগে জল নামে।

জল চলিবার সময় মাটীর ঢিপির গায় কেমন ছোট ছোট নালার সৃষ্টি করিয়াছে—জলের স্রোতে মাটী কাটিয়া গিয়াছে। এইরূপ বড় পাহাড় হইতে বৃষ্টিজল নামিবার সময় পাহাড়ের গায় কত বড় বড় নালা কাটিয়া থাকে।

পাহাড়ের উপর হইতে জল নামিয়া পাহাড়ের নীচে আসে ; পাহাড়ের নীচের জমিকে কি বলে? উপত্যকা। সেখানে জল কিরূপ বেগে চলে? উপত্যকা পাহাড়ের মত খাড়া নহে—তবে সমতল অপেক্ষা কিছু ঢালু। উপত্যকায় জলের বেগ পাহাড়ের গায়ের জলের বেগ অপেক্ষা কম বটে কিন্তু সমতলের বেগ অপেক্ষা বেশী।

পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া নদী উপত্যকায় পড়ে, আবার উপত্যকা হইতে সমতলে আসে। তারপর সমুদ্রে পড়ে। নদী কত আঁকিয়া বাঁকিয়া যায়। ইহাতে কি উপকার হয়? সরলভাবে গেলে অতি অল্প গ্রামের লোকের উপকার হইত কিন্তু আঁকিয়া বাঁকিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া যায় বলিয়া অনেক গ্রামের লোকের উপকার হয়। [সরলরেখা ও বক্ররেখা আঁকিয়া বুঝাইয়া দাও]

বারমাস ত বৃষ্টি থাকে না, কিন্তু নদীতে বারমাস জল আসে কোথা হইতে? বর্ষায় পাহাড়ে যে জল পড়ে, সেই জল পাহাড়ের ফাটালে

ফাটালে বাধিয়া থাকে ও পাহাড়ের গায়ের ছিদ্র দিয়া বাহির হয়। এই জলেই নদী সকল সময়ে ভরা থাকে।

আবার নদীর মধ্য হইতেও জল উঠে। এইরূপ জল উঠাকে ঝরণা

পাহাড়ের অভ্যন্তস্থ ঝরণা।

বলে। [ঝরণা কেমন করিয়া হয় তাহা পুকুরের ও কূপের কথা বুঝাইবার সময় বলিয়া দিবে।]

নদীর চল্‌তি পথে নানা পাহাড় হইতে ছোট ছোট নদী আসিয়া মিলিত হয়। এই সকল নদীকে করদ নদী বলে। ইহারা বড় নদীকে জলের কর (খাজানা) দেয় বলিয়া ইহাদের এই নাম হইয়াছে। নদী যতই সমুদ্রের দিকে যাইতে থাকে ততই বড় হইতে থাকে।

গ্রামের নিকটস্থ নদীর কথা বল। এই নদী অমুক অমুক পাহাড় হইতে আসিতেছে। নদী যে স্থানে উৎপন্ন হয় সে স্থান পাহাড়ের মধ্যে। সেখানে যাওয়া বড় কঠিন। অনেক বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া পাহাড়ের উপর উঠিয়া খুঁজিলে নদীর উৎপত্তি স্থান দেখা যায়। তারপর সেখান হইতে যদি দুই তিন মাস হাঁটিয়া হাঁটিয়া নদীর গতির সঙ্গে রাস্তা ধরিয়া চলা যায়, তবে সমুদ্রে আসিয়া পৌঁছান যায়। সমস্ত নদীর জলই সমুদ্রে আসিয়া পড়িতেছে। কেন? কারণ সমুদ্রই সর্ব্বাপেক্ষা নীচু স্থান। জল ক্রমাগত নীচের দিকেই যাইতে থাকে—তাই শেষে সমুদ্রে আসিয়া পড়ে।

নদীর ভিতর একটী কাঠী ফেলিয়া দাও। নদীর স্রোত কোন্ দিকে? কোন্ দিকে পাহাড় ও কোন্ দিকে সমুদ্র?

নদীর স্রোত ভিতরে বেশী না পাড়ের দিকে বেশী? নদীর স্রোত যতই বেশী হয় নদীর জল ততই ঘোলা হয়। জল ঘোলা হয় কেন? জলের স্রোতে মাটী কাটিয়া যায়, সেই মাটি জলের সহিত মিশিয়া জল ঘোলা হয়। [একটী কাচের গেলাস জলে পূর্ণ কর ও তাহাতে খানিকটা মাটী ও বালি মিশাইয়া দাও। আঙ্গুল দিয়া জল নাড়িয়া দাও। বালি ও মাটী জলের স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইবে। গেলাসটী খানিকক্ষণ স্থির রাখ, বালি ও মাটী নীচে থিতাইয়া পড়িবে] নদীর স্রোত কমিয়া গেলে, বালি ও মাটী নদীর নীচে জমা হয়। এম্নি করিয়া অনেক নদী ভরাট হইয়া যায়। বর্ষার শেষে নদীর ধারে যে পলিমাটী জমে তাহা বালকগণকে দেখাও।

নদী দ্বারা কি উপকার হইতেছে? নিত্য ব্যবহারের জল পাইতেছি। মৎস্য পাইতেছি। নদীর দু'ধারের জমি সরস হওয়াতে কৃষির সুবিধা। নৌকা করিয়া দেশবিদেশে যাতায়াত ও বাণিজ্যদ্রব্যাদির চালান। ইত্যাদি।

মাটী।

উপকরণ—নানা রঙের মাটী, বালি, আঠাল ও দোঁআশ মাটী, বাটি, জল, মাটীর স্তর।

সদ্য কাটা এক কোদালী ভাল মাটী দেখাইয়া জিজ্ঞাসা কর—এ জিনিষটা কি? এক চাপ মাটী। 'মাটী কোথায় পাওয়া যায়?' এই জমি থেকে কোদালী দিয়া কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। মাটীর রঙ কেমন? অল্পকাল—ময়লা-ময়লা রঙ্। হাঁ ঠিক বলেছ—কাপড়ে

মাটী লাগিলেই আমরা বলিয়া থাকি কাপড় ময়লা হইয়াছে। যদি নিকটে অন্য কোন রঙের মাটী থাকে তবে তাহা দেখাও। আঠালে মাটী বেশ কাল, অনেক পাহাড়ে মাটী লাল, কোন কোন মাটী হল্‌দে। (অভাবপক্ষে বাজার হইতে গিরিমাটী (লাল) ও এলামাটী (হল্‌দে) আনিয়া দেখাইতে পার)।

এক দলা মাটী হাতে কর। ভারী না হাল্‌কা? ভারী। কেমন করিয়া বুঝিতে পারা যায়? এই মাটীর দলা জলে ফেলিয়া দিলেই ডুবিয়া যাইবে। ভারী জিনিষ জলে ডোবে। জলের সহিত মাটী মিশাইলে কি জিনিষ হয়? কাদা। হাঁ, কাদা হাতে টিপিয়া দেখ। কাদা বেশ নরম কিন্তু পাথর নরম নয়। কুমারেরা কাদা দিয়া পুতুল, হাঁড়ি, গেলাস, কলসী গড়ে। তুমি কাদা দিয়া একটা বল তৈয়ারী কর। বলের দুই দিকে আঙ্গুল দিয়া একটু একটু চাপ দেও—কমলা লেবু হইল।

আঠালে মাটী ও বেলে মাটী দেখাও। এই আঠালে মাটীতে জিনিষ গড়া যায়। এক একটা মাটীর বাটী তৈয়ারী করিতে বল। প্রত্যেক বাটীতে একটু একটু জল ঢালিয়া দেখাও যে আঠাল মাটীর বাটিতে জল দিলে, জল পড়িয়া যায় না। বালি মাটীর বাটি গড়িয়া, তাহাতে জল ঢালিয়া দেখাও যে জল পড়িয়া যায় ও বাটি ভাঙ্গিয়া যায়। আঠাল মাটীর মধ্য দিয়া জল যাইতে পারে না—বালি মাটীর মধ্য দিয়া জল চলিয়া যায়।

নদীর ধারে বালি মাটী, সেইজন্য নদীর ধারে বৃষ্টি হইলে কাদা হয় না; যে গ্রামের রাস্তায় আঠাল মাটী, বৃষ্টি হইলে সে রাস্তায় জল বাধিয়া থাকে ও রাস্তায় কাদা হয়। কাদা শুকাইলে শক্ত হয়। শীতকালে মাঠের জমি কেমন ফাটিয়া থাকে তাহা দেখাইবে। শুষ্ক মাটী খুব সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। শুষ্ক মাটীতে জল ছিটাইয়া দেখাও; জল কোথায়

গেল? শুষ্ক মাটীর দলার মধ্যে যে সকল ফাঁক আছে তাহার ভিতর জল চলিয়া গেল। যে পর্য্যন্ত সেই ফাঁকগুলি বন্ধ না হইবে সে পর্য্যন্ত যত জল দাও, শুষ্ক মাটী চুষিয়া লইবে। তার পর আরও জল দিলে মাটীর গা দিয়া গড়াইয়া পড়িবে। আর মাটীর মাঝে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

শুষ্ক মাটীতে জল দিলেই কাদা হয়। যে মাটীতে বালি নাই, সেই মাটীতেই ভাল কাদা হয়। ইহাকেই আঠাল মাটী বলে। বালি মিশান মাটীকে দোঁআঁশ মাটী বলে। দোঁআঁশ মাটীতে ভাল কৃষি হয়। দোঁআঁশ মাটীর ভিতর গাছের মূল সহজে প্রবেশ করিতে পারে। আঠাল মাটী শক্ত বলিয়া তাহার ভিতর মূল সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি মাটীর বাসন ও ইট—আঠাল মাটী দিয়াই গড়ে। প্রথমে রৌদ্রে শুকাইয়া পরে আগুণে পোড়ায়। আগুণে পোড়াইলে মাটী খুব শক্ত হয়। ইট সহজে ভাঙ্গা যায় না। কিন্তু শক্ত হইলেও ইট ঠুন্‌ক, লোহার মত ঠম্‌ক নয়। ইটে জোরে ঘা দিলেই ভাঙ্গিয়া যায়, লোহা ভাঙ্গে না।

একটী নূতন পুকুরের ধারে গিয়া বালকগণকে মাটীর স্তর দেখাও। মাটীর স্তরের ভিন্ন রঙ দেখাও। পুকুরের উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত কয়টী স্তর তাহা গণিতে বল। প্রত্যেক স্তরের মাটী পরীক্ষা কর—বেলেমাটী, আঠালমাটী, দোঁআঁশ মাটী বুঝাইয়া দাও। নদীর ধারে লইয়া গিয়াও বালকগণকে মাটীর স্তর দেখাইয়া দাও। নিকটে পাহাড় থাকিলে, পাহাড়ের মাটীতেও স্তর দেখাও। আমাদিগের পার নীচে যে মাটী তাহা কেবল এক রকমের মাটীতে গড়া নহে, থাকে থাকে নানা রঙের ও নানা রকমের স্তরে গঠিত।

চতুর্থ প্রকরণ।

(৯।১০।১১ বৎসরের বালকবালিকার জন্য।)

১। বিড়াল ও কুকুর।

উপকরণ—একটী পোষা বিড়াল ও একটী পোষা কুকুর। (বালকেরা নিজ হস্তে সমস্ত অঙ্গ পরীক্ষা করিবে)।

মস্তক।—কুকুরের মাথা লম্বা, বিড়ালের মাথা গোল। কুকুরের মাথাটা কোন্‌খান থেকে লম্বা হয়েছে? নাকের গোড়া থেকে লম্বা হয়ে গেছে। চোখে আলো লাগিলে বিড়াল একটা পাতলা পর্দ্দা দিয়া চোখের মনি ঢাকিয়া রাখে। দেখিবার জন্য সামান্য একটু ফাঁক রাখে। (চিত্র আঁকিয়া দেখাও) কুকুরের চোখ আলো ও অন্ধকারে এক রকমই থাকে। কুকুরের দাঁত ও বিড়ালের দাঁত প্রায় এক রকম। বিড়াল মাংস ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া গিলিয়া খায়, চিবায় না। কুকুর ছিঁড়িয়া লইয়া প্রথমে চিবায় পরে গেলে। কুকুরের জিভ তেলতেলে ও ভিজে ভিজে, বিড়ালের জিভ খস্‌খসে ও শুকনা। বিড়ালের গোঁপ লম্বা ও তেলতেলে

কুকুরের গোঁপ খাট ও খস্‌খসে। কুকুরের গোঁপ কোন কাজে আসে না। বিড়াল গোঁপ দিয়া অন্ধকারে রাস্তা ঠিক করে। (অন্ধকারে রাস্তা ঠিক করিতে হইলে কি করিয়া থাক ? দুই হাত দিয়া রাস্তা ঠিক করিয়া লই।)

পা।—বিড়াল ও কুকুর—দুইই পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া হাঁটে—পায়ের গোড়ালি মাটিতে ঠেকে না। বিড়ালের পায়ের নীচের গদি বেশ নরম, কুকুরের শক্ত। বিড়ালের নখগুলি বাঁকা ও খুব ধারাল। কুকুরের নখ তত বাঁকা নয় আর তত ধারালও নয়। বিড়াল গাছে উঠিতে পারে, কুকুর পারে না। শরীর আন্দাজে বিড়ালের পা খাট।
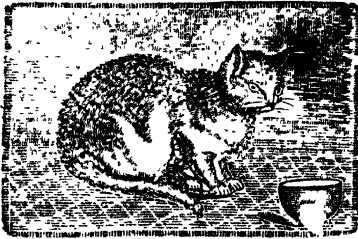
বিড়াল।
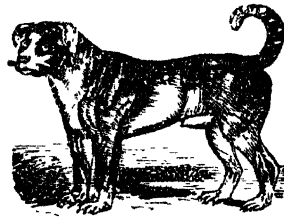
কুকুর।

লোম।—বিড়ালের লোম বেশ নরম, কুকুরের লোম শক্ত।

শিকার ধরা।—বিড়ালের দৃষ্টিশক্তি খুব প্রবল—চোখে দেখিয়া শিকার ধরে ; কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রবল, ঘ্রাণের সাহায্যে শিকার খুজিয়া বাহির করে।

ব্যবহার।—কুকুর বাড়ী পাহারা দেয়। (কেমন করিয়া ? শিপ্‌ডগ, সেণ্টবারনার্ডডগ, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডডগ, প্রভৃতি কি কাজ করে জিজ্ঞাসা কর)। বিড়াল মাঝে মাঝে ইঁদুর মারে। বিড়াল অপেক্ষা কুকুর বেশী উপকারী। উভয়েই মাংসাশী।

আরামে শুইবার পূর্ব্বে প্রায় কুকুরই দুই একটা পাক ঘুরিয়া নেয়। শীত লাগিলে গোল হইয়া কুণ্ডলী করিয়া শোয়।

সামান্য দুই মুটী ভাত পাইলে কুকুর ১০৲ দশ টাকা মাহিনার দ্বারবানের কাজ করে। ইহার অর্থ কি?

শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাকবোর্ডে এইরূপ লিখিয়া যাও:—(যদি বালকেরা সাধুভাষা শিক্ষার উপযুক্ত মনে না হয় তবে সাধারণ ভাষায় লিখিবে)

অঙ্গ	বিড়াল	কুকুর
মস্তক	গোল	লম্বা
চক্ষু	আলোতে অন্ধকারে ভিন্ন	আলোতে অন্ধকারে এক রকম
দন্ত	মাংস ছিঁড়িয়া গিলিয়া খায়	মাংস ছিঁড়িয়া চিবাইয়া খায়
জিহ্বা	কর্কশ ও শুষ্ক	মসৃণ ও রসযুক্ত
গোঁপ	দীর্ঘ ও মসৃণ	হ্রস্ব ও কর্কশ
নখ	তীক্ষ্ণাগ্র ও বক্র	স্থূলাগ্র ও সরল
পা	কোষে বদ্ধ করিতে পারে	কোষে বদ্ধ করিতে পারে না
”	পায়ের নীচের গদি কোমল	পায়ের নীচের গদি কর্কশ
লোম	কোমল	কর্কশ
শীকার ধরা	দেখিয়া, খুব ধীরে ধীরে যায়	ঘ্রাণ পাইয়া, দৌড়ায়

গোরু ও ঘোড়া।

উপকরণ—পোষা গোরু ও ঘোড়া বা তাহাদের চিত্র।

মস্তক।—উভয়েরই মস্তক লম্বা আর গলাও লম্বা। তবে ঘোড়া, গোরু অপেক্ষা উঁচু বলিয়া ঘোড়ার গলা একটু বেশী লম্বা। মুখ ও গলা লম্বা না হইলে মুখ লাগাইয়া ঘাস খাইতে পারিত না। (হস্তীর গলা খুব খাট কিন্তু একটা লম্বা শুঁড় আছে। তাহা দ্বারা মাটী হইতে খাদ্য

তুলিয়া লয়।) উভয় জন্তুরই চোখ বড় বড়। কেবল সম্মুখে নয়—তাহারা এক সঙ্গে সম্মুখের ও আশেপাশের অনেক জিনিষ দেখিতে পায়। এইজন্য গাড়ীর ঘোড়ার চোখের পাশে ঢাকনা বাঁধিয়া দেয়—যেন সম্মুখ ছাড়া অন্য দিকে দেখিতে না পায়। উভয় জন্তুরই শ্রবণ-শক্তি খুব প্রবল এবং উভয় জন্তুই কাণ নাড়িতে পারে। গোরুর নাকের চেয়ে ঘোড়ার নাকের ছিদ্র বড়। ঘোড়া দৌড়াইয়া চলে, কাজেই অনেক নিশ্বাসের দরকার হয়—এইজন্য নাকে বড় বড় ছিদ্র। ঘোড়ার মাথায় ও ঘাড়ে চুল থাকে।
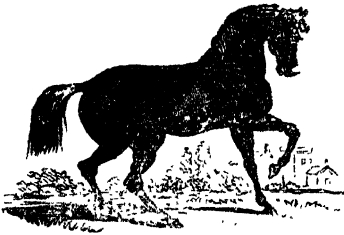
ঘোড়া।
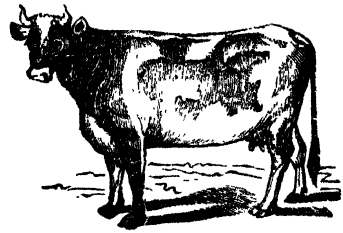
গোরু।

দাঁত।—গোরুর উপরপাটীর সম্মুখে দাঁত নাই, ঘোড়ার আছে। তবে ঘোড়ার আবার উপরপাটী ও নীচপাটীর দাঁতের মধ্যে (দুই পাশে) ফাঁক আছে। (ঘোড়া ও গোরুর করোটী দেখাও বা বোর্ডে চিত্রাঙ্কণ করিয়া দাঁতের বিন্যাস বুঝাইয়া দাও) গোরুর ও ঘোড়ার দাঁত দেখিয়া কিরূপে তাহাদের বয়স জানিতে পারা যায়—শিখাইয়া দাও।

দেহ।—ঘোড়ার পিঠের মধ্যভাগ নীচু—বসিবার বেশ সুবিধা হয়। গোরুর পিঠ তেমন নয়—সোজা।

পাকস্থলী।—গোরু প্রথমে তাড়াতাড়ি ঘাস পাতা গিলিয়া ফেলে—পরে আবার তাহা বমি করিয়া মুখের মধ্যে আনিয়া ভাল করিয়া চিবাইয়া থাকে। ইহাকেই জাবর কাটা বলে। ঘোড়া এক বারেই চিবাইয়া খায়

লেজ।—গোরুর লেজের মাথায় অল্প চুল—ঘোড়ার লেজে কেবলই চুল।

পা।—ঘোড়ার (শরীর আন্দাজে) পা সরু ও লম্বা—গোরুর মোটা ও খাট। ঘোড়ার ক্ষুর আস্ত, গোরুর মাঝখানে কাটা। শুইবার সময় গোরু আগে পিছনের পা ভাঙ্গে পরে সামনের পা ভাঙ্গে। ঘোড়া আগে সামনের, পরে পিছনের পা ভাঙ্গে। ছাগল—ঘোড়ার মত আগে সামনের পা ভাঙ্গে। আবার উঠিবার সময় গোরু আগে সামনের পা তোলে পরে পিছনের পা। ঘোড়া ইহার বিপরীত।

কার্য্য।—ঘোড়ার দাম বেশী, আর পালন করিতে খরচও খুব বেশী, কিন্তু আমাদের তেমন বেশী কাজে লাগে না। গোরুর দ্বারা জমির চাষ দেওয়া চলে, মোট বওয়া ও গাড়ী টানা চলে, গোরুর দুধ খাই। গোরুরচামড়ায় জুতা প্রস্তুত হয়। গোবর ও চোনায় সার হয়।

আয়ু।—মানুষের আয়ুকাল সাধারণতঃ ১০০ বৎসর। "নরগজে বিশেষয়। তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়। বাইশ বলদ তের ছাগল। তার অর্দ্ধেক কুকুর বিড়াল॥"

অর্থাৎ মানুষ ও হাতী ১০০, ঘোড়া ৫০, গোরু ২২, ছাগল ১৩, কুকুর ১১, বিড়াল ৭ বৎসয় বাঁচে।

পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাকবোর্ডে লেখ :—

অঙ্গ	গোরু	ঘোড়া
মস্তক	শিং আছে	চুল আছে
দাঁত	উপরপাটীর সম্মুখে নাই	দুই পাটীর পাশে ফাক আছে
	জাবর কাটে	জাবর কাটে না
পা	মোটা ও খাট	সরু ও লম্বা
	কাটা খুর	আস্ত খুর
পিঠ	সমান	মাঝখানে নীচু
লেজ	লেজের মাথায় অল্প চুল	লেজে বড় বড় চুল

৩। বিড়াল জাতীয়—সিংহ ও ব্যাঘ্র।

উপকরণ—ব্যাঘ্র ও সিংহের পুতুল বা ছবি এবং বিড়ালের ছবি। বাঘের ছাল।

আকার—(চিত্র দেখাইয়া) পাখীর মধ্যে ময়ুর অপেক্ষা সুন্দর কোন পাখী নাই, আর জন্তুর মধ্যে ব্যাঘ্র অপেক্ষাও সুন্দর কোন জন্তু নাই। বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় পীত ও উজ্জ্বল—তার উপর খুব কাল কাল ডোর টানা।
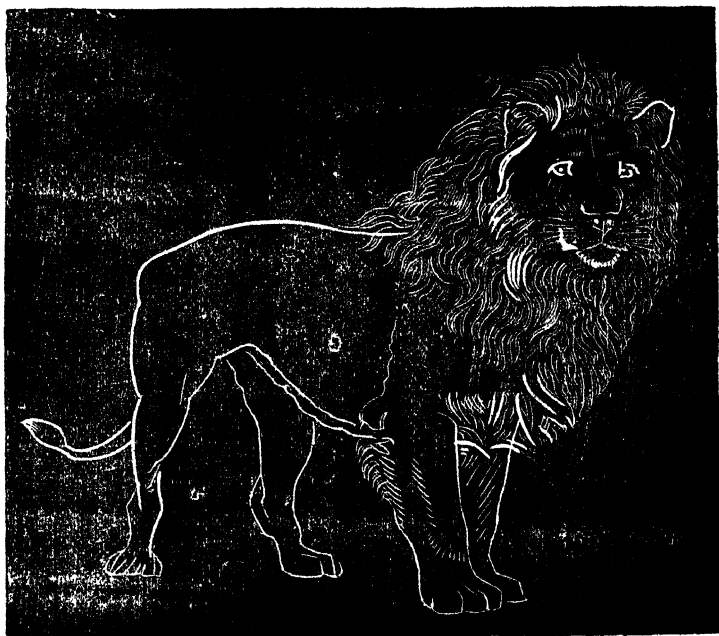
সিংহ।

সিংহের রঙ্ কটা—পোড়া মাটীর মত। (বিড়ালের গায়ে নানা রঙ্ দেখিতে পাওয়া যায়) সিংহ ব্যাঘ্র দুইই প্রায় ৩।৪ ফুট উচ্চ হইয়া থাকে (একটী ৪ ফুট উচ্চ বালককে খাড়া করিয়া দেখাও)। বাঘের ঘাড়ে

লোম হয় না—বিড়ালের মত। সিংহের ঘাড়ে ও মাথায় বড় বড় লোম হয়, তাহাকে কেশর বলে। এই কেশরে সিংহকে মুনিঠাকুরের মত দেখায়। সিংহীর কেশর হয় না। বিড়ালের লেজের মত বাঘের লেজ স্থাড়া—সিংহের লেজের মাথায় চুল আছে।

ব্যাঘ্র।

ইহাদের চোখ, পা, নখ, গোঁপ সব বিড়ালের মত। (বিড়ালের এই সমস্ত অঙ্গের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আদায় কর) বিড়ালের মত ইহারাও রাত্রিতে শিকার ধরে। বাঘ দিনে বড় বড় হলুদ বর্ণের লম্বা ঘাসের ভিতর লুকাইয়া থাকে—গায়ের রঙে ও ঘাসের রঙে মিলিয়া যায় বলিয়া ধরা যায় না। সিংহ কটা রঙের বালির ভিতর পড়িয়া থাকে। বিড়াল যেমন ছোঁ পাতিয়া ইঁদুর ধরে, ইহারাও তেমনি ছোঁ পাতিয়া অন্যান্য জন্তু ধরে। হরিণ ইহাদের প্রিয় খাদ্য। তৃণভোজী জন্তুরা প্রায়ই সন্ধ্যার সময় জল খাইবার জন্য জলাশয়ের ধারে যায়। ইহারাও ইহা জানিয়া সন্ধ্যার সময় জলাশয়ের

ধারে ছোঁ পাতিয়া বসিয়া থাকে। ইহাদের গায়ে খুব জোর—হরিণ, গোরু, মহিষ পর্য্যন্ত মুখে করিয়া লইয়া যায়। ইহারা খুব লম্ফ দিতে পারে—এক লম্ফে ২০ ফুট। (বালকের মধ্যে কে লম্ফে ও কে উল্লম্ফনে—(High jump and long jump) পারদর্শী জিজ্ঞাসা কর—বালকেরা ৭।৮ ফুট লম্ফ দিতে পারে)।

প্রকার।—আমাদের দেশের বাঘের মত এত বড় বাঘ কোন দেশে নাই—ইহারা বড়ই হিংস্র। লোকালয়ে ঢুকিয়া মানুষ, গোরু, ঘোড়া, ছাগল মারিয়া ফেলে। আসামের ও চট্টগ্রামের পাহাড়ে আর হিমালয়ের নিম্নপ্রদেশে ও সুন্দরবনের জঙ্গলে ইহাদের বাস।

চিতাবাঘ মানুষ খায় না—ইহাদের আকার কিছু ছোট—গার বর্ণ হলুদ—তাহার উপর কাল কাল চক্র। ইহারা ছাগল, বাছুর, হাঁস, মুরগী ধরিয়া খায়—ইহারা গাছে থাকে। আসামের ও চট্টগ্রামের পাহাড়ের মধ্যে কাল বাঘ দেখিতে পাওয়া যায়—ইহারাও খুব হিংস্র। এই শ্রেণীর আর এক রকমের জন্তু আছে তাহাকে বনবিড়াল বলে—ইহারাও গাছে থাকে আর পাখী ধ'রে খায়—ইহাদের গায়ের রঙ শৃগালের মত। আসামের পাহাড়ে ইহাদের বাস। সিংহ লোকালয়ে আসে না। সিংহের প্রধান বাসস্থান আফ্রিকা। সিংহও বাঘের মত বলশালী কিন্তু এত হিংস্র নয়—আর লোকালয়ে আসিয়া উৎপাত করে না। সকল জন্তু সিংহকে ভয় করে। এই জন্য সিংহ পশুরাজ। সিংহ গাছে চড়িতে পারে না।

ব্যবহার।—বাঘ পোষ মানে কিন্তু ক্রোধ বা ক্ষুধা হইলে প্রতিপালককেও মারিয়া ফেলে। এই জন্য কেহ বাঘ পোষে না। (সার্কাসে বাঘের সঙ্গে খেলার গল্প কর) সন্ন্যাসীরা বাঘের চামড়া ব্যবহার করে—চর্ম্ম বেশ গরম। বাঁশ কি কাঠ দিয়া খাঁচা প্রস্তুত করিয়া তার মধ্যে ছাগল বাঁধিয়া রাখে—বাঘ ছাগল খাইতে খাঁচায় ঢুকিলেই খাঁচার দরজা পড়িয়া যায়। (একটা ইঁদুর ধরার কল দেখাও) এইরূপে বাঘ ধরে।

হাতীতে চড়িয়াও বাঘ শিকার করে। সিংহ শিকার করা বড় কঠিন—আফ্রিকার লোকেরা ঘোড়ায় চড়িয়া সিংহ মারে। অনেক সময় নিজেরাও মারা পড়ে।

ব্যাঘ্রী ও সিংহী তিন বৎসর বয়সে গর্ভধারণে সমর্থ হয় ও প্রায় সাড়েতিন মাস গর্ভধারণের পর ২ হইতে ৬টী পর্য্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে। ইহারাও বিড়ালীর মত ছানাগুলি লুকাইয়া রাখে। কেন? কাহার ভয়ে?

৪। শৃগাল ও নেকড়েবাঘ।

আকার।—(চিত্র দেখাইয়া) দেখিতে কোন্ জন্তুর মত? কুকুরের মত। দেশী কুকুরের চেয়ে শৃগালের গায়ের লোম বড়। দেশী কুকুরের লেজ ন্যাড়া—বিড়ালের লেজের মত কিন্তু শৃগালের লেজে প্রচুর চুল আছে। নেকড়েবাঘ দেখিতেও শৃগালের মত কিন্তু শৃগাল অপেক্ষা আকারে বড়। শৃগালের গায়ের রঙ্ মাটীর মত ময়লা, নেকড়ের রং
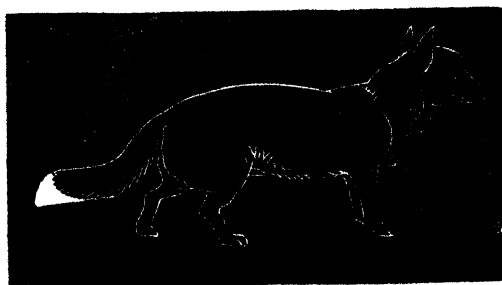
শৃগাল।

একটু কটা ও পরিষ্কার। দাঁত ও পা কুকুরের মত, তবে মুখ কুকুরের মুখের চেয়ে আর একটু লম্বা ও মুখের সম্মুখের ভাগ একটু অধিক ছুঁচাল।

কুকুরের মত গন্ধে গন্ধে শিকারের অন্বেষণ করে। ঘ্রাণশক্তি প্রবল। নেকড়ে শৃগাল অপেক্ষা অধিক বলবান। বাঘের মত গোরু, বাছুর, ছাগল ধরিয়া খায় বলিয়া ইহাকে (নেকড়ে) বাঘ বলে, বাস্তবিক পক্ষে ইহার আকৃতি বাঘের মত নয়। নেকড়ে কুকুরজাতায়—বাঘ, বিড়াল-জাতীয়।

নেকড়েবাঘ।

প্রকার।—ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই শৃগাল আছে। ইউরোপের দক্ষিণে শৃগাল দেখিতে পাওয়া যায়। খেঁকশিয়াল নামে আর একজাতীয় শৃগাল আছে। তাদের বর্ণ একটু লাল্‌টে—শৃগালের চেয়ে আকারে ছোট। নেকড়েবাঘের প্রধান আড্ডা অষ্ট্রীয়া ও রুসিয়া (বালকেরা ভূগোলের এতদূর পড়িয়া থাকিলে, মানচিত্রে স্থান দেখাইয়া দাও)। আমাদিগের দেশে যশোহর, খুলনা, বরিশাল ও সুন্দরবন অঞ্চলে নেকড়েবাঘ আছে। অযোধ্যায়ও অনেক নেকড়েবাঘ আছে। নেকড়ের আর এক নাম কেঁদো বাঘ।

ব্যবহার।—শৃগাল ছোট ছোট জীব জন্তু ধরিয়া খায়। পচা শব খাইতে খুব ভালবাসে। এই সমস্ত পচা শব খাইয়া আমাদিগের কি উপকার করে ?

আর কোন্ কোন্ পশু পক্ষী এইরূপ পচা শব খায় ? (মিউনিসিপালিটির ম্যাথরদিগের কার্য্যের সহিত তুলনা কর—গ্রামের মিউনিসিপাল ম্যাথর কে ? শৃগাল, কুকুর, কাক, শকুণ ইত্যাদি) শৃগাল গর্ত্তে বাস করে—রাত্রিতে বাহির হইয়া খাদ্য অন্বেষণ করে। (প্রহরে প্রহরে ডাকে বলিয়া যামঘোস নাম—ক্যাহুয়া, ক্যাহুয়া ডাক) একসঙ্গে অনেক শৃগাল থাকে, একটা ডাকিলে সকলে ডাকিয়া উঠে। (শৃগাল কিরূপে কুকুরের ছানা চুরী করে তাহার গল্প বল) শৃগাল খুব চালাক। সময় সময় ছোট ছোট ছেলে চুরী করিয়া লইয়া যায় (গ্রামের এরূপ কোন ঘটনা থাকিলে বিবৃত কর) শৃগাল আক, কাঁঠাল, ও খেজুর খাইতে ভালবাসে। শৃগাল কুকুরকে বড় ভয় করে। গ্রামে বাঘ আসিলে শৃগাল এক রকম বিকট শব্দ করিয়া সকলকে সাবধান করে—ইহাকেই ফেউডাকা বলে।

নেকড়েবাঘ ছাগল, বাছুর, কুকুর ও ছোট ছোট ছেলে লইয়া যায়। "অযোধ্যায় ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রতিবৎসর শত শত শিশুসন্তান এইরূপে অপহৃত হয়।" নেকড়ে সময় সময় শিশুকে লালনপালনও করে। লক্ষ্ণৌ নগরে এইরূপ একটী শিশু আনীত হইয়াছিল—সে নেকড়ের মত চলিত, কাঁচা মাংস খাইত ও নেকড়ের মত শব্দ করিত। (ভল্লুক-পালিতা কন্যার গল্প কর)। নেকড়েবাঘ অনেক সময় দলে দলে ফেরে একদলে ২০ হইতে ২০০ শত পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যখন দলবদ্ধ হইয়া আক্রমণ করে তখন গোরু, ঘোড়া, মানুষ প্রভৃতি কাহারও নিস্তার নাই (সেই প্রভুভক্ত ভৃত্যের গল্প বল)।

৫। ভল্লুক ও মধুভুক।

আকার। ভল্লুকের আকার একটা ছোট গোরুর মত—গায় খুব ঘন ও বড় বড় লোম। মুখের আকৃতি কতকটা কুকুরের মত। কিন্তু দাঁতগুলি কুকুরের মত নয়। অনেকটা মানুষের মত। পায়ে ৫টী করিয়া নখ আছে। সম্মুখের দুই পার নখগুলি লম্বা ও খুব শক্ত, একটু বক্র ও ধারাল। ভল্লুক পশ্চাতের দুই পার উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারে (যে দিন গ্রামে বাজীকরেরা ভালুক নাচাইতে আনে, সেই দিন এ পাঠ দিলে ভাল
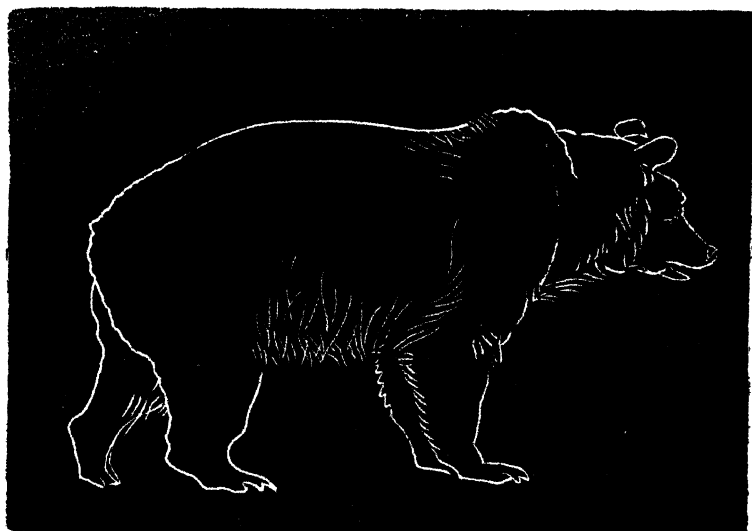
ভল্লুক।

হয়) কুকুরকে শিক্ষা দিলেও পশ্চাতের পার উপর ভর করিয়া একটু দাঁড়াইতে পারে কিন্তু কুকুর বিড়ালের পদতলের সমস্ত অংশ মাটীতে পড়ে না, ইহারা কেবল আঙ্গুলের উপর ভর করিয়া দাঁড়ায়—পদতলের গোড়ালী উঁচু হইয়াই থাকে। ভালুকের পদতলের সমস্ত অংশ (আমাদের মত)

মাটীতে পড়ে। ভালুকের কাণ ছোট, লেজও ছোট। নাকটী বেশ সরু, ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ। আর কোন্ জন্তুর ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ? ইহারা তীক্ষ্ণ নখের দ্বারা মাটী খুঁড়িয়া বাসের নিমিত্ত গর্ত্ত করে। ভালুক খুব গাছে চড়িতে পারে। আর কোন্ জন্তু গাছে চড়িতে পারে? গাছে চড়িতে হইলে কিরূপ নখ আবশ্যক?

প্রকার।—সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলে অনেক ভালুক আছে। ভারতবর্ষের আরও অনেক জঙ্গলে ভালুক দেখিতে পাওয়া যায়। ভালুকের বর্ণ হয় কাল না হয় মেটে। উত্তর মেরুর নিকট যে সকল ভল্লুক থাকে তাহাদের বর্ণ খুব সাদা—আর ইহারা আকারেও খুব বড়। আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া ভিন্ন পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই ভালুক দেখিতে পাওয়া যায়।

মধুভুক।

ব্যবহার।—ভালুক ফল, মূল, মধু ও শামুক খাইয়া থাকে। গাছে উঠিয়া ফল পাড়ে ও মৌচাক ভাঙ্গে। গায় খুব ঘন ও বড় বড় লোম থাকাতে মৌমাছি হুল ফুটাইতে পারে না। ভালুক সাধারণতঃ শান্ত কিন্তু উৎপাত করিলে ভয়ঙ্কর হয়—মানুষ মারিয়া ফেলে। শ্বেত ভল্লুক মাছ ও উদ ধরিয়া খায়। (মেরুর নিকটে ফল মূল আছে কি না জিজ্ঞাসা কর)। বাজরুভালুক নামে আর এক রকম ভালুক আছে

তাহারা আকারে কতকটা শূকরের মত। ইহারা মধু খাইতে খুব ভালবাসে বলিয়া ইহাদিগকে মধুভুক বলে। ইহাদের পিঠের উপর সাদা লোম ও পেটের উপর কাল লোম। মেরুর সন্নিহিত স্থানের লোকেরা ভালুকের চামড়ায় কোট, টুপি, দস্তানা, পায়জামা প্রস্তুত করে। কেন? তাহারা ভালুকের মাংসও খায়।

৬। নীলগাই ও হরিণ।

উপকরণ—নীলগাই, হরিণ, বলগাহরিণ, কস্তুরীহরিণ প্রভৃতির চিত্র।

নীলগাই দেখিতে অনেকটা গোরুর মত। তবে শিং গোরুর মত নহে। নীলগাইর শিং স্ক্রুপের মত জড়ান জড়ান লম্বা শিং। পাহাড় ও জঙ্গলে বাস করে। ভারতবর্ষের উত্তরাংশেই ইহাদিগের বাস। ইহাদের গায়ের রঙ একটু নীলাভ বলিয়া ইহাদের নাম নীলগাই। নীলগাই হরিণজাতীয়।

হরিণ।

নানা রকমের হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন হরিণ গোরুর মত বড়। হরিণের মাথায় ডালবিহীন বা ডালপালা যুক্ত শিং থাকে। কোন কোন হরিণের শৃঙ্গে (প্রত্যেকটায়) ৬।৭ টা করিয়া ডাল দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় হরিণের শৃঙ্গের এক ডালের মাথা থেকে আর এক ডালের মাথা পর্য্যন্ত পরিসর প্রায় ২।৩ হাত।

আবার কুকুরের মত ছোট ছোট হরিণও আছে। ইহাদের মাথায় ছোট ছোট শিং।

হরিণের বর্ণ পিঙ্গল। পোড়া মাটীর মত। কোন কোন হরিণের গায় সাদা সাদা চক্র আছে। এই হরিণ দেখিতে বেশ সুন্দর।

হরিণের শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি ও দর্শনশক্তি সমস্তই বিশেষ প্রবল। হরিণের কাণ—ছাগলের মত—সকল দিকেই ঘুরাইতে পারে। অনেক দূর হইতে ব্যাঘ্র সিংহাদির ঘ্রাণ পাইয়া হরিণ পলায়ন করে। অনেক দূরে সামান্য শব্দ হইলেই হরিণ শুনিতে পাইয়া সাবধান হয়।

হরিণের চক্ষু খুব সুন্দর—বড় বড় চক্ষুর কোটরে, ঘনকৃষ্ণ চক্ষুর মনি দেখিতে সুন্দর।

হরিণের পা খুব সরু ও লম্বা। হরিণ খুব বেগে দৌড়াইতে পারে। ব্যাঘ্র, সিংহ হরিণকে দৌড়াইয়া ধরিতে পারে না।

প্রায়ই হরিণেরই শিং দেখিতে পাওয়া যায়। হরিণীর শিং হয় না।

কস্তুরীহরিণের শিং নাই। কিন্তু বড় বড় দুই দাঁত আছে—শূকরের বড় দাঁতের মত। এই হরিণগুলি প্রায় গোরুর মত বড়। এই জাতীয় হরিণের নাভিদেশে এক প্রকার কাদার মত সুগন্ধ পদার্থ থাকে। ইহাকেই মৃগনাভি বা কস্তুরী বলে। ইহার দ্বারা গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয় ও ইহা ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহার দাম অনেক—একতোলা ৬০৲ টাকা। নেপাল, ভুটান ও আসামের পাহাড়ে এই হরিণের বাস। হরিণীর নাভিতে কস্তুরী থাকে না। বলগাহরিণের বাস ল্যাপল্যাণ্ড দেশে। ইহাদের শিং খুব বড় বড়। ইহারা বরফের উপর স্লেজ নামক এক প্রকার চাকা-বিহীন গাড়ী টানে (ছবি দেখাও) হরিণ ঘাস পাতা খায় ও জাবর কাটে। হরিণের দাঁতের অবস্থান গোরু ছাগলের মত।

হরিণের মাংস উপাদেয়। হরিণের শৃঙ্গে ছুরী, ছাতা, লাঠী প্রভৃতির

উত্তম হাতল প্রস্তুত হয়। হরিণের চর্ম্মে সুন্দর জুতা প্রস্তুত হয়। ল্যাপল্যাণ্ডের লোকে বলগাহরিণের দুধ খায়, মাংস খায় আর তাহার চর্ম্মে নিজেদের পোষাক ও তাঁবু প্রস্তুত করে।

৭। শূকর ও গণ্ডার।

উপকরণ—শূকর ও গণ্ডারের চিত্র। শূকরের লোম, গণ্ডারের চর্ম্মনির্ম্মিত ঢাল।

আকার।—শূকর বেশ মোটা—গায় খুব মাংস। শূকরের চামড়া খুব পুরু। গায়ে সামান্য লোম আছে। সেগুলি খুব শক্ত (শূকরের লোম বা কুঁচি দেখাও) শূকরের পা খুব ছোট ছোট। মুখ লম্বা—ঠোঁট খুব শক্ত ও ধারাল—দাঁতগুলিও খুব শক্ত।

শূকরের গর্দ্দনা আর শরীর একটানা, গর্দ্দনা নাই বলিলেও হয়। গায়ের রঙ মেটে কাল—মহিষ ও হাতীর মত। শ্বেত শূকরও আছে তবে তাহার সংখ্যা অল্প।
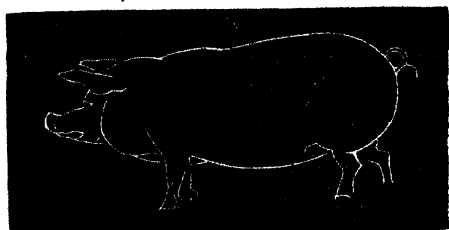
শূকর।

শূকরের লেজ ছোট—তাহা আবার অনেক সময়েই পাকাইয়া রাখে। শূকরের চোখ ছোট ছোট।

আহার।—শূকর কচু খাইতে বড় ভালবাসে। যে সকল গাছের মূল নরম, শূকর সেগুলি খুঁড়িয়া খায়। শূকরের শক্ত ঠোঁটকে চাকু বলে—এই চাকু দিয়া সে বেশ শক্ত মাটী খুঁড়িতে পারে। শূকরের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। যেখানে মাটীর নীচে তাহার খাদ্যের উপযোগী নরম শিকড় থাকে তাহা সে উপর হইতেই গন্ধে বুঝিতে পারে। ঘাস পাতাও খুব খায়। সম্মুখের ধারাল দাঁত দিয়া ঘাস কাটে ও কসের দাঁত দিয়া চিবায়

(নিজের মুখে—সম্মুখের ধারাল দাঁত ও কসের ভোঁতা দাঁত দেখাইয়া দাও) বুনো শূকরের আবার বড় বড় চারটী দাঁত থাকে (স্বদন্ত)— ইহার দ্বারা তাহারা কখন কখন মানুষ মারে। শূকরের খুরের মাঝে চেরা (গোরু, ছাগলের মত) কিন্তু শূকর জাবর কাটেনা। শূকর কেঁচো, শামুক, পাখী প্রভৃতি ছোট ছোট জীব জন্তুও খায়।

ব্যবহার।—শূকরের গায়ে ঘন লোম না থাকাতে মশা মাছিতে উৎপাত করে আর রৌদ্রের তাপও খুব বেশী লাগে। তাই শূকর জল কাদায় গা ডুবাইয়া থাকিতে ভালবাসে। (মহিষ ও হাতীর কথা জিজ্ঞাসা কর)। সাহেবেরা শূকরের মাংস ভালবাসে। শূকরের মাংস মেষ ও গোমাংস অপেক্ষা সুস্বাদু বটে কিন্তু সেরূপ পুষ্টিকর নয়। শূকর বনে জঙ্গলে বাস করে। ইহারা রাত্রে বাহির হয়—কৃষকের ধান, আক, কচু, আলু প্রভৃতি খাইয়া ফেলে। এইজন্য (যেখানে শূকরের উৎপাত বেশী) কৃষকেরা ক্ষেতের ধারে ছোট ঘর করিয়া রাত্রিতে তাহাদের শস্য পাহারা দেয়। বাঁশের বাথারির মাথায় কলার সাদা খোলা ঝুলাইয়া ক্ষেতের উপরে পুঁতিয়ারাখে; অন্ধকার রাত্রে শূকর মানুষ (শিকারী) ভ্রমে ভয় পাইয়া পলায়। শূকর গর্দ্দনা ফিরাইয়া এপাশ ওপাশ দেখিতে পারে না। সেইজন্য শূকর কেবল সম্মুখের জিনিষের উপরেই রোখ করে। শূকরে তাড়া করিলে, তাহার সন্মুখে না দৌড়াইয়া পাশের দিকে সরিয়া যাইতে হয়।

গণ্ডার।—আকারে মহিষ অপেক্ষাও বড়—চর্ম্ম খুব মোটা ও খুব শক্ত—গায়ের উপর ভাঁজে ভাঁজে সাজান—ভাঁজের দাগ গুলি বেশ দেখা যায়। লোম নাই। পেটের দিকে চামড়া একটু নরম। শিকারীরা এই খানেই তীর ও গুলি মারে। শরীরের

গণ্ডার।

অন্য জায়গায় মারিলে তীরের মাথা ভাঙ্গিয়া যায়। এইজন্য গণ্ডারের চামড়ায় ঢাল প্রস্তুত করে। মুখ শূকরের মত লম্বা। ঘাড় নাই বলিলেও হয়। ইহার নাকের উপর দুইটী শিং আছে (একটীও থাকে)—ইহা বাস্তবিক শিং নয়—ইহাকে খড়্গা বলে। এই খড়্গা দিয়া মানুষ, গোরু, এমন কি বাঘ সিংহ পর্য্যন্ত মারিতে পারে। ইহাদের উপরের ঠোঁট—খুব বড় ও বেশ নরম—ইহার দ্বারা (হাতীর শুঁড়ের কথা উল্লেখ কর) ডাল পালা জড়াইয়া ধরে। গণ্ডার ঘাস পাতা ও ছোট ছোট ডালপালা খায়। ইহারা মাংস খায় না। ইহাদিগের দাঁত খুব শক্ত—মট্ মট্ করিয়া ডাল চিবাইয়া খায়। জলে যে সমস্ত গাছ হয় তাহাই ইহাদের প্রিয় খাদ্য। ইহাদিগের পা ছোট। প্রতিপায় তিনটী করিয়া খুর (ঘোড়ার একটী, গোরুর দুইটী)। লেজ খুব ছোট। জলে থাকিতে (মহিষ শূকরের কথা বল) ভালবাসে। আসামের ও চট্টগ্রামের জঙ্গলে গণ্ডারের বাস। গণ্ডার অনেক দিন বাঁচে।

৮। বানর ও বনমানুষ।

উপকরণ—নানা জাতীয় বানরের ও নানাবিধ বনমানুষের চিত্র।

ছবি দেখাও।—জন্তুর মধ্যে বানরই অনেকটা মানুষের মত। গোরুর, ঘোড়ার, কুকুরের মুখ লম্বা—বানরের মুখ অনেকটা মানুষের মুখের মত চ্যাপটা। বানর মানুষের মত দাঁড়াইতে পারে। হাত দিয়া জিনিষ ধরিতে পারে। গোরু, ঘোড়ার চার পা—কিন্তু বানরের চার হাত। এই চার খানিকেই হাত বলে কেন? কারণ সে এই চারি অঙ্গের দ্বারাই জিনিষ ধরিতে পারে। মানুষ পার আঙ্গুল দিয়া ছোট ছোট জিনিষ ধরিতে পারে কিন্তু মানুষের পার আঙ্গুল এরূপ কার্য্যে বড় ব্যবহার হয় না। মানুষ পার তালু গুটাইতে পারে না। বানর পার তালু

শুঁটাইয়া গাছের ডাল ধরে। গোরুর কেবল চার পা—কোনটীর দ্বারাই কোন জিনিষ ধরিতে পারে না।

হনুমান।
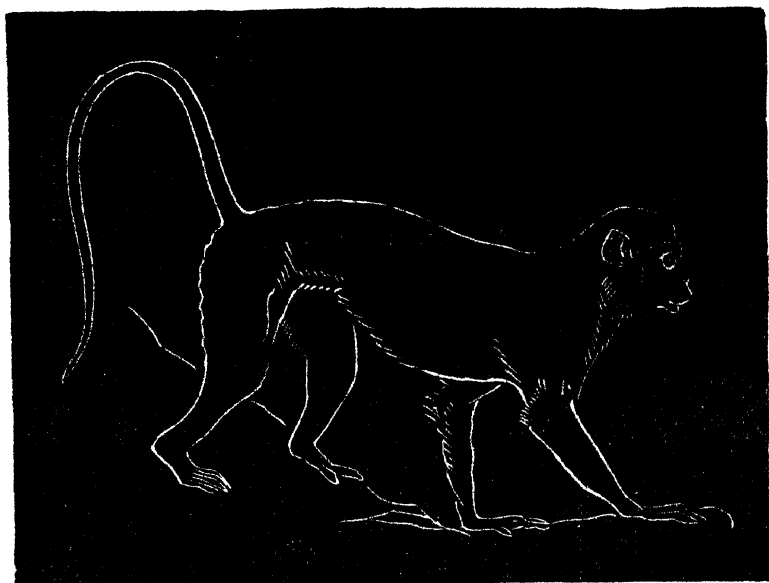
বিড়াল কুকুর নখ দিয়া জড়াইয়া ধরিতে পারেনা—বিঁধাইয়া ধরে। সকল বানরের লেজ থাকে না। আবার কোন কোন বানরের গলার কাছে একটা থলে থাকে। তার মধ্যে খাবার জিনিষ সঞ্চয় করিয়া রাখে। নানা প্রকারের বানর দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বানরগুলি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথাঃ—

১। মর্কট—ইহাদের গলার কাছে থলে থাকে আর ইহাদের লেজ আছে।

২। হনুমান—ইহাদের গলার কাছে থলে নাই—লম্বা লেজ আছে।

৩। বনমানুষ—ইহাদের গলার কাছে থলে নাই আর লেজও নাই।

বনমানুষ (ওরাং)
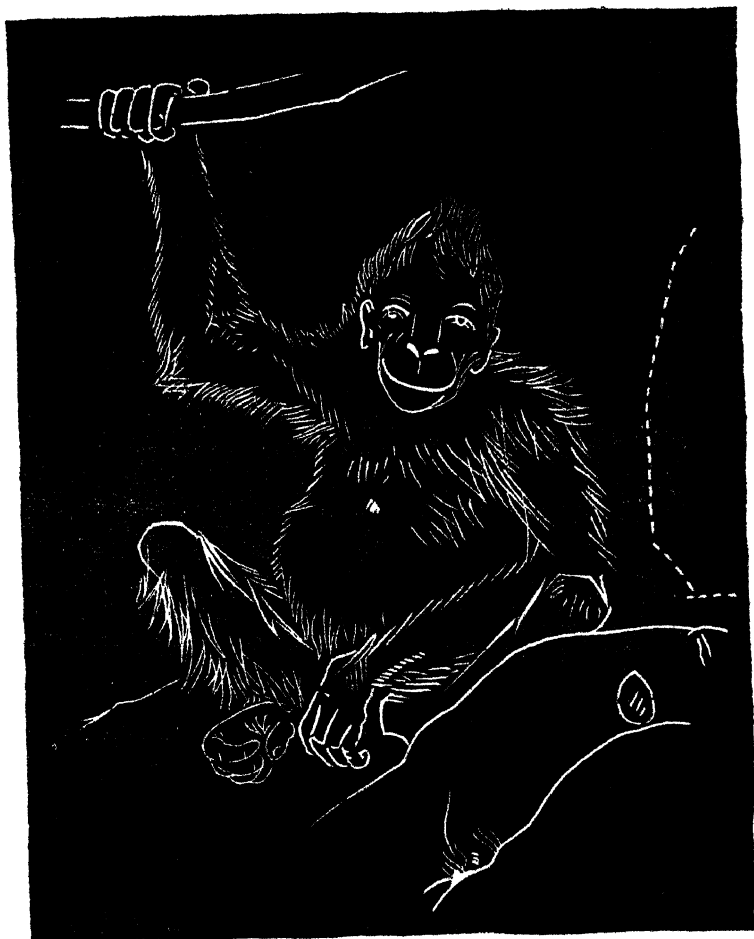
মর্কট—বাজীকরেরা যে বাঁদর নাচায়, আমরা সাধারণতঃ তাহাকেই বানর বলে থাকি। এই বাঁদরের নামই মর্কট। ইহাদের

মুখের মধ্যে—গালের দুই পাশে (গলার কাছে) থলে আছে। কোন খাবার জিনিষ পাইলে টপ্ টপ্ করিয়া আগে এই থলে বোঝাই করে। মনে কর এক জনের বাগান থেকে ফল চুরী করিতেছে—যদি সেই খানে বসিয়াই চিবাইয়া খাইতে আরম্ভ করে তবে অনেক সময় লাগিতে পারে—আর এর মধ্যে বাগানওয়ালা আসিয়া তাড়া করিতে পারে। সেইজন্ত আগে থলে বোঝাই করে। যদি কেহ তাড়ায়, তবে দূরে গিয়া ঐ থলের জিনিষ খাইবে—আর যদি না তাড়ায়, তবে প্রথমে ভবিষ্যতের জন্ত থলে বোঝাই করিয়া রাখিয়া পরে অন্তফল খাইতে আরম্ভ করে। ইহাদের লেজ শরীর অপেক্ষা বেশী লম্বা হয় না। দাঁড়াইলে দেড় কি দুই ফুট মত উঁচু হয়। গায়ের লোম কটা—মুখ একটু চেপ্টা। ছোট কালে বেশ পোষ মানে। শিখাইলে বেশ [illegible]টিতে শেখে, নাচিতে শেখে, খঞ্জনী বাজায়, সেলাম করে, টুপি মাথায় দেয়, পয়সা ভিক্ষা করে। ইহারা জলে বেশ সাঁতরাইতে পারে। দলবদ্ধ হইয়া বন জঙ্গলে বাস করে; একদলে ২০।২৫ হইতে ১০০।২০০ মর্কট বাঁদরও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কচি পাতা ও ফল মুল খায়। সময় সময় পোকা, মাকড়, ফড়িং, ব্যাং, গুগ্‌লীও খায়। মর্কটের বাচ্চা বড় না হওয়া পর্য্যন্ত মার বুকে ঝুলিয়া থাকে। আমেরিকায় নানা রকমের মর্কট আছে। ইহাদের অনেকেরই লেজ ও হাত খুব বড় বড়। ইহারা কেবল লেজ দিয়া ডাল জড়াইয়া ধরিয়াই বেশ ঝুলিতে পারে (ছবি দেখাও)।

কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ স্থানে খুব বানরের উৎপাত। (বানর কেমন ক'রে জিনিষ চুরী করিয়া খাবার আদায় করে তাহার গল্প বল)।

হনুমান—বাজীকরেরা সাধারণতঃ যে মর্কট বানর লইয়া খেলা করে হনুমান সেই বানরের চেয়ে বড়। শরীর বেশ সোজা—রঙ ছাই ছাই—অর্থাৎ সাদার সঙ্গে কাল মিশাইলে যেমন হয়। তবে মুখ ও হাত পার তালু কাল। লেজ খুব লম্বা, ২॥ হাত মত। ইহাদের গালে

থলে নাই। মুখ বানরের মত লম্বা নয়। সম্মুখের হাতের চেয়ে পেছনের হাত বড়। ইহারা দলে দলে থাকে। মধ্যে মধ্যে একদলের সহিত অপর দলের খুব মারামারি হয়—তাহাতে রক্তারক্তি হয়—এমন কি এইরূপ মারামারিতে দু চারটী মারাও যায়। ইহারা বাগানে ও ক্ষেতে ঢুকিয়া খুব অনিষ্ট করে—সমস্ত খাইয়া, ভাঙ্গিয়া ও ছিঁড়িয়া নষ্ট করিয়া যায়। ইহারা কচিপাতা, শস্য ও ফল খাইয়া থাকে। বানরের মত কীট পতঙ্গ ধরিয়া খায় না।

গঙ্গার দক্ষিণ দিক হইতে মধ্য প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই হনুমান আছে। তবে তীর্থস্থানে ইহাদের উৎপাত বেশী। কাশী, বৃন্দাবন, জগন্নাথ প্রভৃতি স্থানে ইহারা যাত্রীদিগকে নানারূপে বিরক্ত করে কিন্তু রামচন্দ্রের ভক্ত বলিয়া যাত্রীগণ ইহাদিগকে মারে না বরং নানারূপ খাবার দিয়া ইহাদিগকে তুষ্ট করে। ইহারা খুব লাফাইতে পারে। ছোট ছোট বাচ্চা মার বুকে লাগিয়া থাকে। ইহারা বাচ্চা লইয়াই লাফায়। ইহারা গাছের উপর বাস করে। জল দেখিয়া ভয় করে। ইহারা সাঁতরাইতে জানে না।

উল্লুক।

উল্লুক—উল্লুকের লেজ নাই। আর খাবার রাখার জন্য গালে থলেও নাই। সাধারণ মর্কট বানরের মত ছোট। তবে গায়ের রঙ খুব কাল। লোম বেশ নরম। হাত

খুব লম্বা—হাঁটিবার সময় হাত উঁচু করিয়া হাঁটিতে হয়। শিখাইলে বেশ হাঁটিতে ও দৌড়াইতে পারে আর আড়ার উপরে নানারূপ বাজী করিতে পারে। যখন হুকু হুকু করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে তখন কাণ ঝালাপালা হইয়া উঠে। গাছের কচি পাতা ও ফল মূল খায়। এক ডাল থেকে যখন আর এক ডালে ঝুল খায় তখন বেশ আমোদ বোধ হয়। ১২।১৪ হাত দূরের ডালও এক ঝুল দিয়া গিয়া ধরে। আসামের অনেক জেলাতেই উল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়। আফ্রিকার উল্লুককে গিবন বলে। সেগুলি প্রায় হনুমানের মত বড়। এমেরিকায় সাদা উল্লুক আছে।

ওরাং ওটাং বনমানুষের কথা—সুমাত্রা, বর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে বনমানুষের বাস। ইহারা মানুষ নয়—তবে কতকটা মানুষের মত চেহারা বলিয়া, আর বনে থাকে বলিয়া ইহাদিগকে বনমানুষ বলে। ইহাদের গায়ে বড় বড় লোম—রঙ্ মেটে মেটে। দাঁড়াইলে ৩ হস্তমত উঁচু হয়। ঠোঁট দুইখানি একটু সম্মুখের দিকে ঝুকিয়া পড়া। হাত খুব লম্বা—দাঁড়াইলে মাটীতে ঠেকে। লেজ নাই। ইহারা গাছের পাতা ও ফলমূল খায়। গাছের উপর ডালের মাচা করিয়া তাহার উপর বাস করে। ইহারা হনুমানের মত মাটীতে লাফাইতে পারে না কিন্তু এক ডালে ঝুল দিয়া ১০।১২ হাত দূরের আর এক ডাল ধরিতে পারে। বনমানুষ পোষ মানে আর নানারূপে অনুকরণ করিতে পারে। এই বনমানুষকেই ওরাং বা ওরাংওটাং বলে। শিখাইলে মানুষের মত কলম ধরিয়া কাগজে নানারূপ দাগ দিতে পারে।

গরিলা।—ইহারা মধ্য আফ্রিকার জঙ্গলে থাকে। গায়ে খুব ঘন কাল লোম। মুখের দাঁত খুব বড় বড়—বাঘের মত। উঁচুতে প্রায় ৪ কি ৪॥ হাত। ইহাদের মুখ অনেকটা ওরাঙের মত। ইহারাও ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের হাত খুব লম্বা, তবে মাটী ঠেকে না—হাঁটুর নীচ পর্য্যন্ত। ইহাদের গায়ে খুব জোর। গরিলা শত্রুকে

কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। খুব বলবান মানুষও ইহাদের সহিত জোরে পারে না। ইহারা অনায়াসে বাঘ মারিয়া ফেলে। ওরাঙের মত গাছের উপরে, ডালে ঝোপ বাঁধিয়া বাস করে। মানুষ দেখিলে গাছের উপর হইতে পা নামাইয়া দিয়া মানুষের গলা জড়াইয়া ধরে আর গাছের উপরে তুলিয়া লইয়া তাহাকে খুব জোরে মাটীতে ফেলিয়া দেয়।

শিম্পানজি।—ইহারাও আফ্রিকার বনমানুষ। শিম্পানজির চেহারা অনেকটা মানুষের মত। লোম কাল ও ঘন। দাঁড়াইলে মানুষের মত উঁচু হয়। মুখে বেশী লোম থাকে না। মুখখানি অনেকটা মানুষের মুখের মত চেপটা। গরিলা ও ওরাঙের মত অত কুকুর মুখো নয়। হাত দুখানি হাঁটু পর্য্যন্ত। কাণ দুইটী মুখ আন্দাজে বড়—নাক চ্যাপটা। দুই পার উপর ভর করিয়া হাঁটিতে পারে—তবে বেশীক্ষণ পারে না। মানুষের মত পিঠ সোজা করিতে পারে না। একটু সামনে ঝুঁকিয়া চলে। ইহারা প্রায়ই মাটিতে বাস করে। ফল মূল আহার। ইহাদের শরীরে খুব বল—সিংহ পর্য্যন্ত ইহাদিগকে ভয় করে। ছোট সময় ধরিয়া আনিলে বেশ পোষ মানে। শিখাইলে নানারূপ খেলা দেখাইতে পারে। মানুষের মত চামুচ দিয়া চা খাইতে পারে। বিছানায় কম্বল গায় দিয়া শুইতে পারে। সাহেবের মত ছুরী কাঁটা দিয়া খাইতে পারে।

[আদিম মানব পৃথিবী হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। অধ্যাপক ভল্‌স বলেন,—বর্ত্তমান কালে সর্ব্বাপেক্ষা বর্ব্বর ও আদিম মানব সুমাত্রার দক্ষিণ অংশে বিদ্যমান আছে। ইহারা 'কুর্ব্ব' নামে পরিচিত। ইহারা যাযাবর।গভীর অরণ্যে বিচরণ করে। বন্য পশুর মত খুঁটিয়া খায়। গহ্বরে অথবা পত্ররচিত বাসায় নিশিযাপন করে। ইহারা পশুপালনে অনভ্যস্ত। কোনও প্রকার যন্ত্রাদির ব্যবহারে অনভিজ্ঞ। খাদ্যের অন্বেষণ ও জঠর জ্বালা নিবৃত্তি ভিন্ন ইহাদের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বাঁধিয়া বিচরণ করে। কুর্ব্বর জাতি বদ্ধ নহে। পরিবার ও জাতির কোনও সংস্কার তাহাদের ঘটে নাই। কুর্ব্বর মৃতের সৎকার করিতে জানে না, যে যেখানে মরে সে সেখানেই পঞ্চভূতে বিলীন হয়। ইহাদের মধ্যে কোনরূপ ধর্ম্ম প্রচলিত নাই। [বসুমতী ১৭ই বৈশাখ ১৩১৭সাল।

৯। বাদুড় ও পেঁচা।

উপকরণ—একটা জীবন্ত বা মরা বাদুড় (অভাবে চামচিকা) ও একটা পেঁচা বা ইহাদিগের ছবি।

আকার—বাদুড়ের গায় লোম, কিন্তু পেঁচার গায় পালক। বাদুড়ের গায়ের লোম শেয়ালের মত। বাদুড়ের মুখও শেয়ালের মত লম্বা, দাঁতগুলিও অনেকটা শেয়ালের মত। চোখ দুটী খুব

পেঁচা।

উজ্জ্বল নয়। সাহেবেরা বাদুড়কে উড়ো শেয়াল (Flying fox) বলে। মুখখানি বাস্তবিক শেয়াল কুকুরের মতই। কাণে লোম নাই, কান দুটী ছোট ছোট। পেঁচার মুখ চ্যাপটা ও গোলপানা—চোখ দুইটী কতকটা

বিড়ালের চোখের মত কিন্তু বিড়ালের চোখের চেয়ে খুব উজ্জ্বল। ঠিক

যেন মানুষের মত—কাল। ইহাদের পাখীর মত ছোট দুইখানি (শিকারী পাখীর ঠোঁটের মত) ঠোঁট আছে। কাণ দুইটী ছোট ছোট, গর্ত্তমাত্র, পালকে ঢাকা থাকে। শরীর আন্দাজে পেঁচার মুখ খুব বড়। দুইই রাত্রিতে বেড়ায়, দিনের আলো চকে সইতে পারেনা। বাদুড় ও পেঁচা যেন আকাশের কুকুর ও বিড়াল। উভয়েরই পাখা খুব বড় বড় তবে পেঁচার পাখা পাখীর পাখার মত—কলমে তৈয়ারী। বাদুড়ের পাখা পাতলা রবারের মত, একখানি চর্ম্মে তৈয়ারী। বাদুড়ের পাখায় ছাতির লোহার শিকের মত হাড়ের শিক লাগান। (বাদুড় দেখাও বা বাদুড়ের পাখার চিত্র দেখাও—ঠিক আমাদের আঙ্গুলের মত—পাঁচটা সরু সরু ও লম্বা লম্বা হাড় পাখার সাথে লাগান) পায়ের আঙ্গুল গণিয়া দেখ—পাঁচটা করিয়া—তাহাতে আবার ধারাল ও বক্র নখ। পেঁচার পায়ে খুব ধারাল ও বক্র ৪টা করিয়া নখ আছে—এই নখগুলি বিড়ালের মত কোষে বন্ধ করিতে পারে। পেঁচা—সম্পূর্ণরূপে পিছনে মাথা ঘুরাইতে পারে (মানুষে পারে কি না জিজ্ঞাসা কর)।

বাদুড়ের স্পর্শশক্তি খুব প্রবল। ডালপালার মধ্যদিয়া অনায়াসে গমনাগমন করে—পাখাতেই স্পর্শশক্তি অধিক। পেঁচার শ্রবণশক্তি খুব প্রবল। বাদুড় উড়িবার সময় পাখার শব্দ হয়, কিন্তু পেঁচার পাখার শব্দ হয় না। পেঁচা ইন্দুর, বেঙ, ও নানারূপ পোকা মাকড় ধরিয়া খায়। পাখার শব্দ হইলে শিকার পলাইয়া যাইত। (বিড়ালের পায়ের শব্দ হয় না—তাহাতে বিড়ালের কি সুবিধা হয়?)

বাদুড় নানারূপ ফল খাইয়া থাকে—কীট পতঙ্গাদিও খায় কিন্তু

ফলই প্রধান খাদ্য। পাখার শব্দ হওয়াতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

চামচিকা।

দিনের বেলায় বাদুড় গাছের ডালে পায়ের নখ বাধাইয়া দিয়া ঝুলিয়া থাকে। পাখা দুখানি দিয়া চোখ মুখ ঢাকিয়া রাখে। সূর্য্যাস্তের দুই ঘণ্টা পরে বাহির হয় আর সূর্য্যাস্তের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে ফিরিয়া আসে। অনেক বাদুড় এক সঙ্গে একটা গাছ বা একটা বাগানে বাস করে। ইহারা একসঙ্গে থাকিতে ভালবাসে। যে যে গাছে বাস করে ঠিক সেই সেই গাছেই ফিরিয়া আসে। গাছ বা ডালের জায়গা লইয়া সময় সময় মারামারি করে। শেষ রাত্রে কিচির মিচির করিয়া অস্থির করিয়া তোলে। যে বাগানে একসঙ্গে অনেক বাদুড় থাকে তাহাকে লোকে 'বাদুড় বাগান' বলে। পেঁচা গাছের গর্ত্তে বা ঘরের কোণে বাসা করে।

বাদুড়ের ডিম হয় না, বাচ্চা হয়। বানরের বাচ্চার মত—মায়ের বুকের সঙ্গে লাগিয়া থাকে। বাচ্চা মায়ের দুধ খায়। একেবারে একটা কি দুইটা বাচ্চা হয়।

পেঁচার ৩।৪টী ডিম হয়—ডিমে তা দিয়া বাচ্চা বাহির করে।

পেঁচা আমাদের বড়ই উপকারী। পোকা, মাকড়, ইন্দুর, ছুঁচা, বেঙ, কেঁচো খাইয়া ইহাদের উৎপাত হইতে আমাদিগকে বাঁচায়।

বাদুড়ও কতক পরিমাণে পোকা মাকড় খায়। কিন্তু বাদুড় অপেক্ষা চামচিকাতেই বেশী পোকামাকড় খায়। চামচিকা বেঙ, ইঁদুরও খায়। পেঁচা সাধারণতঃ দুই জাতের। বড় বড় পেঁচাকে লক্ষ্মী পেঁচা বলে আর ছোটগুলিকে কালপেঁচা বলে। লক্ষ্মীপেঁচা লক্ষ্মীর বাহন। কালপেঁচা শনির বাহন। অজ্ঞ লোকের বিশ্বাস যে লক্ষ্মীপেঁচা ঘরে থাকিলে টাকা পয়সা হয় আর কালপেঁচা থাকিলে সর্ব্বনাশ হয়; লক্ষ্মীপেঁচাকে হুতুম পেঁচাও বলে—হুতুম হুতুম করিয়া ডাকে বলিয়া। কালপেঁচা কোঁক কোঁক করিয়া ডাকে। মূর্খলোকের বিশ্বাস যে কাল-পেঁচা বাড়ীতে ডাকলে বাড়ীর কাহারও মরণ হয়।

বাদুড় যেখানে বাস করে তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান অস্বাস্থ্যকর হয় কারণ বাদুড়ের বিষ্ঠার গন্ধ অপকারী। এইজন্য বাদুড়ের দলকে গ্রামের মধ্যে কোন বাগানে আড্ডা করিতে দিবে না।

চামচিকা এক রকমের ছোট বাদুড় বলিলেও হয়। তবে ইহাদের নাকের উপর দুইখান পাতলা চর্ম্মপত্র আছে—এইটুকুই বিশেষত্ব। চামচিকার কান দুইটা একটু বড় বড়। আর গোরুর মত উপর পাটির সামনে দাঁত নাই। পরিত্যক্ত গৃহেই চামচিকার আড্ডা। এক রকম চামচিকা আছে, তাহারা রক্ত খায়। ইহাদিগকে 'রক্তচোষা' বলে। ইন্দুর, ছুঁচা এবং অন্যান্য রাত্রিচর ছোট ছোট প্রাণীর শরীরে দাঁত বসাইয়া দিয়া রক্ত চুষিয়া খায়।

(দক্ষিণ আমেরিকায় ভ্যাম্পায়ার নামে এক রকম খুব বড় রক্তচোষা চামচিকা আছে। তাহারা নিদ্রিত পশুর ও সুবিধা পাইলে নিদ্রিত মানুষের রক্ত চুষিয়া খায়)।

১০। কাক, চিল ও শকুন।

উপকরণ—একটা জীবন্ত কাক বা কাকের ছবি। চিল শকুনের ছবি।

তোমরা সকলেই কাক দেখেছ? কয় রকমের কাক দেখিতে পাও। দাঁড়কাক ও পাতিকাক। দাঁড়কাক কেমন আর পাতিকাক কেমন? দাঁড়কাক বড় বড় আর তার গা সব কাল, পাতিকাক ছোট ছোট —আর তার গলার কাছে ছাইর মত রঙ। দাঁড়কাক ও পাতিকাকের ডাক শুনিয়া চিনিতে পার? কোন কাকের ডাক কেমন? কাক রাত্রে কোথায় থাকে? বড় বড় গাছের ডালে—প্রাতঃকাল হইলেই গাছ থেকে উড়িয়া যায়। তাহারা কোথায় বাসা করে? বড় বড় গাছে। নিকটস্থ কোন বড় গাছে কাকের বাসা আছে কিনা জিজ্ঞাসা কর। প্রশ্ন করিয়া এই সকল বিষয় আদায় কর :—

(১) কাকেরা একসঙ্গে থাকিতে ভালবাসে। অনেক কাক একসঙ্গে বাস করে।

(২) তাহারা গ্রামের নিকটেই থাকে—মানুষের বাড়ী থেকে দূরে থাকিতে চায় না কেন?

(৩) তাহারা এক গাছে অনেক বাসা তৈয়ারী করে। কি দিয়া বাসা তৈয়ারি করে? ছোট ছোট ডালপালা দিয়া। বাসার মধ্যে খড়, কুটা, তুলা, পালক পাতিয়া দেয়। কেন? একটা কাকের বাসা কত বড়?

এই দুইটী কাকের ছবি দেখ (বা মরা কাক দেখাও) আর এই কাকের পালক দেখ। দাঁড়কাকের রঙ কেমন? খুব চক্‌চকে কাল। একটু ভাল করিয়া দেখিলে বুঝিবে, চক্‌চকে কাল নয়—চক্‌চকে গাঢ় নীল (নীলকান্ত)। পাতিকাকের পাখা গাঢ় নীল কিন্তু গায়ের রঙ কাল। আর গলার কাছে ধূসর—ছাই ছাই।

কাকের ঠোঁট কেমন? (বোর্ডে আঁকিয়া দেখাও) উপরের ঠোঁটের

মাঝখানে একটু বাঁকান, নীচের ঠোঁট সরল। নীচের ঠোঁট অপেক্ষা উপরের ঠোঁট কিছু বড়। ঠোঁটের মাথা কেমন সরু। (বোর্ডের উপর কাকের পা ও নখ আঁক)—এই দেখ কাকের পায়ের আঙ্গুল কেমন লম্বা—তিনটী সামনে ও একটী আঙ্গুল পেছনে। যে সকল পাখী মাটীতে হাঁটে তাহাদের পার আঙ্গুল এই রকম। মোরগের পার আঙ্গুল কেমন?

চিলের ঠোঁট ও নখের সহিত কাকের ঠোঁট ও নখের কি পার্থক্য বার্ডে ছবি আঁকিয়া দেখাও। চিলের ঠোঁটের অগ্রভাগ বড়সীর মত বক্র বলিয়া শিকার ধরিবার সুবিধা হয়। যেমন বড়সী বিঁধাইলে মাছ খুলিয়া যাইতে পারে না (কেন পারে না তাহা বলিয়া দাও) সেইরূপ চিলের বক্র নখ বিঁধিলেও তাহার শিকার ছুটিয়া যাইতে পারে না। চিলের নখও খুব বক্র।

কাকের ঠোঁট।

কাকের খাদ্য।—কাককে সর্ব্বভূক্ বলে অর্থাৎ কাক সব জিনিষই খায়। তোমরা কাককে কি খাইতে দেখেছ? ভাত, মাছ, পোকা, আম, পেঁপে, কলা, সন্দেশ। হাঁ, কাক পচা মড়াও খায়। আমরা যে সকল ভাত, মাছ ফেলিয়া দিয়া থাকি তাহা কাক না খাইলে আমাদের কত অসুবিধা হইত—সে সমস্ত পচিয়া দুর্গন্ধ হইত। কাকে পোকা খাইয়াও কৃষকের অনেক উপকার করে—তাহা না হইলে পোকার পাল বাড়িয়া ক্ষেতের ধান টান সব নষ্ট করিয়া ফেলিত।

গোরু, বাছুর, ছাগল, মহিষ, শুইয়া পড়িলে কাক আসিয়া তাহাদিগের নাকের, চোখের ও কানের ভিতর হইতে উকুনের মত কীট বাহির করিয়া খায়। গোরু কেমন গা উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া কাককে নিজের অবস্থা জানায় ও যেখানে যেখানে পোকা আছে তাহা গা নাড়িয়া

দেখাইয়া দেয়। কাক গোরুর এই সঙ্কেত বেশ বুঝিতে পারে। কাকের দ্বারা এইরূপে গবাদি পশুর কত উপকার হইতেছে। কাক না থাকিলে ইহাদিগের সমস্ত গায় নানা কীট জন্মিয়া ইহাদিগকে মারিয়া ফেলিত।

পাখীর মধ্যে কাক খুব চালাক। ছোট ছেলেকে খাইতে দেখিলে তাহার মাথায় ঠোকর দিয়া তাহাকে কাঁদায়—আর হাঁ করিলে মুখের ভিতর থেকে খাবার কাড়িয়া লয়। (বালকদিগের নিকট হইতে কাকের দুষ্ট বুদ্ধির গল্প আদায় কর)।

শীতের শেষভাগে কাক বাসা বাঁধে (অনেক পাখীই এই সময়ে বাসা বাঁধে) আর বসন্তে তাহাদের ডিম পাড়ে। বর্ষার পূর্ব্বেই বাচ্চাগুলি বড়

হইয়া উড়িতে শেখে। যখন বাচ্চা ছোট থাকে—বাচ্চার বাপ মা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পোকা আনিয়া আনিয়া বাচ্চাগুলিকে খাওয়ায়। কাক

শকুন।
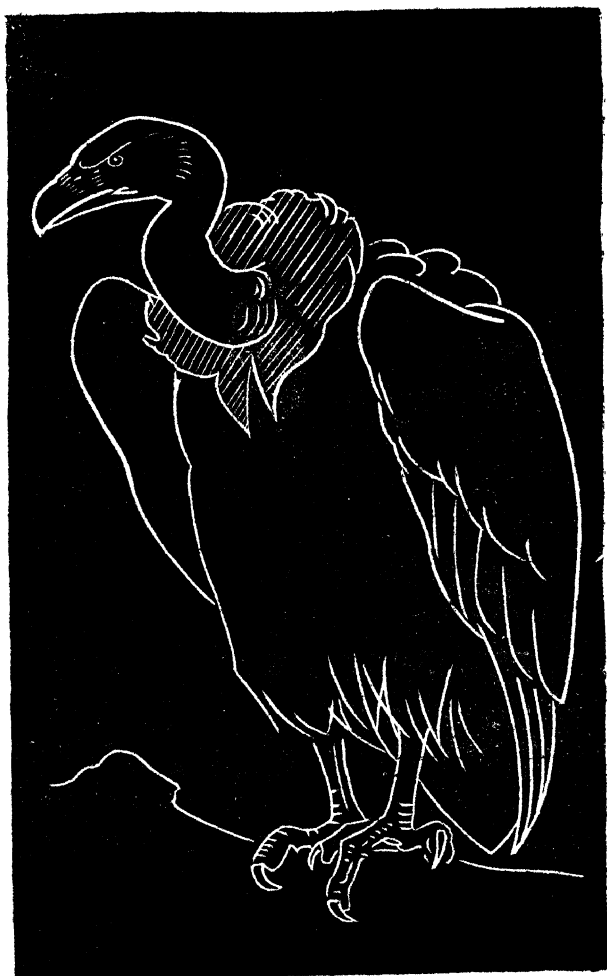
খুব চালাক হইলেও কোকিলের সঙ্গে পারে না। কোকিল নিজে বাসা করিতে জানে না। চুপ করিয়া কাকের বাসায় ডিম পাড়িয়া যায়। কাক নিজের ডিম ভাবিয়া তাহাদিগকেও তা দেয়। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইলে কাকের ছা ও কোকিলের ছা এক রকমই দেখায়। তারপর যখন কোকিলের বাচ্চা বড় হইয়া ডাকিতে শেখে তখন কাক তাহাকে ঠোকরাইয়া বাহির করিয়া দেয়। দাঁড়কাক অপেক্ষা পাতিকাকগুলিই বেশী দুষ্ট।

কাকের পা ও ঠোঁটের সঙ্গে শকুনের পা ও ঠোঁটের তুলনা কর। কাকের উপর ঠোঁট সামান্য বক্র কিন্তু শকুনের উপর ঠোঁট একটু বেশী বক্র। কেন? শকুনকে এই ঠোঁট দিয়া মরা জীবজন্তু টানিয়া ছিঁড়িতে হয়। ঠোঁট বক্র না হইলে, মাংস হইতে সহজেই ঠোঁট খুলিয়া আসিত। শকুনের পার নখ কাকের পার নখ অপেক্ষা বক্র, কারণ শকুনকে অনেক সময় নখ দিয়া শব ছিড়িতে হয়। চিলের ঠোঁট ও নখ শকুনের ঠোঁট ও নখের মত। তোমরা পক্ষীরাজ ঈগলের নাম শুনিয়াছ। ঈগল একটা খুব বড় চিলের মত—৬।৭ টা চিল একত্র করিলে যত বড় হয় ঈগল তত বড়। ঈগলের ঠোঁট ও পা এইরূপ। (চিত্রে দেখাও) ঈগল ছোঁ মারিয়া ছোট ছোট ছাগল, ভ্যাড়া, বাছুর লইয়া যায়। চিল ছোঁ মারিয়া মাছ ধরে। ঈগল ও চিল তাজা জীব খায়, শকুন পচা শব খায়। শকুন উড়িয়া খুব উচ্চে উঠে। কেন? কোথায় কোন্ শব পড়িয়া আছে না আছে তাহাই দেখিবার জন্য। শকুন খুব উচ্চবৃক্ষে বাসা বাঁধে। শকুন অনেকদিন বাঁচে। কেহ কেহ বলেন যে, অনেক শকুন ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

১১। বক ও হাড়গিলা।

উপকরণ—বকের ছবি ও বকের পালক। হাড়গিলের ছবি।

তোমরা কে কে বক দেখেছ? আচ্ছা বককে বিশ্রী দেখায় কেন? বকের ঠ্যাং দুখানি শরীর আন্দাজে খুব লম্বা। হাঁ, ঠিক কথা। আচ্ছা বকের ঠোঁট দুখানি কেমন? ঠোঁটও অন্যান্য পাখীর ঠোঁটের চেয়ে খুব লম্বা। বক কোথায় থাকে? জলের ধারে। সেখানে কি করে? মাছ ধরিয়া খায়। মাছ ধরিবার জন্য কি সে ডাঙ্গায় বসিয়া থাকে? না সে জলের ভিতর নামিয়া মাছ ধরে। তোমরা জলে নামিয়া মাছ ধরিতে পার? জলের কিনারে মাছ থাকিলে ধরিতে পারি, কিন্তু অনেক জলে যাইতে পারি না। কেন পার না?

বক।

একটু দূরে গেলে কাপড় ভিজিয়া যাইবে আর অনেক দূরে গেলে ডুবিয়া যাইব। আচ্ছা গোপালের দাদা ত অনেক দূরে যাইতে পারে। হাঁ, সে আমাদিগের চেয়ে বয়সে বড়—তার ঠ্যাংও অনেক বড়। আচ্ছা তোমার যদি লম্বা লম্বা ঠ্যাং থাকিত তবে তুমি কি অনেক জলে যাইতে পারিতে না? এখন বল ত বকের লম্বা ঠ্যাং থাকায় কি সুবিধা হইয়াছে? আচ্ছা জলে নামিয়া কেমন করিয়া মাছ ধর? হাত দিয়া মাছ ধরি। অনেক জলে কি হাত দিয়া ধরা যায়? না হাত মাটী পায় না—অনেক মাছ মাটীতে না হাত দিলে ধরা যায় না। আচ্ছা তোমার হাত যদি

খুব লম্বা হ'ত তবে কি মাটীতে হাত দিয়া মাছ ধরিতে পারিতে না? বকের কি হাত আছে? সে ঠোঁটের দ্বারাই হাতের কাজ করে—তাই তার ঠোঁট ও গলা খুব লম্বা। বক জলের ভিতর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে—বড় বেশী নড়ে চরে না। যখন নিকট দিয়া কোন মাছ সাঁতারাইয়া যায়, তখনই তাহাকে গলা বাড়াইয়া লম্বা ঠোঁট দিয়া ধরিয়া ফেলে। বক বড় শান্ত। বক ব্যাঙও খায়।

কাল্ছি বকের গার রঙ একটু নীলাভ সাদা। পাখা দুখানি একটু কাল। গলা খুব সাদা—আর বুক একটু ময়লা সাদা। লেজ কাল। এই বকের মাথায় কেমন নীলাভ ঝুঁটি আছে। বকের বুকের উপর একগোছা সাদা পালক আছে। বুকের এই সমস্ত কোমল পালক টুপিতে ও পোষাকে লাগাইলে বেশ সুন্দর দেখায়। এই কাল্ছি বকের পাখার নীচে বেশ সাদা।

সাদা বক—কাল্ছি বকের চেয়ে বড়। সাদা বকগুলি অনেক সময় গোরু মহিষের পালের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়। এই জন্য সাদা বককে 'গোবক'ও বলে। গোরু মহিষ যখন মাঠে হাঁটিয়া বেড়ায় তখন তাহাদিগের পায়ের শব্দে বা আঘাতে ঘাসের মধ্য হইতে ছোট ছোট অনেক পোকা, মাকড়, ফড়িং, ব্যাঙ লাফাইয়া উঠে। বক এইগুলি ধরিয়া খাইবার জন্যই গোরুর ও মহিষের সঙ্গ নেয়। (ফাল্গুন চৈত্র মাসে নদীর ধারে বা মাঠে গোরুর বা মহিষের পায় পায় কেমন করিয়া বক চলে তাহা বালকগণকে দেখাইলে তাহাদিগের আনন্দ হইবে ও বকের বুদ্ধি বুঝিতে পারিবে)। বক নদী ও বিলের ধারেই থাকে। তাহারা নদী বা বিলের ধারে খুব বড় বড় গাছে ছোট ছোট ডাল পালা দিয়া বাসা তৈয়ারী করে। একবারে চার পাচটা ডিম হয়। বাচ্চা হইলে বাপ মা ছোট ছোট মাছ আনিয়া তাহাদিগকে খাওয়ায়।

বক উড়িবার সময় লম্বা গলাটী সম্মুখে বাড়াইয়া দিয়া লম্বা পা দুখানি

বুকের সঙ্গে চাপিয়া পেছনে বাড়াইয়া দেয় এবং লম্বা পাখা দুখানি বেশ বিস্তার করিয়া উড়িয়া যায়।

হাড়গিলে।—বকের মতই আকার—তবে বকের চেয়ে বড়—ঠোটও বকের চেয়ে খুব বড় ও শক্ত। গলা বকের গলার চেয়ে কিছু ছোট। আস্ত আস্ত মাছ গিলিয়া ফেলে—কেঁচো, গুগুলী, বেঙ, সাপ প্রভৃতিও ইহার খাদ্য।

১২। বেঙ্।

উপকরণ।—একটা বেঙ্ ও বেঙাচী (বর্ষার শেষে যখন পুকুরে বেঙাচী জন্মে, সেই সময়েই এই পাঠ দিতে হইবে)।

সূচনা:—বেঙের গায় হাত দিযে দেখ। গা কেমন ঠাণ্ডা। বিড়ালের গায় হাত দেও, মাছের গায় হাত দাও, নিজের গায় হাত দাও। মানুষ ও বিড়ালের গা গরম, বেঙের ও মাছের গা ঠাণ্ডা। সাপের গাও খুব ঠাণ্ডা। বেঙ, সাপ প্রভৃতি জন্তুকে সরীসৃপ বলে।

বেঙ।

মৎস্য ও সরীসৃপ।—মৎস্যের রক্ত ঠাণ্ডা বটে কিন্তু মৎস্য সরীসৃপ নয়।

যাহারা বুকে হাঁটে বা যাহাদের পা খুব ছোট ছোট তাহাদিগকে সরীসৃপ বলে। মাছের ডিম হয়, সরীসৃপেরও ডিম হয়। পাখীর মত ইহারা ডিমে তা দেয় না। মাটীর নীচে বা বালির নীচে ডিম রাখিয়া দেয়। সূর্য্য-তাপে মাটী বা বালি গরম হইয়া ইহাদের ডিম ফুটে। বেঙ্ জলের মধ্যে ডিম পাড়ে। সূর্য্য-তাপে জল গরম হইয়া ইহাদের ডিম ফুটাইয়া দেয়। একটা বেঙ্ ৫০০ হইতে ১১০০ পর্য্যন্ত ডিম প্রসব করে।
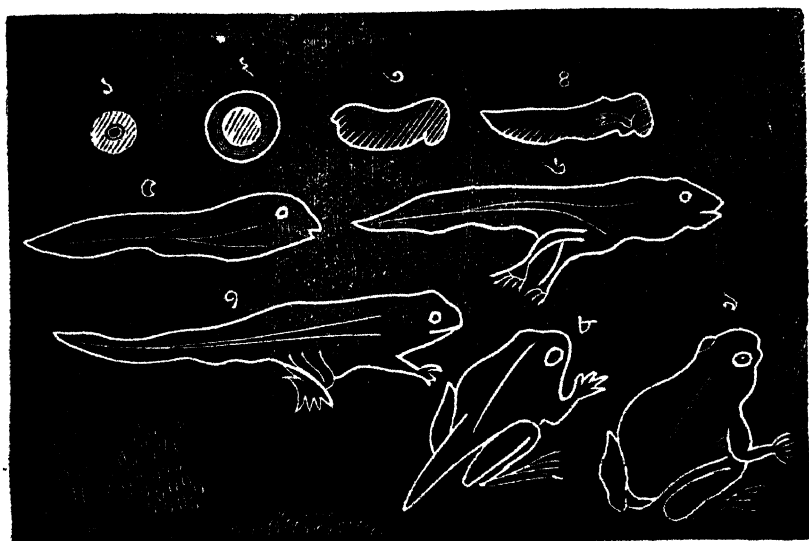
বেঙের নানা অবস্থা। (চিত্র আঁকিয়া বুঝাও) (১) প্রথমে ডিমগুলি খুব ছোট ছোট কাল সর্ষপ দানার মত থাকে। (২) তারপর ৪।৫ ঘণ্টায় ফুলিয়া উঠিয়া এক একটা ছোট মটরের দানার মত হয় আর এই ডিমের চারিদিকে সাদা সাদা শ্লেষ্মার মত এক রকম পদার্থ জন্মে। (তোকমা বা ইসবগুল বা সাবুদানা ভিজাইয়া দেখাও) পুকুরের ঘাটে তক্তা বা শানের সঙ্গে এইরূপ ডিম লাগিয়া থাকে। সুবিধা হইলে সংগ্রহ করিয়া দেখাইবে।

(৩) (৪) ২০।২২ দিন পরে ডিম ফুটিয়া বেঙাচী বাহির হয়। (বেঙাচী দেখাও) একটা মাথা ও একটা লেজ মাত্র। পা নাই। এই অবস্থায় ইহারা মাছের মত লেজ নাড়িয়া নাড়িয়া জলে সাঁতরায়। (৫) বেঙাচী যতই বড় হইতে থাকে ততই তার লেজ ছোট হইতে থাকে। (৬) বেঙাচীর বয়স দেড় মাস হইলে তাহার পিছনের পা দুখানি বাহির হয়। (৭) দুই মাস পরে সামনের দুই পা বাহির হয়। আর লেজটা আস্তে আস্তে খসিয়া যায়। (৮) (৯) পা হইলেই বেঙ্ ডাঙ্গায় চলিয়া আসে।

আকার ও প্রকার।—বেঙের পাছের পা খুব বড়—এই জন্য খুব লাফাইতে পারে। (যাহারা লাফাইতে পারে তাহাদের পাছের পা বড়। যথা :—হনুমানের, ক্যাঙ্গারুর) পাছের পায় বড় বড় পাঁচটী আঙ্গুল—এই আঙ্গুলগুলি আবার (হাঁসের পায়ের মত) পাতলা চামড়ায় জোড়া। (ইহাতে কি সুবিধা হয় ? কেমন করিয়া পাছের পা দিয়া জল ঠেলিয়া চলে তাহা দেখাও) সম্মুখের পা ছোট—আর তাহাতে চারিটী করিয়া আঙ্গুল। এই আঙ্গুলগুলি জোড়া নয়। বেঙ্ পোকা, মাকড়, পিপ্ড়ে, মাছি, কেঁছো প্রভৃতি খাইয়া বাঁচে। (বেঙাচী কেবল ছোট ছোট শেওলা খায়—ও জলজ অন্যান্য ছোট ছোট গাছ খায়—এইজন্য তাহারা পুকুরের ধারে থাকে, পুকুরের মাঝখানে যায় না)। বেঙের জিভ্ লম্বা ও পাতলা আর তার মাথা চেরা—সাপের জিভের মত। পিপ্ড়ে ধরিবার সময় চট্ করিয়া লম্বা জিভ্টা বাহির করিয়া পিপড়ের গায় লাগাইয়া দেয়। বেঙের জিভের গায় আঠার মত লালা আছে। পিপড়ে তাহাতেই আঁটিয়া যায়—আর বেঙ চট্ করিয়া মুখের মধ্যে টানিয়া লয়।

বেঙের চোখ বেশ বড় বড়—রাত্রিতেও দেখিতে পায়। কোন্ কোন্ জন্তু রাত্রিতে দেখিতে পায় ? রাত্রিতে দেখিতে পায় বলিয়া বেঙের কি সুবিধা হইয়াছে ? বেঙের গায়ের চামড়া বেশ মসৃণ। চামড়ায় ছোট

ছোট ছিদ্র আছে (মানুষের লোমকূপের ছিদ্র দেখাও)—এই ছিদ্র দিয়া বেঙ নিশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ করে আর এই গায়ের ছিদ্র দিয়া বেঙ্ জল খায়। মুখ দিয়া জল খায় না। বেঙের শ্রবণশক্তি খুব প্রবল। (জুতার দ্বারা মাটিতে শব্দ কর—বেঙ্ কেমন ভয় পায় দেখাও)। বেঙের কেবল উপর মাড়ীতেই দাঁত আছে—সেগুলি খুব ধারাল আর মুখের দিকে বাঁকান। এ দাঁতে খাওয়ার কাজ হয় না—কেবল এই দাঁত দিয়া পোকা মাকড় ধরিয়া রাখে, খাওয়ার সময় আস্ত আস্ত পোকা মাকড় গিলিয়া খায়। আমাদিগের দেশে সচরাচর ৪ প্রকার বেঙ্ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) কোলা বেঙ্—হল্‌দে রঙ্—পিঠের উপর একটা কটা রেখা—আকারে সকল বেঙ্ অপেক্ষা বড়। যখন ডাকে তখন গলার দুই দিক ফুলিয়া উঠে। আওয়াজ খুব বড়। (২) কট্‌কটে বেঙ্—সাধারণ ছোট ছোট বেঙ্—গায়ের রঙ মাটীর মত। এই বেঙ্ ১০০ একশত বৎসরেরও বেশী বাঁচিতে দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) সোনা বেঙ্—রঙ উজ্জ্বল পীত—পেটের নীচে একটু সাদা। (৪) সেপো বেঙ্—সাপের মত মুখ বলিয়া ইহার নাম সেপো বেঙ—রঙ হলদে—তার উপর নীল ও সাদা দাগ। আকার মাঝারী। ফরাসী দেশে এক প্রকার খুব বড় বড় বেঙ্ পাওয়া যায়—সে দেশের লোক এই বেঙের মাংস খায়। আমেরিকার "বুলফ্রগ" (ষণ্ড বেঙ্—ষাঁড়ের মত আওয়াজ করে বলিয়া এই নাম।) বেঙের মাংস নাকি সুস্বাদু ও সুগন্ধ।

বাসস্থান।—বেঙ্ গরম সহ্য করিতে পারে না। আবার বেশী শীতও সহ্য করিতে পারে না। বর্ষায় বেঙের খুব আনন্দ হয়—সেই সময়েই ইহারা ডিম পাড়ে—আর বর্ষা শেষ হইতে না হইতেই ডিম হইতে বেঙাচী ও বেঙাচী হইতে বেঙ্ জন্মে। বেঙ্ শীতকালে গর্ত্তে বাস করে। রৌদ্রের সময়ও গর্ত্তে থাকে।

[একটা মাটীর বড় গামলা বা গোরুর খড় খাবার মাটীর চাড়ী সংগ্রহ কর। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সেইটী স্থাপন কর। চাড়ীর নীচের দিকে একটা ছোট ছিদ্র কর ও এই ছিদ্র ন্যাকড়ার পুঁটলী করিয়া বন্ধ করিয়া রাখ। চাড়ীর মধ্যে ছোট ছোট পাথরখণ্ড, ঝামা বা পুরাতন ইটখণ্ড দাও। সামুক ঝিনুক দু'চারিটীও তাহার মধ্যে রাখ। কিছু শ্যাওলা দিলে আরও ভাল হয়। এই জলে বেঙ ছাড়িয়া দাও। ডিম হইতে কেমন করিয়া বড় বেঙ হয় তাহা বালকগণকে প্রত্যক্ষ দেখাইবার পক্ষে বেশ সুবিধা হইবে। ইহার মধ্যে কতকগুলি থল্‌সে মাছ ছাড়িয়া দিলে দেখিতেও সুন্দর হইবে আর মাছ বিষয়ক পাঠের সময় ইহার একটী মাছ তুলিয়া দেখাইতে পারিবে। জলজ শৈবালাদির বিষয় শিক্ষাদানেরও সহায়তা হইবে। এইরূপ জলাধারকে ইংরেজীতে 'আকোয়ারিয়ম' বলে। বাঙ্গালায় 'আপনীয়' বলা যাইতে পারে।]

কেঁচো।

উপকরণ—কয়েকটা তাজা কেঁচো; পচা গোবর মাটীতে পূর্ণ একটা হাঁড়ী বা বাক্স; একটা মরা কেঁচো; এক গেলাস জল; একখানি লেন্‌স (স্থূলমধ্য কাচ); একখানি ধারাল ছুরি।

কেঁচো।

পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ	মন্তব্য	সিদ্ধান্ত
আকার ১। একটা কেঁচো দেখাও; লম্বা, মাঝখান থেকে দুই দিকে সরু হইয়া গিয়াছে।	এক একটা কেঁচো এক ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে।	মুখ সূচালো বলিয়া গর্ত্ত কাটিয়া গর্ত্তে ঢুকিবার ও গর্ত্তে বাস করিবার সুবিধা হয়।
২। দেখাও যে একদিক অপেক্ষা অপরদিক বেশী সূচালো। কেমন করিয়া চলে দেখাও; এই সূচাল দিকটা প্রথমে বাড়াইয়া দেয়।	সামান্য একটু শব্দ হইলেই কেঁচো গর্ত্তে ঢুকিয়া যায়। ছেলেরা বৃষ্টির সময় কি সন্ধ্যার সময় পরীক্ষা করিতে পারে।	এই সূচালো দিকটাই কেঁচোর মাথা। গর্ত্তে বাসের পক্ষে বিশেষ সুবিধা।
৩। হাত পা নাই।	সাধারণতঃ দিনের বেলা বাহিরে আসে না। রাত্রিতে বাহির হয় কিন্তু রাত্রিতেও আলো দেখিলে গর্ত্তে ঢুকে।	মাথার দিক সরু বলিয়া এই অঙ্গই গর্ত্ত করিবার উপযোগী।
৪। হাঁড়ীর মাটীতে কয়েকটা কেঁচো ছাড়িয়া দাও। দেখাও যে মাথার দিক দিয়াই গর্ত্ত করে।	বোধ হয় কেঁচোর ঘ্রাণশক্তি আছে। খাবার জিনিষ চিনিয়া খায়।	কেঁচোর কোন বিশেষ অঙ্গ নাই বটে কিন্তু (ক) শব্দ টের পায় (খ) দ্রব্যের ঘ্রাণ পায়
৫। খানিকটা মাটী চাপিয়া একটা শক্ত ঢিপি প্রস্তুত কর। সেই মাটীর ভিতর কোন বালককে একটা পেন্সিল (স্লেট পেন্‌সিল) দিতে বল। পেনসিলের কোন্ দিকটা মাটীর ভিতর সহজে যাইবে? সরু দিক্ না মোটা দিক্?	মাটীতে সামান্য আঘাত করিলেই কেঁচো ভয় পায়। মাছ মারিবার সময় কেঁচো তুলিতে কেবল মাটীতে একবার কোদালীর ঘা দিলেই হইল। চারিদিকের গর্ত্ত হইতে সব কেঁচো বাহির হইয়া আসিবে।	(গ) আলোক অন্ধকার বুঝিতে পারে (ঘ) স্পর্শশক্তি খুব প্রবল (ঙ) সামান্য আঘাতেই ভীত হয়।
৬। কেঁচোর মুখ মাথার নীচে। নাক, কাণ, চোখ নাই।		

পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ	মন্তব্য	সিদ্ধান্ত
অঙ্গুরীয়ক দেহ		
১। দেখাও যে কেঁচোর দেহ অঙ্গুরীয়ক খণ্ড যোগে নির্ম্মিত।	এইরূপ অঙ্গুরীয়ক-সংখ্যা ১২০টীর অধিক।	সাধারণ লোকের বিশ্বাস আছে যে কেঁচোকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলে প্রত্যেক খণ্ড হইতে এক একটা নূতন কেঁচো জন্মে। এ বিশ্বাস কিন্তু ভুল। একটা কেঁচো সমান দুই খণ্ডে কাটিয়া ফেল। পাছের খণ্ড শুকাইয়া যাইবে। সম্মুখের খণ্ড আস্তে আস্তে তাজা হইয়া উঠিবে। আবার কেঁচোর মাথার দিক থেকে ৪।৫ টা অঙ্গুরীয়কখণ্ড কাটিয়া ফেল। এই ক্ষুদ্রখণ্ড শুকাইয়া যাইবে। বৃহৎখণ্ডে আবার মাথা গজাইবে।
২। সম্মুখের অঙ্গুরীয়কগুলি পশ্চাতের অঙ্গুরীয়ক অপেক্ষা বড়।	।কাঁটাগুলি সমস্তই কেঁচোর পেটের দিকে। এই কাঁটাই কেঁচোর পা। (কেন্নোর পাগুলি বড় বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কেন্নোর গায় ৮টী খণ্ড—আর অনেক পা) কেঁচো কাটিয়া ফেলিলেও বাঁচে। মাথার দিকে খানিকটা কাটিয়া ফেল, দুই মাস মধ্যে আবার কেঁচোর মাথা গজাইবে। (মানুষ, গোরু, সাপ প্রভৃতির মাথা কাটিলে কি বাঁচে?—পা কাটিলে বাঁচিতে পারে মাথা কাটিলে বাঁচিতে পারে না)।	
৩। একটা কেঁচো জলে ধুইয়া লও। চিৎ করিয়া টেবিলের উপর রাখ। এখন লেন্‌স দিয়া দেখাও পেটের নীচে ছোট ছোট কাঁটা আছে। প্রত্যেক অঙ্গুরীয়কখণ্ডের নীচে ৮টী।		
৪। কেঁচোর লেজের দিক হইতে মাথা পর্য্যন্ত আঙ্গুল বুলাও। কাঁটাগুলি হাতে ঠেকিবে।		
চলৎশক্তি		
১। পেটের নীচের কাঁটাগুলি পেছনের দিকে বাঁকান।		এই কাঁটায় ভর দিয়া চলে। এই কাঁটার সাহায্যে মাটীতে গর্ত্ত কাটে। এই কাঁটা গর্ত্তের গায় লাগাইয়া রাখে বলিয়া ঝুপ করিয়া গর্ত্তের ভিতর পড়িয়া যায় না।
২। গায় হাত দিয়া দেখ, গা ভিজা ও তেলতেলে। গায় ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্র দিয়া সর্ব্বদা এই তেল বাহির হয়।		কেঁচোর গায় তেল আছে বলিয়া সে কাদায় জড়াইয়া পড়ে না।
৩। শুকনা ধুলির ভিতর বা রৌদ্রে কেঁচো রাখিলে শীঘ্র মরিয়া যায়।		ধূলিতে কেঁচোর গায়ের ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায়। রৌদ্রে তেল শুকাইয়া যায়। এই তেল বাহির না হইলে কেঁচো বাঁচিতে পারে না।

পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ	মন্তব্য	সিদ্ধান্ত
খাদ্য ১। ছুরি দিয়া মুখ কাটিয়া দেখ দাঁত নাই।	কেঁচো মাটী, পচা পাতা, ঘাসের ডগা, শালগম, মূলা, পেঁজ, পোকা প্রভৃতি খায়।	দাঁত নাই। তবে কেমন করিয়া খাদ্যবস্তু পিষিয়া লয়? ছোট ছোট ইঁট বা পাথরের টুকরা গিলিয়া ফেলে। এই সকল পাথরের টুকরা পেটের ভিতর গিয়া খাদ্যদ্রব্য পিষিয়া দেয় (পাখীরাও পাথরটুকরা গিলিয়া খায়)।
শীতকালে কোথায় থাকে? শীতে কি খায়?	শীতকালে মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে খুব নীচে চলিয়া যায়। মাটীর নীচে জল পায়।	জল না হইলে কেঁচো বাঁচিতে পারে না।
রাত্রিতেই কেঁচোরা আহারের কার্য্য সারে।	মাটীর নীচে গর্ত্তের মধ্যে পচা পাতা সংগ্রহ করিয়া রাখে।	খাবার জিনিসকে এক রকম লালা দিয়া ভিজাইয়া লয়, তারপর পেটে জীর্ণ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ বাহির করিয়া ফেলে। এই অবশিষ্ট ভাগের নামই "কেঁচোর মাটী"।

কেঁচোর উপকারিতা।—কীট পতঙ্গের মধ্যে কেঁচো অপেক্ষা উপকারী কেহই নহে। ইহারা গর্ত্ত করিয়া অনেক মাটীর নীচে যায় বলিয়া, নীচের মাটী উপরে আসে। আর ইহাদের গর্ত্তের ভিতর জল প্রবেশ করিয়া সমস্ত মাটীকে সরস করিয়া রাখে। এই সব গর্ত্ত দিয়া মাটীর ভিতর বাতাস প্রবেশ করে। ইহারা পচা পাতা, পচা পোকা মাটীর ভিতর টানিয়া লইয়া গিয়া, মাটীর নীচে বহুদূর পর্য্যন্ত সার বিস্তার করে। তারপর "কেঁচোর মাটী"ও জমির উত্তম সার।

১ বিঘা জমিতে প্রায় ২০,০০০ কেঁচো থাকে। ইহারা বৎসরে প্রায় ৩০০ মন মাটী উলট পালট করে। ১৫ বৎসরের কেঁচোর মাটী হিসাব

করিলে দেখা যায় যে, কেঁচো জমির উপর ৩ ইঞ্চ পুরু নূতন মাটী বিস্তার করিয়াছে। কেঁচো কৃষকের পরম মিত্র।

(গারলিকের অবজেক্‌ট লেসন্‌স্‌ হইতে গৃহীত)

১৪। সর্প।

উপকরণ।—সর্পের ছবি। সুবিধা হইলে সর্পের হাড়। (সর্পের হাড় সংগ্রহ করা শক্ত নহে। যখন গ্রামে কোন বৃহৎ সাপ মারা যায় তখন সেই সাপটীকে এক স্থানে গর্ত্ত করিয়া লম্বা ভাবে পুঁতিয়া রাখিবে। ২ মাস পরে আস্তে অস্তে মাটী সরাইয়া ফেলিবে ও হাড়গুলি যেরূপ ভাবে পরস্পর সাজান থাকে ঠিক সেইরূপ ভাবে একটা সরু পিতলের তারে গাঁথিবে। পরে একটা ডোবার জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেই হইল। এই হাড়ের ছড়া বিদ্যালয়ের মিউজিয়মে রাখিয়া দাও। সাপের হাড়ে বিষ থাকে না—সুতরাং হাত দিতে কোন ভয় নাই। যে দিন গ্রামে কোন সাপ মারা যাইবে বা যে দিন কোন সাপুড়িয়া সাপ দেখাইতে আসিবে সেই দিন এই পাঠ দিবে। সাপের খোলস (ইহাতে হাত দিতেও কোন ভয় নাই—খোলসে বিষ থাকে না। তবে খোলস মিউজিয়মে রাখা যাইবে না—এগুলি পচিয়া যায়।)

"সাপের পা দেখেছ কে ?—সাপের পা নাই। সে বুকে হাঁটে। "আর কোন্‌ প্রাণী সাপের মত বুকে হাঁটে" ? কেঁচো। "মানুষ কখন বুকে হাঁটে জান ?"—যখন খুব ছোট থাকে—হামা শেখার আগে। তবে এদের বুকে হাঁটা আর সাপের বুকে হাঁটা ভিন্ন রকমের। সাপ আঁকিয়া বাঁকিয়া যায় কিন্তু ছোট ছেলে বুকে হাঁটিবার সময়ও সোজা চলে। সাপের মেরুদণ্ড আছে। কেঁচোর মেরুদণ্ড নাই। সাপ এই মেরুদণ্ডের সাহায্যেই বুকে হাঁটিতে পারে। কেঁচোর শরীরের নীচে কিছু কিছু শক্ত মাংস লাগান আছে। সে তাহার উপর ভর করিয়া চলে।

এখন সাপের বুকে হাঁটা বুঝাও। যদি সাপের হাড় সংগ্রহ করিয়া থাক তবে তাহা দেখাইয়া সহজে বুঝাও। আর যদি না থাকে তবে বালকগণকে

তাহাদের নিজ নিজ মেরুদণ্ড দেখাইতে বল। "মেরুদণ্ডের উপর হাত বুলাইয়া দেখ ত, একখান আস্ত হাড় না খণ্ড খণ্ড হাড় বলিয়া বোধ হয়? মেরুদণ্ডের সহিত পাঁজড়ার সমস্ত হাড় জোড়া আছে—পাঁজড়ার হাড় দেখাও। আবার এই পাঁজড়ার হাড়গুলি বুকের হাড়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। বুকের হাড় দেখাও। সাপের বুকের হাড় নাই। তার মেরুদণ্ডের সঙ্গে পাঁজড়ার হাড় জোড়া। সাপের মেরুদণ্ডের এই খণ্ড খণ্ড হাড়গুলি কেমন ক'রে জোড়া লাগান তা জান?" সাপের হাড় থাকিলে দেখাও, না থাকিলে এক কাজ কর—একটা পেনসিল বা কলমের মাথায় একটা বেশ গোলাকার আলু বিঁধিয়া লও। ঐ আলুটী রাখিলে ভরিয়া যায়—এমন একটী তেলের বাটী সংগ্রহ কর। এখন কলম ধরিয়া আলুটী বাটীর মধ্যে ঘুরাও। "হাড়খণ্ডগুলি এইরূপ জোড়া
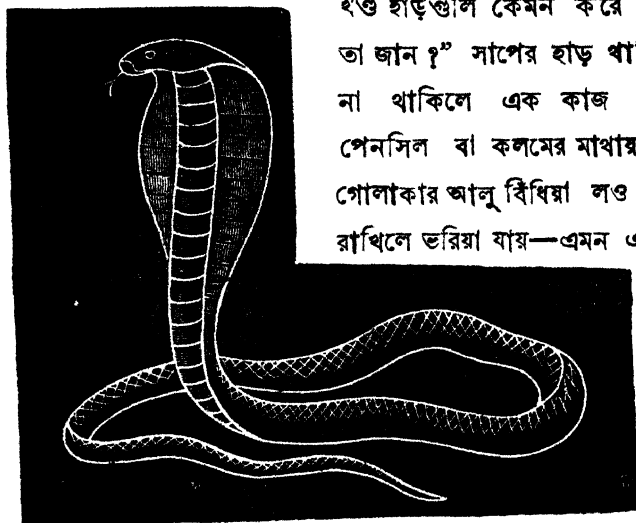
ফণাযুক্ত সর্প।

—একখান হাড়ে এইরূপ গর্ত্ত আর ঠিক তার পরের হাড়খানির মাথায় এইরূপ একটা গোল পিণ্ড। এই পিণ্ডগুলি গর্ত্তের মধ্যে সবদিকেই ঘুরিতে পারে। তাই সাপ বেশ আঁকিয়া বাঁকিয়া যায়। (এইরূপ অস্থি সংযোগকে গর্ত্তগোলা বা বাটিবর্ত্তুল সংযোগ বলে।)

সাপের গায়ে খোলস বা শল্ক আছে—কতকটা মাছের আঁইসের মত। উপরের শল্কগুলি গার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপ আটা, কিন্তু পেটের

নিকটের শল্কগুলি মাছের শল্কের মত কেবল একদিকে আটা। এই সমস্ত নীচের শল্ক মাটীতে বাধাইয়া দিয়া সাপ সম্মুখে অগ্রসর হয়। খুব মসৃণ স্থানে সাপ ভাল চলিতে পারে না। মসৃণ দেয়াল বাহিয়া সাপ উঠিতে পারে না। সাপ গর্ত্তের ভিতর ঢুকিলে, লেজে টানিয়া সাপ বাহির করা যায় না। বুকের উপরের শল্কগুলি গর্ত্তের গায় বাধিয়া যায়। (সাপের খোলস দেখাইলে বালকেরা শল্কের বিন্যাস বুঝিতে পারিবে।)

ফণাহীন সর্প।

সাপ গর্ত্তে বাস করে কিন্তু নিজে ভাল গর্ত্ত করিতে পারে না। (কেন পারে না জিজ্ঞাসা কর) ইন্দুর কি ব্যাঙের গর্ত্তে ঢুকিয়া তাহাদিগকে খাইয়া ফেলে ও গর্ত্তটী দখল করিয়া বসে। (ঘরে গর্ত্ত দেখিলেই তাহা ইট ও মাটী দিয়া বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিবে।)

সাপ গিলিয়া খায়—দাঁত আছে বটে কিন্তু তাহা চিবাইবার জন্য নহে। ছোট ছোট দাঁত-গুলির মাথা ভিতরের দিকে ঝাঁকান। ইহার সাহায্যে সে খাদ্য জিনিষ মুখে আটকাইয়া রাখে। তারপর আমাদের যেমন মাঢ়ীর হাড়—আর একখান হাড়ের সঙ্গে আটা —সাপের তা নয়। সাপের মাঢ়ীর হাড় কেবল চামড়া দিয়া বাঁধা আছে। এইজন্য ইচ্ছা করিলে সে মুখের হাঁ খুব বড় করিতে পারে। চামড়ার বাঁধে টান লাগিলে (রবারের মত) সহজেই বাড়িয়া যায়। এইজন্য সাপ নিজের চেয়ে বড় আকারের জীবজন্তু ধরিয়া খাইতে পারে। তারপর
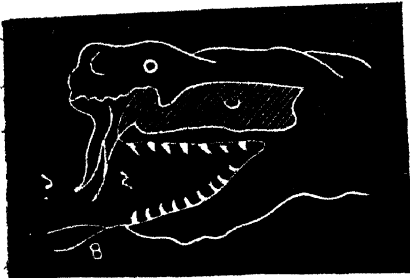
সর্পের দন্ত।

খাবার জিনিষ সাপের গলার ভিতর নামিয়া গেলে কোন বাধা পায় না কারণ সাপের পাঁজড়ার হাড় আমাদের মত বুকের দিকে আবদ্ধ নয়। ইহা ছাড়া তাহার পেটের চামড়াও বেশ স্থিতিস্থাপক (আমাদের পেটের চামড়াও স্থিতিস্থাপক—কিন্তু সাপের চামড়ার মত এতদুর নয়।)

সাপের গা খুব ঠাণ্ডা—কেঁছোর গায় হাত দিলে যেমন ঠাণ্ডা বোধ হয় সেইরূপ ঠাণ্ডা। মানুষ, গোরু, পাখী প্রভৃতির গা গরম। কেন? সাপের রক্ত ঠাণ্ডা। যে সকল প্রাণী এইরূপ বুকে হাঁটে তাহাদের রক্ত ঠাণ্ডা।

সাপ—ব্যাঙ ও কীট পতঙ্গ খায়। সুবিধা পাইলে গাছে উঠিয়া পাখীর ডিম খায়। ব্যাঙ, ইঁদুর, পাখীর ডিম ও দুধ ইহাদের প্রিয় খাদ্য। দাঁড়াস সাপ এতই দুধের প্রিয় যে গোরু ছাগলের পিছনের পা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাদের বাঁট থেকে দুধ টানিয়া খায়। পাহাড়ে সাপ খুব বড়। ইহারা পাখী, ছাগল, হরিণ, বাছুর ধরিয়া খায়। সাপ আস্ত জিনিষ গিলিয়া খায়। পেট ফুলিয়া উঠিলে বাহির হইতে হরিণ ছাগল প্রভৃতির আকার বুঝিতে পারা যায়। সাপে সাপও খায়। জলের সাপ মাছ খায়।

খুব রৌদ্রে কি খুব শীতে সাপ বাহির হয় না। বর্ষাকালেই সাপের উৎপাত বাড়ে। সেই সময় ব্যাঙ পায় বলিয়া তাহাদের যথেষ্ট খাদ্যও মেলে। অল্প অল্প বৃষ্টির সময়ই সাপ অধিক বাহির হয়। সন্ধ্যা হইলেই সাপ বাহিরে আসিতে আরম্ভ করে। ইহারা রাত্রিতেই খাদ্যান্বেষণ করে। সাপ প্রকাণ্ড স্থান দিয়া যায় না। ইঁটের গাদার মধ্যে, কাঠের গাদার মধ্যে লুকাইয়া থাকে আর যখন বাড়ীর উপর দিয়া চলে তখন ঘরের ভিটের সঙ্গে গা ঘেঁষিয়া চলে। কাজেই যে গ্রামে সাপের ভয় সেখানে বিনা আলোতে সন্ধ্যাবেলা চলাফেরা করা উচিত নয়। কিম্বা সন্ধ্যা ও রাত্রিতে ইঁটের গাদা বা ঘরের ভিটের নিকট দাঁড়ান উচিত নয়। সাপ সাধারণতঃ খুব ভীরু। মানুষকে খুব ভয় করে। গায় ব্যথা না পাইলে

কামড়ায় না। (কেবল সুন্দরবনের পাতরাজ সাপ তাড়া করিয়া কামড়ায়) আমাদিগের দেশে প্রায় ৩০০ প্রকার সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৫০।৬০ প্রকার সাপের বিষ আছে। কেউটে (বা জাত সাপ) পাতরাজ, গোক্ষুর, সাঁখিনী সাপ খুব বিষাক্ত। কেউটে, পাতরাজ, গোক্ষুর সাপের ফণা আছে। রাগ করিলে, ভয় পাইলে ও কামড়াইবার সময় মাথা উঁচু করিয়া ফণা বিস্তার করে। (সেই ফণার উপর গোরুর ক্ষুরের মত কাল দাগ আছে বলিয়া গোক্ষুর সাপ নাম হইয়াছে।) গোক্ষুর দুই রকমের—এক রকম খুব কাল আর এক রকম একটু সাদা সাদা। এই সাদাটে গোক্ষুরকে খইয়ে গোক্ষুর বলে, আর কাল গোক্ষুরকে আলাদ বলে। হেলে, ধোড়া, দাঁড়াস প্রভৃতি সাপের বিষ নাই। চন্দ্রবোড়া খুব বড় সাপ। হাঁসের মত বড় পাখী ও ছাগলের বাচ্চা ধরিয়া খায়। সাধারণ দাঁত ছাড়া সাপের আরও দুইটী বড় বড় দাঁত আছে। তাহার ভিতর ফাঁপা। সেই দুই দাঁতের গোড়ায় (মাঢ়ীতে) দুইটী থলে থাকে—তার মধ্যে এক রকম খুব গাঢ় সবুজ তরল পদার্থ থাকে। সেই পদার্থই বিষ। সাপ যখন এই দুই বিষ-দাঁত দিয়া কামড়ায় তখন থলে হইতে এই দুই দাঁতের ভিতর দিয়া বিষ প্রবেশ করিয়া মানুষের রক্তে মিশে। এই বিষের এমন তেজ যে ২।৪ ঘণ্টার মধ্যে শরীরের সমস্ত রক্ত নষ্ট করিয়া দেয়। এই জন্যই মানুষ মরিয়া যায়। (একটু বিষের দ্বারা শরীরের সমস্ত রক্ত কিরূপে বিকৃত হয় তাহা বালকেরা সহজে বুঝিতে পারিবে না। এক হাঁড়ী দুধের ভিতর একটু অম্লরস দিলে সমস্ত দুধই যে নষ্ট হইয়া যায় তাহা বালকেরা অনেকেই জানে। এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে বিষের ক্রিয়া বুঝিতে পারিবে।) সাপুড়িয়ারা সাপের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দেয়। সেইজন্য তাহাদের পোষা সাপে কামড়াইলে তাহারা মরে না।

সাপ প্রায়ই পায়ে ও হাতে কামড়ায়। সাপে কাটিলে—তৎক্ষণাৎ

সেই কাটার উপরে খুব কসিয়া দুইটা বাঁধ দিবে। তাহা হইলে রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া যাইবে। কাটা স্থানের দুষিত রক্ত শরীরের অন্য স্থানের রক্তের সহিত মিশিতে পারিবে না। জিজ্ঞাসা কর—"আচ্ছা তোমাকে হঠাৎ সাপে কাটিল, এখন বাঁধ দিবার দড়ি পাইবে কোথায় ?"—(কোন ব্রাহ্মণ-বালক একটু চিন্তা করিয়া) 'গলার পৈতা দিয়া বাঁধ দিব।' "যাহার পৈতা নাই ?"—(আর একটী বালক) পৈতার দরকার কি—সকলেই ত কাপড় পরিয়া থাকি—কাপড়ের পাড় ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া ফেলিব। হাঁ, ঠিক কথা—এইরূপে খুব শীঘ্র বাঁধিয়া ফেলিবে।

সর্পের শল্ক।
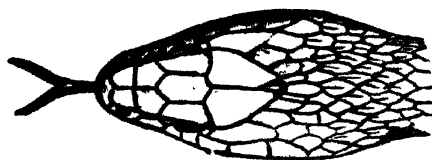
সাপের চক্ষু গোল ও খুব উজ্জ্বল। চক্ষুর পাতা নাই—ইহারা চক্ষু মেলিয়া ঘুমায়। যখন সাপ রাগে তখন এই চক্ষু আরও উজ্জ্বল ও ভয়ঙ্কর হয়। সাপের কাণের ছিদ্র এই চোখের পাশে বলিয়া সাপকে চক্ষুশ্রবা বলে।

সাপ দেখিয়া প্রায় সকল জন্তুই ভয় করে। আলিপুর পশুশালায় যখন সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি খুব গর্জ্জন করিতে থাকে তখন তাহাদিগকে থামাইবার জন্য একটা সাপের খাঁচা আনিয়া তাহাদের সন্মুখে রাখা হয়। আর তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া ঘরের এক কোণে লুকায়। ময়ুর সাপ ধরিয়া খায় কিন্তু বিষাক্ত সাপ ধরে না। কেবল বেজী সাপ দেখিয়া ভয় করে না বরং সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করে ও সাপের সমস্ত গা নখের দ্বারা আঁচড়াইয়া রক্তনদী করিয়া দেয়। সাপের কামড়ে বেজী মরে না।

সাপের গা খুব নরম। সামান্য লাঠির আঘাতেই থেঁতলাইয়া যায়। বিষাক্ত সাপ মারিয়া থানায় কি মাজিষ্ট্রেটের কাছে নিয়ে গেলে পুরস্কার পাওয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট এরূপ পুরস্কার কেন দেন বলিতে পার? "পয়সার লোভে লোকে বিষাক্ত সাপ মারিয়া ফেলিবে—এইরূপে মারিতে মারিতে বিষাক্ত সাপ কমিয়া যাইবে।" হাঁ ঠিক, এইদেশে পূর্ব্বে সাপের কামড়ে যত লোক মরিত, এখন তত লোক মরে না। মারিতে মারিতে বিষাক্ত সাপ ক্রমে কমিয়া আসিতেছে।'

সাপ বাঁশীর শব্দ শুনিতে ভালবাসে। সাপুড়িয়ারা এই জন্য বাঁশী বাজাইয়া সাপ নাচায়। আর কোন্ জন্তু বাঁশীর শব্দ ভালবাসে? হাতী।

সাপের ডিম হয়, ডিমগুলি বেশ শাদা। একটা সাপের ১০।১২টা ডিম হইয়া থাকে। মাটীর গরমেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। ইহারা বাহির হইয়াই ছোট ছোট পোকা মাকড় ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করে। সাপ লেজ নাড়িয়া নাড়িয়া জলে সাঁতরাইতে পারে। কোন কোন সাপ কেবল জলেই থাকে।

(বালকগণকে সন্ধ্যার পর পায়রার খোপে বা হাঁসের কি মুরগীর ঘরে হাত দিতে নিষেধ করিয়া দাও। নদীর ধারে গাঙশালিকের বাচ্চা বাহির করিবার জন্য অনেক দুষ্ট ছেলে পাখীর গর্ত্তে হাত ঢুকাইয়া দিয়া মারা গিয়াছে।]

১৫। রেসম কীট ও প্রজাপতি।

উপকরণ—রেসমের কাপড়, পলুর গুঁটী (আস্ত ও কাটা) রেসমের সুতা—একটা পলু পোকা (যদি একটা শিশিতে স্পিরিট অর্থাৎ সুরাসার দিয়া তার মধ্যে একটা পলু পোকা রাখিয়া দেওয়া যায় তবে অনেক দিন থাকে) পলু উৎপন্ন প্রজাপতি, প্রজাপতির ডিম, তুঁত বা ভ্যারেণ্ডা পাতা ইত্যাদি।

প্রাপ্তিস্থান।—চীনদেশে (মানচিত্রে দেখাও) রেশমের প্রধান কারবার ছিল। পূর্ব্বে আমাদিগের দেশেও চীন হইতে রেশমের কাপড়ের আমদানি হইত। এইজন্য রেশম কাপড়ের অপর নাম চীনাংশুক। রামায়ণ মহাভারতে এই চীনাংশুকের কথা আছে। (বালকেরা ইতিহাস জানিলে রামায়ণ মহাভারতের বয়স জিজ্ঞাসা কর, না জানিলে বলিয়া দাও —রামায়ণ ১২০০ পূঃ খৃঃ মহাভারত ৮০০ পূঃ খৃঃ) এখন ফরাসী, স্পেন
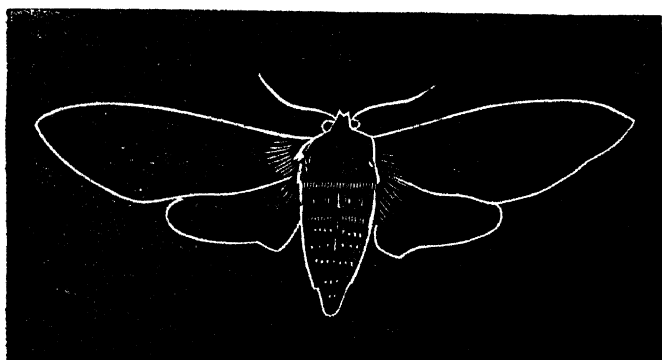
রেশম প্রজাপতি।

ইতালী প্রভৃতি দেশে অনেক রেশমের কারখানা হইয়াছে। জাপান, চীন ও ব্রহ্মদেশ হইতে এখনও আমাদের দেশে অনেক রেশম বস্ত্রের আমদানী হইয়া থাকে (জাপানী রেশম বস্ত্র দেখাও) ভারতবর্ষের অনেক স্থানে রেশমের কারখানা আছে। বহরমপুরের গরদ, ভাগলপুরের বাপ্‌তা, গৌহাটী, নওগা, শিবসাগর জেলার এঁড়ি, মুগা পাঠ প্রসিদ্ধ।

(এঁড়ি, মুগা, পাট, গরদ প্রভৃতির গুঁটী দেখাইতে পারিলে ভাল হয়)। পাট (পট্টবস্ত্র) কাপড়ের দাম সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ভাল পাট কাপড়ের রঙ্‌ মাখনের মত। গরদের রঙ্‌ ঘৃতের মত। মুগার রঙ্‌ তামাক পাতার মত। এঁড়ির রঙ্‌ আলুর মত।

পলুর কথা।—প্রথমে রেশম কীটের ডিম দেখাও। খুব ছোট

ছোট পোস্তদানার মত। এই ডিম ফুটিয়া পোকা বাহির হইতে ১০।১২ দিন লাগে। একটা পলু পোকা দেখাও। দেখিতে বিশ্রী—ছোট ছোট ১৬ খান পা আছে। মাথার উপর ছয়টা চক্ষু—শরীরে ১২টী খণ্ড—মধ্যের খণ্ডগুলি দুই পাশের খণ্ড অপেক্ষা কিছু মোটা। পলু ডিম হইতে বাহির হইয়াই খাইতে আরম্ভ করে আর দিন রাত্রি কেবল খায়। তুত পাতা, ভেরেণ্ডা পাতা প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য। ৪।৫ দিন পর পর ইহারা খোলস পরিত্যাগ করে (সাপের মত)। প্রায় এক মাসের মধ্যেই পলু খুব বড় হইয়া উঠে (৩।৪ ইঞ্চ) এই এক মাসের মধ্যে ৪ বার খোলস বদলায়। তখন আর খায় না। এই সময় পলুর শরীরের দুই পাশের দুই ছিদ্র হইতে সরু সূতা বাহির হইতে থাকে—আর পলু নিজে ঐ সূতা গায় জড়াইয়া ৫।৬ দিনে একটা (লেবুর মত) গুঁটী—(বা কোয়া) প্রস্তুত করে। গুঁটী হইতে ঐ সূতা ছাড়াইলে এক পোয়া মাইল লম্বা (এক মাইল ১৭৬০ গজে—১ পোয়াতে কয় গজ ? বোর্ডে কসাইয়া লও) সূতা পাওয়া যায়। এই সূতার গুঁটীগুলি গরম জলে ফেলিয়া রাখে। ইহাতে ভিতরের পোকা মরিয়া যায়। ভিতরের পোকা না মারিলে ভিতরের পলুর পাখা বাহির হইয়া প্রজাপতি হইয়া যায়। আর গুঁটি কাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। গুঁটী কাটিলে সূতা ছিড়িয়া নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া প্রজাপতি হওয়ার পূর্ব্বেই পলু মারিয়া ফেলে। পরে গুঁটী হইতে সূতা বাহির করিয়া লাটাইতে জড়ায়। রেশমের সূতা খুব সরু ও হাল্‌কা। ২০০০ গুঁটীর সূতা—একসঙ্গে করিলে আধ সের ওজন হয়।

প্রজাপতি ;—গুঁটীর ভিতর রেশম-প্রজাপতি ২০।২৫ দিন ঘুমাইয়া থাকে। যে সময় পলু গুঁটীর ভিতর বাস করে সেই সময় তাহার পাখা উঠিতে থাকে। তারপর পাখা বেশ বড় হইলে পলু প্রজাপতি হইয়া গুঁটী কাটিয়া বাহির হয়। সকল প্রকার রেশম গুঁটির যেমন এক প্রকার রঙ নয় সেইরূপ সকল প্রজাপতিরও এক রকম রঙ নয়। যত প্রজাপতি

দেখিতে পাও সকলেই এইরূপ গুঁটি কাটিয়া বাহির হয়। তবে সব রকম গুঁটীতেই রেশম হয় না, আর সব রকম গুঁটীও রেশম গুঁটীর মত নহে। অনেক গুঁটী কেবল একটী পাতলা চামড়ার আবরণের মত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যেই পলু বাস করে ও তাহার মধ্যে থাকিতে থাকিতেই তাহার পাখা হয়। অবশেষে সেই চামড়ার গুঁটী কাটিয়া বাহির হয়।
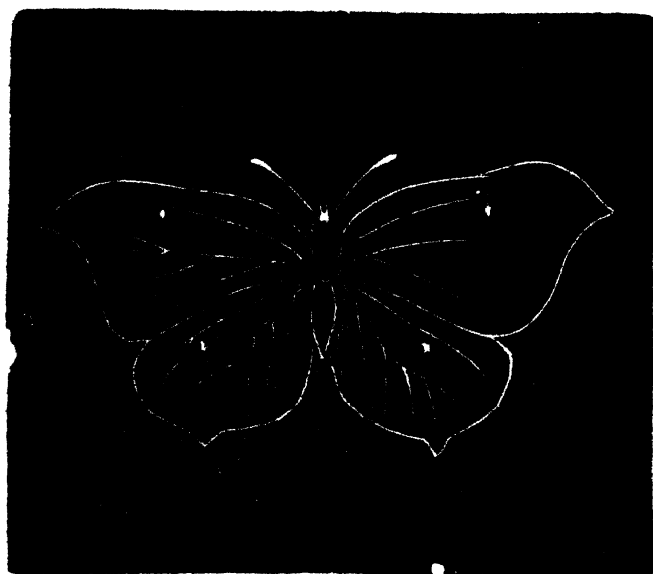
সাধারণ প্রজাপতি।

একটী প্রজাপতি দেখাও। চারখানি পাখা। দেহের তিনটী অংশ—মস্তক, বক্ষ, উদর। শরীরের এইরূপ তিন অংশ বিশিষ্ট কীটকে পতঙ্গ বলে। প্রজাপতির দুইটী হুল আছে—সে প্রায়ই এই দুই হুল নাড়ে কিন্তু হুল যে তার কি কাজে লাগে তাহা কেহ বলিতে পারে না। প্রজাপতির মাথার সম্মুখে একটা লম্বা সরু শুঁড় আছে। সে এই শুঁড় জড়াইয়া রাখে

—ফুলের মধু খাইবার সময় ইহা লম্বা করিয়া ফুলের মধ্যে চালাইয়া দেয়। যেদিন বেশ রৌদ্র উঠে সেইদিন অনেক প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষার দিনে প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রজাপতির চক্ষু দুইটী মশা মাছির চোখের মত অনেক অংশে ভাগ করা। (পলতোলা চিম্‌নী বা ডোমের সহিত তুলনা কর) প্রজাপতির পাখায় হাত দেও—পাখার রঙ্‌ তোমার হাতে লাগিয়া গেল।
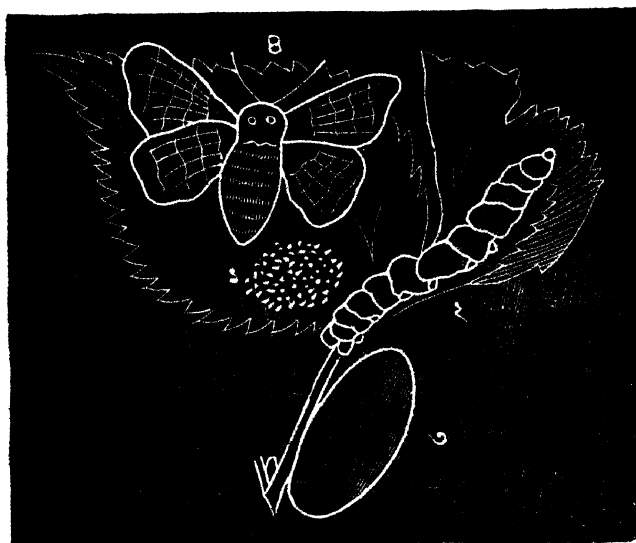
(১) রেশম কীটের ডিম (২) রেশম কীটের পলু (৩) রেশম কীটের কো প্রজাপতি।

প্রজাপতি বংশকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে—যাহারা দিবালোকে উড়িয়া বেড়ায় তাহাদিগকে দিবাচর বলে। এই দিবাচর প্রজাপতিই আসল প্রজাপতি। যাহারা সন্ধ্যালোকে উড়িয়া বেড়ায় তাহাদিগকে সায়ঞ্চর ও যাহারা রাত্রিতে উড়িয়া বেড়ায় তাহাদিগকে নিশাচর বলে। এই সায়ঞ্চর ও নিশাচর প্রজাপতি ঠিক প্রজাপতি নয়

—তবে প্রজাপতি জাতীয় এক প্রকার পতঙ্গ বটে। রেশম, এঁড়ি প্রভৃতি প্রজাপতি নিশাচর শ্রেণীর। আদত প্রজাপতি ও এই সকল পতঙ্গে তফাৎ এই যে আদত প্রজাপতির মুখের শুঁড় খুব বড়, ইহাদিগের শুঁড় খুব ছোট। আদত প্রজাপতি ২।১ মাস জীবিত থাকে, আর এঁড়ি, রেশম প্রজাপতি ৫।৬ দিন মাত্র বাঁচিয়া থাকে।

রেশমকীটের প্রজাপতি গুটী হইতে বাহির হইয়া ২।৩ দিন পরে ডিম পাড়ে। ডিমগুলি পোস্তদানার মত ছোট ছোট—রঙ্ সাদাটে। ডিমগুলি একটীর গায় আর একটী লাগিয়া থাকে। তুত পাতা বা ভেরেণ্ডার পাতার উপর ডিম পাবে। কেন? কারণ ডিম হইতে পলু বাহির হইলেই সে খাইতে চাহিবে। সাধারণতঃ রৌদ্রের গরমেই ডিম ফুটিয়া পলু বাহির হয়। একটা রেশম প্রজাপতি ২০০ হইতে ২০০০০ ডিম পাড়ে। প্রজাপতি ডিম পাড়িয়াই ৪।৫ দিন পরে মরিয়া যায়। অন্যান্য প্রকার প্রজাপতি কিছুদিন উড়িয়া বেড়ায়, মধু খায় তারপরে ডিম পাড়িয়া মরিয়া যায়।

রেশমে নানারূপ বস্ত্র ও ফিতা প্রস্তুত হয়। হিন্দুগণ রেশম বস্ত্র পবিত্র বলিয়া মনে করেন।

১৬। মাছি।

উপকরণ—জীবন্ত বা মৃত মাছি।

কোন্ খানে মাছির উৎপাত বেশী দেখিতে পাও?—মিঠাইর দোকানে আর মাছের বাজারে। কোন্ কালে মাছির উৎপাত বাড়ে? গরমের সময়। মাছি কোন জিনিষ খাইতে ভালবাসে? মিষ্ট জিনিষ।

শরীরের অংশ।—এই মাছিটা দেখ। কয়খানা পাখা?

পাখা কেমন স্বচ্ছ—ইহার ভিতর দিয়া মাছির শরীর দেখা যাইতেছে। পাখা দুখানি কোথায় লাগান? মাছির শরীরের ঠিক মাঝখানে। শরীরের কয়টা অংশ আছে? তিনটী—মস্তক, বক্ষ, উদর। মাথাটা ছোট আর উদর বড়। আবার দেখ বক্ষের ও উদরের উপর গোল গোল দাগ আছে। এই সব জায়গায় খাঁচকাটা থাকায় মাছি শরীর ঘুরাইতে ফিরাইতে পারে। মাছির গায় হাত দাও—গায়ের উপর ভাগ শক্ত, ভিতর নরম—চিংড়ি মাছের মত। মাছির শরীরে হাড় নাই। আমাদের শরীরের উপর ভাগ নরম, ভিতরে শক্ত হাড়। মাথা আন্দাজ মাছির চোখ দুইটী খুব বড়। আবার এই চোখ আমাদের চোখের মত নয় (বোর্ডে চিত্র আঁকিয়া দেখাও। একটা কমলা লেবু বা গোল মাটীর বলকে দুই খণ্ডে ভাগ করিয়া তাহার উপর জালের টুকরা বা জালের মত কাপড় লাগাইলে যেরূপ হয়, অনেকটা সেইরূপ) অনেক গুলি ছোট ছোট চোখ (প্রায় ৪০০০ মত) এই রকমে পাশে পাশে সাজান অনুবীক্ষণ যন্ত্র ভিন্ন দেখা যায় না। আমাদের চোখ গর্ত্তে—তাই কেবল সম্মুখে দেখি। মাছির চোখ অনেক উঁচু ও অনেক অংশে ভাগ করা বলিয়া সে সকল দিকেই দেখিতে পায়। (এইরূপ ছোট ছোট কীট পতঙ্গের অনেক শত্রু বলিয়া ভগবান ইহাদের আত্মরক্ষণের নিমিত্ত এত চক্ষু দিয়াছেন—এই কথা বুঝাইয়া দাও)

মাছির চোখ।

তারপর দেখ ছোট ছোট দুইটী গোঁপ বা হুল আছে। বিড়ালের মত ইহা দ্বারা মাছি পথ ঠিক করে। মাথার সম্মুখে (দুইটী হুলের মাঝ খানে) একটী ছোট শূঁড় আছে। ইহার দ্বারাই সে খায়। মাছি শক্ত জিনিষ খাইতে পারে না। মিশ্রির উপর বসিয়া ইহাতে তাহার শূঁড় লাগাইয়া দেয়। শূঁড় দিয়া এক রকম রস বাহির হইয়া আসিয়া মিশ্রি গলায়। সেই গলান মিশ্রি শূঁড় দিয়া টানিয়া লইয়া খায়।

মাছির কয়খানি পা? ছয়খানি—সবগুলিই বুকের নীচে লাগান। পায়ে অনেকগুলি জোড় আছে।

মাছির জন্ম।—গ্রীষ্মকালে মাছি ডিম পাড়ে। মশারীর দড়িতে কি ঘরের অন্য কোন শুষ্ক ও খস্‌খসে স্থানে দেখিবে যে কালো কালো দানার মত অনেক ডিম লাগিয়া আছে। কিছুদিন পরে ডিম ফুটিয়া পোকা বাহির হয়। সে পোকার চেহারা এইরূপ (বোর্ডে আঁকিয়া দেখাও) ইহার চোখও নাই, পাও নাই। কেবল শরীরের গোল গোল ১৩টী খণ্ড আছে মাত্র। তবে মুখ আছে—আর এই পোকা দিন রাত্রি কেবল খাইতে থাকে। তার পর যখন পোকা বড় হয় তখন আর খায় না। সে সময়ে তার গা থেকে এক রকম রস বাহির হইয়া তাহাকে ডুবাইয়া রাখে—সেই রস আস্তে আস্তে শক্ত হইয়া একটা থলের মত হয়। সেই থলের মধ্যে থাকিতে থাকিতে পোকার পাখা উঠে। পাখা উঠিলেই সেই থলে কাটিয়া বাহির হয়। এইরূপে মাছির জন্ম হয়।

সাবধানতা।—মাছি মল খাইতেও ভালবাসে। নানারূপ পচা জিনিষের উপরও ইহারা আড্ডা করে। এইজন্য খাবার জিনিষ ঢাকিয়া রাখা উচিত—বিশেষতঃ ওলাউঠার সময়। ওলাউঠার সময় মাছিতেই ওলাউঠার বীজ চারিদিকে ছড়ায়। ইহারা ওলাউঠা রোগীর বিষ্ঠার উপর বসে—ওলাউঠার বীজ ইহাদের গায় লাগিয়া যায়। এমন অবস্থায় ঐ মাছি যাহার খাবার জিনিষের উপর আসিয়া বসে তাহার খাবার জিনিষে ওলাউঠার বীজ লাগিয়া যায়। কাজেই যে সেই খাবার খায় তাহারই ওলাউঠা হয়।

মাছিকে ভাল কথায় মক্ষিকা বলে।

১৭। মশা।

উপকরণ—জীবন্ত বা মৃত মশক। মশকের নানা অবস্থার চিত্র।

শরীরের অংশ।—এই মশার শরীরের অংশগুলির নাম কর ও দেখাও। এই দুইখানি পাখা—খুব স্বচ্ছ, ভিতর দিয়া দেখা যায়। পাখা দুখানি খুব হাল্‌কা,—মশা যখন উড়ে, তখন এই দুই পাখায় বাতাস বাধিয়া ঐ রূপ ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়। বড় ঘুড়ির সঙ্গে পাতলা বেত বাঁধিয়া দিলে কেমন শব্দ হয় শুনিয়াছ? তার পর দেখ শরীরের এই তিনটী অংশ—মস্তক, বক্ষ ও উদর। ৬ খানি পা—পেছনের দুই খানি পা পাখার কাছ থেকে উঠিয়াছে আর মাঝের দুইখানা ও সম্মুখের দুইখানা বুকের মাঝখান থেকে উঠিয়াছে। মাথায় ৩টী হুল—দুইটী ভোঁতা হুল আর একটা সুঁয়োহুল। এই সুঁয়ো হুলটিই মানুষের শরীরের মধ্যে চালাইয়া দিয়া রক্ত চুষিয়া আনে। মশার চোখ মাছির চোখের মত। মাথা আন্দাজে খুব বড় বড় আর উঁচু ও পল্‌তোলা, প্রায় ৪০০০ হাজার ছোট ছোট চোখ, মৌচাকের মত সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। মাছির মত মশাও সব দিকে দেখিতে পারে। আমরা কি পশ্চাতে দেখিতে পারি? কেন পারি না? যদি আমার চোখ খুব বড় বড় করিয়া মাথার উপর বসান থাকিত তবে পশ্চাতে দেখিতে পাইতাম। মশার গায়ের উপরের চামড়া চিম্‌ড়ে—শরীরের মধ্যে খুব নরম—কোন রূপ হাড় নাই।

মশার জন্ম।—(চিত্র দেখ) মশা জলে (১) ডিম পাড়ে। ময়লা ও স্রোতহীন জল হইলেই সুবিধা হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সূর্য্যের তাপে, ডিম ফুটিয়া একটী (২) ছোট পোকা বাহির হয়। এই পোকা জলেই থাকে ও জলের ময়লা খায়। কিছুদিন পরে এই পোকা একটা পাতলা চামড়ার থলের মধ্যে প্রবেশ করে—এই (৩) থলে তার শরীরেই জন্মায়। সে এই

থলে সমেত জলের মধ্যে খেলা করিতে থাকে—এক বার ডুবিয়া যায় আবার ভাসিয়া উঠে। এই সময় ইহাদের আকার ছেদ চিহ্ন কমার মত দেখায়। বাহিরে কোন কলসী বা হাঁড়িতে অনেক দিনের জল থাকিলে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ—এইরূপ অনেক কমা-মশা দেখিতে পাইবে! দুই তিন দিন হইতে দশ বার দিনের মধ্যেই ঐ থলের মধ্যে মশার পাখা উঠে। তখন থলে কাটিয়া বাহির হয়। এই সময়েই জল পরিত্যাগ করিয়া (৪) ডাঙ্গায় আসে।

অনেক রকমের মশা আছে। যে গুলি আমাদিগকে সাধারণতঃ কামড়ায় তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া মশা (বা এনোফিলিস anophilis) বলে।
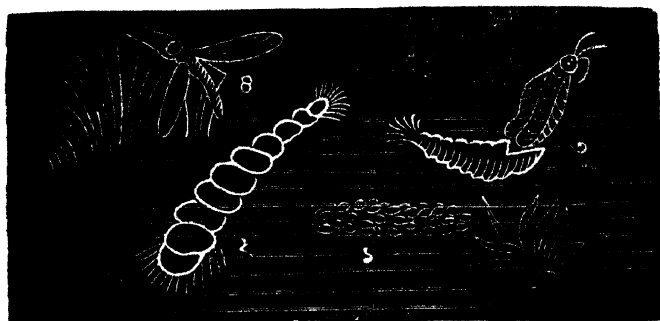
এই জাতীয় মশার আবার পুরুষটী কামড়ায় না—স্ত্রী মশাই আমাদিগকে কামড়ায়; আর রক্ত খায়। ইহাদের কামড়েই ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। যে মশার পেটভরা রক্ত দেখিবে সেইটীই ম্যালেরিয়া মশা জানিবে।

মশানিবারণ।—বাড়ীর চারদিক বেশ পরিষ্কার রাখিবে। কোনরূপ পচা জলের ডোবা বা নালা থাকিলে তাহা বন্ধ করিবে বা তাহাতে মধ্যে মধ্যে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিবে। কেরোসিন তেলে মশার ডিম মরিয়া যাইবে। ঘর খুব পরিষ্কার রাখিবে—মাকড়সার জাল, কালির ঝুল,

বেশ করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিবে। ঘরে প্রত্যহ ধুপ ধুনা দিবে। শুইবার ঘরে অনেক জিনিষ রাখিবে না। নিদ্রার সময় মশারি ব্যবহার করিবে। শীতকালে মশার উৎপাত থাকে না। গ্রীষ্ম ও বর্ষাতেই ইহাদের উৎপাত বাড়ে কারণ সেই সময়ই ইহাদের বৃদ্ধির সময়।

১৮। মৌমাছি।

উপকরণ—মৃত মধুমক্ষিকা বা তাহার ছবি। মৌচাক বা বোলতার চাক।

শরীরের অংশ।—মাছির মত মৌমাছিরও শরীরের তিনটী অংশ—মস্তক, বক্ষ ও উদর। ছয়খানি পা। চক্ষুও মাছির মত বড় বড় ও বহু পার্শ্বযুক্ত—একটা চোখে প্রায় ৪০০০ চার হাজার ছোট ছোট চোখ, মৌচাকের মত সাজান। এই দুইটী বড় চোখ ছাড়া, মৌমাছির আরও ছোট ছোট ছয়টী চোখ আছে—এই ছয়টী চোখ বড় দুই চোখের মধ্যে ছটী বিন্দুর মত। মাছির পাখা দুইখান, কিন্তু মৌমাছির পাখা ৪ খান। তবে হাত দিয়া ধরিয়া না দেখিলে চারখানা পাখা বুঝিতে পারা যায় না। মৌমাছির মুখে দুইটী হুল আছে। একটী শুঁড় আছে ও কাঁকড়ার চিম্‌টের মত দুইটী চিম্‌টে আছে।

মাদী মাছি

মর্দ্দা মাছি

মজুর মাছি

ফুলের মধ্যে শুঁড় চালাইয়া দিয়া মধু চুষিয়া খায়। চিম্‌টে দিয়া কামড়াইয়া ধরিয়া চাক তৈয়ারী করে। মৌমাছির লেজের দিকে যে হুল আছে সেইটীই গায় বিঁধাইয়া দেয় আর সে হুলের মধ্য দিয়া এক প্রকার

বিষাক্ত রস ঢালিয়া দেয়। ইহাতেই জ্বালা হয়। একসঙ্গে অনেক মৌমাছি হুল বিঁধাইলে মানুষ মরিয়াও যায়। সাবধান—মৌচাকে ঢিল ছুড়িও না।

মৌমাছির প্রকার।—একটা মৌচাকে কত মাছি থাকে জান? অনেক মাছি—এক একটা বড় চাকে প্রায় ২০ হাজার মাছি থাকে। এই বিশ হাজার মাছি আবার এক রকমের নয়—তাহাদের আকার কি কাজ-কর্ম্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। একটা খুব বড় মাছি থাকে, সেটাকে মা-মাছি বা মাদী মাছী (ইংরেজীতে মা মাছিকে রাণী-মাছি) বলে। সকল মজুর-মাছি এই মা-মাছির সেবা করে। মা-মাছি চাকে থাকিয়া চাকের ঘরে ঘরে ডিম পাড়ে। আর কোন কাজ নাই, সে ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করে না। এই জন্য এই বড় মাছির নাম মা-মাছি। (চিত্রে মা মাছি বা মাদী মাছির আকার দেখাও ও ইহার উদরের অংশ কেমন সরু তাহা লক্ষ্য করিতে বল)। তারপর এই বিশ হাজারের মধ্যে প্রায় দুই হাজার মাছি মর্দ্দা মাছি। ইহাদের হুল নাই—উদরের দিক মা-মাছির মত, সূঁচাল নয় (চিত্র দেখ) আর ইহারা কোনরূপ কাজকর্ম্মও করে না বলিয়া ইহাদিগকে ইংরাজীতে 'অলস (Drone) মাছি' বলে।

তারপর অবশিষ্ট আঠার হাজার মাছি 'মজুর মাছি'। ইহারাই ফুল হইতে মধু আনে—ইহারাই চাক তৈয়ারী করে—ইহারাই মা-মাছির বাচ্চাগুলিকে পালন করে। ইহাদের আকার ছোট (চিত্র দেখ)।

মৌচাক নির্ম্মাণ।—মজুর মাছিরাই মৌচাক নির্ম্মাণ করে। ইহারা পেট ভরিয়া মধু খায় ও সেই মধু পেটের ভিতরস্থ এক প্রকার রসের সহিত মিশাইয়া মোম প্রস্তুত করে। এই মোম দিয়াই চাক তৈয়ারি করে। তাহা-দের মুখে যে দুইটা চিম্‌টা আছে, তাহাই
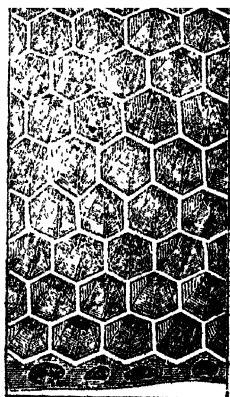
দিয়া চাক গড়ার কাজ করে। একটা চাকে ১৫।২০ হাজার খোপ করে। এই খোপগুলি বেশ সুন্দররূপে গায় গায় সাজান। সকলগুলিরই ছয়টী বাহু (ষড়ভুজ) বা দেয়াল (একখানি মধুচক্র ও মোম দেখাও। অভাব-পক্ষে মৌচাকের চিত্র দেখাও) এই সমস্ত খোপে খোপে মাদি-মাছি ডিম পাড়িয়া যায়। মাদি-মাছির আর কোন কাজ নাই। তারপর সেই ডিমে মজুর মাছি তা দেয়। ডিম ফুটিয়া পোকা বাহির হইলে (রেশমকীট, মাছি, মশা প্রভৃতির মত) সেই পোকাগুলিকে (মৌচাক ভাঙ্গিলে এইরূপ পোকা দেখিতে পাওয়া যায়—অভাবপক্ষে বোলতার টোপ দেখাইতে পার) মজুর মাছিরাই খাওয়ায়। মজুর মাছিরা যখন মধুর জন্য ফুলের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তাহাদের গায় ফুলের রেণু (কোন বালকের হাতের উপর একটা ফুল ঝাড়িয়া তাহার রেণু দেখাও) লাগিয়া যায়। এই রেণুগুলি তাহারা মাঝের পা দিয়া ঝাড়িয়া পেছনের পার-সহিত-লাগান থলিয়ার মধ্যে রাখে। এই রেণুর সহিত মুখের লালা মিশাইয়া পোকাগুলিকে খাইতে দেয়। ৫।৬ দিন পরে পোকাগুলি যখন বড় হইয়া উঠে—তখন আর খায় না।

এই সময়ে তাহাদের শরীর হইতে এক প্রকার সূতা বাহির করিয়া, নিজকে তাহাতে জড়াইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। মজুর মাছিগুলি চাকের খোপের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। ৭।৮ দিনের মধ্যেই পোকার পাখা উঠে। তখন সে তাহার ঘরের ঢাকনা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসে। এই ছোট মাছিগুলিকে মজুর মাছিরা ২।৩ দিন মধু খাওয়ায়। তারপর তাহারা নিজেই কাজ করিতে পারে। মর্দ্দা-মাছিরা কোন কাজ করে না বলিয়া মজুর-মাছিরা তাহাদিগকে হুল ফুটাইয়া মারিয়া ফেলে। সকল মাছিই মধু খাইয়া জীবন ধারণ করে। বর্ষায় মধু সংগ্রহ কঠিন হয় বলিয়া ইহারা বসন্তে ও গ্রীষ্মে চাক ভরিয়া মধু রাখে।

ইউরোপের অনেক স্থানে মৌমাছি পুষিয়া থাকে। ছোট ছোট

খড়ের ঘর করিয়া দেয়—সেই ঘরে একটা মাদী-মাছিকে আনিয়া আবদ্ধ করে। মজুর মাছি ও মর্দ্দা মাছিগুলি মাদী মাছির অনুগত। তাহারা গিয়া সেই ঘরেই চাক নির্ম্মাণ আরম্ভ করে।

একটা মাদী মাছি প্রায় ৩ বৎসর বাঁচে। প্রতি বৎসর ২।৩ বার ডিম প্রসব করে। প্রতি বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ ডিম পাড়ে। এই ডিমের অনেকগুলিতেই মজুর মাছি হয়। অল্পসংখ্যক মর্দ্দা মাছি আর অতি অল্প মাদি মাছি। এই মাদি মাছিরা আবার প্রত্যেকে কতকগুলি মর্দ্দা মাছি ও অনেকগুলি মজুর মাছি লইয়া এক এক দল করে ও পৃথকভাবে ডিম্ব প্রসব ও মৌচাক নিৰ্ম্মাণের কাজ করে।

মধু সুমিষ্ট—মধু ঔষধে ব্যবহার করে—মধু দুধের সঙ্গে খায়। মোম দিয়া বাতি তৈয়ারী হয় ও পুতুল তৈয়ারী হয়।

মাকড়সা ও কাঁকড়া।

(তৃতীয় প্রকরণের অন্তর্গত মাকড়সার পাঠ দেখ)

উপকরণ—মাকড়সার চিত্র, মৌমাছির চিত্র, মাকড়সার জাল প্রভৃতি। জীবন্ত মাকড়সা হইলেই ভাল হয়। কাঁকড়া বা কাঁকড়ার চিত্র।

মাকড়সা ও মৌমাছির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর :—

(১) মৌমাছির ৬ পা, মাকড়সার ৮ পা।

(২) মৌমাছির দেহ ৩ খণ্ডে বিভক্ত—মস্তক, বক্ষ ও উদর।

মাকড়সার দেহে ২ খণ্ড—মস্তক ও বক্ষ এক খণ্ডে, উদর অপর খণ্ডে।

(৩) মৌমাছির পক্ষ ৪ খানি—মাকড়সার পক্ষ নাই। ইহা ছাড়া আরও অনেক সূক্ষ্ম বিষয়ে পার্থক্য আছে। সেগুলি বালকেরা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিবে না, যথা—

(ক) মৌমাছির দেহে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল আছে, এই সমস্ত নলের সাহায্যেই তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য চলে। কিন্তু মাকড়সার ফুসফুস আছে, সে ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাস প্রশ্বাস করে।

(খ) মৌমাছি ডিম হইতে জন্ম প্রাপ্ত হয় আর তাহার মৌমাছিত্ব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ৩ বার দেহ পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু মাকড়সার বাচ্চা জীবন্ত মাকড়সাই হয়—ডিম হয় না।

মাকড়সা কীট পতঙ্গ খাইয়া জীবনধারণ করে। কোন কোন মাকড়সা তাড়িয়া শিকার ধরে, কেহ কেহ জালে শিকার আবদ্ধ করে। সকল-জাতীয় মাকড়সাই বিষ প্রয়োগ করিয়া শিকার বধ করে। মাকড়-সার উপর মাঢ়ীতে নলের মত একজোড়া দন্ত আছে। তাহার ভিতর ছিদ্র। এই দন্তের গোড়ায় বিষের থলি। কোন কীটের দেহে দন্ত বিঁধাইয়া দিলে যে চাপ পড়ে সেই চাপের বেগে দন্তমূলে স্থিত থলি হইতে বিষ বাহির হইয়া দন্তের ছিদ্রপথে দংষ্ট্র কীটের দেহে প্রবেশ করে। সাপের বিষও এইরূপে দেহে প্রবেশ করে। এমন মাকড়সা আছে যাহার বিষে একটা পাখী মারা যাইতে পারে। মানুষকেও মাকড়সা কামড়াইয়া থাকে। চেলা, বিচ্ছু কামড়াইলে যেমন যন্ত্রণা হয়, মাকড়সার কামড়েও তদ্রূপ হইয়া থাকে।
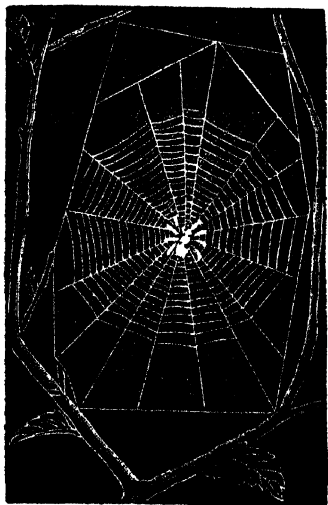
মাকড়সার পশ্চাতভাগে সচ্ছিদ্র ৪টী নল আছে। প্রতিনলের মুখে ছিদ্রসংখ্যা এক হাজার। ইহার শরীর হইতে এই ছিদ্রপথে এক প্রকার রস

নির্গত হয়। সেই রসে বায়ু লাগিলেই শক্ত হইয়া যায়। মাকড়সার এক গাছি সূতা হাজার সূতার সমষ্টি। মাকড়সা পশ্চাতের পা দিয়া সূতা পাকায়। যদি খুব বড় জাল তৈয়ারী করিতে হয় তবে দেহ হইতে দীর্ঘ সূত্র বাহির করিয়া ছাড়িয়া দেয়। বায়ুবেগে সেই সূত্র দূরবৃক্ষে সংলগ্ন হয়। এই সূত্রের উপর ভর করিয়া সে সুবৃহৎ জাল প্রস্তুত করিয়া থাকে। একটা বড় জালের ব্যাস ২০।২৫ হাত পর্য্যন্ত দেখা যায়। মাকড়সা প্রথমে জালের ব্যাসার্দ্ধগুলি নানাস্থানে সংলগ্ন করিয়া লয়। তারপর ঠিক কেন্দ্রস্থান হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাল বুনিতে আরম্ভ করে।

নানাজাতীয় মাকড়সা আছে। কাহারও ২টী, কাহারও ৪টী ও কাহারও ১২টী পর্য্যন্ত চক্ষু দেখা যায়।
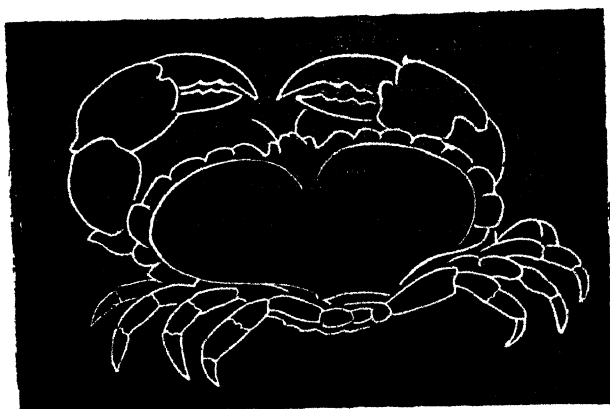
কাঁকড়া।

কাঁকড়া দেখাও।—সমস্ত শরীর যেন একখণ্ড বলিয়া মনে হয়। পিঠের উপর এক শক্ত আবরণ। কচ্ছপের আবরণের মত। কাঁকড়ার ১০ খানি পা। ইহা ছাড়া কাঁকড়ার দুইটী বড় বড় চিম্‌টা (বা সাঁড়াসী) আছে। এই চিম্‌টা দিয়া সে খাবার জিনিষ ধরিয়া আনে। যদি

এই চিম্‌টা দিয়া তোমার আঙ্গুল ধরিতে পারে তবে আঙ্গুল কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিবে। চিমটার সহিত ইঁদুরধরা জাতিকলের তুলনা কর। চিম্‌টার দাঁতগুলি আর জাঁতিকলের দাঁতগুলি এক রকমের। কাঁকড়ার মুখ কোথায় দেখাও? নীচের দিকে—ঠিক শরীরের মধ্যস্থলে—অন্য জীবজন্তুর যেখানে পাকস্থলী। কাঁকড়ার খাওয়া দেখেছ? দুই চিমটা দিয়া খাবার জিনিষ ধরিয়া মুখের ভিতর দেয়—মনে হয় যেন খাবার জিনিষ বুঝি একবারেই পেটের ভিতর পুরিয়া দিল। চোখ দুটী মুখের কাছে নয়—মাথার কাছে। মাথায় কেবল কাল দুইটী উঁচু চোখ ও দুইটী গোঁপ আছে। কাঁকড়া অনেক প্রকার আছে। কাঁকড়া সাঁতরাইতে পারে না—জলের নীচে মাটীর উপর হাঁটিয়া চলে। এক রকম ছোট কাঁকড়া আছে—সেগুলি সাঁতারায়। তাদের পার আগা চাপ্‌টা। সমুদ্রের কাঁকড়া খুব বড় বড়। কাকড়ার ঠ্যাং কাটিয়া দিলে আবার সে ঠ্যাং গজায়। মানুষের ঠ্যাং কাটিলে কি আবার নতুন ঠ্যাং হয়? কাঁকড়া জলের পোকা ও ছোট ছোট—মাছ ধরিয়া খায়। কাঁকড়া মারামারি ভালবাসে। এক জায়গায় ১০।১২টা কাঁকড়া রাখিলে দেখিবে যে ২।৩ দিনের মধ্যে অন্য সবগুলি মরিয়া গিয়াছে, কেবল সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী কাঁকড়াটি—জীবিত আছে। এক এক কাঁকড়া অন্য কাঁকড়াকে ধরিয়াও খায়।

কাঁকড়াকে জলের মাকড়সা বলে।

২০। মূল।

নানারূপ মূল সংগ্রহ কর। গাছ সমেত সংগ্রহ করিতে পারিলেই ভাল হয়।

গাছের মূল কোথায় থাকে? মাটীর নীচে। মূলের রঙ্‌ কেমন? কটা কটা—সাদাটে। হাঁ, ঠিক কথা—মূল মাটীর নীচে থাকে বলিয়া তার

রঙ্ তেমন উজ্জ্বল নয়। পাতার রঙ্ কেমন? সবুজ। সবুজ ঘাসের উপর ২।৩ দিন একখানি ইঁট বা কাঠ চাপা দিয়া রাখিলে ঘাসের রঙ্ কটা হইয়া যায়—কেন বলিতে পার? সূর্য্যের আলো পায় না বলিয়া। (ধানগাছ কি ঘাস দেখাইয়া) এইটা কি গাছ বল ত? ধানগাছ। ইহার মূল কোন্‌গুলি? মূলের বর্ণনা কর। সরু সরু চুলের গোছার মত। আবার এক একটা মূলের গা দিয়া আরও সরু সরু মূল বাহির হইয়াছে।
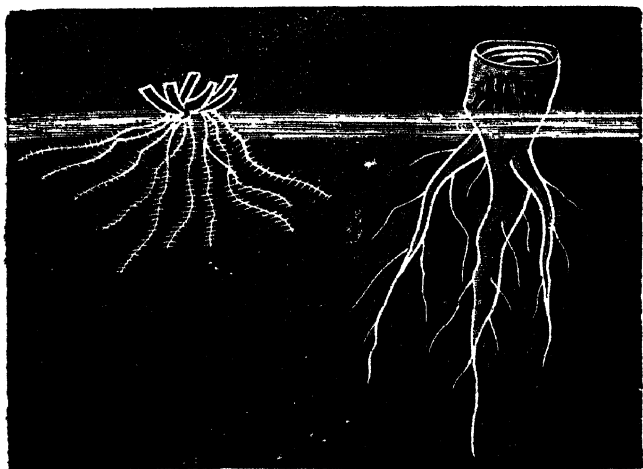
(একটা কালকাসিন্দা, ধুতুরা, আমচারা, বেগুণ কি এইরূপ কোন গাছ দেখাও)—এই গাছের মূল দেখ। বর্ণনা কর। একটা মূল শিকড় সরু হইয়া মাটীর নীচে গিয়াছে, আর তাহার গা দিয়া সরু সরু শিকড় বাহির হইয়াছে। (ডেঙ্গোশাকের গাছ দেখাও) আবার এই দেখ একটা মূল শিকড়ের গা থেকে কেমন সব ডাল-শিকড় বাহির হইয়াছে। আম, জাম, তেঁতুল, বট প্রভৃতি গাছের শিকড় টিপিয়া দেখ—কেমন শক্ত।

মূলের উপর একটা নরম ছাল আছে। এই ছাল তুলিয়া ফেল। মধ্যে কাঠের মত শক্ত একটা দণ্ড। (মূলা দেখাও)—এই জিনিষটা কি? মূলা। ইহার নাম মূলা বলে কেন জান? মূলই এই গাছের প্রধান অংশ বলিয়া ইহাকে মূলা বলে। মূলা টিপিয়া দেখ শক্ত না নরম? বেশ নরম। মূলাই মূলাগাছের আদত মূল, তবে ইহার গা থেকেও আবার দেখ সরু সরু মূল বাহির হইয়াছে। আর এই রকম নরম মূলের নাম করিতে পার? শালগম, গাজর, আলু। হাঁ, শালগম, গাজর মূল বটে, কিন্তু আলু মূল নয়। আলু যে কেন মূল নয়, তাহা এক দিন তোমাদিগকে বলিয়াছি, আবার আর এক দিন বলিব।

তাল, খেজুর, নারিকেল প্রভৃতি গাছের মূল দেখাও। মূলগুলি গাছের গোড়ার চারিদিক থেকে বাহির হইয়াছে। কতক মূল মাটীর উপরেই আছে। মূলগুলি কেমন শক্ত—টিপিয়া দেখিতে বল। বাঁশের মূল দেখাও। কতকগুলি শিকড় সরু সরু। আবার দড়ির মত শিকড়ও আছে। মূলী বাঁশের শিকড় দেখাইতে পারিলে মোটা দড়ির মত শিকড়ের আকার বুঝিতে পারিবে।

বট গাছের মূল দেখাও। মূলগুলি কতদূর স্থান ব্যাপিয়া আছে, তাহা দেখাও। বটের ব বা ঝুরি দেখাও। ঝুরিও এক রকম মূল। ডাল থেকে আস্তে আস্তে নামিয়া মাটীর নীচে গিয়াছে। বলিয়া দাও যে কলিকাতার অপর পারে যে একটী উদ্ভিদ শিক্ষার বাগান আছে তাহার ভিতর একটা প্রকাণ্ড বট গাছ আছে। সেই গাছে প্রায় দুইশত ঝুরি নামিয়াছে।

কেয়ার গাছ দেখাও—গাছের গুঁড়ি থেকে কেমন মূল বাহির হইয়া মাটীর নীচে গিয়াছে।

পরগাছার মূল দেখাও। মূলগুলি কেমন অন্য গাছের গায় জড়াইয়া আছে। গুলঞ্চের মূল দেখাও—পরগাছার মূলের মত গুলঞ্চের মূল

গাছে থাকে না। স্বর্ণলতা (কুল গাছের উপর জন্মে—হলুদ বর্ণের লতা) দেখাও। মূল অতি ক্ষুদ্র। ইহাও গাছের গায় লাগিয়া থাকে না।

অনন্তমূল দেখাও। অনেক মূল আছে বলিয়া ইহাকে অনন্ত মূল বলে।

পানা দেখাও। ইহার মূল জলে থাকে।

সংক্ষিপ্তসার।—প্রায় গাছের মূলই মাটীর ভিতর থাকে। পানা, শেওলার মূল জলে থাকে। স্বর্ণলতার মূল শূন্যে।

২১। কাণ্ড।

কতক সংগ্রহ করিতে হইবে আর কতক বাগানে কি জঙ্গলে লইয়া গিয়া দেখাইতে হইবে।

আম, জাম, নারিকেল, বেল, গোলাপ প্রভৃতি প্রায় গাছের কাণ্ডই গোল—ঢোলাকৃতি। কাণ্ডের রঙ কেমন ?—মূলের মত কটা কি সাদাটে নয় আবার পাতার মত সবুজ নয়। প্রায়ই ময়লা ময়লা রঙ। আবার দুই গাছের গুঁড়ির রঙ এক রকম নয়।

ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণ কাণ্ডও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এরূপ কাণ্ডের সংখ্যা খুব কম। হাড় জোড়ার গাছের (লতাবিশেষ) কাণ্ড চতুষ্কোণ।

আবার কোন কোন গাছের কাণ্ড বেশ নরম, কোন কোন গাছের কাণ্ড বেশ শক্ত। ডেঙ্গোশাক, নটেশাক, পুঁইশাক, কলমী, হিঞ্চে লাউ প্রভৃতি গাছের কাণ্ড নরম। এই জন্যই এই সমস্ত কাণ্ড আমরা খাইতে পারি। এই সমস্ত গাছের কাণ্ডের রঙও সবুজ। কচু, ওল, কলা প্রভৃতি গাছের কাণ্ড আরও নরম। মানকচুর কাণ্ড কতক উপরে থাকে কতক মাটীর নীচে থাকে। যে অংশ উপরে থাকে তাহার রঙ সবুজ. যে অংশ মাটীর নীচে থাকে তাহার রঙ কটা। মাটীর নীচে যে কাণ্ড থাকে

তাহার গা দিয়া মূল বাহির হয়। ওলও কাণ্ড বিশেষ। এইরূপ আদা হলুদও কাণ্ড। (গাছ তুলিয়া দেখাও) এই দেখ কাণ্ডের গা থেকেই শিকড় বাহির হইয়া থাকে। মূলের খণ্ড হইতে কখন গাছ হয় না। একটা আম গাছের মূল কাটিয়া লাগাও—গাছ হইবে না। কিন্তু আমের কাণ্ড ও ডাল হইতে গাছ হয় (কেমন করিয়া আমের কলম করে তাহা বলিয়া দাও)। আলু, ওল, কচু, আদা, হলুদ প্রভৃতি কাণ্ড—ইহাদের গায় চোখ আছে (দেখাও)—এই চোখ হইতেই গাছ বাহির হয়। মূলের গায় চোখ থাকে না। গাছের গুঁড়ি বা ডালের গায় চোখ থাকে—পাতা ও ডালের সন্ধিস্থল এবং ডাল ও কাণ্ডের সন্ধিস্থলগুলি চোখ। পেঁজের কাণ্ডও এইরূপ মাটীর নীচে থাকে। (একটা পেঁজের খোসা ছাড়াইয়া দেখাও যে মূলের উপরিস্থিত সামান্য শাঁস টুকুই ইহার প্রকৃত কাণ্ড। পেঁজের খোসাগুলি পেঁজের পাতা বলিলেও হয়। কলাগাছের কাণ্ডও এইরূপ মাটীর নীচে। কলার খোলাগুলি কলাপাতার বোঁটা মাত্র। তবে কলার ফল হইবার সময় এই কাণ্ড বৃদ্ধি হইতে হইতে গাছের মাথা পর্য্যন্ত যায়। কাণ্ড কেমন নরম। ইহা নরম বলিয়া আমরা খাইতে পারি।

কাণ্ড প্রায়ই মাটীর উপরে উঠিয়া থাকে। কিন্তু কচু, আলু, ওল প্রভৃতির কাণ্ডের কতকাংশ উপরে আর কতকাংশ নীচে জন্মে। কাণ্ডের উপরে একটা আবরণ আছে—তাহাকে বাকল বা বল্কল বলে। একটা গাছের বাকল তুলিয়া দেখাও। অনেক অসভ্য জাতি এখনও বাকল পরিয়া থাকে। সুপারী, নারিকেল, তাল প্রভৃতি গাছের উপরে বাকল নাই। বাঁশ ও আকেরও বাকল নাই; যে সকল গাছের বাকল আছে, তাহাদের কাণ্ড নিরেট—ফাঁপা নয়। তাল, সুপারীর কাণ্ড ফাঁপা—মধ্যে কেবল কতকগুলি লম্বা লম্বা আঁস থাকে। আকের কাণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখ। বাঁশের কাণ্ড একেবারেই ফাঁপা।

আম, জামের বাকল দিয়া কোন কাজ হয় না—বাকল নরম। বাক-

লের নীচেই যে শক্ত কাণ্ড থাকে, তাহাতেই নানারূপ কাজ হয়। তাল, সুপারীর বাহিরের অংশই শক্ত, এই বাহিরের অংশই আমাদের কাজে লাগে,, ভিতরে অংশে কোন কাজ হয় না।

আম, জাম গাছ বাহিরের দিকে বাড়ে—প্রত্যেক বৎসর একটু একটু করিয়া মোটা হইতে থাকে। তাল, সুপারীর গাছ ভিতরের দিকে বাড়ে। ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত একটু একটু মোটা হয়। তারপর মাটীর উপর ২।৪ হাত উঠিয়া গেলে আর মোটা হয় না। ইহার পর থেকে কেবল লম্বার দিকেই বাড়ে।

আম, কাঁঠালের কত ডাল পালা, তাল সুপারীর মাথায় সামান্য কয়েক খানি মাত্র ডাল।

যে সকল গাছ নিজের জোরে খাড়া হইয়া থাকিতে পারে না তাহা-দিগকে লতা বলে। লাউ, কুমড়া, শসা, সিম—লতা। সিমের গাছ তার আশ্রয়কে (বাঁশ, কঞ্চি বা গাছ) জড়াইয়া জড়াইয়া উঠে কিন্তু লাউগাছ জড়াইয়া উঠে না। লাউ গাছের যে আঁকড়ী (আকর্ষি) বাহির হয় তাই দিয়া ধরিয়া ধরিয়া উপরে উঠে।

আবার দেখ সিম, ঝিঙ্গা, ধুদুঁল, পুই লতা তাহাদের আশ্রয়কে বাম দিক থেকে দক্ষিণ দিকে জড়াইয়া জড়াইয়া উঠে। কোন কোন লতা (যেমন মেটে আলু লতা) দক্ষিণ হইতে বামে জড়ায়।

মিষ্টি কুমড়ার গাছ মাটীতে থাকিলে মাটীর উপরে বেঁকিয়া বেঁকিয়া বাড়িতে থাকে আর তার কাণ্ডের প্রত্যেক গিরা (গ্রন্থি) থেকে মূল বাহির হইয়া মাটীর নীচে যায়। পিপুল ও হিঞ্চে গাছের উদাহরণ দাও।

২২। পত্র।

পাতার আকার।—বেশীর ভাগ পাতার আকার লম্বা—অর্থাৎ পাশ অপেক্ষা লম্বার দিকে বড়। আমের পাতা, আতার পাতা, জামের পাতা, নারিকেলপাতা, কলাপাতা ইত্যাদি। অশ্বথ, বট, কাঠাল প্রভৃতি গাছের পাতাগুলিরও আশ পাশ সমান নয়। পাতার মধ্যে যে একটা শিরা আছে—যে শিরাটা বোঁটা বরাবর পাতার মাথা পর্য্যন্ত গিয়াছে—সেই শিরার বরাবরই পাতাটা লম্বা হইয়া থাকে।

অধিকাংশ পাতার আগাটা সরু—আম, জাম, পেয়ারা, নারিকেল প্রভৃতির পাতা দেখাও। পদ্ম পাতা গোল; তেঁতুলের পাতার মাথা সরু নয়। আম, জাম পাতার আকার ডিঙ্গি নৌকার মত, পদ্ম পাতা ঢালের মত, কচুর পাতা তীরের মাথার মত, কাঁঠালের পাতা হাতার মত, পেঁপের পাতা হাতের মত আঙ্গুল বাহির করা। গোলাপের পাতা, শেফালিকার পাতার পাশ কাটা কাটা—করাতের মত। বেগুন পাতা, লাউপাতা, কুমড়া পাতার ধার এঁকা বেঁকা—ঢেউ তোলা। তরমুজ, উচ্ছে প্রভৃতি পাতার পাশ আরও এঁকা বেঁকা। ধুতুরা, লাউ, কুমড়া, পেঁপে প্রভৃতি গাছের পাতার পাশ এঁকা বেঁকা হইলেও পাতার মাঝশিরার ডান ও বাম পাশের বাঁকগুলি প্রায় এক রকমের, কিন্তু উচ্ছে, তরমুজ প্রভৃতি পাতার দুই পাশ এক রকম নয়। পাতার দুই ভাগ—একটা বোঁটা (বৃন্ত) ও একটা ফলা (বা ফলক)। যাহার দ্বারা পাতার ফলা ডালে লাগান থাকে তাহাকেই বোঁটা বলে। আর বোঁটা বাদে পাতাকে পাতার ফলা বলে।

পাতার বিন্যাস।—অশ্বথ, বট, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছের পাতার এক বোঁটায় একটা পাতা। আবার কোন কোন পাতায় এক-বারেই বোঁটা থাকে না (রঙ্গণ ফুলের পাতা) আর কোন পাতার বোঁটা খুব বড়—পেঁপে পাতার বোঁটা, কচু পাতার বোঁটা। কলা পাতার

বোঁটা একেবারে মাটী থেকে আরম্ভ—কলার পেটো (বা খোলা) কলা পাতার বোঁটা মাত্র। তেঁতুল, কালকাসুন্দি, গোলাপ গাছের পাতা অন্যরূপ—এক বোঁটায় অনেক পাতা। (বালকেরা হয় ত মনে করিতে পারে যে যেমন আম ডালের গায় পাতা লাগান থাকে, তেমনি ত তেঁতুলের পাতাগুলিও একটা ছোট ডালের গায় লাগান আছে। কিন্তু তেঁতুলের ছোট ছোট পাতাগুলি যে ছোট ডালে লাগান থাকে, সেটা ডাল নয়; যদি সেটা ডাল হইত তবে ত আমের ডালের মত দিন দিন বাড়িত, কিন্তু সেটা বাড়ে না। কাজেই সেটা ডাল নয়—একটা বড় বোঁটা বা বৃন্ত। এই বড় বোঁটার গায় আবার ছোট ছোট বোঁটায় ছোট ছোট পাতা লাগান।) যে সকল বোঁটায় একটী পাতা তাহাকে সরল, আর এক বোঁটায় অনেক পাতা থাকিলে তাহাকে জটিল পাতা বলে। বালকগণকে নানারূপ সরল ও জটিল পাতা সংগ্রহ করিতে বলিবে। তেঁতুল, সজিনা, গোলাপ, বেল প্রভৃতি পাতায় এক বোঁটায় কয়টা পাতা থাকে তাহা গণিতে বল।

পাতার শিরা।—বর্ষার পর বড় বড় গাছের নীচে অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবে যে, অনেক পাতার সারভাগ পচিয়া গিয়াছে, কেবল শিরাগুলি আছে। এইরূপ কতকগুলি পচা পাতা সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া রাখিবে।

অশ্বত্থ, বট, আম, পাতা দেখাও—কাঁচা ও পচা পাতা উভয়ই দেখাও—বোঁটা বরাবর যে মোটা শিরাটা পাতার মাথা পর্য্যন্ত গিয়াছে সেইটা পাতার নীলদাঁড়া (মেরুদণ্ড) বা মধ্য শিরা। তাহার গা হইতে পাতার দুই পাশে কেমন সরু সরু আরও কত শিরা উঠিয়াছে তাহা দেখাও। আবার এই সমস্ত সরু শিরাগুলিকে ইহা অপেক্ষা সরু শিরা দ্বারা জালের মত জড়াইয়া রাখিয়াছে তাহাও দেখাও। বাঁশপাতা, নারিকেল পাতার শিরা দেখাও। মাঝের শিরাটা আছে, আর সেই শিরার

দুই ধারে অনেকগুলি সরু সরু মাঝারী শিরাও গিয়াছে। কিন্তু আম জাম পাতায় যেমন এই সকল মাঝারী শিরাগুলি আবার সরু সরু শিরা দ্বারা জালের মত জড়ান, বাঁশ ও নারিকেলের পাতায় সেরূপ শিরা নাই। যে সকল গাছ আমজাতীয় অর্থাৎ যে সকল গাছের বহির্বৃদ্ধি সে সকল গাছের পাতার শিরা জালের মত, আর যে সকল গাছ তাল জাতীয় অর্থাৎ যাহাদের অন্তর্বৃদ্ধি তাহাদিগের শিরা কতকটা ঘরের কুয়ার মত—পাশাপাশী (সমান্তর ভাবে) সাজান।

তারপর দেখাও যে ডালে যে পাতা সাজান থাকে তাহাও আবার সকল গাছ এক রকম নয়। লিচুর ডাল দেখাও—পাতাগুলি কেমন জোড়ায় জোড়ায় একই মুখে ডালের দুই দিকে সাজান।

লিচুর পাতা।

আতার ডাল দেখাও—পাতাগুলি কেমন দুই পাশে, একটার পর একটা করিয়া, এক মুখে, থাকে থাকে সাজান।

শেফালিকার ডাল দেখাও—পাতাগুলি কেমন দুইটী দুইটী করিয়া একত্র সাজান—এক জোড়ার মুখ অন্য জোড়ার বিপরীত।

আম কাঁঠালের পাতা দেখাও—পাতাগুলি ডালের গায়ে লতার মত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সাজান। ছাতিম ও শিমুলের পাতা দেখাও—ডালটাকে ঘুরাইয়া একস্থানেই পাতাগুলি স্থাপিত।

জবার ডাল দেখাও—পাতার বোঁটার নীচে কেমন ছোট ছোট সরু দুইটি পাতা আছে। ইহাকে উপপত্র বলে।

পেঁপের পাতা, ভ্যারেণ্ডার পাতা জটিল পত্র—অনেকগুলি মধ্য শিরা আছে—তাহাদের সঙ্গে মাঝারী শিরা ও সরু শিরা লাগান। একটা মধ্য শিরাযুক্ত একপত্র ফলককে একটা পত্র ধরিয়া লইলে, পেঁপের ও ভ্যারেণ্ডার এক বোঁটায় কয়টা করিয়া পাতা গণিয়া দেখাও। পেঁপের পাতাগুলি ফাঁক ফাঁক—আমাদের আঙ্গুলের মত; ভ্যারেণ্ডার পাতাগুলি জোড়া লাগান—হাঁসের পার মত।

আতার পাতা।

পাতা যখন পড়িয়া যায় তখন বোঁটা সমেত পড়িয়া যায়—ডালের গায়ে যেখানে বোঁটা লাগান থাকে সেখানেএকটা দাগ থাকিয়া যায়।

পাতার রঙ। নূতন পাতার রঙ সবুজ। আম, কাঁঠাল, জামের বুড়া পাতার রঙ সবুজ নয়—সবুজের সঙ্গে যেন একটু কাল। পাতার উপর পিঠের রঙ্ বেশ চক্‌চকে সবুজ, নীচের পিঠের রঙ খস্‌খসে—সাদাটে সবুজ। পাতার শিরা-গুলির রঙ পাতার সবুজের চেয়ে পাতলা সবুজ—তাই পাতার গায়ে শিরাগুলি বেশ পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়।

শেফালিকার পাতা।

যখন নূতন পাতা বাহির হয় তখন তাহার বর্ণ খুব পাতলা সবুজ বা শ্যামল

থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে নূতন তেঁতুলের পাতার যে রঙ হয় তাহা প্রায় হলুদ। যতই বড় হইতে থাকে রঙও ততই ঘন সবুজ হইতে থাকে। অনেক গাছের পাতা প্রথমে বেশ বেগুণে রঙের হইয়া থাকে। (আমের নূতন পাতা দেখাও) এই আমের নূতন পাতা দেখ—এখন কেমন বেগুণে রঙের। তার পরে আস্তে আস্তে পাতা একটু একটু লাল হইতে থাকে। পাতার লালবর্ণ ক্রমশঃ লোপ হইয়া প্রথমে পাতলা সবুজ পরে ঘন সবুজ রঙ ধারণ করে। গোলাপের, অশ্বত্থের, কদমের, জামের ও তেঁতুলের নূতন পাতা পরীক্ষা কর। গাব গাছে যখন নূতন পাতা বাহির হয় তখন তাহার কেমন শোভা হইয়া থাকে। অধিকাংশ গাছের পাতা সবুজ হইলেও দুই গাছের পাতার এক রকম রঙ নয়। সবুজ রঙেরই নানারূপ ঘন ও পাতলা অবস্থা। ডালের অগ্রভাগের পাতায় পাতলা রঙ, নীচের পাতায় ঘন। (এইগুলি বেশ করিয়া লক্ষ্য করিতে বল—চিত্র অঙ্কনে ইহার জ্ঞান আবশ্যক হইবে)। অন্যান্য বর্ণের পাতাও দেখা যায়। পাতাবাহারের (ক্রোটন গাছ) পাতা নানা রঙের। কচুর পাতায় কত সুন্দর রঙ দেখিতে পাওয়া যায়।
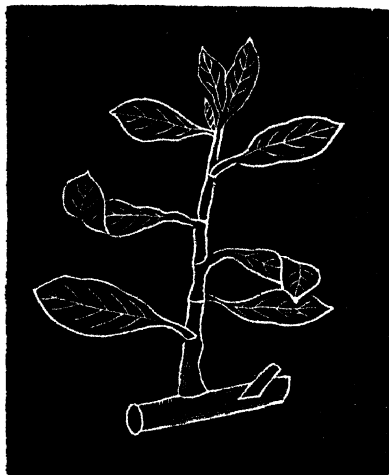
কাঁঠালের পাতা।

(চিত্রকরগণের মতে লাল, নীল ও হলুদ মূলবর্ণ কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণের মতে বেগুণে, লাল ও সবুজ বর্ণই মূলবর্ণ। নূতন পত্রে এই তিন মূল বর্ণের ক্রম বিকাশ বেশ লক্ষ্য করিতে পারা যায়)।

পাতার গন্ধ।—ভিন্ন ভিন্ন পাতার ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ। লেবুর পাতা, পেয়ারার পাতার গন্ধ সেই সেই ফলের মত। সকল পাতাতেই সেই সেই ফলের গন্ধ পাওয়া যায় না। কিছু দিন পরীক্ষা করিয়া অভ্যাস করিলে কেবল গন্ধের দ্বারাই পাতার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। তেজ-পাতার উত্তম গন্ধ বলিয়া আমরা ইহা ব্যঞ্জনে ব্যবহার করি।
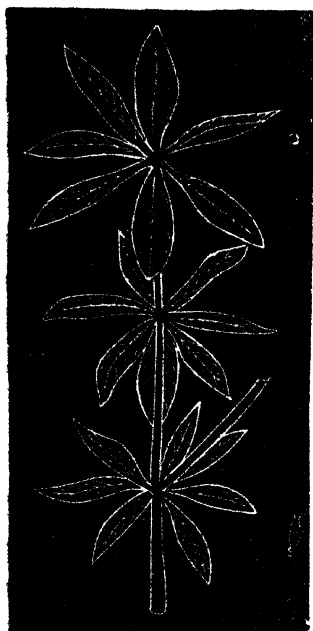
ছাতিমের পাতা।

পাতার স্বাদ।—তুলসীপাতা ও পানের স্বাদ ঝাল। শেফালিকা ও নিম পাতা তিতা। টক্‌পালঙ ও তেঁতুল পাতা টক্‌।

কোন কোন গাছ ঘুমায়। তেঁতুলের গাছ অশোকের গাছ পরীক্ষা কর। মেঘ হইলেই তেঁতুলের পাতা বুঁজিয়া যায়—রাত্রে তেঁতুল ও অশোকের পাতা বুঁজিয়া থাকে। অতসী ফুলের গাছ দেখাও। রাত্রে কেমন পাতাগুলি বুঁজিয়া থাকে প্রাতঃকালে ও সূর্য্য উঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই অবস্থাতেই থাকে। আবার লজ্জাবতীর গাছ দেখাও; একটু ছুঁইলেই পাতাগুলি কেমন বুঁজিয়া যায়। পাতাগুলি গাছের আগার দিক থেকে কি গোড়ার দিক থেকে বুঁজিয়া আসে তাহা লক্ষ্য করিতে বল।

২৩। ফুল।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসই এই পাঠের পক্ষে উপযুক্ত। এই সময়ে অনেক প্রকার ফুল সংগ্রহ করিতে পারা যায়। বিশেষ ধুতুরা ফুলের দ্বারা ফুলের বিষয় শিখাইবার যেমন সুবিধা হয় এমন আর কোন ফুলে হয় না। ধুতুরা ফুল চৈত্র বৈশাখে ফোটে।

প্রথমে ফুলের রঙের কথা বল। আমরা ফুল এত ভালবাসি কেন? সৌন্দর্য্যের জন্য আর ফুলের গন্ধের জন্য। কি কি রঙের ফুল দেখিয়াছ? নাম কর। বেল, জুই, টগর, গন্ধরাজ, কুটরাজ, রজনীগন্ধা, কুন্দ, লাউ সাদা। জবা, শিমুল, মাদার, পলাস, রঙ্গন লাল। পদ্ম, লালকাঞ্চন, গোলাপ গোলাপী। কনক (বা কলিকা) করবী, ঝিঙ্গা, ধুঁতুল, অতসী, সর্ষপ হলুদ। এই তিন রঙের ফুলই অধিক। অপরাজিতা. নীলঝাণ্টা, নীল। বেগুনের ফুল বেগুণে। গাঁদা ফুলে লাল, হলুদ ও কমলা রঙ দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতী কুমড়ার ফুল পাটল। সবুজ রঙের ফুল খুব কম। এক রকম লতার ফুল আছে, জেলা বিশেষে ইহাকে বনলতা বলে—তাহার ফুলগুলি পাতলা সবুজ বা শ্যামল। এই ফুলে সুন্দর শির তোলা মালা হয়। কাল রঙের ফুল দেখা যায় না।

ফুল কখন ফোটে? কতকগুলি ফুল সন্ধ্যার সময় ফোটে আর কতক রাত্রিতে ফোটে। প্রাতঃকালেও কোন কোন ফুল ফোটে। দুপুর বেলায় খুব কম ফুলই ফোটে।

বেল, মল্লিকা, নবমল্লিকা, বনমল্লিকা, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, জুথী, চাঁপা বৈকালে বা সন্ধ্যায় ফোটে। কৃষ্ণকলি বৈকালে। শেফালিকা সন্ধ্যার পর। পদ্ম, সূর্য্যমুখী, জবা, অপরাজিতা, করবী সূর্য্যোদয়ের পরে। কুমুদ, টগর, ধুতুরা রাত্রে।

বালকেরা ফুল না দেখিয়া কেবল গন্ধের দ্বারা যাহাতে ফুল চিনিতে

পারে এরূপভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দাও। প্রথমে দুই তিন রকম (মনে কর গোলাপ, বেল ও চাঁপা) ফুলের গন্ধ পরীক্ষা করিতে বল। তারপর তাহাদিগকে চক্ষু বুঁজিতে বল। তুমি একটী একটী ফুল তাহাদিগের নাসিকার নিকট ধর ও কি ফুল তাহা গন্ধের দ্বারা ঠিক করিতে বল।

তারপর বাগানে নিয়া দেখাও গাছের কোন স্থান হইতে ফুল বাহির হয়। গোলাপ, বেল, গাঁদাফুল ডালের মাথা হইতে বাহির হয়। জবা,
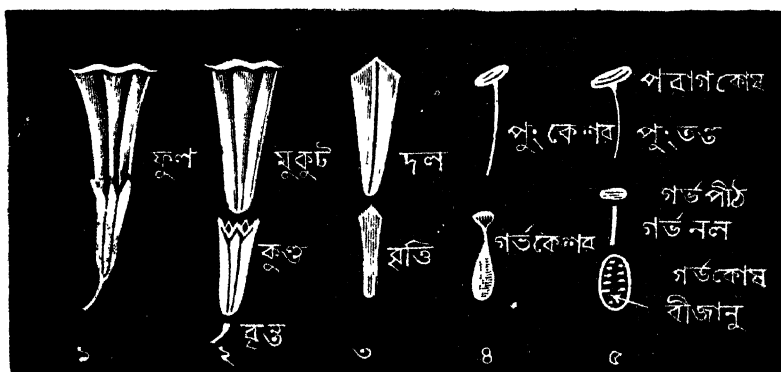
দোপাটী, ডালের গায়ে ফোটে—পাতা ও ডালের সন্ধি স্থল হইতে বাহির হয়। এইরূপে, কুমড়াফুল, লাউফুল, ঝিঙ্গাফুল প্রভৃতিও দেখাও।

এখন ফুলের অংশ শিখাইতে হইবে। একটা চিনে জবা কি কনক করবী ও একটা ধুতুরা ফুল সংগ্রহ কর। (অনেক ফুল সংগ্রহ করিয়া বালকগণের প্রত্যেকের হাতে এক একটা দিতে পারিলে খুব সুবিধা হইবে) ফলের বোঁটা দেখাও। বোঁটাকে ভাল কথায় 'বৃন্ত' বলে। বোর্ডে একটা বোঁটা আঁকিয়া দেখাও তাহার পাশে বৃন্ত কথা লেখ। এখন বোঁটার উপরিস্থিত কুণ্ড দেখাও—বল যে বোঁটার উপরে এই যে কতকগুলি ছোট ছোট সবুজ পাতার একটা বেড় দেখিতেছ, ইহাকেই কুণ্ড বলে। কুণ্ড

মানে গর্ত্ত—এই পাতাগুলি মিলিয়া একটা ঠোঙ্গা হইয়াছে। সেই ঠোঙ্গার গর্ত্তের মধ্যেই আবৃত ফুলটীর গোড়া। তারপর এই আবৃতফুল দেখ—ইহারও পাতা আছে, এই পাতাগুলিকে পাঁপড়ী বলে। কুণ্ডের পাঁপড়ীগুলির রঙ্ কেবল সবুজ—কিন্তু ফুলের পাঁপড়ীগুলির নানারূপ রঙ্ হইয়া থাকে। পাঁপড়ীগুলিও গায় গায় লাগিয়া গোল হইয়া কুণ্ডের উপর বসিয়া আছে। পাঁপড়ীগুলির উপরের দিক চওড়া নীচের দিক সরু। (একটা কলমের মাথার উপর একটী কনক করবী, জবা কি ধুতুরা ফুল উল্টা করিয়া বসাও বোঁটা উপরের দিক করিয়া) এই দেখ এই কলমটার মাথায় এই ফুলটা যেন মুকুটের মত দেখাইতেছে। এই জন্য পাঁপড়ী দিয়া গড়া ফুলের এই অংশকে (দেখাইয়া) মুকুট বলে। মুকুটের পৃথক্ পৃথক্ পত্রকে (পাঁপড়ীকে) ভাল কথায় 'দল' বলেআর কুণ্ডের পৃথক্ পৃথক্পত্রকে 'বৃতি'বলে।

তারপর দেখ এই জবাফুলের, করবীফুলের দলগুলি ছাড়া ছাড়া আর এই ধুতুরা ফুলের দলগুলি জোড়া লাগান। জবা, সিমুলের দল 'মুক্ত' আর ধুতুরা, কলমীর দল 'যুক্ত'। আবার এইরূপ, জবা, সিমুলের বৃতিও মুক্ত, আর ধুতুরা, কলমীর বৃতিও যুক্ত।

আবার দেখ করবী, কলমী, সিমুলের দলের কেবলমাত্র একটী থাক্, কিন্তু গোলাপ, গন্ধরাজ, পদ্মের কত থাক্—থাকের উপর থাক্। জবার কুণ্ডের দুইটী থাক।

বালকগণকে দেখাইয়া দাও যে ফুলের দলগুলি প্রায়ই বিজোড়। বহু থাক্যুক্ত ফুলের পাঁপড়ী গণিয়া ঠিক করা শক্ত। এক থাক্যুক্ত ফুলের পাপড়ী গণিয়া দেখাও যে অনেক ফুলেরই ৫টী দল।

রঙ্গণ, সরিষা, মূলা—৪ দল

কৃষ্ণকলি, করবী, আকন্দ—৫ দল

কন্দ, ধুতুরা, দাড়িম্ব, গুলঞ্চ, লঙ্কা—৬ দল

(বালকগণকে এইরূপ একটী তালিকা প্রস্তুত করিতে বলিবে)

এখন একটী ফুলের (ধুতুরা ফুল হইলেই ভাল হয়) বৃতি ও দল আস্তে আস্তে ছিঁড়িয়া ফেল। মুকুটের গোড়া হইতে সরু খড়ের মত যে পাঁচটি সূতা বা কেশর উঠিয়াছে, তাহাদিগের প্রত্যেকটীকে পুংকেশর বলে। আর এই পাঁচটী পুংকেশরের মধ্যে যে আর একটী দণ্ড খাড়া হইয়া আছে, তাহাকে গর্ভকেশর বলে। ফুল বিশেষে গর্ভকেশর যে একাধিকও হইয়া থাকে তাহা দেখাও (চিনেজবা)। পুংকেশরের সংখ্যা প্রায়ই পাঁপড়ীর সংখ্যার সমান হইয়া থাকে। তবেই দেখ একটা ফুলে ৪ রকমের ৪টা থাক্। প্রথম থাকে হইল কুণ্ড, তারপরের থাকে মুকুট তার মাঝে পুংকেশর, তারমাঝে গর্ভকেশর। যে সকল ফুলে এই ৪টা থাক্ই থাকে তাহাকে বলে পূর্ণাঙ্গ ফুল আর যে ফুলে এই ৪ টার কোন একটার অভাব থাকে তাহাকে বলে হীনাঙ্গ ফুল। ধুতুরা ফুলে এই চার থাক্ আছে বলিয়া ধুতুরা পূর্ণাঙ্গ ফুল।

রজনীগন্ধ ফুলের বৃতি নাই। কুমড়াগাছে দুই রকম ফুল হয়—এক রকম ফুলের মাঝে কেবল পুংকেশর থাকে—এই ফুলে ফল হয় না—ইহাই আমরা তুলিয়া খাই। আর এক রকম ফুলে গর্ভকেশর আছে পুংকেশর নাই—এই ফুলেই ফল হয়। রজনীগন্ধ ফুল আর দুই রকমের কুমড়া ফুল হীনাঙ্গ ফুল। দুই রকমের পেঁপের গাছ আছে—এক রকম মাদী (মেয়ে) আর এক রকম মর্দ্দা (পুরুষ) গাছ। মাদী গাছের ফুল দেখাও—ইহাতে কেবল গর্ভকেশর আছে। মর্দ্দা গাছের ফুলে পুংকেশর, পেঁপে ধরে না।

(বালকগণকে পূর্ণাঙ্গ ও হীনাঙ্গ নানারূপ ফুল সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের খাতায় তালিকা করিতে বল। কোন্ ফুলের কোন্ অঙ্গহীন তাহাও লিখিয়া রাখিবে)।

একটা একটা গাঁদাফুল হাতে দাও। ফুলগুলি খুলিতে বল। দেখাইয়া দাও যে একটা গাঁদাফুল প্রকৃত পক্ষে একটা ফুল নয়—অনেকগুলি ছোট ছোট ফুল একত্র হইয়া এক কুণ্ডের মধ্যে বাস করে। প্রত্যেক

ফুলের ভিতর যে পুংকেশর, গর্ভকেশর আছে তাহাও দেখাও। (গাঁদা ফুলের পাশের ফুলগুলিতে গর্ভকেশর নাও থাকিতে পারে। মধ্যের ফুল গুলি দেখাও—ম্যাগনিফাইং কাচ দিয়া দিয়া পরীক্ষা কর) এইরূপ অনেক ফুল একত্র হইয়া এক ফুল রচিত হইলে, তাহাকে জটিল পুষ্প বলে। প্রায় পুষ্পই সরল, জটিল পুষ্প কম। সূর্য্যমুখী জটিল পুষ্প।

২৪। ফল।

বালকগণকে একটা পাকা আম ও একটা নারিকেল দাও। দুই জনকে দুইটী ফলের খোসা ছাড়াইতে বল। আমের খোসা সহজে হাত দিয়া ছাড়ান যায়—নারিকেলের খোসা ছাড়াইতে দা কি ছুরির দরকার হয়। (নারিকেলের ছোবড়ার উপরে যে পাতলা একটা আবরণ তাহাই নারিকেলের ত্বক বা খোসা)। তারপর দেখ আমের খোসার নীচে কি আছে? আমের খোসার নীচে আমের শাঁস ও তার ভিতর অল্প অল্প আঁশ আছে। নারিকেলের খোসার পরে কি দেখিতেছ? কেবল আঁশ (বা ছোবড়া) কোনরূপ শাঁস নাই।

আমের শাঁসের পর কি? আমের আঁটী। আঁটী ভাঙ্গ—কি দেখিতেছ? আঁটীর উপরে একটা শক্ত খোসা ও আঁটীর মধ্যে সাদা নরম শাঁস। নারিকেলের ছোবড়ার পরে কি আছে? নারিকেলের আঁটী। (অর্থাৎ আদত নারিকেল) আঁটীর আবরণ (নারিকেলের মালা) কাঠের মত শক্ত। মালা ভাঙ্গিলে ভিতরে আঁটীর সাদা শাঁস অর্থাৎ নারিকেল। আমের শাঁসের সঙ্গে তুলনা কর? আমের আঁটীর শাঁসের চেয়ে নারিকেলের আঁটীর শাঁস শক্ত—আমের শাঁস আঁটীর খোসার গায়ে তেমন

আটিয়া লাগিয়া থাকে না—নারিকেলের শাঁস আঁটীর গায়ে শক্তভাবে লাগিয়া থাকে—ছুরি দিয়া শাঁস ছাড়াইতে হয়। আমের আটীর শাঁস নিরেট—নারিকেলের আঁটীর শাসের ভিতর ফাঁপা; সেই ফাঁপা জায়গায় নারিকেলের জল থাকে। আমরা আমের ফলমধ্যস্থ শাঁস খাই, আর নারিকেলের বীচি বা আঁটী মধ্যস্থ শাঁস খাই।

তালের সহিত আম নারিকেলের তুলনা কর। তালের ত্বকের ঠিক পরেই তাহার আঁশ সমেত শাঁস। এই শাঁস আমরা খাই, আঁশ ফেলিয়া দেই। শাঁসের পর আঁটী। আঁটীর মধ্যে আঁটীর শাঁস।

তারপর ফল কিরূপে জন্মে তাহা দেখাও। কুমড়া গাছের নিকট বালকগণকে লইয়া যাইয়া দেখাও যে যে ফুলে গর্ভকেশর আছে সেই ফুলেই ফল হয়। এই দেখ গর্ভকেশরের নীচের অংশ কেমন স্থূল। গর্ভ কেশরের এই স্থূল অংশকে গর্ভকোষ বলে। এই কোষের মধ্যেই ছোট ছোট বীজ আছে। যেমন বীজ বড় হইতে থাকে তেমন এই গর্ভকোষও বড় হইতে থাকে। (একটা ফুলের গর্ভকোষ কাটিয়া ছোট ছোট বীজ দেখাও) তবেই দেখ কুমড়াটা গর্ভকেশরের নীচের অংশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। (বালকগণ প্রতিদিন একটা কুমড়ার ফুলের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেই, ক্রমবৃদ্ধি বুঝিতে পারিবে)। গর্ভকোষ যেমন বাড়িতে থাকে, ফুলের পাঁপড়ী ক্রমে শুকাইয়া পড়িয়া যায়।

যে সকল ফুলের গর্ভকোষ কুণ্ডের মধ্য দিয়া বৃন্ত পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহাদের ফল বৃদ্ধি হইলে কুণ্ডের নিম্নভাগ বৃদ্ধি পায়, বৃতিগুলি অনেকদিন পর্য্যন্ত ফলের মাথায় থাকিয়া যায়—যেমন ডালিম, পেয়ারা। লাউ, কুমড়া, প্রভৃতি ফুলের বৃতি নাই—ফল বড় হইলেও ফলের মাথায় গর্ভকেশর (শুষ্ক) দেখিতে পাওয়া যায়। নারিকেল ও তালের কুণ্ডের উপরিভাগে গর্ভকোষ থাকে—কাজেই তাল নারিকেল বৃদ্ধি হইলে বৃতিগুলি ফলের নীচে (অর্থাৎ বৃন্তের দিকে) থাকে।

তেঁতুলের ফুল দেখাও। গর্ভকেশরের নীচের অংশ (গর্ভকোষ) কেমন স্থূল—ছোট তেঁতুলের মত, তাহা লক্ষ্য করিতে বল।

পাতার মত, ফলও কতক সরল আর কতক জটিল। যে সকল ফল একটা গর্ভকেশর থেকে জন্মে তাহাদিগকে সরল ফল বলে। সরল ফল তিন রকমের (১) রসসার (২) শাঁসসার (৩) আঁটীসার।

(১) রসসার—আঙ্গুর, বিলাতী বেগুণ, লেবু, কমলা। (ফলের মধ্যে খুব রস আর ছোট ছোট অনেক বীজ)।

(২) শাঁসসার—লাউ, কুমড়া, তরমুজ, ফুটী, শসা। (ফলের মধ্যে যথেষ্ট শাঁস আর অনেক বীজ)।

(৩) আঁটীসার—আম, জাম, লিচু, কুল, নারিকেল, তাল, আমড়া, ধান, তিল, ছোলা, মটর। (ফলের মধ্যে বড় একটা আঁটী। চাউল—ধানের আঁটী।)

কাঁঠাল ও আনারস জটীল ফল। কাঁঠালের এক একটা কোষ আর আনারসের এক একটী চোক—এক একটা গর্ভকেশর থেকে জন্মিয়াছে। তবে পৃথক পৃথক না জন্মিয়া একসঙ্গে জন্মে বলিয়া এইরূপ ফলকে জটিল ফল বলে। প্রকৃতপক্ষে কাঁঠাল ও আনারস অনেকগুলি ফলের সমষ্টি।

২৫। কূপ ও পুষ্করিণী।

উপকরণ—বাটি, জল, বালি, আঠাল মাটী।

একটা বাটির মধ্যে বালি দাও। তার উপর জল ঢালিয়া দাও। জল কোথায় গেল? জল বালির ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়া বালির মধ্যেই আছে। আর একটী বাটিতে আঠাল মাটীর কাদা রাখ। এখন তাহার উপর জল

ঢাল। জল আঠাল মাটীর উপরেই থাকিল—মাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। বৃষ্টি হইয়া গেলে নদীর ধারে কাদা হয় না—সেখানে কেবল বালি মাটী; গ্রামের রাস্তায়, পুকুরের ধারে খুব কাদা হয়—এ সকল স্থানে আঠাল মাটী। আঠাল ও বালি মাটীতে মিশিয়া যে মাটী হয় তাহাকে দোআঁশ মাটী বলে। দোআঁশ মাটীতেও কাদা হয়। তবে সে কাদা খুব আঠাল হয় না। পায়ে আঠাল মাটীর কাদা লাগিলে দুঘটি জলের কমে ছাড়ান যায় না। কিন্তু দোআঁশ মাটীর কাদা এক ঘটি জলেই ধোয়া যায়। আমাদের কৃষিক্ষেত্রাদিতে প্রায় দোআঁশ মাটী। আমাদিগের উঠানের মাটীও দোআঁশ। দোআঁশ মাটীতে বালি আছে, ইহার ভিতরও জল প্রবেশ করে।

এখন দেখ, আমরা যে জমির উপর বেড়াইতেছি ইহার মাটী দোআঁশ মাটী। ইহার নীচে এক স্তর আঠাল মাটী আছে। তার নীচে এক স্তর বালি মাটী, তার নীচে আবার আঠাল মাটী। 'স্তর' বলিলে বোধ হয় কিছুই বুঝিলে না। [বালকগণকে নিকটস্থ কোন নদীর ধারে লইয়া গেলে স্তর দেখান যাইতে পারে। নদীর উচ্চ পাড়ের গায়ে স্তরের দাগগুলি বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। যদি নিকটে কোথায়ও পুকুর কাটা হইতে থাকে, তবে সেখানে নিয়াও স্তর দেখান যাইতে পারে]। পুস্তকের পাতাগুলি যেমন একের উপর আর একটী সাজান থাকে, পৃথিবীর উপর নানা প্রকারের মৃত্তিকাও সেইরূপ সাজান আছে। তবে পুস্তকের পাতা যেমন পাতলা, মৃত্তিকার স্তর তেমন পাতলা নয়। কোন কোন স্তর ২।৩ ফুট মাত্র পুরু আবার কোন কোন স্তর ৫।৭ মাইল পুরু।

পুকুর কাটিবার সময় আমরা প্রথমে দোআঁশ মাটীর স্তর কাটিয়া ফেলি। তারপর (স্থান অনুসারে) হয়ত বালি কি আঠাল মাটীর স্তর পাই। তাহা কাটিলে আবার অন্য স্তর পাই ইত্যাদি।

মনে কর প্রথমে দোআঁশ মাটীর স্তর, তার নীচে বালি ও তার নীচে আঁঠাল মাটীর স্তর আছে। দোআঁশ ও ও বালিমাটীর ভিতর দিয়া জল আঁঠাল মাটীর স্তরের উপর গিয়া বাধা পাইবে। এখন যদি আমরা দোআঁশ ও বালি মাটী সরাইয়া গর্ত্ত করি তবে কি ঘটিবে? আঁঠাল মাটীর উপর যে গর্ত্ত হইবে তাহাতেই বৃষ্টির জল (বালি ও দোআঁশ মাটী ভেদ করিয়া) জমিবে। (চিত্রে দেখাও)।
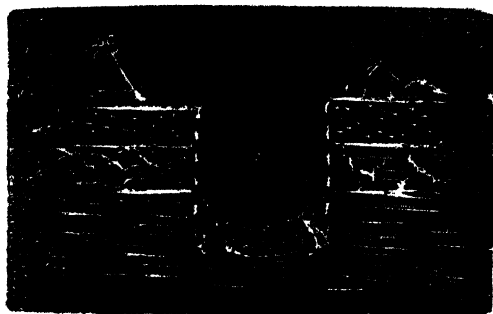
এমনি করিয়া কূপ প্রস্তুত করিয়া থাকে। পুষ্করিণীও এই প্রকারের স্তর কাটিয়া কাটিয়া প্রস্তুত করে। পুকুরের জল উঠা কি কেহ দেখিয়াছ?

পাহাড়ের গায় নানারূপ ফাটা আছে। সেই সকল ফাটাল দিয়া পাহাড়ের ভিতর জল প্রবেশ করে। এই জল পাহাড়ের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া পাহাড়ের নীচে বা নদীর মধ্যে ঝরণারূপে বাহির হয়। এইজন্য অনেক নদীর জল গ্রীষ্মকালেও শুকায় না।

একটা মাটীর মুড়ি (ছাদের জল পড়ার নল) কাটিয়া কাটিয়া কূপের পাট (মাটীর বেড়) প্রস্তুত কর। একটা গামলার নীচে আঁঠাল ও তাহার উপর বালি মাটী দাও। এই পাটগুলি গামলার মাটীর ভিতর গর্ত্ত করিয়া সাজাও। বালির উপর জল ঢাল। পাটের ফাঁক দিয়া কেমন করিয়া জল চুয়াইয়া কূপের মধ্যে পড়ে তাহা দেখাও।

২৬। দিবারাত্র।

উপকরণ—একটী গোলক ও একটা বাতি। গোলকের অভাবে একটা বাতাবি-লেবু (জাম্বুরা) হইলেও চলিতে পারে। লেবুটীর ভিতর দিয়া একটা ছাতার শিক চালাইয়া দাও। এইটীই যেন পৃথিবীর কল্পিত মেরুদণ্ড। বাতাবিলেবুর উপর চক দিয়া বিষুবরেখা টান ও তাহার যে কোন স্থানে একটা আলপিন্ পুঁতিয়া দাও। যেন এই আলপিন্টীই একজন মানুষ।

বালকগণকে প্রথমে পৃথিবীর আকার ও অবস্থান বিষয়ে কিছু জ্ঞান দান করা আবশ্যক। পৃথিবী কমলালেবুর মত গোল। আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। আকাশে যে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র দেখিতে পাও সেগুলিও শূন্যে আলগা আলগা ভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। [এইরূপ জ্ঞানদান করিতে হইলে আকাশে যে ফানুস উড়ান হইয়া থাকে সেই কথা বালকগণকে মনে করাইয়া দিতে হইবে। অথবা কিছু ভেরেণ্ডার কস লও আর ঘাসের শীষ দিয়া একটা অঙ্গুরী প্রস্তুত কর। এখন শীষের আংটী ভাগটী ভ্যারেণ্ডার কসে ডুবাইয়া তাহাতে ফুঁ দাও। অনেক গোল গোল ফুঁপড়ি উড়িবে। এই ফুঁপড়ি যেমন শূন্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রগুলি ঠিক সেইরূপ আকাশে ভাসিতেছে। [ভ্যারেণ্ডার কসের পরিবর্ত্তে সাবান গোলাজল (প্রস্তুতের প্রণালী পরিশিষ্টে দেখ) ও একটী কাঁচের নল বা পাটকাঠি দিয়াও এইরূপ ফুঁপড়ি দেখান যাইতে পারে।]

তারপর বালকগণকে বুঝাইয়া দাও যে সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না। সূর্য্য একস্থানে স্থির আছে—আমাদিগের পৃথিবী শূন্যে লাঠিমের মত ঘুরিতেছে। তবে আমরা সূর্য্যের গতি দেখি কেন? দৃষ্টান্ত দাও—রেলে যাইবার সময় রেলের পার্শ্বস্থ গাছপালা চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু গাছপালা চলে না—রেলগাড়ী চলে। নৌকা

যখন খুব বেগে চলে, তখন নদীতীরস্থ বৃক্ষগুলি চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ সূর্য্য চলিতেছে বলিয়াই মনে হয় কিন্তু সূর্য্য স্থির। পৃথিবী খুব জোরে ঘুরিতেছে বলিয়া আমাদিগের এই দৃষ্টিভ্রম (কথাটার অর্থ বুঝাইয়া দিবে) জন্মে।

টেবিলের উপরে বা ঘরের মেজেতে একটা বাতি জালিয়া রাখ।
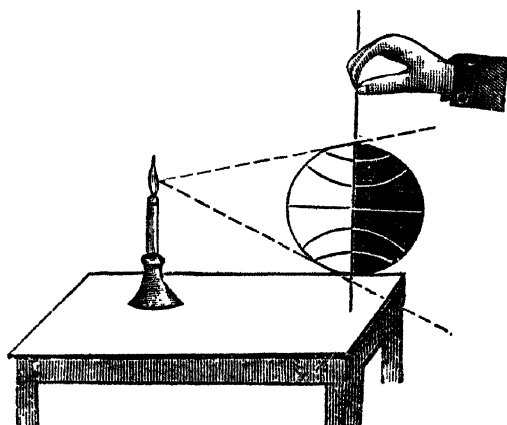
বাতি হইতে অন্ততঃ তিনফুট অন্তরে তোমার গোলকটী বা বাতাবি-লেবুটী ধর। (চিত্র দেখ) বাতি হইতে আলো আসিয়া গোলক বা বাতাবিলেবুর অর্দ্ধেক অংশ আলোকিত করিবে। এখন গোল-কটী বা বাতাবিলেবুটী ঘুরাইতে থাক। বালকগণকে দেখাও যে গোলক বা বাতাবিলেবুতে যে আলপিন লাগান আছে—সেই আলপিন একবার আলোতে আসি-তেছে ও একবার অন্ধকারে যাইতেছে। এই অন্ধকারই রাত্রি। যখন আমাদিগের রাত্রি তখন পৃথিবীর বিপরীত অংশে দিন। এখন আমাদিগের দিন (স্কুলের সময়)—কিন্তু এখন আমেরিকায় রাত্রি। [বালকগণকে বুঝাইয়া দাও যে এ সকল কথা কল্পনা নয়। আমেরিকায় যে এখন রাত্রি তাহা টেলিগ্রাম করিলেই জানা যাইবে] পৃথিবী গোল কি চেপটা, তাহা মানুষ আকাশে উঠিয়া দেখিতে পারে না। তবে লোকে কেমন করিয়া জানিতে পারে যে পৃথিবী গোল? নাবিকেরা জাহাজে চড়িয়া ক্রমাগত পশ্চিম মুখে যাইতে লাগিলেন। অবশেষে তাহারা ঘুরিয়া আসিয়া

দেখিলেন যে, যেস্থান হইতে তাঁহারা রওনা হইয়াছিলেন ঠিক সেই থানেই উপস্থিত হইয়াছেন। বালকগণকে বুঝাইয়া দাও যে গোল জিনিষ না হইলে এরূপ সম্ভবে না। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা দৃষ্টেই পৃথিবীকে গোল মনে করা হয়।

তারপর দেখ দিন রাত্রি সকল সময় সমান থাকেনা। কখনও বড় ও কখন ছোট হয়। যদি গোলকটীর ভিতরস্থ শলাকা টেবিলের উপর লম্বভাবে ধরা যায়, তবে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ আলোকিত হইবে। ঘুরাইলেও ঠিক তাহাই থাকিবে, এরূপ অবস্থা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সকল সময়ে দিন রাত সমান হইবে। কিন্তু তাহা হয় না। বিশেষ মেরু সন্নিহিত লোকেরা বলে যে তাহাদিগের ৬ ছয়মাস দিন ও ৬ ছয়মাস রাত্রি হয়। তাহা হইলে গোলকের শলাকা বাতির সম্মুখে ঠিক লম্বভাবে ধরিলে
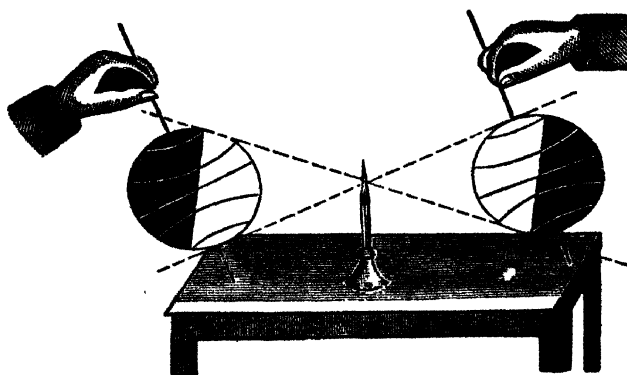
চলিবে না। (চিত্র দেখ) এখন গোলকের শলাকা তেড়া করিয়া ধর। দেখ এক অবস্থায় উত্তর মেরুতে একবারেই আলো যাইতেছে না—গোলক ঘুরাইলেও যাইবে না। আবার গোলকটী বাতির অপর পার্শ্বে

দিন সর্ব্বাপেক্ষা বড়
দিন রাত্রি সমান
দিন রাত্রি সমান
রাত্রি সর্ব্বাপেক্ষা বড়
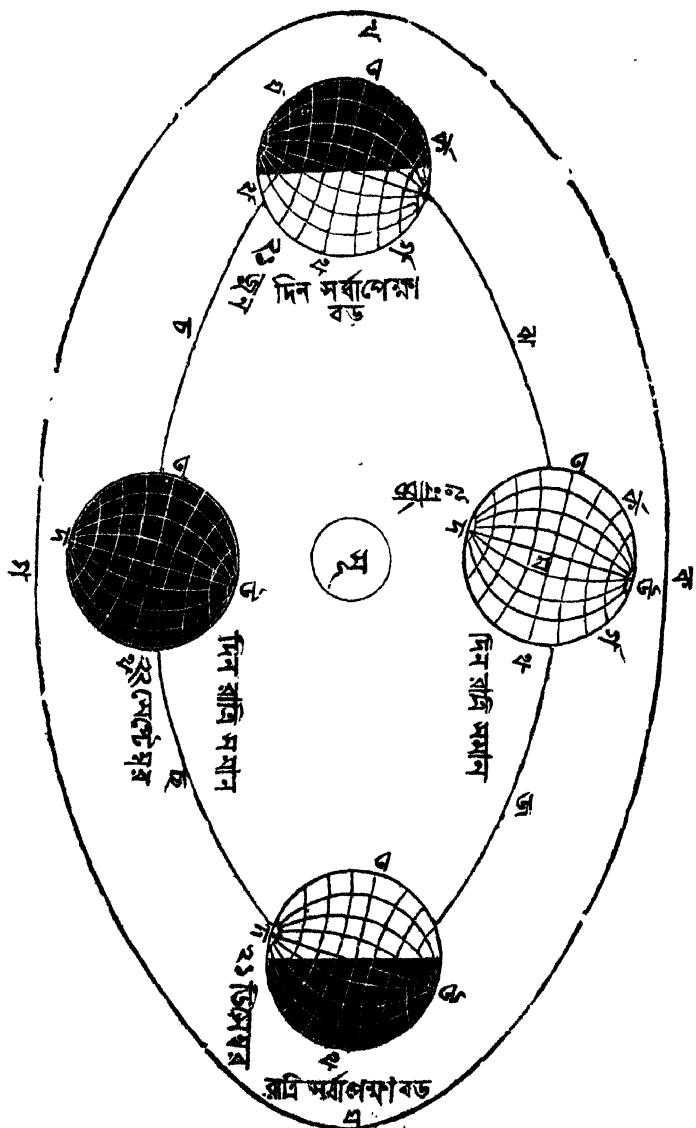
হেড়া করিয়া ধরিলে দক্ষিণ মেরুতে একবারেই আলো যাইবে না। সুতরাং আমরা এইসকল দৃষ্টে ইহাই অনুমান করিতে পারি যে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিক দিয়া একবার ঘুরিয়া যায়—এই ঘুরিবার সময় ৬ মাস উত্তর মেরুতে আলো পায় আর ৬ মাস দক্ষিণ মেরুতে আলো পায়। যখন উত্তর মেরুতে ৬ মাস আলো থাকে তখন বিষুব রেখার (কোন রেখাকে বিষুব রেখা বলে দেখাইয়া দাও) উত্তরে দিন বড় হয়। দিন বড় হয় বলিয়া গরম হয়—এইরূপেই গ্রীষ্মকাল হয়। আবার যখন দক্ষিণ মেরুতে ৬ মাস আলো পড়ে, তখন আমাদিগের দিন ছোট, রাত্রিবড়—শীতকাল। আমাদিগের যদি এখন গ্রীষ্মকাল হয়—তবে অষ্ট্রেলিয়াতে (মানচিত্রে দেখাও যে অষ্ট্রেলিয়া বিষুবরেখার দক্ষিণে) এখন শীতকাল। [বিশ্বাস না হয়—টেলিগ্রাম করিলে এখনই উত্তর পাওয়া যাইবে] এইরূপে শীতগ্রীষ্ম হইয়া থাকে।

২৭। বাজার।

একদিন বালকগণকে সঙ্গে করিয়া বাজারে লইয়া যাও। দোকানে কিরূপে জিনিষগুলি সাজাইয়া রাখে তাহা লক্ষ্য করিতে বল। ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের ভিন্ন ভিন্ন দোকান যথা কাপড়ের দোকান, মুদির দোকান (যেখানে চা'ল, ডাল, তেল, লবণ প্রভৃতি বিক্রয় হয়) ময়রার দোকান (যে থানে সন্দেশ মিঠাই বিক্রয় হয়) বাসনের দোকান, জুতার দোকান, দর্জির দোকান, বেণের দোকান (যেখানে নানাবিধ মসলা বিক্রয় হয়), মনোহারী দোকান (যেখানে খেল্না, কাচের বাসন, ল্যাম্প, চিমনী, দোয়াত কলম, ছুরী, কাঁচী বিক্রয় হয়) কাঠের দোকান, জুতার দোকান, পুস্তকের দোকান, ঔষধের দোকান, তরকারীর দোকান, মাছের দোকান ইত্যাদি। দুই একটী দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বেচা কেনা দেখাও।

দোকানে উত্তমরূপ শৃঙ্খলা না থাকিলে যে কাজের অসুবিধা হয় তাহা বুঝাইয়া দাও। প্রত্যেক জিনিষ রাখিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। যদি বিশৃঙ্খল অবস্থায় জিনিষ রাখা হয়, তবে খরিদ্দার আসিলে তাহাকে জিনিষ দিতে বিলম্ব হইবে। খরিদ্দার অনেক সময় অপেক্ষা করিতে পারিবে না কারণ তাহাকে নানারূপ জিনিষ কিনিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইবে। যে দোকানে যত শৃঙ্খলা সে দোকানে তত অল্প সময়ে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে। কাজেই সেই দোকানেই বেশী খরিদ্দার যায়।

বাজারের আবশ্যকতা কি? বাজারের সমস্ত জিনিষ কোথা হইতে আসে? বাজারের জিনিষ দোকানদারেরা বাড়ী হইতে আনে। তবে আমরা বাজারে না গিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াইত জিনিষ কিনিতে পারি? হাঁ পারি বটে কিন্তু ইহাতে অনেক সময় নষ্ট হয় আর অনেক পরিশ্রম হয়। কাহার বাড়ীতে যে কোন জিনিষ আছে তাহাত আমরা জানিনা। কাজেই একসের আলু কিনিবার জন্য হয়ত আমাকে পঞ্চাশ বাড়ী ঘুরিতে হইবে। আবার যাহার বাড়ীতে বিক্রয়ের জিনিষ আছে সেও জানেনা যে কাহার সেই জিনিষের দরকার। কাজেই ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলেই একস্থানে উপস্থিত হয়। এই স্থানের নামই বাজার। গ্রামে হাট হয়। হাট সাময়িক বাজার। কোন গ্রামে রবিবারে, কোথাও সোমবারে ইত্যাদি এক এক নির্দ্দিষ্ট বারে হাট বসে। গ্রামের লোকে হাটের বার ও সময় জানে। সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে, সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে ও সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গ্রামের ক্রেতা ও বিক্রেতা একত্র হইয়া বেচাকেনা করে।

এই সঙ্গে মুদ্রা প্রচলনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলেও ভাল হয়। পুর্ব্বে বিনিময়ে কেনা বেচা চলিত। অর্থাৎ আমার ঘরে যথেষ্ট ধান আছে, আমার বৎসরের পরিমাণ ধান রাখিয়া অবশিষ্ট ধান তোমাকে দিলাম। তোমার আবার অনেক ডা'ল আছে। তুমি বৎসরের পরিমাণ

ডা'ল রাখিয়া অবশিষ্ট ডা'ল আমাকে দিলে। এখনও কোন কোন গ্রামে বিনিময়ে কারবার চলে। কুম্ভকারেরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া হাঁড়ি কলসী বিক্রয় করে, কিন্তু দামের বাবদ ধান নেয়। গৃহস্থও ধান দেওয়াই সুবিধা মনে করে, কারণ তাহার বেশী ধান রাখিবার জায়গা নাই। এখন ধর, এই কুম্ভকারের যদি ধানের দরকার না থাকে, তবে সে ধান লইবে কেন? কাজেই এমন একটা সাধারণ জিনিষের সৃষ্টি করা হইল যাহার বিনিময়ে (বদলে) সকলেই সকল জিনিষ পাইতে পারে। এই জিনিষই টাকা পয়সা। (ধাতু ও মুদ্রা বিষয়ক পাঠে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে)

এখন একদিন নিম্নলিখিত কবিতার আবৃত্তি বা অভিনয় করাও। ইহাতে প্রকারন্তরে নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

জন্মদিনের বাজার।

(একটী বালকের হাত ধরিয়া একটী বালিকার প্রবেশ)

বালিকা।— আজ খুকুর জন্মদিনে ভাল ভাল জিনিষ কিনে
আনব মোরা ভাই—
চল বাজারেতে যাই।
নুতন নুতন জিনিষ কত দিচ্ছে সবাই মনের মত
আমরা কিনব এমন জিনিষ
যাহা কেউ কেনে নাই
চল বাজারেতে যাই।

(প্রথম দোকানে প্রবেশ)

বালিকা।— ওগো দোকানদার
তোমার কাছে কি কি আছে, দেখাও একটি বার।

১ম দোকানী।— 'সাহস' আছে আমার কাছে
'সদাচার' ও 'বিনয়' আছে
'নিষ্ঠা' 'চেষ্টা' 'সরলতা'
আছে 'সত্য' কথা।
এসব জিনিষ খাঁটি অতি রাখ্‌ব নাকো বাকী।
ফাউ টাউ মিল্‌বেনাকো আগেই বলে রাখি॥

বালিকা।— বাকী দিতে হবে নাকো নগদ টাকা দেব।
সুরেন যাহা ভালবাসে বেছে বেছে নেব॥

(দ্বিতীয় দোকানে প্রবেশ)

২য় দোকানী।— নূতন নূতন নানা জিনিষ এই দোকানে আছে
দোকানদারের সেরা আমি এস আমার কাছে॥

বালিকা।— দেখি আগে কেমন জিনিষ আছে তোমার ঘরে।
মনের মত হলে মোরা কিনব তাহা পরে॥

২য় দোকানী।— এই দেখ সোণার চেইন এই সোণার ঘড়ি।
হাজার টাকার চসমা আছে পঁচিশ টাকার ছড়ি,
কিংখাপের জামা, টুপি, শাড়ী আছে ঘরে।
সোনার ব্রোচে হীরার ফুল ঝক্ ঝক্ করে।
দর দস্তুর করি নাকো সস্তা দরে ছাড়ি।
মুটে ভাড়া লাগ্‌বে নাকো পৌঁছে দেব বাড়ী॥

বালিকা।— ফিরিয়ে টেরি ঘুরিয়ে ছড়ি
বুক ফুলিয়ে চলে।
তারাই তোমার এসব জিনিষ
কিন্‌বে কুতুহলে।
সুরেন যাহা ভলবাসে
এ দোকানে নাই।
বাবুয়ানার মুখে আগুণ
কপালেতে ছাই॥

(তৃতীয় দোকানে প্রবেশ)

৩য় দোকানী।— এই দোকানে এস ওগো এই দোকানে এস
হরেক রকম জিনিষ পাবে একটু খানি বসো।

বালিকা।— তোমার কাছে কি কি আছে দেখ্‌তে আগে চাই
কিন্‌ব শেষে মনের মত জিনিষ যদি পাই।

৩য় দোকানী।— আমার কাছে 'স্বার্থ' আছে
'ঘৃণা' 'মিথ্যা কথা'
'আলস্য' আর 'অহঙ্কার'
'নিন্দা' 'কপটতা';
'হিংসা' 'দ্বেষ' এই দোকানে
সস্তাদরে পাবে,
নগদ টাকা নাইবা দিলে
ধারেই দেওয়া যাবে।
হাজার টাকার জিনিষ করি
একটি টাকায় দান
ইহার উপর উপহার
'ছল' 'চাতুরী' 'ভান'॥

বালিকা।— চাইনা মোরা এসব জিনিষ দূরে ফেলে দাও,
ছি ছি ছি ছি কি পরিতাপ লজ্জা নাহি পাও॥
সুরেন যাহা ভাল বাসে এখানে তা নাই।
হিংসা দ্বেষের মুখে আগুন কপালেতে ছাই॥

(চতুর্থ দোকানে প্রবেশ)

বালিকা।— শুন শুন কথা মোদের ও দোকানদার ভাই,
তোমার কাছে কি কি আছে দেখ্‌তে মোরা চাই

৪র্থ দোকানী।— দেখ্‌লে শুধু হবে নাকো কিনতে পার যদি,
সারা জীবন কাটবে তবে সুখে নিরবধি।
আমার কাছে 'স্নেহ' 'প্রেম'
আছে 'ভালবাসা'

'ক্ষমা' আছে 'দয়া' আছে
'শ্রদ্ধা' 'ভক্তি' 'আশা';
এসব জিনিষ অনেক দামী
বেচি নাকো ধারে।
লক্ষ টাকায় তারা কেনে
চিন্‌তে যারা পারে॥

বালিকা।— মনের মত অমূল্য ধন তোমার আছে ঠিক,
এ সব জিনিষ যে না কেনে তার জীবনে ধিক্।
টাকা কড়ি যত লাগে নেও তুমি তবে
এসব রতন পেলে সুরেন বড়ই সুখী হবে॥

(সঙ্গী বালকের প্রতি)

আজ সুরুর জন্মদিনে মনের মত রতন কিনে
এনেছিরে ভাই
চল বাড়ী ফিরে যাই।

পঞ্চম প্রকরণ।

(১০।১১।১২ বৎসরের বালক বালিকার জন্য)

১। মূলের কার্য্য।

মূলের কার্য্য প্রধানতঃ দুইটী—(১) বৃক্ষটীকে মৃত্তিকায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখা (২) মৃত্তিকা হইতে রস শোষণ করিয়া বৃক্ষকে পোষণ করা।

যে গাছ যত বড় হয় তাহার মূলও তত বেশী হয় আর বহু স্থান ব্যাপিয়া রাখে। বটগাছের মূল দেখ—ডালপালা যেমন চারিদিক বিস্তার করিয়া গাছ প্রকাণ্ড হইতে থাকে, মূলও গাছের গোড়া হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। (যদি পার তবে বালকগণকে একখানি গোল টেবিল দেখাও আর টেবিল প্রস্তুতের কায়দাটা বুঝাইয়া দাও। এই দেখ টেবি-লের মাথার কাঠ খুব প্রশস্ত বলিয়া, টেবিলের পায়া তিনটীও খুব ফাঁকে ও দূরে দূরে অবস্থিত। মাথা বড় ও পায়া ছোট হইলে টেবিল পড়িয়া যাইত) গাছের মূল যে গাছটীকে কেবল মাটীতে ঠিক রাখিবার জন্য চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে তাহা নহে, মূলগুলি গাছের আহারের অন্বেষণের জন্যও নানাদিকে যায়। গাছ কি খায় জান? গাছ মাটীর রস খায়।

যে শিশুর দাঁত হয় নাই সে কি খায়? দুধ খায়—সে শক্ত জিনিষ খাইতে পারে না। মূলের দাঁত নাই, শক্ত জিনিষ খাইতে পারে না। বুড়া মানুষ কেমন করিয়া লুচি খায় দেখিয়াছ? দই কি ক্ষীরের ভিতর চট্‌কাইয়া লয়। মাটীতে নানা রকম জিনিষ আছে। যে গাছ যে রকম জিনিষ চায়, তাহার মুল সেই রকম জিনিষই সংগ্রহ করিয়া আনে। বৃষ্টির জলে মাটীর শক্ত জিনিষ ভিজাইয়া তরল করিয়া দেয়। মুল এই তরল জিনিষ শোষণ করিয়া লয়। মাটীর নীচে সর্ব্বদাই ভিজে থাকে—সুতরাং বৃষ্টি না হইলেও বড় বড় বৃক্ষের তেমন অসুবিধা হয় না. কারণ এই সকল বৃক্ষের মুল মাটীর অনেক নীচে চলিয়া যায়। কিন্তু ছোট ছোট গাছ, বিশেষতঃ ধান, গম প্রভৃতির মত ছোট ছোট গাছ বৃষ্টি না পাইলে বা কোনরূপ জল না পাইলে বাঁচে না। ইহাদের মুল বেশী মাটীর নীচে যায় না। উপরের শুকনা মাটী থেকে রস শোষণ করিতে পারে না। তাই এই সকল গাছ বৃষ্টির বা অন্য কোন রকম জলের অভাবে মরিয়া যায়। আমাদের দেশে যে বৎসর কমবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হয়, সে বৎসর ধান মরিয়া যায় আর দেশে দুর্ভিক্ষ হয়।

গাছ বড় বড় মুল দিয়া রস সংগ্রহ করে না—বড় বড় মুলের গায়ে যে সকল সরু সরু মূল জন্মে তাহারাই রস সংগ্রহ করে। এই জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গাছ তুলিয়া লাগাইতে হইলে এমন সাবধানে মাটী খুড়িয়া গাছ তুলিতে হইবে যাহাতে এই সরু মুলগুলি ছিঁড়িয়া না যায়।

আমাদের মুখ উপরে, গাছের মুখ নীচে—গাছের মুলই গাছের মুখ। আমরা যেমন করিয়া দুধ কি জল খাই, গাছ সেরূপ করিয়া রস টানিতে পারে না। গাছের মূলে খুব সরু সরু ছিদ্র আছে। সেই সকল ছিদ্র দিয়া রস উপরে উঠে। (একটু জলের মধ্যে এক টুকরা পরিষ্কার কাপড় কি ব্লটিং কাগজের এক কোণ ধর। জল কেমন করিয়া উপরে উঠিতে থাকে

বালকগণকে তাহা লক্ষ্য করিতে বল; এখন process of osmosis বুঝাইবার দরকার নাই)।

তারপর আবার দেখ কোন কোন গাছের মূল সেই সেই গাছের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। যেমন মূলা। একটা বড় মূলার মাথার এক অংশ কাটিয়া লও। একখানি থালায় জল দিয়া তাহার উপর মূলার এই খণ্ডটী বসাইয়া রাখ। প্রত্যহ থালায় একটু একটু জল দাও। এখন দেখিতে পাইবে যে মূলার গাছ বেশ বাড়িতে থাকিবে ও তোমার থালার উপরেই মুলাগাছের ফুল ও ফল ধরিবে। কারণ কি? মূলার ভিতর মূলা গাছের যথেষ্ট খাদ্য থাকে। কিন্তু গাছত শুষ্ক ও শক্ত খাদ্য খাইতে পারে না। তাই জল দিয়া খাদ্যকে তরল করিয়া দিতে হয়।

অনেক পরগাছা ও স্বর্ণলতার মূল বায়ু হইতে রস সংগ্রহ করে। বাতাসে যে জলীয় বাষ্প আছে তাহা তোমরা জান। বাতাসে যে আরও নানারূপ বায়বীয় পদার্থ আছে (যথা অক্‌সিজেন, নাইট্রোজেন, কারবন, ধূলা প্রভৃতি) তাহাও তোমরা জান।

২। কাণ্ডের কার্য্য।

কাণ্ডের প্রধান কার্য্য গাছটীকে মাটীর উপর খাড়া করিয়া রাখা। কাণ্ডের মধ্যে কি থাকে? কাঠ। কাঠ শক্ত না নরম? খুব শক্ত। আমাদিগের শরীরের মধ্যে কাঠের মত কি আছে? হাড়। হাড় না থাকিলে কি হইত? আমরা সোজা হইয়া চলিতে পারিতাম না—কেঁচোর মত মাটীতে বুকে হাঁটিতে হইত। হাঁ, কাঠই গাছের হাড়।

একটা ছোট গাছ তুলিয়া লও। ছোট গাছটীর বাকল তুলিয়া ফেল, মধ্যে নরম কাঠ দেখাও। বলিয়া দাও যে এই নরম কাঠের মধ্য দিয়াই গাছের রস প্রবেশ করে। গাছ বড় হইলে মধ্যের এই নরম কাঠ শক্ত

হইয়া যায়। কিন্তু এই কাঠের উপরে ও বাকলের নীচে আবার নূতন নরম কাঠ জন্মে। এই নরম কাঠের ভিতর দিয়াই গাছে রস ঢুকে। এই রূপ প্রতি বৎসর এক এক থাক নরম কাঠ শক্ত হয় আর নূতন এক থাক নরম কাঠ জন্মে। শীতকালে গাছ মরার মত হইয়া থাকে, তখন আর মাটী থেকে বেশী রস টানে না। বসন্ত কাল থেকে শীতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে নূতন কাঠ হয়, তাহার বৃদ্ধি এই শীতেই শেষ হয়। এইরূপ প্রতি বৎসর গাছে একটা করিয়া নূতন কাঠের জামা বা আবরণ জন্মে।

এখন (করাতে কাটা) কাঁঠাল কি তদ্রূপ অন্য কোন গাছের একটা স্থূল কাষ্ঠ খণ্ডের (চিত্রানুরূপ) নিকট বালকগণকে একত্র কর।
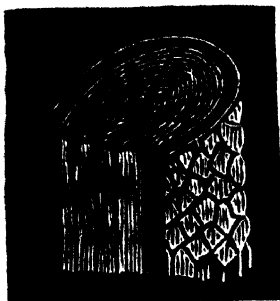
কাঠের কাটা মাথায় এই যে চক্র দাগগুলি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই দাগগুলি গণিয়া গাছের বয়স ঠিক করা যায়। যতগুলি চক্র গাছের তত বৎসর বয়স।

গাছের বাকলের নীচে যে নরম কাঠ থাকে, তাহার ভিতর দিয়াই যে রস যাতায়াত করে ইহা সহজেই পরীক্ষা করিতে পার। একটা গাছের বাকল তুলিয়া বাকলের নীচের কাঠে হাত বুলাও; হাতে ভিজা ভিজা বোধ হইবে।

বাকলের নীচের এই নরম কাঠে কোন আসবাব তৈয়ারী করা যায় না; এই কাঠকে গরমা কাঠ বলে—মিস্ত্রিরা কুড়ালির দ্বারা এই গরমা কাঠ ছাড়াইয়া ফেলে। গাছের যতই মধ্যের দিকে যাওয়া যায় ততই বেশী শক্ত কাঠ পাওয়া যায়। ভিতরের কাঠকেই সারকাঠ বলে।

এখন কাঠের আঁশ দেখাও। কাঠের আঁশগুলি গাছের গোড়া থেকে উপরের দিকে লম্বালম্বি উঠিয়া গিয়াছে। কাঠ চিরিতে হইলে এই

আঁশ বরাবর চেরাই সুবিধা। কুড়ালো দিয়া কাঠ চিরিয়া চেলা করিবার সময় কোন দিকে চিরিতে হয় ?

একখান আক্ কাটিয়া দেখাও। দেখ ইহার বাহিরের দিক খুব শক্ত কিন্তু মধ্যের অংশ নরম। আকের মধ্যে যে সকল লম্বা লম্বা আঁশ আছে তাই দিয়া রস চলাচল করে। তাল, সুপারী, নারিকেল, বাঁশ প্রভৃতি গাছের রস যাতায়াতের রাস্তা গাছের মধ্যস্থিত ঠিক এইরূপ আঁশ। এ সকল গাছের মধ্যে সার নাই। ইহাদের সার বাকলে অর্থাৎ বাহিরে। এইজন্য আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছকে অন্তঃসার বলে আর তাল, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি গাছকে বহিঃসার বলে। বহিঃসার গাছে বাৎসরিক চক্র দাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ বহিঃসার গাছ ভিতরদিকে আলগাভাবে বাড়ে।

বাকলের দ্বারা বৃক্ষের নরম কাঠ ঢাকা থাকে। ঢাকা না থাকিলে এই কাঠে আঘাত লাগিয়া নষ্ট হইতে পারে, আর রৌদ্র লাগিয়া এই কাঠের রস শুকাইয়া যাইতে পারে। এই জন্য গাছের বাকল তুলিয়া ফেলিলে গাছ নির্জীব হয় ও সময় সময় মরিয়া যায়।

গাছের বাকল খুব শক্ত নয়। কর্ক নামক গাছের বাকলে বোতলের কাক বা ছিপি হয়। পাট বা কোষ্ঠা কি জিনিষ? পাট গাছের বাকল। সাপে যেমন খোলস বদলায়, তেমনি বড় বড় গাছের বাকল পুরাতন হইলে উপর হইতে ঝরিয়া পড়ে আবার নূতন বাকল জন্মে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে কাণ্ডের কার্য্য দুইটী। একটী কাজ এই যে কাণ্ড গাছটীকে মাটীর উপর খাড়া করিয়া রাখে, আর একটি কার্য্য এই যে কাণ্ডের ভিতর দিয়া মাটীর রস বৃক্ষের ডালে, পাতায়, ফুলে ও ফলে যাতায়াত করে।

গাছের কাঠে আমাদের ঘর দরজা ও আসবাব প্রস্তুত হয়। গাছের

কাঠ দিয়া আমরা রান্না করি। আকের কাণ্ড হইতে গুড় চিনি হয়; নারিকেল গাছের মত এক রকম গাছ আছে তার মধ্যস্থ নরম শাঁসে সাগুদানা হয়। দারজিলিঙ্গের সিনকোনা গাছের রস থেকে কুইনাইন হয়। জাপানের কপূর গাছের রস থেকে কর্পূর হয়। তারপিন্‌ও এক রকম গাছের রস। আসামের রবার গাছের রসে রবার হয়। জিটা বা জিগে গাছের রসে আঠা হয়। গঁদ, রজন প্রভৃতিও গাছের রস। খেজুর, তাল, নারিকেল গাছে যে মিষ্ট রস পাওয়া যায় তাহা জান।

পত্রের কার্য্য।

তোমরা জান যে আমজাতীয় বৃক্ষের (অন্তঃসার বৃক্ষের) পাতায় যে সকল শিরা আছে তাহারা জালের মত সাজান কিন্তু তাল জাতীয় বৃক্ষের (বহিঃসার বৃক্ষের) পাতায় যে সকল শিরা আছে সেগুলি পাশা-পাশি সমান্তর ভাবে সাজান। শিরা ছাড়া পাতার যে সবুজ অংশ আছে তাহাই পাতার শাঁস। এই সবুজ অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে গঠিত। (কোষ অর্থ বুঝাইয়া দাও। একটা আবরণের মধ্যে তরল পদার্থ ভরা। পাখীর ডিম একটা খুব বড় কোষ।) পাতার কোষগুলি এত ছোট ছোট যে অনুবীক্ষণ ভিন্ন দেখা যায় না। কেবল পাতা কেন, বৃক্ষের প্রত্যেক অংশ, মনুষ্য দেহ, পশু পক্ষী সমস্ত জীবের দেহ এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমষ্টি।) এই কোষে যে রঙের রস থাকে, দেহেরও তদ্রূপ রঙ হয়। পাতায় যে সকল কোষ আছে—তাহার ভিতর সবুজ রঙের রস আছে। (এই সবুজ রসের ইংরাজী নাম ক্লোরোফিল্‌) সেই জন্য পাতা সবুজ দেখায়।

গাছের শিকড় মাটীর ভিতর হইতে যে রস সংগ্রহ করে তাহা সেই অবস্থায় বৃক্ষের খাদ্য হয় না। সেই রস কাণ্ড ও শাখা দিয়া

পাতায় পাতায় যায়। পাতা আবার বায়ু হইতে কারবনিক এসিড্ গ্যাস সংগ্রহ করে। (বায়ুতে কি কি গ্যাস আছে জিজ্ঞাসা কর। কারবন ও অক্সিজেন গ্যাসের সংযোগে যে একটী বিষাক্ত গ্যাসের উৎপত্তি হয় তাহাকেই কারবনিক এসিড্ গ্যাস বলে। আমরা প্রশ্বাসের সহিত এই গ্যাস বা বায়ু বাহির করিয়া দিয়া থাকি। এক হাজার ঘন ফুট বায়ুতে এই গ্যাস ৪ ঘন ফুট মাত্র।) এই রস আর এই কারবনিক এসিড্ গ্যাস একত্র করিয়া সূর্য্যের তাপে পাতায় রন্ধন করা হয়। পাতাগুলি যেন গাছের হাঁড়ী। রন্ধন শেষ হইলে পাতা হইতে গাছের খাদ্য, গাছের ডাল ও কাণ্ডে প্রেরিত হয়, আর যে সকল বাজে জিনিষ (যেমন আমরা ভাত রাখিয়া ভাতের ফ্যান ফেলিয়া দিয়া থাকি) গাছের খাদ্য নহে তাহা পাতা ফেলিয়া দেয়। পাতাগুলি কারবনিক এসিড্ গ্যাসের কারবন ভাগ রাখে আর অকসিজেন ভাগ ছাড়িয়া দেয়। মূল হইতে যত রস উপরে আসে তাহার যে পরিমাণ কাজে লাগে, তাহা কাজে লাগাইয়া অবশিষ্টাংশ বাষ্পাকারে ছাড়িয়া দেয়। পাতার মধ্যে খুব ছোট ছোট কতকগুলি ছিদ্র আছে। সেই সকল ছিদ্র দিয়া এই কাজ করে। সূর্য্যের আলো না হইলে রান্নার কাজ হয় না। গ্রীষ্মকালেই গাছের খুব খাওয়া দাওয়া চলে, শীত কালে সূর্য্যের তেজ কম বলিয়া রান্নার অসুবিধা হয়, খাওয়া দাওয়া কমিয়া যায়। গাছ রাত্রিতে কিছু খায় না। তবে রাত্রিতে পাতাগুলি বায়ু হইতে (আমাদিগের মত) অকসিজেন বায়ু গ্রহণ করে ও কারবনিক এসিড্ বায়ু পরিত্যাগ করে। এইজন্য রাত্রিতে ঘরে কোনরূপ গাছ, পাতা, ফুল রাখা ভাল নয়; কি গাছের নীচে ঘুমানও উচিত নয়। দিনের বেলায় ঘরে গাছ রাখিলে ভাল কারণ আমরা যে বিষতুল্য প্রশ্বাস অর্থাৎ কারবনিক এসিড্ গ্যাস পরিত্যাগ করি তাহা গাছ গ্রহণ করে। কাঠ পোড়াইলে কয়লা বা কারবন হয়। এই কারবন বা কয়লা বায়বীয় আকার ধারণ করিলেই

কারবনগ্যাস বা অঙ্গারক্ বায়ু হয়—এই বায়ুর সাথে অক্‌সিজেন মিলিলেই কারবনিক এসিড্ গ্যাস হয়। যাহা হউক কারবন গ্যাস বা অঙ্গারক বায়ু যে কাঠ হইতে উৎপন্ন তাহা ঠিক। এই বায়ুই আবার প্রথমে তরল, পরে শক্ত হইয়া গাছের কাঠে পরিণত হয় ও তাহার বৃদ্ধির সহায়তা করে। তবেই দেখ পাতা দ্বারা গাছের কত উপকার হয়। ছায়ায় একটা গাছ লাগাও—দেখিবে যে তার ডাল ও পাতাগুলি বেঁকিয়া সূর্য্যের আলোর দিকে যাইতে চাহিতেছে। গাছের নীচের ডালগুলি বড় হয় কেন? বড় না হইলে তাহারা সূর্য্যের আলো পায় না—উপরের ডালে ঢাকিয়া ফেলে। গাছের পাতা ছিঁড়িয়া দিলে, গাছের বৃদ্ধি কমিয়া যায়, কোন কোন গাছ একবারেই মরিয়া যায়। গোরুতে কোন গাছের পাতা খাইয়া গেলে যে, সে গাছ আর শীঘ্র বাড়ে না ইহা তোমরা দেখিয়াছ। তোমরা কেউ কেউ হয়ত একটা খনার বচন শুনিয়াছ :—

কলা বুনে না কাট পাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত,

অর্থাৎ কলার পাতা কাটিলেই গাছ নির্জীব হইয়া পড়ে। আম গাছ, কাঁঠাল গাছের অনেক ছোট ছোট পাতা; ১০।২০টা ছিঁড়িলে তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু কলা গাছের পাতার সংখ্যাই একে কম, তাহাতে এক একটা পাতা অন্য গাছের ২।৩ হাজার পাতার সমান—কাজেই কলার একটা পাতা কাটিলে কলা গাছের আহার সংগ্রহ ও আহার প্রস্তুতের যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মে। পাতা না কাটিলে গাছের বেশ জোর হয় ও যথেষ্ট ফল ধরে। কলার গাছের বেশী যত্নও করিতে হয় না; একটু বড় হইলে আর গোরুতেও খাইতে পারে না। প্রায় সকল রকম জমিতেই কলা জন্মে। যদি একজন ১০০ কলার ঝাড় করে, তবে কলা বিক্রয় করিয়াই তাহার ভাত কাপড় চলিয়া যাইতে পারে—ইহাই এ বচনের অর্থ।

ফুলের কার্য্য।

ফুলের প্রধান কার্য্য ফলের সৃষ্টি করা। একটা ধুতুরা বা তদ্রূপ সমস্ত অঙ্গযুক্ত অন্য কোন ফুল সংগ্রহ কর বা ফুলের অভাবে বোর্ডে ফুলের চিত্রাঙ্কণ কর ও ফুলের প্রত্যেক অঙ্গের নাম বালকগণের মনে আছে কি না তাহার পরীক্ষা কর। এখন ফুলের পরাগ কেশর ও গর্ভকেশর সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু নূতন কথা শিখাও। বোর্ডে পরাগ কেশরের চিত্রাঙ্কণ কর ও বালকগণকে দেখাইয়া দাও যে পরাগ কেশরের মাথায় যে একটা লম্বা থলিয়া দেখা যাইতেছে (হস্তস্থিত ফুলেও দেখাও) তাহাকে পরাগ কোষ বলে। পরাগকে রেণুও বলে। এই কোষের মধ্যে হলুদ বর্ণের যে গুঁড়া থাকে তাহাকে পরাগ বা রেণু বলে। এক খানি কাগজ, শ্লেট বা বালকের হাতের উপর একটা ধতুরা, জবা, চাঁপা, কেতকী কি অন্য কোন ফুল ঝাড়িয়া দেখাও। যে সূতার মত দণ্ডের মাথায় এই পরাগ কোষ থাকে তাহাকে পরাগ তন্তু বা পুংতন্তু বলে। তাহা হইলে পরাগকেশরের দুই ভাগ—এক পরাগকোষ, আর এক পুংতন্তু। পরাগকেশরের আর এক নাম পুংকেশর। পরাগকোষে পরাগ বা রেণু থাকে।

তারপর এইটা দেখ—ইহার নাম তোমরা জান—ইহাই গর্ভকেশর। এই দেখ এই গর্ভ কেশরের মাথায় একটা ছোট পাগড়ী আছে। এই পাগড়ীর নাম গর্ভ পীঠ। ইহার উপর হাত দিয়া দেখ—আঠা আঠা হাতে লাগে কি না? তারপর এই গর্ভপীঠের নীচে যে দণ্ড আছে দেখিতেছ তাহাকে গর্ভনালী বলে। (কোন কোন ফুলে ছোট, আবার কোন ফুলে একবারেই নাই। বালকগণকে ভিন্ন ভিন্ন ফুল দেখাইয়া দাও)। আবার ইহার নীচে যে একটা ছোট পিণ্ড দেখিতেছ—ইহার নাম গর্ভকোষ। এই গর্ভকোষই যে বাড়িতে বাড়িতে ফলে পরিণত হয়

তাহাও তোমাদিগকে বলিয়াছি। (২৬৪ পৃঃ দেখ) এই গর্ভকোষ কাটিয়া দেখ। খুব ছোট ছোট বীজ দেখিতে পাইতেছ (ধুতুরা কি মিষ্টি কুমড়-ফুলের গর্ভকোষ কাটিয়া দেখাও। অথবা একটু বড় গর্ভকোষযুক্ত অন্য কোন ফুলের গর্ভকোষ কাট) ইহাদিগকে বলে ভ্রূণবীজ অর্থাৎ খুব বাচ্চা বীজ। এখন দেখ গর্ভ কেশরের তিনভাগ পাইলাম—গর্ভপীঠ, গর্ভনালী, গর্ভকোষ। গর্ভকোষ কাটিলে আবার তার মাঝে ভ্রূণবীজ বা বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়। এই গর্ভকোষের ঠিক নীচে ও বোঁটার ঠিক উপরে যে একখানি আসন আছে (গাঁদাফুলে, ধুতুরাফুলে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়) তাহাকে স্থালী বা আসন বলে। বৃতি, কুণ্ড, দল, মুকুট কথাগুলিও তোমাদের মনে আছে।

আচ্ছা এখন কেমন করিয়া ফল হয় তাহাই আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি। একটা ধুতুরা, জবা কি কুমড়া গাছ ধরিয়া পরীক্ষা কর। ধুতুরার গাছে একটা পরিপক্ক ফুল বাহির করিয়া লও ও সেই ফুলের পাপড়ীগুলি আস্তে আস্তে ছিড়িয়া ফেল (সাবধান গাছ হইতে ফুল ছিড়িয়া আনিও না) তারপর সেই ফুলের পরাগ কেশরগুলি ছিঁড়িয়া ফেল, কেবল গর্ভকেশরটী থাকিল। আর একটা ফুলেরও ঐরূপ দল ও পরাগ কেশর ছিঁড়িয়া ফেল, কিন্তু এবারে পরাগ কেশর ছিঁড়িয়া পরাগ কোষগুলি গর্ভকেশরের উপর ঝাড়িয়া দেও। গর্ভপীঠে পরাগ বা রেণু লাগিয়া যাইবে। এখন দুইখানি কাগজের বড় এনভেলাপ বা খামের দ্বারা ঐ দুইটী ফুল ঢাকিয়া দাও। এনভেলাপের মুখ একত্র করিয়া ফুলের বোঁটার গায় সূতা দিয়া বাঁধিয়া রাখ। ৫।৭ দিন পরে দুই ফুল খুলিয়া দেখাও। কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে ফুলটীর গর্ভপীঠে রেণু ঝাড়িয়া দিয়াছিলে সেইটীই তাজা আছে ও তাহার নীচে গর্ভকোষ বাড়িতেছে। অপর ফুলটীর গর্ভকেশর শুকাইয়া যাইতেছে। তাহা হইলে এখন দেখিতে পাইতেছ যে পরাগ না হইলে গর্ভকোষ বাড়ে না আর গর্ভকোষ না বাড়িলে ফল হয় না।
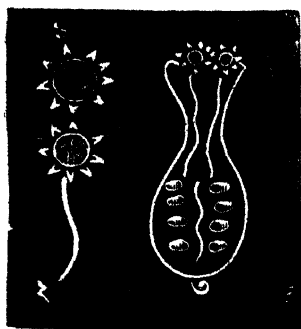
এখন দেখ (বোর্ডে চিত্রাঙ্কন করিয়া দেখাও) এই রেণু কি কাজ

করে। এই যে রেণু দেখিতেছ ইহাও ছোট ছোট কোষ। ইহার মধ্যে এক রকম তরল পদার্থ থাকে। গর্ভপীঠে রেণু পড়িলে, রেণু বাড়িতে থাকে। ৪।৫ দিন পরে এক একটা রেণুর এক একটা লেজ বাহির হয়। এই লেজগুলি গর্ভনালীর ভিতর দিয়া (গর্ভনালী ফাঁপা) গিয়া গর্ভকোষের এক একটা বীজাণুতে লাগে। বীজাণুতে লাগিলে এই লেজের মধ্যদিয়া (এই লেজগুলিও ফাঁপা) রেণুর রস আসিয়া বীজাণুতে লাগে। এই রস লাগিলেই বীজাণু বড় হইতে থাকে। বীজাণু বড় হইতে আরম্ভ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে গর্ভকোষও বড় হইতে থাকে। এই গর্ভকোষ বড় হইলেই ফল হইল।

অচ্ছা আমরা যেন পরীক্ষার সময় পরাগ কোষ ছিঁড়িয়া গর্ভপীঠের উপর পরাগ ছড়াইয়া দিলাম। কিন্তু আমরা ত প্রত্যেক ফুলে এমন করিয়া পরাগ ছড়াই না, তবে কেমন করিয়া পরাগ গর্ভপীঠে লাগে? পরাগ কোষ পাকিলেই ফাটিয়া যায়, আর রেণু উড়িয়া গর্ভপীঠে লাগে। বাতাসে রেণু উড়াইয়া নিয়া অনেক দূরের গাছেও লাগায়। তোমরা দেখিয়াছ পেঁপের দুই রকম গাছ আছে—একগাছে ফল হয় (মেয়ে গাছ) আর এক গাছে ফল হয় না (পুরুষ গাছ)। এখন এই পুং বৃক্ষের ফুলের রেণু বাতাসে উড়াইয়া নিয়া গিয়া বহুদূরের স্ত্রী বৃক্ষের ফুলের গর্ভপীঠে লাগাইয়া দেয়। দশ ক্রোশের মধ্যে একটা পুং বৃক্ষ থাকিলেই দেশের সমস্ত স্ত্রী বৃক্ষের ফুল রেণু পাইবে।

তারপর আবার দেখ মৌমাছি, প্রজাপতি, ফড়িং, পিপীলিকা ও

অন্যান্য পোকা ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মধু খায়। এক ফুলে মধু খাইতে গিয়া তাহাদিগের গায় যে রেণু লাগে, সেই রেণু লইয়া তাহারা যখন অন্য ফুলে প্রবেশ করে তখন এই রেণু এই দ্বিতীয় ফুলের গর্ভপীঠে লাগিয়া যায়। তাই দেখ কীট পতঙ্গ যে কেবল ফুলের মধু খাইয়াই বেড়ায় তাহা নহে, তাহারা ফুলের উপকারও করে। রেণু আনিয়া ফুলে ফুলে বিতরণ করে। তবে তোমরা জিজ্ঞাসা করিবে, যে ফুলের মধু নাই সে ফুলেত কেহই যায় না, তার দশা কি হয়? কীট পতঙ্গকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ফুলের মধু ছাড়া আরও দুইটী জিনিষ আছে—গন্ধ ও রঙ্। রঙ দেখিয়াও কীট পতঙ্গ আকৃষ্ট হয়। তোমরা হয়ত এখন জিজ্ঞাসা করিবে যে রাত্রিতে রঙ দেখা যায় না। কিন্তু রাত্রেও তো ফুলে কীট পতঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। হাঁ কথা ঠিক—যে সকল ফুল রাত্রিতে ফুটে সে গুলির রঙ নাই বটে (প্রায়ই সাদা) কিন্তু গন্ধ আছে। কীট পতঙ্গ গন্ধে গন্ধে গিয়া জুটে। যে সকল ফুল দিনে ফুটে, সেই গুলিই খুব রঙিল, তাহাতে প্রায়ই গন্ধ নাই। বেল, জুই, চাঁপা রাত্রিতে ফুটে; জবা কৃষ্ণচূড়া, দোপাটী দিনে ফুটে। যে সকল ফুলের মুখ আকাশের দিকে তাহাদিগের পরাগকেশর অপেক্ষা গর্ভকেশর ছোট। পরাগকোষ ফাটিলে পরাগ আপনিই (বাতাস না থাকিলেও) গর্ভপীঠের উপর পড়ে। আবার যে সকল ফুলের মুখ মাটির দিকে, তাহাদিগের গর্ভকেশর পরাগ-কেশর অপেক্ষা লম্বা। চীনে জবা ও লণ্টন জবার ফুল দেখাও। বালকগণকে আকাশমুখো ও মাটীমুখো ফুল সংগ্রহ করিতে বল।

তারপর আর এক কথা বলা হয় নাই। মুকুট বা দলের কি কাজ, বৃতিরই বা কি কাজ? মুকুটের এক প্রধান কাজ গর্ভকেশর ও পরাগ-কেশর ঢাকিয়া রাখা—যেন রৌদ্র বৃষ্টি ও ঝড়ে পরাগকেশর আর গর্ভ-কেশরগুলি কোন আঘাত পায়। ইহা ছাড়া রঙ্গিল মুকুট যে কীটপতঙ্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে তাহা বলিয়াছি।

কুণ্ডের কার্য্য—গর্ভকোষটীকে আবরণ করিয়া রাখা। কোন কোন ফুলে এই কুণ্ডও গর্ভকেশরের সঙ্গে বাড়িতে বাড়িতে ফলে পরিণত হয়। ফল যেমন বড় হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মুকুট, পরাগকেশর, বৃতি প্রভৃতি নিজ নিজ কার্য্য শেষ করিয়া ঝরিয়া পড়ে। ডালিমে ও পেয়ারায় দেখিয়াছ যে ফল খুব বড় হইলেও বৃতি ঝরিয়া যায় না। এইরূপে কোন ফলে শীঘ্র, কোন ফলে দেরীতে বৃতি ঝরিয়া পড়ে।

আর একটা কথা শুনিলে তোমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। ফুলের পাঁপড়ী ও কেশরগুলিও গাছের পাতার রূপান্তর মাত্র। ফুলের পাঁপড়ী—পাতা ভিন্ন আর কিছু নয়। পাঁপড়ীগুলির গায় যে শিরা আছে তাহা দেখিলেই কতকটা বুঝিতে পারিবে।

ফলের কার্য্য।

ফলের কার্য্য বীজ সৃষ্টি করা, সেই বীজ রক্ষা করা, সেই বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া দেওয়া ইত্যাদি। ফলের ভিতর যে বীজ থাকে তাহা তোমরা জান। ফল যতই বড় হয়, বীজও ততই বড় হয়। যখন আর বড় হয় না, তখন ফল পাকে ও ফলের ভিতর বীজও পাকে। এইরূপ পাকা বীজ না হইলে, তাহা হইতে গাছ জন্মে না।

নানারূপ বীজ দেখাও। সরিষা ও শাকবীজ কত ছোট। বটবীজও খুব ছোট কিন্তু সেই একটু বীজ থেকে কত বড় প্রকাণ্ড গাছ হয়। আমের বীজ বড়।

আম, জাম, কুল প্রভৃতি উত্তম ফলগুলি আমরা খাইবার জন্য সংগ্রহ করি। এক দেশ হইতে অন্য দেশে লইয়া যাই। তাই দেখ আমরা আহারের লোভে এক দেশের বীজ আর দেশে ছড়াইয়া দিয়া থাকি। কেবল আমরা নই পশুপাখীও এইকাজ করে। পাখীরা

ফল ঠোঁটে করিয়া অন্যত্র উড়িয়া যায়। গোরু, ছাগল, শেয়াল প্রভৃতি পশু অনেক ফল খাইবার জন্য এক স্থানের ফল অন্য স্থানে সরাইয়া রাখে। খট্টাসে (বা বাঘডেঁসা) জাম, পেয়ারা, খেজুর প্রভৃতি খাইয়া, যেখানে এই সকল বীজযুক্ত মল পরিত্যাগ করে, সে স্থানেও এই সকল গাছ জন্মিতে দেখা যায়।

তারপর দেখ দোপাটী মটর, সিম প্রভৃতির ফল পাকিলে শুঁটী ফাটিয়া যায় আর বীজ আপনা আপনিই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আবার শিমুল, কার্পাসের বীজ বাতাসে বহুদূর উড়াইয়া নিয়ে যায়। পেঙ্গে, সোণালী প্রভৃতির বীজে যেন পাখা লাগান আছে বলিয়া মনে হয়। এগুলি বাতাসে বেশ উড়িয়া চলে। ছাতিমের বীজ কতকটা শিমূলের বীজের মত। আবার দেখ চোরকাঁটা, শেয়াল কাঁটার ফল কাপড়ে লাগিলে ছাড়ে না। গোরু, বাছুরের গায়ও লাগিয়া যায়। এই সকল ফল এইরূপে নানাস্থানে নীত হয়। নদীর ধারে যে সকল গাছ থাকে, তাহাদের বীজ নদীর ভিতর পড়িয়া ভাসিয়া ভাসিয়া বহুদূর চলিয়া যায়। এইরূপে মানুষ, পশু, পক্ষী, বাতাস ও জলের দ্বারা একস্থানের বীজ নানাস্থানে নীত হয়।

এখন কতকগুলি বীজ পরীক্ষা কর। আম, তেঁতুল, সীম, মটর, প্রভৃতি গাছের বীজ দুই ভাগে বিভক্ত। সীম ও তেঁতুল বীজের দুইটী ভাগ, ছোট ছোট চারাগাছে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা খুব ছোট আমের গাছ তুলিয়া দেখাও আমের বীজও কেমন দুইভাগে ভাগ করা। আবার ধান, গম, সুপারী, নারিকেলের বীজ দেখ—একখণ্ড মাত্র। আম, জাম, তেঁতুল, মটরের বীজকে এই জন্য দ্বিদল (দুইটীদল বা ভাগ আছে বলিয়া) ও ধান, গম, সুপারীর বীজকে একদল বীজ বলে। একদল বীজ থেকে যে গাছ হয় তাহার শাখা প্রশাখা থাকে না; গাছগুলি লম্বা লম্বা হয়, মূলগুলি সরু সরু ও গোছা গোছা, পাতার শির-

গুলি সরল আর কাণ্ড অন্তঃসার শূন্য। কিন্তু দ্বিদল বীজ হইতে যে গাছ হয়, তাহার শাখা প্রশাখা অনেক, পাতার শির জালের মত, মূল খুব মোটা, লম্বা ও শক্ত আর কাণ্ড অন্তঃসার পূর্ণ।

তাহা হইলে বীজ দেখিয়া কিরূপ গাছ হইবে—অর্থাৎ তাল জাতীয় (বহিঃসার) কি আমজাতীয় (অন্তঃসার) তাহা বলা যাইতে পারে। আবার গাছ দেখিয়াও কিরূপ বীজ হইবে অর্থাৎ একদল বীজ কি দ্বিদল বীজ, তাহাও বলা যাইতে পারে।

বীজের কার্য্য।

কতকগুলি সিমের বীজ এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখ। পর দিন সেইগুলি বালকগণকে পরীক্ষা করিতে দাও। বীজের একদিকে কালদাগ আছে। এই কালদাগের স্থানেই বীজটী সুঁটীর মধ্যে লাগান ছিল। দেখ বীজের উপরে একটা পাতলা খোসা বা আবরণ আছে। হাত দিয়া কি ছুরী দিয়া অতি সাবধানে এই খোসা খুলিয়া ফেল। সাদা সার বাহির হইল। এখন এই বীজটীর উপর কি কি রকম দাগ দেখিতে পাও। একটা কাল দাগ আছে। আর এই দাগ দেখিয়া বোধ হয় যে বীজটী যেন দুই খণ্ড। কাল দাগের দিকে না খুলিয়া, অপর দিকে ছুরী বা নখ দিয়া বীজটী দুইভাগে ভাগ কর। পুস্তক খুলিলে যেমন দুইদিকে পাতা পৃথক হয় কিন্তু পুস্তকের বাঁধার কাছে লাগা থাকে, এখানেও দেখ ঠিক সেই অবস্থা। বীজ দুইখণ্ড ঐ কাল দাগের কাছে লাগান আছে। কাল দাগ যেন কবজা। ঐ কাল দাগটী এখন বেশ করিয়া পরীক্ষা কর। এই কাল দাগটীই বা এই কবজার
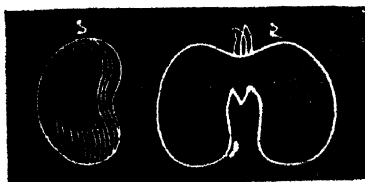
স্থানটীই আদত স্থান। এই স্থানে গাছের অঙ্কুর থাকে। এই দেখ এখান হইতে দুইটী অতি সরু গেঁজ বাহির হইয়াছে; একটার মুখ উপরের দিকে আর একটার নীচের দিকে (ছবিতেও দেখাও)। ঐ উপরের অংশই কালে বড় হইয়া গাছ হইবে আর নীচের অংশ মাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া মূল হইবে। বাক্সের ভিতর বীজ রাখিয়া দিলে কি তাহা হইতে গাছ বাহির হয়? কেন হয় না? বীজ হইতে গাছ করিতে হইলে বীজ ছাড়া আরও কি কি চাই? জল, মাটী, বায়ু ও রৌদ্র।

কতকগুলি ছোলা কি মটর জলে ভিজাইয়া রাখিলে দুই তিন দিনেই তাহার অঙ্কুর বাহির হয়। বালকগণকে বুঝাইয়া দাও যে সীম, ছোলা, মটর প্রভৃতি বীজের মধ্যে যে দুই খণ্ড ডা'ল (দ্বিদল বীজ পত্র) থাকে, তাহাই অঙ্কুরের খাদ্য। যেমন ছোট শিশু তরল ভিন্ন কঠিন জিনিষ খাইতে পারে না, সেইরূপ গাছের শিশু অর্থাৎ অঙ্কুরও তরল ভিন্ন কঠিন জিনিষ খাইতে পারে না। সীম, ছোলা, মটর জলে ভিজাইলে ইহাদের ডা'লের অংশ জলে মিশিয়া তরল হয়। (মিশ্রি জলে ভিজাইলে কি হয়?) তরল হইলে সেই তরল রস খাইয়া বীজের পার্শ্বস্থিত এই ছোট কাল অংশ অর্থাৎ অঙ্কুর বড় হইতে আরম্ভ করে। প্রথমে নীচের দিক মূল বাহির হয়। গাছের কাণ্ডটী তখনও গুঁটী সুঁটী হইয়া দুইখানি ডা'লের মধ্যেই থাকে। (যদি জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে এই পাঠ দেওয়া আবশ্যক মনে কর, তবে বালকগণকে কাণ্ডের এই অবস্থা দেখাইবার জন্য একটা আমের অঙ্কুর দেখাও। যে সকল আমের আঁটী বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার ২।৪টী পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাইবে যে গাছের কাণ্ড ও পাতা আমের আঁটীর ভিতরই লুকাইয়া আছে কিন্তু মূল বাহির হইয়া আসিয়াছে।) যদি এইরূপ অবস্থায় অর্থাৎ কেবল জলের মধ্যেই সীম, মটর, ছোলার অঙ্কুর রাখিয়া দাও, তবে ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত গাছ বাড়িয়া মরিয়া যাইবে। কেন? ডা'লের মধ্যে অঙ্কুরের যে খাদ্য ছিল তাহা এই কয়েক

দিনেই ফুরাইয়া গিয়াছে। এই জন্য মাটীর দরকার। মাটীর মধ্যে গাছের নানারূপ খাদ্য থাকে। জলে সেই সব গলিয়া গেলে গাছের শিকড় দিয়া সেই রস গাছের ভিতর যাতায়াত করিয়া গাছটীকে বাড়ায়।

ঘরের ভিতর নারিকেল থাকিলে তাহা হইতে গাছ বাহির হইয়া থাকে। জলের আবশ্যকতা হয় না, কেন? কারণ নারিকেলের ভিতরেই জল থাকে, সেই জলে নারিকেলের শাঁস গলিয়া তরল হয়। এই তরল শাঁস খাইয়া নারিকেলের চারা বড় হইতে থাকে। (একটা গাছ বিশিষ্ট নারিকেল ভাঙ্গিয়া দেখাও) শাঁস থাকিতে থাকিতেই মাটীতে পুঁতিতে হয়, যেন শাঁস ফুরাইয়া গেলেই মাটীতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে।

তোমরা হাঁসের কি মুরগীর ডিম দেখিয়াছ? (একটা ডিম ভাঙ্গিয়া দেখাইতে পার) ডিমের সঙ্গে গাছের বীজের বেশ মিল আছে। ডিমের যেমন খোসা আছে বীজেরও দেখ তেমনি একটা খোসা আছে। ডিমের ভিতর যেমন একটা সাদা তরল সার, বীজের ভিতরও তেমনি সাদা সার। তবে বীজের এই সার জল দিয়া তরল করিয়া লইতে হয়। ডিমের ভিতর যেমন হলুদ বর্ণের ভ্রূণ, বীজের ভিতরও তেমনি কাল অঙ্কুর। এই হলুদবর্ণের ভ্রূণ ঐ সাদা সার খাইয়া পাখী হয়। বীজের মধ্যে এই কাল অঙ্কুর বীজের সাদা সার খাইয়া গাছ হয়।

আচ্ছা, এখন দেখা যাউক বীজ বপনের দিন হইতে গাছ একটু বড় হওয়া পর্য্যন্ত কতরকম পরিবর্ত্তন ঘটে। তোমরা নিজেও এইরূপ পরীক্ষা করিতে পার। একটা ফুলের টবে বা হাঁড়িতে মাটী দিয়া সীম, মটর, আম, লাউ কি যে কোন বীজ পুঁতিয়া রাখ আর হাঁড়ীটীতে যাহাতে রৌদ্রের উত্তাপ ও বাতাস লাগে এমন স্থানে রাখিয়া দাও। তাহাতে মাঝে মাঝে একটু করিয়া জল দাও। ২।৪ দিন পরে এক একটা বীজ তুলিয়া পরীক্ষা করিতে পার। দেখিবে যে বীজের উপরের খোসা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, শিকড় দ্বিদলের বাহিরে দেখা দিয়াছে। যে পর্য্যন্ত দ্বিদলের সার থাকে
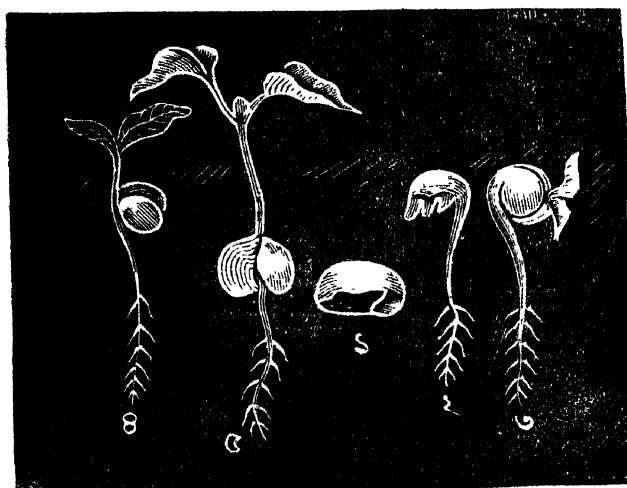
সে পর্য্যন্ত আর মাটীর খাদ্য খায় না। সার ফুরাইয়া গেলেই পাতাগুলি বাহির হইয়া পড়ে। মূল পরীক্ষা করিয়া দেখ—মূলের গা থেকে খুব সরু সরু কত মূল বাহির হইতেছে। প্রথমে গাছের কাণ্ডের মাথায় এক জোড়া পাতা দেখা দেয়। তারপর সেই জোড়ার সন্ধিস্থল থেকে আবার এক জোড়া বাহির হয়। এইরূপে ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। গাছের পাতার কি আবশ্যকতা তাহা তোমাদিগের মনে আছে। গাছের জন্য এখন পাতাকে বায়ু হইতেও কত আহার সংগ্রহ করিতে হইবে।

এখন দেখ ভিন্ন ভিন্ন বীজের আবার একটু ভিন্ন ভিন্ন রকমও আছে। তেঁতুলের গাছ ও সীমের গাছ বীজ দল দুইখানি সাথে করিয়াই মাটীর উপর উঠে। আম, জাম প্রভৃতি অধিকাংশ গাছের দ্বিদল মাটীর নীচেই থাকে। যে সকল বীজের দ্বিদল খুব পাতলা (বঁুট, অড়হড়) তাহাদের গাছ কেবল দ্বিদলের খোসাটা লইয়া উঠে। দ্বিদলের সার মাটীর নীচে থাকিতেই ফুরাইয়া যায়।

ধানগাছ গজাইবার প্রণালী একটু ভিন্ন। ধানে যে একদল বীজ

খণ্ডিত ভুট্টা দানা।

তাহা তোমাদের জানা আছে। ভুট্টা (মুকাই) একদল বীজ তাহাও তোমরা জান। ভুট্টার দানাগুলি একটু বড় বড়, তাই একটা ভুট্টার দানা কাটীয়া দেখা যাউক। তাহার মধ্যে মূল ও কাণ্ড কিরূপ ভাবে গুটী সুঁটী হইয়া আছে। উপরে যে চোখের মত একটা দাগ দেখিতেছ তাহাই কাণ্ডের; আর নীচে যে
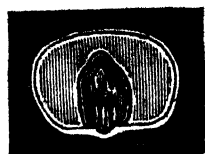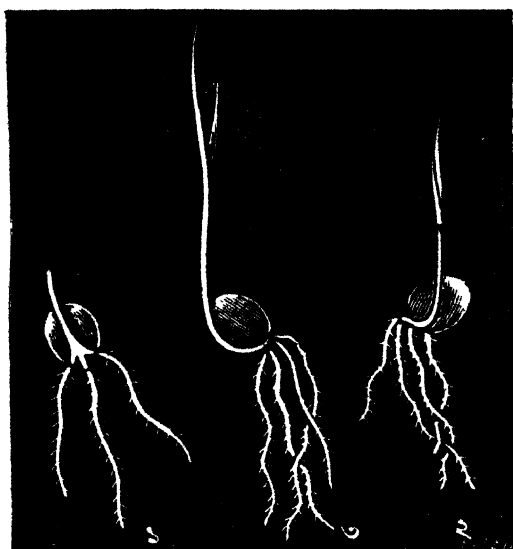
আধখানি চোখের মত একটা দাগ দেখিতেছ তাহাই মূলের আদি অবস্থা। দ্বিদল বীজের যেমন উপরের খোসাটা ফাটিয়া যায় ও তাহার ভিতর হইতে ডা'ল দুখানি বাহির হইয়া পড়ে, এক দলের তাহা হয় না। একদলের শাঁস শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত খোসা থাকিয়াই যায়। পরে পচিয়া যায়। কাণ্ড ও মূল এই খোসায় ছিদ্র করিয়া বাহির হয়। কাণ্ডটী প্রথমে একটী ছোট মোচার মত দেখায়, তাহা হইতে পাতা বাহির হয়। আর

মূল মাটীর নীচে যায়। তবে দ্বিদলের যেমন একটা প্রধান মূল বাহির হয়, একদলের তাহা হয় না। একসঙ্গে অনেক মূল বাহির হইয়া পড়ে।

অপুষ্পক উদ্ভিদ।

এতদিন তোমাদিগকে কেবল পুষ্পক বৃক্ষের কথা বলিয়াছি। গাছে ফুল হয়, ফুল হইতে ফল হয়, ফল হইতে বীজ হয়, বীজ হইতে গাছ হয়—ইহাই তোমরা জান। আজ আবার আর এক রকম গাছের কথা শুন। এ গাছের ফুলও হয় না ফলও হয় না। এই জাতীয় এক রকম গাছ তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। ইহাকে ইংরেজীতে ফারণ্ গাছ বলে। আমাদের দেশে এই গাছের জেলায় জেলায় নানারূপ নাম আছে। কুঁকড়ী, ঢেঁকি, পালই প্রভৃতি ঢের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ ইহাকে পালক পাতা গাছও বলিয়া থাকে। এই শ্রেণীর অনেক রকম গাছ আছে। আমরা ইহার কোন কোন গাছের নরম ডগার শাক খাইয়া থাকি। এই সকল গাছ ভাঙ্গা প্রাচীরে, কূপের ধারে, পাহাড়ের ধারে ছায়াযুক্ত ঠাণ্ডা জায়গায় যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা ছবি দেখিলেই এই গাছ অনায়াসে চিনিতে পারিবে। অনেকে টবে করিয়া এই সকল গাছ ঘরে রাখিয়া দেন। ইহাদের যদিও ফুল নাই কিন্তু ইহাদের পাতাগুলি খুব সুন্দর। ফার্ণের গাছ খুব বড়ও হইয়া থাকে—এক একটা খেজুর গাছের মত। এইরূপ ফার্ণকে গাছ-ফার্ণ বলে। দার্জিলিং পাহাড়ে অনেক গাছ-ফার্ণ দেখিতে পাওয়া যায়

এই গাছের ফুল ফল নাই বটে, কিন্তু ইহার পাতার নীচের পিঠে কি পাতার ধারে এক রকম ছোট ছোট বীজ জন্মে। এই বীজ ফল হইতে উৎপন্ন নয় বলিয়া (ফলোৎপন্ন বীজের সহিত পৃথক করিবার জন্য) ইহাকে স্পোর (Spore) বলে। ('স্পোর' কথাটা ইংরেজী, কাজেই উচ্চারণের সময় 'প'এর মস্তকের 'স'কে কোমল 'ছ' এর মত উচ্চারণ করিতে হইবে)। এই স্পোরের মধ্যে দুই রকমের (অতি ক্ষুদ্র) কোষ থাকে। ভাল অণুবীক্ষণ ভিন্ন তাহা দেখিবার উপায় নাই। এই কোষগুলি আবার দুই রকমের— এক রকম একটু লম্বা আর এক রকম একটু গোল। গোল কোষ হইতে এক রকম রস বাহির হইয়া যখন লম্বা কোষে প্রবেশ করে, তখন এই লম্বা কোষ হইতে গাছের অঙ্কুর বাহির হইতে থাকে। এই সকল কোষে কোনরূপ দল নাই বলিয়া এইরূপ বীজকে নির্দ্দল বীজ বলে।

আর এক রকম গাছ—বেঙের ছাতা। ভাল কথায় ইহাকে ছত্রক বলে। বেঙের ছাতা যে এক রকম গাছ তাহা হয়ত তোমরা এতদিন জানিতে না। ইহার রঙ সাদা আর ডাল পালা বা পাতা নাই বলিয়া ইহাকে গাছ বলিয়া মনে করাও কঠিন। কিন্তু বেঙের ছাতাও উদ্ভিদ। এই গাছগুলি খুব শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে। সন্ধ্যার সময় দেখিয়াছ যে মাঠে বেঙের ছাতার কোন চিহ্নই নাই, কিন্তু প্রাতঃকালে গিয়া দেখ যে কত বেঙের ছাতা উঠিয়াছে। তার মধ্যে কোন কোনটা এই এক রাত্রে ৩।৪ ইঞ্চ লম্বা হইয়াছে। ছত্রক জাতীয় উদ্ভিদের মাথায় প্রথমে একটা গোল ঢিবি দেখিতে পাওয়া যায়। এই গোল ঢিবি পরে খুলিয়া গিয়া ছাতার মত হয়। এই গাছের ছাতার মত আকার। বর্ষাকালে এই গাছ জন্মে আর বর্ষাকালে বেঙও জন্মে বলিয়া ইহাকে বেঙের ছাতা বলে; অর্থাৎ বেঙগুলিকে বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্যই যেন এই সকল ছাতার সৃষ্টি হইয়া থাকে। যখন ছাতা খুলিয়া যায় তখন ছাতার নীচের পিঠে স্পোর জন্মে। এই স্পোর হইতেই

নূতন গাছ জন্মে। কোন কোন বেঙের ছাতা উত্তম খাদ্য। কিন্তু না জানিয়া সকল বেঙের ছাতা খাওয়া উচিত নয় কারণ অনেক প্রকার বেঙের ছাতাই বিষাক্ত। বর্ষকালে জুতার উপর, পুস্তকের মলাটের উপর, কাঠের বাক্‌সের উপর সাদা সাদা ছাতা পড়িতে দেখিয়াছ। এগুলি কি জান? এগুলি খুব ছোট ছোট বেঙের ছাতা। অপুষ্পক গাছের স্পোরের কোষগুলি এত ছোট যে তাহারা সকল সময়েই বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়। এইরূপে ভাসিতে ভাসিতে একটু স্যাঁতস্যাতে স্থান পাইলেই তাহাতে লাগিয়া যায় আর সেই স্থানে ছাতা জন্মে।

আর এক রকম অপুষ্পক উদ্ভিদ—শৈবাল বা শ্যাওলা। এ সকলের জন্মস্থান জলাশয় বা জলাভূমি। তোমরা সকলেই শ্যাওলা দেখিয়াছ। পুকুরের ঘাটে মেটে সবুজ রঙের যে এক রকম সূতা সূতা গাছ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকেই শ্যাওলা বলে।

বড় বড় গাছের গায়ে, পুরাতন প্রাচীরের গায়ে, পুকুরের সিঁড়ির গায়ে, রাস্তার নর্দ্দমার ধারে, পাথরের গায়ে, যে সবুজ মখমলের মত উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও শৈবাল। ইহাদেরও ফুল ফল নাই। স্পোর হইতে গাছ উৎপন্ন হয়।

—— ——

উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ।

তোমরা দুই শ্রেণীর উদ্ভিদের পরিচয় পাইয়াছ। এক শ্রেণী সপুষ্পক আর এক শ্রেণী অপুষ্পক। আবার সপুষ্পক বৃক্ষের দুই শ্রেণী (১) দ্বিদল (২) একদল।

দল হিসবে আবার সমস্ত বৃক্ষজাতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় (১) নির্দ্দলবীজ (২) দ্বিদলবীজ (১) একদলবীজ।

আবার এক এক শ্রেণীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে ভাগ করা হইয়া থাকে। যে সকল গাছের ফুলের মুকুট, কুণ্ড, পরাগকেশর, গর্ভকেশর

প্রভৃতির সংখ্যা ও আকার এক রকম তাহাদিগকে একজাতি ভুক্ত করা হয়। যেমন লাউ, কুমড়া, শঁসার ফুল এক রকম—ইহারা কুষ্মাণ্ড জাতি; কার্পাস ও ঢেঁড়সের ফুল এক রকম—ইহারা কার্পাস জাতি; অনেক প্রকার পরগাছা আছে—কিন্তু ফুল সমস্ত এক আকারের—ইহারা অরকিড্ (পরগাছার ইংরেজী নাম) জাতি; কামিনীফুল, লেবুফুল, বেলের (শ্রীফল) ফুল এক রকম—ইহারা লেবু জাতি; জুঁই, বেল, কুন্দ, কুল এক রকমের বলিয়া ইহারা কুন্দ জাতি; মটর, সীম অড়হর প্রভৃতি মটর জাতি; ধান, গম, যব প্রভৃতি ধান্য জাতী; তাল, খেজুর, গুপারী তাল জাতি; ইত্যাদি। তোমরা যখন উদ্ভিদের বিষয়ে আরও অনেক অনুসন্ধান করিতে শিখিবে তখন এই সকল জাতির বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে; কেবল জাতি বিভাগ কেমন করিয়া করিতে হয় তোমাদিগকে তাহারই একটু আভাস দিলাম। এইরূপ অপুষ্পকেরও জাতি আছে। ফার্ণ বহু প্রকার কিন্তু সকল ফার্ণই এক প্রকার স্পোর হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া সকল প্রকার ফার্ণই একজাতি ভুক্ত। এই জাতিকে ফার্ণ জাতি বলে। এইরূপ ছত্রক জাতি, শৈবাল জাতি ইত্যাদি।

বটজাতীয়, কুন্দজাতীয় ইত্যাদি।
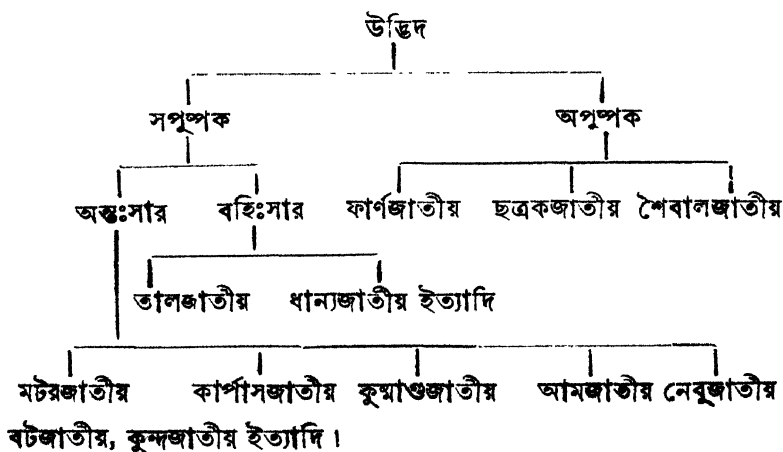
প্রাণীর গাত্রাবরণ।

উপকরণ—মাছ বা মাছের আঁইশ, সাপের খোলস, পাখীর পালক, ছাগলের চামড়া (লোম সমেত) বা ছাগল, শূকরের কুঁচি, সজারুর কাঁটা, কচ্ছপের খোলা, একটা বেঙ ইত্যাদি।

আমাদিগের গায় চর্ম্ম বা চামড়া আছে। এই চামড়া কেমন মসৃণ ও কোমল। এই চামড়ার উপর খুব ফাঁকে ফাঁকে লোম আছে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর গায়ে এরূপ চামড়া নাই। বানরের গায়ের চামড়া অনেকটা আমাদিগের চামড়ার মত বটে কিন্তু তাহাতে লোম খুব ঘন।

মাছের আঁইশ ও সাপের খোলস দেখাও আর কোন্‌গুলিকে আঁইশ বলে তাহা বলিয়া দাও। সাপের খোলসের আঁইশগুলি (বিশেষ নীচের পিঠে) প্রায় মাছের আঁইশের তুল্য। পাখীর গায় পালক আছে। গায়ের পালক বেশ নরম ও সরু সরু, আর পাখার পালক লম্বা লম্বা কলম বা পেনের মত। বিড়ালের গায় হাত দিয়া দেখ, লোম কেমন কোমল। আবার গোরুর লোম কেমন শক্ত। শক্ত লোমকে রোম বলে। লোম নামটী শুনিলেই যেন কোন কোমল পদার্থ বলিয়া মনে পড়ে আর রোম নাম শুনিলে কোন কর্কশ পদার্থ বলিয়া মনে হয়। তাই দেখ নামের সঙ্গেও কোন কোন জিনিষের গুণের মিল থাকে। ভেড়ার লোম নরম কিন্তু খস্‌খসে ; ইহাকে পশম বলে। শূকরের লোম (বিশেষ ঘাড়ের কাছে) খুব শক্ত—ইহাকে কুঁচি বলে। সজারুর গায় শক্ত শক্ত কাঁটা। বেঙের গায় লোম বা আঁইশ নাই—গায় হাত দিয়া দেখ, চামড়া ভিজে ও ঠাণ্ডা। কচ্ছপের খোলা কাঠের মত শক্ত।

আচ্ছা এখন এই সমস্ত আবরণ পরীক্ষা করা যাউক। মাছের গায় হাত বুলাও—মাথার দিক থেকে লেজের দিকে। কেমন বোধ হইতেছে ? শক্ত শক্ত—আমাদের আঙ্গুলের নখের মত কতকগুলি মসৃণ আঁইশ।

আচ্ছা, এবার উল্টা দিকে অর্থাৎ লেজের দিক হইতে মাথার দিকে হাত বুলাও। কি বুঝিতেছ? এই দিকে আঁইশগুলির জোড় নাই—সব
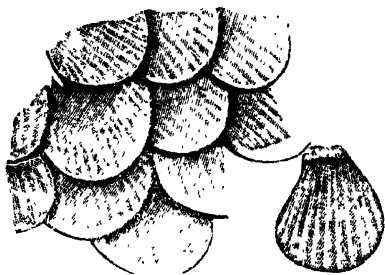
আলগা—হাতে লাগে। যদি বালকেরা টালির ছাদ দেখিয়া থাকে তবে সেই ছাদে টালি বসাইবার কায়দার সহিত মাছের আঁইশ বিন্যা-সের তুলনা করিতে বল। যদি বালকেরা কেরোসিন ক্যানিষ্টার-কাটা টিনের বা ঢেউ তোলা টিনের ঘর দেখিয়া থাকে, তবে সেই ঘরের চালে টিন সাজান লক্ষ্য করিতে বল। কেমন করিয়া এক টিনের উপর আর এক টিন দেয় ও কেন দেয় জিজ্ঞাসা করিয়া আদায় কর। মাছের আঁইশ উল্টা দিকে সাজান হইলে কি অসুবিধা হইত? সাঁতরাইবার সময় আঁইশে জল বাধিয়া যাইত। মাছের আঁইশ বেশ তেল তেলে হওয়ায় কি সুবিধা হইয়াছে? বেশ সহজে জলে চলিয়া যাইতে পারে। যদি মাছের গায় পশম থাকিত, তবে কি অসুবিধা হইত? জলের ভিতর চলিতে বড়ই কষ্ট হইত। বলিয়া দাও যে মাছের আঁইশ বহু রকমের আছে। ফলুই মাছের আঁইশ কেমন ছোট ছোট আর রুই মাছের আঁইশ কেমন বড়। আঁইশ গুলি শক্ত বটে কিন্তু রবারের মত সহজেই বেঁকান যায় ও সোজা করা যায়। এই জন্য জলের ঢেউ লাগিলেও আঁইশ ভাঙ্গিয়া যায় না।

সাপের পেটের নীচের আঁইশও মাছের আঁইশের মত সাজান। সাপ মাটীতে এই আঁইশ বাধাইয়া সম্মুখে চলে। গর্ত্তের ভিতর যাইবার সময় আঁইশে বাধে না। কিন্তু যদি লেজ ধরিয়া গর্ত্ত হইতে সাপ বাহির করিতে চেষ্টা কর তবে পারিবে না। গর্ত্তের গায়ে সাপের আঁইশ বাধিয়া যাইবে।

পাখীর পালকগুলি কিরূপ ভাবে সাজান থাকে—দেখ। খড়ের চালে কেমন করিয়া খড় সাজায়? উল্টা করিয়া সাজাইলে কি হইত? পাখীর পাখার পালকগুলি যদি উল্টা করিয়া সাজান থাকিত তবে পাখী আকাশে উড়িবার সময় বাতাসে তাহার পালক উড়িয়া তাহাকে বাধা দিত। তারপর পালকগুলি বেশ কোমল ও মসৃণ হওয়াতে বাতাসে কি জলে চলিবার বেশ সুবিধা। আবার পালকগুলি খুব হালকা; হালকা না হইলে ভারী পালক লইয়া পাখী উড়িতে পারিত না। তারপর পালক বেশ গরম—তাই শীত কি বর্ষায় পাখীর কষ্ট হয় না। ভেড়ার গায় যেমন পশম, পাখীর গায় যদি সেইরূপ কোঁকড়ান পশম থাকিত তবে পাখীর কি অসুবিধা হইত? পশু মাত্রেরই গায় লোম বা রোম আছে। যে সকল পশুর গায় লোম বেশ ঘন ঘন তাহাদিগের গার চামড়া তেমন পুরু নয়, আর যাহাদিগের গায়ের চামড়াই পুরু তাহাদিগের গায়ে লোম খুব অল্প। বিড়াল, কাঠবিড়াল, ভালুকের গায় লোম খুব ঘন। হাতী, শূকর, মহিষ, গণ্ডারের গায় রোম খুব কম; ইহাদের চামড়াই খুব পুরু।

সজারু খুব ভীরু ও নিরীহ জীব—শেয়াল, কুকুর, বাঘ সুবিধা পাইলেই ইহাকে ধরিয়া খায়। সজারু বিপদে পড়িলে গায়ের কাঁটাগুলি খাড়া করে, ইহাতেই সে অনেক সময় রক্ষা পায়। কচ্ছপের শরীর খুব নরম, হাড় নাই বলিলেই হয়। সেইজন্য তাহার গায়ের উপর একটা শক্ত খোসা আছে। কেহ সহজে তাহাকে আঘাত করিতে পারে না। সজারু ও কচ্ছপ শীঘ্র দৌড়াইয়া পলাইতে পারে না—ইহারা বড়ই ধীরে চলে। বেঙের চামড়ার ভিতর দিয়া নিশ্বাসে প্রশ্বাস চলে তাই তার চামড়া একটু ভিজা ভিজা থাকা দরকার।

মানুষের বুদ্ধি আছে; তাহারা নিজ ইচ্ছামত কাপড় দিয়া গায়ের আবরণ করিয়া নিতে পারে; তাই মানুষের চামড়ার উপর ঘন লোম নাই।

কিন্তু পশু পক্ষীর ত আর সেরূপ বুদ্ধি নাই, তাই ভগবান তাহাদিগকে পুরু চামড়া কি ঘন ও গরম লোম দিয়া ঢাকিয়া দিয়াছেন।

যে সকল নিরীহ জীব মাটীর নীচে থাকে তাহাদের গায়ের রং মেটে; যেমন বেজী, ইঁদুর, ছুঁচা, কেঁচো, বেঙ। মাটীর সঙ্গে গায়ের রঙ মিলিয়া থাকে বলিয়া ইহাদের শত্রুগণ সহজে চিনিতে পারে না। যে সকল পলু পোকা গাছের পাতা খায়, তাহারা সবুজ—গাছের পাতার সঙ্গে বেশ মিলিয়া থাকে বলিয়া পাখী ধরিয়া খাইতে পারে না। বাঘের রঙ্ হলুদ—বাঘ শুষ্ক খড়ের জঙ্গলে বাস করে। ইহারা যে সকল জীব ধরিয়া খায় তাহারা জঙ্গলে বাঘ আছে বলিয়া জানিতে পারে না—হঠাৎ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, আর বাঘ ধরিয়া খায়। এরূপ না হইলে বাঘের খাওয়াই মিলিত না।

কাক চুরি করিয়া খাইতে মজবুত—তাই তার রঙ কাল—গাছের ঘন পাতার মধ্যে বেশ লুকাইয়া থাকে। এইরূপ চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবে যে জীব শরীরের বর্ণও তাহাদের কত উপকারে আইসে।

লেজের কার্য্য।

উপকরণ—একটা কুকুর, একটা বিড়াল, চামর, নানারূপ জীব জন্তুর চিত্র (যে সকল জন্তুর লেজের কথা বলিতে হইবে)।

মানুষের লেজ নাই। পশু, পক্ষী, মাছ প্রভৃতি জীবের লেজ আছে। লেজ কত রকমের আছে ও কিরূপ লেজ কি কাজে লাগে, তাহাই দেখা যাউক।

লেজ নানা রকমের (১) বিড়ালের লেজে আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত বড় বড় লোম (২) বাঘ ও সিংহের লেজের মাথায় বড় বড় লোম (৩) গোরুর লেজের মাথায় বড় বড় লোম বটে কিন্তু সিংহের লেজের

চেয়ে গোরুর লেজের হাড় খুব শক্ত ও সবল (৪) ক্যাঙ্গারুর লেজের গোড়া খুব প্রশস্ত, অগ্রভাগ সরু, হাড় খুব শক্ত ও সবল। আগায় বড় বড় লোম নাই। (৫) ঘোড়ার লেজে কেবল এক গোছা বড় বড় চুল—চামরের মত। (৬) ইঁদুরের লেজে লোম নাই—লম্বা ও সরু। (৭) শূকরের লেজ শরীর আন্দাজে খুব সরু ও ছোট—প্রায় সকল সময়েই পাকাইয়া রাখে। হরিণ ও খরগোষের লেজ খুবই খাট। ছাগলের লেজও বড় নয়। (৮) কুকুরের লেজ নানা প্রকারের—কোন জাতির লম্বা, কোন জাতির খাট, কোন জাতির খুব ঘন চুলযুক্ত—তবে প্রায় সকল কুকুরের লেজের অগ্রভাগই একটু বাঁকান। (৯) খেঁকশেয়ালের ও কাঠবিড়ালের লেজে খুব লোম। (১০) উল্লুক ও বনমানুষের লেজ নাই। মর্কট ও হনুমানের লেজ আছে।

লেজের কাজ কি? (১) লেজ নাড়িয়া মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। যখন কুকুরের খুব আনন্দ হয়, তখন লেজ নাড়িয়া তাহা দেখায়। বিড়াল, বাঘ, সিংহ রাগিলে লেজ ফুলাইয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকে। (২) লেজ দিয়া মশা মাছি তাড়ান যায়। সকল পশুর লেজই এই কাজে লাগে। (৩) লেজ গুঁটাইয়া শরীর গরম করা যায়। বিড়াল কেমন করিয়া লেজে গুঁটাইয়া শুইয়া থাকে তাহা তোমরা দেখিয়াছ। (৪) ক্যাঙ্গারুর লেজে একটা পায়ের কাজ হয়। ক্যাঙ্গারু বসিবার সময় পেছনেই তুই পা ও লেজের উপর ভর দিয়া (তেপায়া টুলের মত) বসে। আবার লাফাইবার সময়ও এই লেজের উপর ভর দিয়া লাফ দেয়। তোমরা কি নেঙটে ইঁদুর লাফাইতে দেখিয়াছ? (৫) এক রকমের বানর আছে, তাহারা লেজ দিয়া ডাল জড়াইয়া ধরিতে পারে—লেজ দ্বারা তাহাদের আর একখানি হাতের কাজ হয়। (৬) হাতীর ও শূকরের লেজ খুব ছোট—ইহাদের শরীরের চামড়াই খুব পুরু—মশা মাছি হুল ফুটাইতে পারে না। কাজেই লেজ দিয়া মশামাছি তাড়াই-

বার দরকার হয় না। ভেড়ার ঘন লোমের মধ্যেও মশামাছি ঢুকিতে পারে না। ভেড়ার লেজ ছোট হওয়াতে তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই। (৭) পাখীর লেজে হা'লের কাজ করে। পাখীর পাখা দুখানি যেন দুটী দাঁড়। মাছের লেজে ও সেই কাজ হয়—মাছের লেজ জলের ভিতর ঠিক হা'লের মত খাড়াভাবে থাকে। জলে চলিবার সময় মাছ কেমন করিয়া লেজ নাড়ে তাহা দেখাও।

মানুষ হাতের দ্বারাই মশা মাছি তাড়াইতে পারে ও সকল জিনিষ ধরিতে পারে ও বুদ্ধির দ্বারা উপায় করিতে পারে; কাজেই লেজের দরকার নাই।

মাথা ও মুখের কার্য্য।

শৃঙ্গ।—গোরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল ও হরিণের মাথায় শিং আছে। গোরু মহিষের শিং ফাঁপা—অর্থাৎ শৃঙ্গের মধ্যে এক রকম হাড় আছে তাহার উপর একটা কাল ঠোস লাগান। কিন্তু হরিণের শিং নিরেট। কোন কোন হরিণের শৃঙ্গে অনেক ডাল থাকে আর খুব বড়ও হয়। গোরু মহিষের শৃঙ্গে ডাল নাই। মহিষের শিং খুব বড়—দুই দিক হইতে বেঁকিয়া আসিয়া মাথার উপরে শেষ হইয়াছে। ছাগলের শিং মাথার উপরে সোজাভাবে উঠিয়া পশ্চাতে বেঁকিয়াছে। ভেড়ার শিং মাথার উপরে পাকান। (ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শিং বোর্ডে আঁকিয়া দেখাও) এই সমস্ত জন্তুই নিরীহ। আত্ম রক্ষা করিবার জন্য ভগবান শিং দিয়াছেন। কেহ উৎপাত না করিলে ইহারা শিং দিয়া কাহাকেও আক্রমণ করে না।

দন্ত।—পশুর দাঁতের বিষয় বুঝিতে হইলে প্রথমে নিজের দাঁতের বিষয় জানা আবশুক। তোমাদের কয়পাটী দাঁত? দুই পাটী, উপরে এক পাটী আর নীচে এক পাটী। এক এক পাটীতে কয়টা করিয়া দাঁত গণিয়া দেখ। নিজের দাঁত গণিতে সুবিধা হইবে না, আর একজনের দাঁত গন। কত গুলি হইল? ২৪ টী (বা ২৬ টী কি ২৮ টী)। তোমরা যখন বড় হইবে তখন ৩২টী দাঁত হইবে। এখন তোমাদের সকল দাঁত উঠে নাই।

দাঁত গুলির আকার দেখ। উপর পাটী ও নীচের পাটীর সম্মুখের ৪টী করিয়া ৮টী দাঁত কোদালির মত চ্যাপটা ও ধারাল। এই দাঁত দিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি কাটিয়া খাই বলিয়া ইহার নাম কর্ত্তন বা ছেদন দন্ত। এই ছেদন দন্তের ডাইনে ও বামে একটী একটী করিয়া ৪টী অস্ত্র রূপ দন্ত আছে। ইহাদের আগা সরু—ইহা দ্বারা আমরা দ্রব্যাদি বিদ্ধ বা ভেদ করিতে পারি এই জন্য ইহাদের নাম ভেদন দন্ত। ভেদন দন্তকে শ্বা (কুকুর) দন্তও বলে। শ্বাপদ বা মাংসাশী জন্তুর এই দন্ত খুব বৃহৎ বলিয়া এই দন্তের নাম শ্বা দন্ত। আর মাঢ়ীর প্রান্তে ৫টী করিয়া ৪ চার প্রান্তে যে ২০টী দন্ত, তাহাদের মাথা চ্যাপটা। এই সকল দাঁতের দ্বারা আমরা খাদ্য চর্ব্বণ বা পেষণ করি সেই জন্য ইহাদিগকে পেষণ দন্ত বলে। একটা শক্ত জিনিষ (যেন এক খণ্ড সুপারী) ভাঙ্গিবার সময় আমরা কোন্ দাঁত দিয়া ভাঙ্গি?

বোর্ডে এইরূপ চিত্র অঙ্কিত কর:—

	পে ভে ছে ভে পে	মোট
উপর পাটী	৫+১+৪+১+৫	১৬
নিম্ন পাটী	৫+১+৪+১+৫	১৬

বুঝাইয়া দাও যে মানুষের দাঁত দুই পাটীতে এইরূপভাবে সাজান।

এখন অন্যান্য প্রাণীর দন্ত কিরূপ ভাবে সাজান থাকে তাহা সহজেই বুঝাইতে পারিবে। বিড়ালের দন্ত বিন্যাস এইরূপঃ—

	পে ভে ছে ভে পে	মোট
উপর পাটী	৪+১+৬+১+৪	১৬
নিম্ন পাটী	৩+১+৬+১+৩	১৪

বিড়ালের মুখ খুলিয়া দেখাও যে তাহার ভেদন দন্ত অন্যান্য দন্ত অপেক্ষা খুব বড়—খুব তীক্ষ্ণ। এই দাঁতগুলি বড় বলিয়া নীচের ভেদন দন্ত উপরের ও উপরের ভেদন দন্ত নীচের মাঢ়ীতে আসিয়া ঠেকে। এই দন্তের দ্বারাই বিড়াল মাংস ছেঁড়ে; ইঁদুর ধরিবার সময় ইহাই তাহার গায় বিঁধাইয়া দেয়। ছেদন দন্ত ১২টী খুব ধারাল। অতি সহজেই ইহার দ্বারা মাংস কাটীয়া লয়। বিড়াল চর্ব্বন দন্ত দ্বারা চিবায়না, ইহার দ্বারাও মাংস কাটে। বাঘ, সিংহ, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি মাংসভোজী জন্তুর দাঁতের এইরূপ ব্যবস্থা। তারপর দেখ, কোন জিনিষ চিবাইয়া, খাইতে হইলে নীচের চোয়ালকে উপর নীচে আর এপাশ ওপাশ নাড়াইতে হয়। আমাদের নীচের চোয়াল উপর নীচে আর এপাশে ওপাশে বেশ নড়ে কিন্তু বিড়াল কুকুরের নীচের চোয়াল উপর নীচ ভিন্ন পাশে নড়ে না। তাহাদের কোন জিনিষ চিবাইতে হয় না, মাংস কাটিয়াই গিলিয়া খায়। কুকুরকে আমরা মুড়ির চাকৃতি (বা বিস্কুট) খাইতে দিয়া ইহার পরীক্ষা করিয়াছি।

এখন গোরুর দাঁতের ব্যবস্থা দেখাও—

	পে ভে ছে ভে পে	মোট
উপর পাটী	৬+০+০+০+৬	১২
নিম্ন পাটী	৬+১+৬+১+৬	২০

গোরুর উপর মাঢ়ীতে ছেদন ও ভেদন দন্ত নাই বটে, কিন্তু এই দাঁতের পরিবর্ত্তে এক খানি খুব শক্ত মাংসের গদি আছে। গোরু ঘাস

খাইবার সময় জিহ্বা দ্বারা ঘাসের গোছা জড়াইয়া মুখে পুরিয়া দেয়, পরে উপরের গদি ও নীচের ছেদন দন্ত মধ্যে চাপিয়া ঘাসের গোছা কাটিয়া ফেলে। ছাগল, ভেড়া, হরিণ, মহিষ, উট জিরাফ প্রভৃতি যে সকল জন্তু জাবর কাটে তাহাদের দাঁতের বিন্যাস এইরূপ।

ঘোড়ার দাঁতের এইরূপ ব্যবস্থা—

	পে		ভে		ছে		ভে		পে		মোট
উপর	৭	+	১	+	৬	+	১	+	৭	=	২২
নীচ	৭	+	১	+	৬	+	১	+	৭		২২

ঘোড়ার পেষণ দাঁত ও ছেদন দাঁতের ভিতরে খানিকটা জায়গা ফাঁক আছে—এখানে কোন দন্ত নাই। এই ফাঁকের ভিতর লাগামের বিট পরাইয়া দেয়। গাধা ও জেব্রার দাঁত ঘোড়ার মত।

ইঁদুর, কাঠবিড়াল ও খরগোষের দাঁত খুব ধারাল। ইহাদের উপরের মাঢ়ীতে দুইটী ও নীচের মাঢ়ীতে দুইটী বড় বড় ছেদন দন্ত আছে। ইহাদের ছেদন দন্ত ও চর্ব্বন দন্তের মধ্যে খানিকটা ফাঁক আছে। হাঁ করিলে বোধ হয় যেন ইহাদের মুখে ৪টী মাত্রই দন্ত। (চিত্র দেখ) ইহাদের দন্তগুলি (বিশেষ ছেদন দন্ত) ঠিক বাটালির মত। কোন জিনিষ খাইবার সময় (বাটালীর দ্বারা কি ছুরি দ্বারা কাঠের উপর চাঁছিয়া দেখাও। কেমন শব্দ হয় লক্ষ্য করিতে বল) ইহারা দাঁত দিয়া কুরিয়া কুরিয়া খায়। (আমরা নারিকেল কুরিয়া খাই) এই জন্ত ইঁদুর যখন কোন জিনিষ কাটে, তখন কুটুর কুটুর শব্দ হয়।

	পে		ভে		ছে		ভে		পে	
উপর	৩	+	ফাঁক	+	২	+	ফাঁক	+	৩	ইঁদুর
নীচ	৩	+	ফাঁক	+	২	+	ফাঁক	+	৩	
উপর	৫	+	ফাঁক	+	২	+	ফাঁক	+	৫	কাঠবিড়াল
নীচ	৪	+	ফাঁক	+	২	+	ফাঁক	+	৪	
উপর	৬	+	ফাঁক	+	২	+	ফাঁক	+	৬	খরগোষ
নীচ	৪	+	ফাঁক	+	২	+	ফাঁক	+	৪	

বাদুড়ের দাঁত আছে। ইহারা দাঁত দিয়া ফল চিবাইয়া খায়। দাঁতগুলি কতকটা কুকুর শেয়ালের দাঁতের মত।

সাপের দাঁত আছে কিন্তু সে দাঁত দিয়া খাওয়ার কাজ হয় না। সাপের দাঁতগুলি মুখের ভিতরের দিকে বাঁকান। যখন বেঙ কি ইঁদুর ধরিয়া মুখের ভিতর পুরিয়া দেয়, তখন এই দাঁতে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখে। যে দাঁত দিয়া সাপ কামড়ায়—সে দাঁত দুইটী বড় বড়। তাহার ভিতর ফাঁপা। সেই দাঁতের গোড়ায় বিষের থলে থাকে। যখন কাহারও শরীরে দাঁত বসাইয়া দেয়, তখন চাপ লাগিয়া বিষের থলে হইতে বিষ বাহির হয় ও দাঁতের ছিদ্র দিয়া শরীরে প্রবেশ করে।

ঠোঁট।—পাখীর দাঁত নাই। কিন্তু তাহাদের ঠোঁটই খুব শক্ত—তাহার দ্বারাই পাখী তাহার খাবার জিনিষ ভাঙ্গিয়া নিতে পারে। পাখীর ঠোঁট নানা আকারের। যে পাখীর যেরূপ আহার, ঠোঁটও সেইরূপ আহারের উপযোগী।
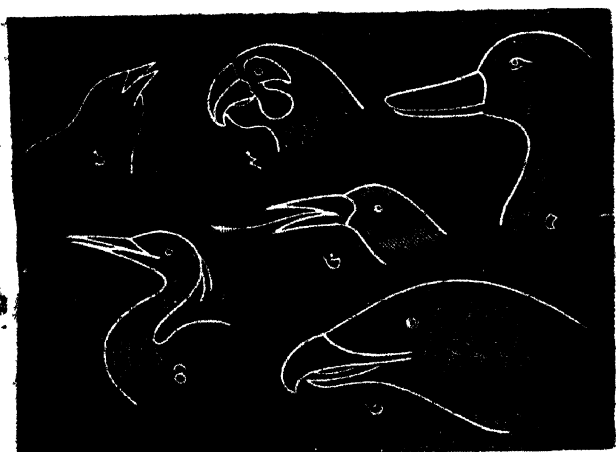
এই দেখ চিল, শকুনের ঠোঁট। ইহারা কি খায়? মাংস ছিঁড়িয়া খায়। উপরের ঠোঁট সেইজন্য বড়সীর মত বাঁকান। যেমন বড়সীতে মাছ বাধিলে সে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না (কেন পারে না জিজ্ঞাসা কর) সেইরূপ চিল যখন মাছ ধরে তখন তাহার ঠোঁট হইতেও মাছ বাহির হইয়া যাইতে পারে না। ঠোঁটের অগ্রভাগ খুব সরু আর ধারাল। এরূপ না হইলে মাংস ছিঁড়িয়া খাওয়া যায় না। পেঁচার ঠোঁটও এইরূপ। পেঁচা কি খায়? বেঙ, ইঁদুর ইত্যাদি। আবার দেখ কাকের ঠোঁট তেমন বাঁকান নয়—কারণ কাক সর্ব্বভোজী—অর্থাৎ সকল প্রকার জিনিষই খায়। কাজেই খুব বাঁকান ঠোঁট না হইলেও চলে। পায়রার ঠোঁট খুব ছোট ও সরু—পায়রাকে মাটী হইতে খুব ছোট ছোট ঘাসের ও শস্যের দানা খুঁটিয়া খাইতে হয়। কাকাতুয়ার ঠোঁট দুখানি বাঁকান—উপরের ঠোঁট লম্বা, নীচের ঠোঁট খাট। এইজন্য কাকাতুয়া ছোলার খোসা ছাড়াইয়া খাইতে পারে। বকের ঠোঁট খুব লম্বা ও সোজা কারণ তাহাকে জলে ঠোঁট ডুবাইয়া মাছ ধরিতে হয়। মাছরাঙ্গার ঠোঁট বকের ঠোঁটের মত। হাঁসের ঠোঁট চ্যাপটা—তাহাকে ঠোঁট দিয়া কাদা ঘাঁটিতে হয় (মাটি কাটিতে হইলে কোদালের দরকার হয়—কোদালের আকার চ্যাপটা) টুনীর ঠোঁট সরু বটে কিন্তু বেশ লম্বা। তাহারা এই লম্বা ঠোঁট ফুলের ভিতর চালাইয়া দিয়া মধু খায়। কাঠঠোকরার ঠোঁট খুব শক্ত ও ধারাল আর সোজা—তাহাকে কাঠ কাটিয়া পোকা বাহির করিতে হয় আর গাছে গর্ত্ত করিয়া বাসা তৈয়ারী করিতে হয়।

জিহ্বা।—আমাদের জিহ্বা কেমন? আমরা জিহ্বাকে ঈষৎ বাঁকাইয়া মধু, ক্ষীর প্রভৃতি খাইতে পারি। আমরা জিহ্বাকে মধ্যে লম্বালম্বি ভাঁজ করিতে পারি। আমাদের জিহ্বা কোমল। বিড়ালের জিহ্বা খস্‌খসে ও ধারাল। এই জিহ্বা দিয়া চাটিয়া সে হাড় হইতে মাংস ছাড়াইতে পারে। কুকুরের জিহ্বা কোমল ও সর্ব্বদা জলে টস্‌টস্ করে। জিহ্বা

দিয়াই কুকুরের ঘাম ঝরে। কুকুর যখন খুব হাঁপাইয়া আসে, তখন জিভ্ বাহির করিয়া হাঁফ ছাড়ে আর জিভ্ হইতে ঘাম পড়ে। জিরাফের জিভ্ খুব লম্বা—একহাত মত আর খুব পাতলা। এত পাতলা যে জিরাফ জিভ্ গুটাইয়া একটা চাবির ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারে। এই জিভ্ বাঁকাইয়া সে গাছের কচিকচি পাতা ছিঁড়িয়া খায়। সাপের ও বেঙের জিভের মাথা দুইখণ্ডে কাটা—জিভের মাথায় আঠার মত লালা আছে। জিভ্ বাহির করিয়া কোন পোকার গায় লাগাইয়া দিলেই ঐ আঠাতে আটকাইয়া যায়—আর মাথা কাটা বলিয়া চিমটার মত আঁকড়াইয়া ধরে। পাখীর মধ্যে কাঠঠোকরার জিভ্ আশ্চর্য্য। খুব লম্বা ও সরু—আর তাহার মাথায় এক গোছা সরু সরু চুল ও আঠা লাগান। গাছের ভিতর যে সকল ছিদ্র থাকে তাহার ভিতর জিভ্ চালাইয়া দিয়া পোকা বাহির করিয়া খায়।

হাত পায়ের কার্য্য।

আমাদিগের দুই পা। চলিবার সময় আমরা প্রথমে দক্ষিণ পদ উত্তোলন করি তারপর বাম পদ। কুকুর, বিড়াল, গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তু প্রথমে সম্মুখের বাম ও পশ্চাতের দক্ষিণ পা বাড়াইয়া দেয়, পরে সম্মুখের দক্ষিণ ও পশ্চাতের বাম পদ চালায়। (গোরু ও ঘোড়ার শয়ন ও উত্থান ভিন্ন রকমের—গোরু শুইবার সময় প্রথমে কোন পা ভাঙ্গে ? উঠিবার সময় কোন পা ?)

আমরা হাত দিয়া ধরি ও পা দিয়া চলি। পা দিয়া কোন জিনিষ ধরিতে পারি না। আমাদিগের দুই পা বলিয়া আমরা দ্বিপদ। বানর ও বনমানুষ পা দিয়াও ডালপালা ও অন্যান্য জিনিষ ধরিতে পারে। তাহাদের

চরণ, হাতের তালুর মত পাতলা ও প্রশস্ত। ইহারা দ্বিপদ নয়—কারণ ইহাদের পা নাই বলিলেই হয়। যাহাকে আমরা বানরের পা বলি, বাস্তবিক পক্ষে তাহাও হাত। এইজন্য বানর ও বনমানুষ চতুর্ভুজ জীব। বিড়ালের শরীর আন্দাজে পা খুব খাট খাট কিন্তু সরু বলিয়া বিড়াল বেশ দৌড়াইতে পারে। গোরুর পাও শরীর আন্দাজে খাট ও মোটা। গোরু বেশী দৌড়াইতে পারে না। ঘোড়ার পা লম্বা ও বেশ সরু—ঘোড়া বেশ দৌড়ায়। হরিণের পা শরীর আন্দাজে খুব সরু ও লম্বা। হরিণ খুব দৌড়াইতে পারে। না দৌড়াইতে পারিলে বনের বাঘ ও সিংহের হাত থেকে নিজকে বাঁচাইতে পারিত না। যাহারা যত বেশী দৌড়াইতে পারে তাহাদিগের পাছের পার হাঁটু তত বেশী ভাঙ্গা। গোরুর হাঁটু অপেক্ষা ঘোড়ার, আবার ঘোড়ার অপেক্ষা হরিণের পাছের পার হাঁটু বেশী ভাঙ্গা। যাহারা লাফায় তাহাদের পাছের পা দুখানি সম্মুখের পা অপেক্ষা বড় ও পাছের পার হাঁটু খুব ভাঙ্গা—যেমন বেঙ্, ক্যাঙ্গারু। হাতীর পশ্চাতের পায়ে হাঁটু অতি সামান্য ভাঙ্গা—হাতী দৌড়াইতে পারে না। ছাগল ও ঘোড়া পা গুটাইয়া অল্প স্থানের ভিতর যাতায়াত করিতে পারে। এইজন্য ঘোড়া ও ছাগল পাহাড়ের অল্প পরিসর পথ দিয়া অনায়াসে উঠিতে পারে। ঘোড়ার একখানি ক্ষুর, গোরুর ক্ষুর দ্বিখণ্ড। উ ?

আবার যাহাদের পা খাট, তাহাদের গলাও খাট। যাহাদের পা লম্বা তাহাদের গলাও লম্বা। গোরুর চেয়ে ঘোড়ার গলা লম্বা—গলা লম্বা না হইলে মাটিতে ঘাস খাইতে পারিবে না। ছাগলের গলা অপেক্ষা হরিণের গলা লম্বা। হাতীর গলা লম্বা নয় বটে কিন্তু হাতীর শুণ্ড আছে। উটের ও জিরাফের যেমন পা লম্বা তেমনি গলাও লম্বা।

যে সকল জন্তুর চার পা আছে তাহাদিগকে চতুষ্পদ জন্তু বলে কারণ ইহাদের চারখানিই পা—ইহার দ্বারা কোন জিনিষ ধরিতে পারে না।

ইঁদুর, কাঠবিড়ালী ও খরগোষ সম্মুখের পা দুইখানি দিয়া খাবার জিনিষ ধরিয়া খায়। ইহাদের সম্মুখের পা—হাতেরও কাজ করে।

পাখীর পা।

পাখীর ভিতরেও—যে পাখীর পা লম্বা, সে পাখীর গলাও লম্বা। বক ও হাড়গিলা দেখিলেই বুঝিবে। ইহারা জলে নামিয়া মাছ ধরিয়া খায়—পা লম্বা না হইলে জলে নামিতে পারিত না। আবার পা লম্বা বলিয়া গলাও লম্বা হওয়া আবশ্যক—তাহা না হইলে জলের নীচে কি মাটীতে যে খাবার জিনিষ থাকে, তাহা ধরিতে পারিত না। বক জলে সাঁতরাইয়া মাছ ধরিতে পারে না। জলের ভিতর নামিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যদি সাঁতরাইতে পারিত, তবে পা খাট হইলেও চলিত। পায়রার পা খাট খাট—পায়রার গলাও খাট কিন্তু মুরগীর পা পায়রার পা অপেক্ষা (অবশ্য শরীর আন্দাজে) বড়—মুরগীর গলাও অপেক্ষাকৃত লম্বা।

পাখীর পায়ের আঙ্গুল ও নখগুলির বিশেষত্ব আছে। একটা মুরগী ধরিয়া আন (অবশ্য আপত্তি না থাকিলে) মুরগীর পায়ের আঙ্গুলগুলি কেমন দেখাও (বা বোর্ডে চিত্রাঙ্কণ করিয়া দেখাও) পায়ের সম্মুখে তিনটী আঙ্গুল—মাঝের আঙ্গুল বড় (আমাদেরও মাঝের আঙ্গুল বড়) আর পাশে একটা ছোট আঙ্গুল—আমাদের বুড়া আঙ্গুলের মত। প্রত্যেক আঙ্গুলের মাথায় ঈষৎ বক্র নখ আছে; নখের মাথা সূক্ষ্ম নয়। ইহার দ্বারা মুরগী মাটী আঁচড়াইয়া শস্যের দানা ও পোকা বাহির করে। পায়রাও মাটী আঁচড়াইয়া থাকে। মাটী আঁচড়ায় অর্থাৎ (ভাল কথায়) আচ্ছুরণ করে বলিয়া এইরূপ পাখীকে আচ্ছুরক বলে। ময়ুর ও পেরু এই জাতীয়। শালিক, ময়না, চড়ুই প্রভৃতি অনেক পাখীর পার সম্মুখে তিনটী ও পশ্চাতে একটী আঙ্গুল। এ সকল পাখী ডালে বা দাঁড়ে বসিয়া ঘুমায়। ডালের উপর বসিলেই শরীরের চাপে পায়ের আঙ্গুল গুলি বেঁকিয়া ডাল জড়াইয়া ধরে। সুতরাং ঘুমাইবার সময় পাখী ডাল হইতে পড়িয়া যায় না। শালিক, টুনী, মাছরাঙ্গা, কাক, ময়না, চড়ুই মাটীর উপর উত্তমরূপে হাঁটিতে পারে না—তাড়াতাড়ি চলিতে হইলে লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। যে সকল পাখী এইরূপ দাঁড়ে বসে তাহাদিগকে দণ্ডোপবেশক বলে। কাকাতুয়া, কাঠঠোকরা ও টিয়ার আঙ্গুল—সম্মুখে দুইটী পশ্চাতে দুইটী। ইহারা মাটীতে হাঁটিতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করে। এইরূপ আঙ্গুলের দ্বারা বৃক্ষাদি আরোহন করা সুবিধাজনক। সেই জন্য এইরূপ আঙ্গুল বিশিষ্ট পাখীকে আরোহক বলে। তারপর চিল, বাজ, পেঁচা, শকুন ও ঈগলপক্ষীর আঙ্গুলগুলি বেশ শক্ত ও বক্র এবং নখ খুব তীক্ষ্ণ ও বক্র। ইহাদের পায়ে সম্মুখে বড় বড় তিনটী আঙ্গুল ও পাশেও একটী বড় আঙ্গুল। বড়সীর মত বক্র নখ না হইলে শীকার ধরিয়া রাখিবার সুবিধা হয় না। ইহাদের ঠোঁটও বক্র। অন্য প্রাণীকে আখেটন অর্থাৎ শীকার করে বলিয়া ইহাদিগকে আখেটক পাখী বলে। সাধারণ

নাম শীকারী পাখী। হাঁসের পা দেখ—সম্মুখে তিনটী আঙ্গুল—একখানি পাতলা চামড়ার দ্বারা জোড়া লাগান—আর পাশে একটী ছোট আঙ্গুল। হাঁস ভালরূপ হাঁটিতে পারে না বটে কিন্তু খুব সাঁতরাইতে পারে। নখ এইরূপ জোড়া থাকাতে জল ঠেলিয়া সাঁতরাইবার বেশ সুবিধা হয়। তোমরা সাঁতরাইবার সময় হাতের আঙ্গুল ফাঁক করিয়া জল ঠেল—না আঙ্গুলগুলি একত্র করিয়া জল ঠেল? হাঁস সন্তরক।

বকের পা খুব লম্বা আর আঙ্গুলগুলিও লম্বা এবং চ্যাপ্টা। আঙ্গুল চ্যাপ্টা বলিয়া কাদায় বসিয়া পড়ে না। সারস ও পানকৌড়ের পা এইরূপ। ইহারা জল ও কাদা উদঘাটন (সরাইয়া) করিয়া চলে বলিয়া ইহাদিগকে উদঘাটক বলে। (উটের আঙ্গুল ও নখ চ্যাপ্টা বলিয়া বালির ভিতর বসিয়া পড়ে না।)

উটপাখী (অসট্রিস্) মাটীর উপর দৌড়ায়। উটপাখীর উপর মানুষ চড়িয়া বেড়ায়। উটপাখীর পা বেশ মোটা (অন্য পাখীর তুলনায়) ও শক্ত। প্রত্যেক পায় আঙ্গুল মাত্র দুইটী—সম্মুখের আঙ্গুলটী খুব বড় ও মোটা—মাথায় একটা ভোঁতা নখ। পাশের আঙ্গুল ছোট তাহাতে নখ নাই। আঙ্গুলগুলি কতকটা ক্ষুরের মত বলিলেও হয়। যে সকল পাখী মাটীর উপর দৌড়ায়—উড়িতে পারে না, তাহাদিগকে ধাবক বলে। সামোরগও এই শ্রেণীর পাখী।

এখন বোর্ডে পাখীর শ্রেণী লিখিয়া দাও ও কোন্ পাখী কোন্ শ্রেণী-ভুক্ত তাহা বালকগণকে লিখিতে বল।

(১) আচ্ছুরক—মোরগ, পেরু, ময়ূর, পায়রা।

(২) দণ্ডোপবেশক—চটক, কাক, টুনি, শ্যামা, মাছরাঙ্গা।

(৩) আরোহক—কাকাতুয়া, কাঠঠোকরা, টিয়া।

(৪) আখেটক—পেচক, বাজ, চিল, শকুন (আখেটক=শিকারী)

(৫) সন্তরক—হাঁস।

(৬) উদ্ঘাটক—বক, পানকৌড়, সারস, কাদাখোঁচা।

(৭) ধাবক—উটপাখী, সামোরগ।

পাখীর পাখা।—আমাদের দুইখানি হাত ও দুখানি পা, বানরের চারখানিই হাত, গোরুর চারখানিই পা; পাখীর দুইখানি পা আর দুইখানি ডানা বা পাখা। এই ডানার সঙ্গে আমাদের বাহুর তুলনা করিতে পারি। দেখ, আমাদের বাহু কাঁধের সঙ্গে কবজার দ্বারা লাগান—পাখীর পাখাও তাহার কাঁধে (অর্থাৎ গলার নীচের অংশে) লাগান। আমাদের বাহুতে যেমন তিন ভাগ—প্রগণ্ড (অর্থাৎ কাঁধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত), প্রকোষ্ঠ (কনুই হইতে কব্জি পর্য্যন্ত) ও হস্ত বা কর, পাখীর ডানাতেও এই তিন অংশ আছে। (চিত্র দেখাও বা সুবিধা হইলে পাখীর পাখা দেখাও)।

ময়ুর।
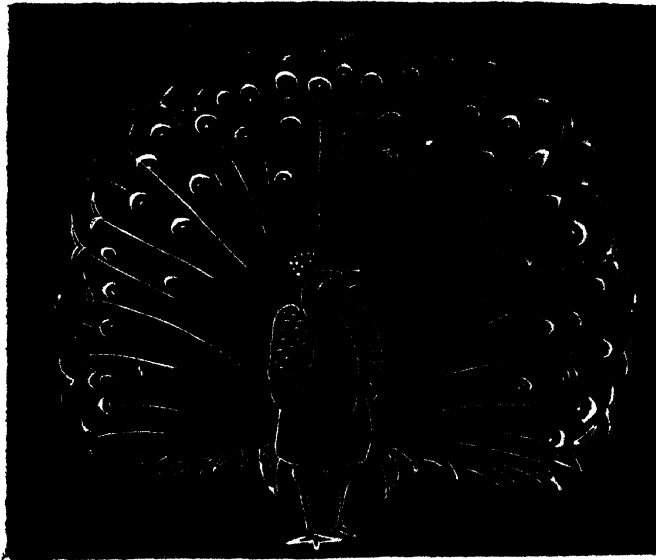
কুইল বা কলম পালকগুলি এই বাহুতে লাগান। আবার দেখ হস্ত বা কর সংলগ্ন পালকগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। গণিয়া দেখ (১০টী); তারপর প্রকোষ্ঠে কয়টী পালক গণনা কর (১৪।১৫টী) এই পালকগুলি কর পালক অপেক্ষা ছোট। তারপর প্রগণ্ডের অংশ পরীক্ষা কর। পালকগুলি খুব হালকা কিন্তু শক্ত ও স্থিতিস্থাপক। পালক ভারী হইলে পাখী উড়িতে পারিত না।

পালক সাধারণতঃ তিন রকমের (১) কলম বা পাখার পালক—পাখা ও পুচ্ছে থাকে! হাঁস ও ময়ূরের এই সমস্ত পালকের কলম দিয়া আমরা লিখিয়া থাকি। তাহাকে পেন কলমও বলে। (২) পিঠের পালক—পাখার পালক অপেক্ষা ক্ষুদ্র। এই পালকের দ্বারা পাখীর দেহ আবৃত থাকে। (৩) পেটের পালক—খুব কোমল ও নরম ছোট ছোট পালকগুলি। (জিনিষ দেখাও বা ছবি আঁকিয়া দেখাও)।

পাখীর পালকের বিচিত্র বর্ণের কথা উল্লেখ কর। পালকের অগ্রভাগ বা পাশেই বর্ণ বিচিত্রতা দেখিতে পাওয়া যায়। পাখীর পালকের সহিত গাছের পাতার তুলনা কর—পাতায় যেমন একটী মধ্য শির আছে, পালকেও সেইরূপ কলম। আবার পাতার মধ্য শিরের দুই পাশে যেমন অর্দ্ধপত্র, কলমের দুইধারেও সেইরূপ অর্দ্ধপালক (আঁকিয়া দেখাও)।

প্রাণীর শ্রেণী বিভাগ।

প্রাণীর মধ্যে মানুষই সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। মানুষের যে পরিমাণ বুদ্ধি আছে, অন্য কোন প্রাণীর তাহা নাই। এই জন্য মানুষ সকল জীবের উপরই কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে।

প্রাণী সমূহকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) দণ্ডী (২) নির্দ্দণ্ডী। যাহাদিগের মেরুদণ্ড বা নীলদাঁড়া আছে তাহারা দণ্ডী, আর যাহাদের মেরুদণ্ড নাই তাহারা নির্দ্দণ্ডী। তোমার নিজের পিঠে হাত দিয়া

দেখ, মাথার নীচ হইতে পিঠের মধ্য দিয়া কোমর পর্য্যন্ত যে একটা লম্বা হাড় দেখিতে পাও তাহাকেই মেরুদণ্ড বলে। এই মেরুদণ্ডই আমাদিগকে খাড়া করিয়া রাখিতে পারে। বানরের মেরুদণ্ড আছে বটে কিন্তু আমাদের মত সোজা নয়—একটু বেঁকা, তাই বানর ও বনমানুষ একটু সাম্‌নে ঝুঁকিয়া চলে; মেরুদণ্ড একটু তেড়া। গোরু, কুকুর, বিড়ালের মেরুদণ্ড খাড়া নয়, পড়া (ভূসমান্তর)। পাখীর, সাপের, মাছেরও মেরুদণ্ড আছে (চিত্র দেখাও)।

এখন এই দণ্ডী প্রাণীর মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে, যথা :—

(১) স্তন্যপায়ী—যে সকল প্রাণীর বাচ্চা হয় আর বাচ্চা মার দুধ অর্থাৎ স্তন পান করে। এই সকল প্রাণীর রক্ত গরম, আর গায় অল্প-বিস্তর লোম থাকে। স্তন্যপায়ীর মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে :—

(ক) দ্বিভুজ—মানুষ

(খ) চতুর্ভুজ—বানর, বনমানুষ

(গ) মাংসাশী—বাঘ, তিমি, ভালুক

(ঘ) রোমন্থনকারী—গোরু, ছাগল

(ঙ) স্থূলচর্ম্মী—হাতী, শূকর
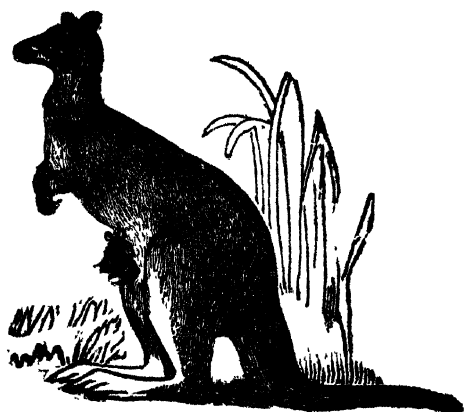
(চ) দন্তুর—ইঁদুর, খরগোষ

ক্যাঙ্গারু।

(ছ) দ্বিগর্ভ—ক্যাঙ্গারু

(২) খেচর (আকাশে চরে যে অর্থাৎ পাখী)।—ইহাদেরও রক্ত গরম। বাচ্চা হয় না—ডিম হয়। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। বাচ্চা

মায় দুধ খায় না। গা পালকে ঢাকা। পাখীরও ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে—যথা :—

(ক) আচ্ছুরক (মাটী আঁচড়ায়)—মোরগ, ময়ুর

(খ) দণ্ডোপবেশক—চটক, কাক

(গ) আরোহক—কাকাতুয়া, কাটঠোকরা

(ঘ) আখেটক—পেচক, চিল

(ঙ) সন্তরক—হাঁস

(চ) উদঘাটক—বক, সারস

(ছ) ধাবক—উটপাখী, সামোরগ

(৩) সরীসৃপ (যাহারা বুকে হাঁটে)। ইহাদের রক্ত ঠাণ্ডা। ডিম হয়। গায় খোলস বা খোলা থাকে। ইহাদের জাতি—

(ক) সর্পজাতি (গায় খোলস)

(খ) কুম্ভীরজাতি (গায় আঁইস)

(গ) কচ্ছপজাতি (গায় খোলা)

(৪) উভচর—জলে ও স্থলে বাস করে। রক্ত ঠাণ্ডা। যেমন বেঙ্।

(৫) মৎস্য—রক্ত ঠাণ্ডা। জলে বাস।

আবার নির্দ্দণ্ডী জীবেরও নানা শ্রেণী আছে। নির্দ্দণ্ডী জীবের গায় হাড় নাই। এই যে অসংখ্য কীট পতঙ্গ জলে স্থলে শূন্যে বিচরণ করে সমস্তই এই শ্রেণীভুক্ত।

(১) কোমলদেহী—(ক) শামুক (একখণ্ড খোলার মধ্যে কোমল দেহ)

(খ) ঝিনুক (দুই খণ্ড খোলার মধ্যে কোমল দেহ)

(২) গ্রন্থিপদ—(ক) পতঙ্গ (তিন জোড়া পা, তিন খণ্ডে শরীর, পক্ষ বিশিষ্ট)

(খ) মাকড়সা (চার জোড়া পা, দুই খণ্ডে শরীর)

(গ) কর্কট (৫ জোড়া পা, শরীরে নানারূপ খণ্ড)।

(ঘ) কেন্নো (অনেক পা, অনেক খণ্ড, শরীরে মাথা ও ধড় আছে, পাখা নাই)।

(৩) কীট—জোঁক, কেঁছো প্রভৃতি (অঙ্গুরীয়ক খণ্ডে শরীরের গঠন)।

(৪) পিণ্ডজীব—অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিহীন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব।

বোর্ডে এইরূপ ভাবে প্রাণীবিভাগ আঁকিয়া দেখাও :—
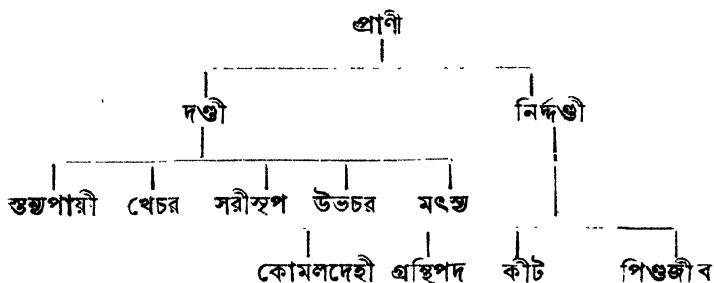
অণু।

বালকগণের হাতে এক একখণ্ড ইঁট বা চক্ দাও ও তাহাদিগকে সেই ইঁট বা চকখণ্ড খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিতে বল। কাহার খণ্ড খুব ছোট হইয়াছে ? সে খণ্ডটীকে কি আর বেশী ছোট করা যায় না ? আবার চেষ্টা করিয়া দেখ। (একটু চকে বা ইঁটে আঙ্গুল ঘষিয়া লও) এই দেখ আমার এই আঙ্গুলের মাথায় কত শত শত চকের খণ্ড লাগিয়া আছে। স্থচের দ্বারা ইহার একটী খণ্ড সরাইয়া লও। খুব ধারাল ছুরি দ্বারা ইহাকে কাট। আর কাটিতে পারা যায় ? না, আর কাটা যায় না। কেন কাটা যায় না ? এক্ে চোখে দেখা যায় না, তাতে আবার

এমন ছোট জিনিষ কাটিবার মত কোন অস্ত্রও নাই। হাঁ, ঠিক বলেছ —কিন্তু আমরা কাটিতে পারিলাম না বলিয়া একথা বলিতে পারি না যে আরও ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করা যায় না। এইরূপ ভাগ করিতে করিতে যখন আমরা এত ছোট ভাগে ভাগ করি যে আর তাহাকে ছোট করা যায় না—তখন সেই ক্ষুদ্রতম খণ্ডটাকে 'অণু' বলিয়া থাকি। সকল জিনিষই অণুদ্বারা গঠিত।

লোহার অণুগুলি খুব ঘন ঘন সাজান, আবার শোলার অণুগুলি ফাঁকে ফাঁকে সাজান। শোলার অণুর মধ্যে যে ফাঁক আছে তাহা দিয়া শোলার ভিতর জল প্রবেশ করে, কিন্তু লোহার অণুর ভিতর ফাঁক এতই ছোট ছোট যে তাহার ভিতর জলও প্রবেশ করিতে পারে না।

একটুকরা মেজেণ্টা জলে ফেলিয়া দাও। মেজেণ্টার অণুগুলি পৃথক হইয়া জলের সহিত মিশিয়া গেল। তাই সমস্ত জলই লাল হইল। একটুকরা মিশ্রি জলে ফেলিয়া দাও। মিশ্রির অণুগুলি জলের সহিত মিশিয়া গেল। এবারে চোখে দেখিয়া বুঝিতে পারিবে না। চাখিয়া দেখ, জল মিষ্টি হইয়াছে। একটুকরা কর্পূর টেবিলের উপর রাখ। জিজ্ঞাসা কর—বালকেরা কর্পূরের গন্ধ পাইতেছে কি না? এই কর্পূরের অণুগুলি বায়ুতে উড়িয়া বেড়ায়। সেই বায়ু আমাদের নাকে লাগিলেই গন্ধ টের পাই। গাছে কেয়া কি চাঁপা ফুল ফুটিলে আমরা গন্ধেই বুঝিতে পারি। ফুলের ভিতর যে সুগন্ধি পদার্থ থাকে তাহার সমস্ত অণুগুলি উড়িয়া বাতাসে মিশিয়া যায়। এই মিশ্রিত বাতাস আমাদের নাকে লাগিলে আমরা সেই ফুলের গন্ধ পাই।

ইঁট, কাঠ, লোহা, পাথর প্রভৃতির অণুগুলির মধ্যে খুব টান বা আকর্ষণ আছে। একখানি কাঠ বা ইঁট ভাঙ্গিতে বল। দেখ, ভাঙ্গিতে কত জোর লাগিল; কিন্তু জলের কি দুধের ভিতর হাত দাও—হাত সহজেই ঢুকিয়া যাইবে। কেন? জলের অণুগুলির মধ্যে তেমন টান

বা আকর্ষণ নাই। ইঁট কি কাঠের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিতে পার না—কারণ ইঁট কাঠ প্রভৃতি জিনিষের অণুগুলির মধ্যে খুব আকর্ষণ। কিন্তু জলীয় পদার্থের অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ অতি সামান্য। আবার দেখ ধোঁয়ার অণুর মধ্যে আকর্ষণ একবারেই নাই। একটা হাঁড়ির মধ্যে ধোঁয়া দিয়া কাগজের দ্বারা হাঁড়ির মুখ বাঁধিয়া রাখ। যতক্ষণ হাঁড়ির মুখ বাঁধা থাকিবে ততক্ষণ হাঁড়ির ভিতর ধোঁয়া থাকিবে—মুখ খুলিয়া দাও, হাঁড়ি থেকে ধোঁয়া উড়িয়া যাইবে।

দ্রবণ, মিলন, মিশ্রণ।

একটা পিতলের বাটিতে লাক্ষা বা চাচ রাখিয়া আগুনের উপর ধর। আগুনে চাচ গলিয়া তরল হইবে। আবার একটু ঠাণ্ডা হইতে দাও—চাচ জমিয়া শক্ত হইবে। গন্ধক ও ফিটকারী দিয়াও এই পরীক্ষা দেখাইতে পার। একটু মাখন সংগ্রহ কর—তাপ দাও গলিয়া যাইবে। ঠাণ্ডা কর জমিয়া যাইবে। একটু সীসা আন। একখানি হাতায় করিয়া তাপ দাও—অল্পক্ষণ পরেই গলিয়া যাইবে। তাপ দিলে সকল জিনিষই গলিয়া যায়। তবে জিনিষ অনুসারে অল্প বা বেশী তাপ লাগে। সামান্য রৌদ্রের তাপেই মাখন গলিয়া যায়, সীসা গলাইতে আগুনের সাধারণ তাপ লাগে কিন্তু লোহা গলাইতে খুব বেশী তাপ লাগে। এইরূপ তাপে গলিয়া যাওয়াকে গলা বা দ্রবণ বলে।

তিন চারিটী ছোট ছোট বাটি আন। বাটির ভিতর পরিষ্কৃত জল দাও। এক বাটিতে একটু মিশ্রি, একটীতে একটু লবণ ও আর একটীতে একটু ফিটকারী দাও। মিশ্রি, লবণ ও ফিটকারী জলে মিলাইয়া গেল। জল দেখিয়া বুঝিবার যো নাই। চাখিয়া পরীক্ষা করিতে পার। এইরূপ মিলিয়া যাওয়াকে মিলন বলে। আবার জল ও চিনি যদি পৃথক

করিতে চাও তবে ছাঁকিয়া পৃথক করিতে পারিবে না। চিনি ও বালি মিশাইয়া দাও। কেমন করিয়া চিনি পৃথক করিবে? জল ঢালিয়া দাও—চিনি জলে মিলাইয়া গেল কিন্তু বালি মিলাইবে না। এখন এই জল কাপড়ে ছাঁকিয়া লও। বালি কাপড়ে বাধিয়া থাকিবে কিন্তু চিনি মিশ্রিত জল কাপড়ের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। এখন যদি চিনি আর জল পৃথক করিতে চাও, তবে চিনিমিশ্রিত জল জ্বাল দাও। জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, চিনি পড়িয়া থাকিবে। যে সকল জিনিষ জলে ফেলিয়া দিলে মিলাইয়া যায় তাহাদের নাম কর। জলে চক্ মিশায় না। কাদাও জলে মিশায় না। চক্‌মিশ্রিত কি কাদামিশ্রিত জল ছাঁকিয়া লইলে কি ফিলটার করিয়া লইলে জল বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়। এই-রূপ মিশিয়া যাওয়াকে মিশ্রণ বলে।

যদি একাধিক জিনিষ মিশাইলে এমন একটা পদার্থের সৃষ্টি হয় যে, তাহাতে ঐ উপকরণগুলির কোন গুণই না থাকে তবে সেই মিলনকে রাসায়নিক মিলন বা পরিবর্ত্তন বলে। যেমন হলুদ আর চূণ মিশাইলে লালবর্ণের একটা পদার্থ হয়। কিন্তু রঙের নিয়মানুসারে সাদা রঙের মধ্যে হলুদ রঙ দিলে খুব পাতলা হলুদ হইয়া থাকে। চূণ আর মধুতে মিলাইলেও রাসায়নিক মিশ্রণ হইয়া থাকে। মিশ্রিত পদার্থে চূণের কি মধুর কোন গুণই থাকে না। পিতলের বাটিতে অম্ল রাখিলে তিতা হইয়া উঠে। এ সমস্ত রসায়নিক মিশ্রণ। সিন্দুর রাসায়নিক মিশ্রণ—গন্ধক ও পারা মিশ্রিত করিয়া খুব উত্তাপ দিলে সিন্দুর প্রস্তুত হয়। একখান হাতার উপরে যদি সিন্দুর ও চুলার ছাই বা চূণ একত্র করিয়া গরম কর ও সেই হাতার উপর একটী ঠাণ্ডা সরা চাপা দেও, তবে দেখিতে পাইবে যে সরার গায়ে পারার দানা লাগিয়া গিয়াছে। উত্তাপে পুনরায় পারা পৃথক হইবে।

ভার।

একটী বালকের হাতে একখানি ছোট পুস্তক দাও। জিজ্ঞাসা কর—তুমি পুস্তকখানি হাতে করিয়া রাখিতে পারিতেছ? এবারে একখানি আস্ত ইঁট হাতের উপর দাও। এখন কি ইঁটখানি হাতে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছ? কেন পারিতেছ না? কিরূপ বোধ হইতেছে? হাত নীচের দিকে যাইতে চাহিতেছে—ইঁটখানি পড়িতে চাহিতেছে। ইঁটখানি টেবিলের উপর রাখ। এবারেও কি ইঁট পড়িয়া যাইতে চাহিতেছে? না, টেবিলের উপর ঠিক হইয়া আছে। হাঁ, তোমার হাতের উপর ইঁটের যে চাপ ইহাকেই ইঁটের ভার বলে। পুস্তকের চাপ কম, ইঁটের চাপ বেশী। সেই জন্য পুস্তক অপেক্ষা ইঁট বেশী ভারী। টেবিল ইঁটের চাপকে বাধা দিতে পারিল কিন্তু তোমার হাত পারিল না। চাপকে বাধা দিবার শক্তিও আবার ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের ভিন্ন ভিন্ন রকম। একখানি কাগজ ইঁটের চাপ সহ্য করিতে পারিবে না।

আবার দেখ সকল জিনিষই নীচের দিকে পড়ে। আম, জাম, নারিকেল পাকিলে মাটীতে পড়িয়া যায়। উপরের দিকে ঢিল ছুড়িলে, সেই ঢিলটাও শেষে মাটীতেই পড়ে। তুমি লাফ দিয়া উপরে উঠিলে, কিন্তু আবার নীচেই পড়িলে। সকল জিনিষকেই মাটীতে টানিয়া আনে। পৃথিবী সকল জিনিষকে আকর্ষণ করে।

তোমরা পৃথিবীর আকার কেমন জান? পৃথিবী গোলাকার। এখন একটা গোলক দেখাও ও তাহার সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণ বুঝাইতে চেষ্টা কর। ভারতবর্ষ দেখাও। ভারতবর্ষের ঠিক বিপরীত দিকের দেশ (উত্তর আমেরিকা) দেখাও। জিজ্ঞাসা কর—

আচ্ছা, তোমার হাতের ইঁটখানি যেন মাটীতে পড়িয়া গেল, যে বালক আমেরিকার স্কুলে এইরূপ হাত হইতে ইঁট ফেলিয়া দিয়াছে, তাহার

ইট কোথায় পড়িল? তাহার ইঁটও মাটীতেই পড়িল। তাই দেখ উপর নীচ কথার অর্থ—মাথার দিকে বা পার দিকে। পৃথিবী অনন্ত আকাশে ভাসিতেছে—সেখানে উপরও নাই, নীচও নাই।

এই কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য বোর্ডে একটী বৃত্ত আঁক। এইটী যেন আমাদের পৃথিবী। মনে কর ভারতবর্ষে একজন লোক আকাশে উঠিয়া (বেলুনে বা এরোপ্লেনে) একটা ঢিল ফেলিল—ঢিল কোথায় পড়িবে? পৃথিবীর উপর। আবার যদি আর একজন আমেরিকার লোক আকাশে উঠিয়া ঢিল ফেলে, তবে সেটী কোথায় পড়িবে? এই পৃথিবীতেই। তবেই দেখ দুই দিকের দুইটী ঢিল একমুখেই ছুটিতেছে। এখন যদি আমরা মাটী কাটিয়া ক্রমাগত গর্ত্ত করিয়া দিতে পারি তবে ঢিল দুইটা কোথায় পৌঁছিবে। উভয় দিক হইতে আসিয়া মধ্যস্থান বা কেন্দ্রে মিলিত হইবে। এই যে সমস্ত দ্রব্যকেই পৃথিবী তাহার মধ্যের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, ইহাকেই বলে মাধ্যাকর্ষণ।

জিনিষের ভারের অর্থ পৃথিবীর এই আকর্ষণ। সমান আয়তনের
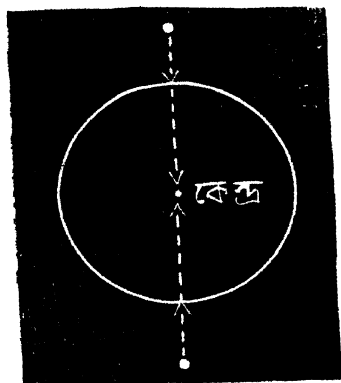
লোহা ও কাঠের মধ্যে—লোহাতে অনেক অণু আছে বলিয়া পৃথিবী লোহাকে খুব জোরে টানে, আর কাঠে কম অণু আছে বলিয়া কাঠকে অপেক্ষাকৃত কম জোরে টানে।

বালকগণ বুঝিতে পারিল কি না তাহা নিম্নলিখিত প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা কর:—

(১) লোহা অপেক্ষা কাঠ ভারী—একথার অর্থ কি?

(২) জলে পাথর ডোবে কেন, আর কাঠ ভাসে কেন?

চূণ।

শ্রেণী—৪র্থ মান। সময়—৩০ মিনিট।

উপকরণ—চুণাপাথর পাহাড়ের ছবি, একখণ্ড চূণাপাথর, একখণ্ড চাখড়ি, একখণ্ড পাথুরে চূণ, সামুক, ঝিনুক, জল, ব্ল্যাকবোর্ড ও চক, আসামের বা ভারতবর্ষের মানচিত্র।

উদ্দেশ্য।—চুণাপাথর পরিচয়, (চুণাপাথরের উপর ছোট ছোট সামুক, ঝিনুক প্রভৃতির উত্তম চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়) চূণের ব্যবহার, চুণাপাথর কোথায় পাওয়া যায়—এই সকল বিষয় শিক্ষা।

পূর্ব্বজ্ঞান।—বালকেরা মানচিত্র দেখিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছে; পানে খাইবার চূণ দেখিয়াছে।

পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ।	শিক্ষনীয় বিষয়।
১। নিকটে যদি কোন পাহাড় থাকে তবে তাহাই উল্লেখ করিয়া চুণাপাথর পাহাড়ের কথা আরম্ভ করিতে হইবে। চুণাপাথর পাহাড়ের ছবি দেখাইতে হইবে। একখণ্ড চুণাপাথর দেখাইতে হইবে। যে জেলায় চুণাপাথর পাহাড় আছে তাহা মানচিত্রে দেখাইতে হইবে। ব্ল্যাকবোর্ডে চুণাপাথর পাহাড়ের চিত্র আঁকিতে হইবে।	১। চুণাপাথরের রঙ্ মেটে মেটে। পাহাড়ের রঙও এইরূপ। শ্রীহট্ট (সিলেট) জেলার ছাতক পরগণায় চুণাপাথরের পাহাড় আছে। এই জন্যই সিলেটী চুণ নাম। এই পাহাড় খাসিয়া জয়ন্তিয়া-পাহাড়ের অংশ বিশেষ।

পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ।	শিক্ষনীয় বিষয়।
২। একখণ্ড চূণাপাথর ও একখণ্ড চাখড়ি তুলনা করা হইবে। (যদি শিক্ষক একটু হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে চূণাপাথর ও চাখড়ির উপর ঐ এসিডের ২।৪ ফোঁটা ঢালিয়া কি ফল হয় তাহা দেখাইতে পারেন।)	২। চূণাপাথরের রঙ্ মেটে। চাখড়ির রঙ সাদা। চাখড়ি দিয়া বোর্ডে লেখা যায়, চূণাপাথর দিয়া লেখা যায় না। (চূণাপাথর ও চাখড়ির উপর এসিড্ ঢালিয়া দিলে উভয় পদার্থের উপরই বুদ্বুদ উঠে।)
৩। চূণাপাথর ও পাথুরে চূণ দেখাইতে হইবে। চূণাপাথর হইতে কেমন করিয়া পাথুরে চূণ পাওয়া যায় তাহা বলিয়া দিতে হইবে। উভয় দ্রব্যের উপর জল ঢালিয়া দেখাইতে হইবে। (পাথুরে চূণ ও চাখড়ি দেখিতে প্রায় এক রকম)	৩। চূণাপাথর খুব শক্ত ও মেটে রঙের, পাথুরে চূণ নরম ও সাদা রঙের। চূণাপাথর পোড়াইলে পাথুরে চূণ হয়। পাথুরে চূণের উপর জল ঢালিয়া দিলে খুব উত্তাপ বাহির হয়, চূণাপাথরে জল ঢালিলে কিছুই হয় না। পাথুরে চূণে জল ঢালিলে পাথর গুঁড়া হইয়া কলিচূণ হয়।
৪। ঝিনুক, সামুক দেখাইতে হইবে। আগুনে পোড়াইলে গুঁড়া চূণ হয়। তাহার উপর জল ঢালিয়া দেখাইতে হইবে। চূণাপাথর নানারূপ ঝিনুক ও সামুকের পিণ্ড মাত্র। চূণাপাথরের গায় যে নানারূপ ঝিনুক ও সামুকের চিহ্ন আছে, তাহা দেখাও।	৪। ঝিনুক, সামুক পোড়াইলে গুঁড়া চূণ হয়। এই গুঁড়া চূণের উপর জল ঢালিলেও খুব উত্তাপ বাহির হয়। এই গুঁড়া চূণ হইতে কলিচূণ হয়। চূণকামের পক্ষে এই চূণই উত্তম।

পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ।	শিক্ষনীয় বিষয়।
৫। ব্যবহারের কথা।—বালির সহিত চূণ ও জল মিশাইয়া দেখাও। (অনেকক্ষণ চূণের ভিতর হাত দিয়া থাকিলে হাত জ্বালা করে, পানের সহিত বেশী চূণ খাইলে জিভ্ জ্বালা করে।)	৫। চূণাপাথর দিয়া রাস্তা বাঁধা যায়, পাথুরে চূণ জমিতে দেয়,—উত্তম সার। কলিচূণ—সুড়কী বা বালির সহিত মিলাইয়া ইঁটের বাঁধ দেয় ও আস্তর করে। কলিচূণ পানের সঙ্গে খায়।

ব্ল্যাকবোর্ডে এই সকল কথা লিখিতে হইবে ও এই চিত্র আঁকিতে হইবে।

শ্রীহট্ট জেলায় চূণাপাথরের পাহাড় আছে। চাখড়িও এক রকমের চূণাপাথর; সামুক, ঝিনুক হইতেও চূণ হয়। চূণাপাথর পোড়াইলে পাথুরে চূণ হয়। সামুক, ঝিনুক পোড়াইলে গুঁড়া চূণ হয়। পাথুরে চূণ ও গুঁড়া চূণে জল ঢালিয়া দিলে কলিচূণ হয়। সুড়কী অথবা বালির সহিত চূণ মিলাইয়া ইঁট গাথে।

চূণাপাথর। চূণাপাথরের পাহাড়।

কয়লা।

উপকরণ—পাথুরে কয়লা, কোক কয়লা, কাঠ কয়লা, জল, গামলা, আগুণের গামলা, বালি, মাটী, গেলাস, ঘোলা কেরোসিন, প্যারাফিনের বাতি, ম্যাজেন্টা, মদ ইত্যাদি।

একখানি পাথুরে কয়লা দেখাইয়া—এই জিনিষটী কি? এর নাম পাথুরে কয়লা। একখানি কাঠপোড়া কয়লা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা কর—এর নাম কি? কাঠ কয়লা। এটাকে পাথুরে কয়লা কেন বলে জান? এটা পাথরের মত শক্ত ও চাপবাঁধা, আর এটা মাটীর নীচে পাওয়া যায় বলিয়া। কাঠ কয়লা কেন বলে? কাঠ পোড়াইয়া এই কয়লা হয়, সেই জন্য। কয়লা দুখানির রঙ দেখ। পাথুরে কয়লা খুব চক্‌চকে কাল, আর কাঠ কয়লা খস্‌খসে কাল। কোন্‌টী ভারী ও কোনটী হাল্‌কা? পাথুরে কয়লা ভারী—জলে ডোবে, কাঠ কয়লা হাল্‌কা—জলে ভাসে।

তারপর দেখ, পাথুরে কয়লা কেমন স্তরে স্তরে সাজান, কিন্তু কাঠ কয়লায় স্তর নাই। কাঠ কয়লা অপেক্ষা পাথুরে কয়লা শক্ত। কিন্তু সামান্য আঘাতে দুই কয়লাই ভাঙ্গিয়া যায়। দুই কয়লাই ঠুন্‌ক বা ভঙ্গুর।

চিমটায় ধরিয়া দুই রকম কয়লায় আগুন দিয়া দেখাও। দুই রকম কয়লা থেকেই ধোঁয়া ওঠে। পাথুরে কয়লার ধোঁয়া খুব ঘন। পাথুরে কয়লা ধরাইতে দেরী হয়, কাঠ কয়লা শীঘ্র ধরে। আবার ধরিলে পাথুরে কয়লার আগুনে যত তেজ হয়, কাঠ কয়লার তত হয় না।

পাথুরে কয়লা মাটীর নীচে পাওয়া যায়। মাটীর নীচে পাথুরে কয়লার খনি আছে। রাণীগঞ্জ, ঝোরিয়া ও ডিব্রুগড়ে (মানচিত্রে দেখাও) পাথুরে কয়লার খনি থেকে কয়লা তোলা হইয়া থাকে।

কয়লার খনি কেমন তাহার বর্ণনা কর। একটা কাচের গেলাস লও। গেলাসের নীচে এক স্তর মোটা বালি সাজাও। তাহার উপর পাথুরে

কয়লার গুঁড়া দিয়া আর এক স্তর কর। তার উপর আবার এক স্তর মাটী দাও। তাহার উপর আবার সরু বালির স্তর কর। ইহার উপর আর এক থাক পাথুরে কয়লার গুঁড়া দাও—এই স্তরটী যেন পূর্ব্বের পাথুরে কয়লার স্তর হইতে পুরু হয়। ইহার উপর আবার বালির ও মাটীর পুরু স্তর করিয়া ঢাকিয়া দাও। তাহার উপর গাছের ছোট ছোট ডাল পুঁতিয়া দাও। এই উপরের স্তর হইল মাটীর উপরের ভাগ। এখন উপর হইতে কেমন করিয়া নীচের পাথুরে কয়লা বাহির করিতে হইবে তাহা জিজ্ঞাসা কর। প্রথমে মাটী খুঁড়িয়া খুব বড় এক গর্ত্ত করিতে হয়। সেই গর্ত্তের মধ্যে লোক নামে (যেমন কুয়ার মধ্যে লোক নামে)। নীচে গিয়া কয়লা কাটিয়া ঝুড়িতে উঠায়। ঐ ঝুড়িতে দড়ি বাঁধা থাকে। উপর হইতে অন্য লোকে কলের সাহায্যে ঐ সকল ঝুড়ি উঠাইয়া কয়লা ঢালিয়া রাখে। গর্ত্তের নীচ হইতে সুড়ঙ্গ কাটিয়া চারিদিকের কয়লা বাহির করে। নীচে খুব অন্ধকার—তাই আলো না জ্বালিলে কিছু দেখা যায় না। আবার সাধারণ বাতি জ্বালিলে বড় বিপদ হয়—কয়লার খনিতে এক রকম গ্যাস জন্মে, সেই গ্যাসের সঙ্গে আলো লাগিলেই জ্বলিয়া উঠে ও ভয়ানক শব্দ হইয়া খনি ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহাতে অনেক লোক চাপা পড়িয়া মারা যায়। কয়লার খনিতে এইজন্য (ডেভিস সেফটী ল্যাম্প নামক) এক রকম তারের জালের লণ্ঠন ব্যবহার করে। ইহাতে আলো হয়—কিন্তু সেই আলোর আগুনে গ্যাস ধরিয়া কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। (কয়লার খনি ও ডেভিস ল্যাম্পের চিত্র দেখাও)। ।।

এক একটা কয়লার খনির নীচে এক একটী ছোট রকমের সহর হইয়া পড়ে। খনির ভিতর রেল বসাইয়া ঘোড়ার গাড়ী চালায়। সেই গাড়ী বোঝাই করিয়া কয়লা আনিয়া গর্ত্তের মুখের নিকট বড় বড় ঝুড়িতে ঢালিয়া দেয়। বড় বড় খনির নীচে ৫।৭ শত লোক ও ৫০।৬০টা ঘোড়ায় কাজ করে।

কাঠ কয়লা কেমন করিয়া হয় তোমরা জান। পাথুরে কয়লা কেমন করিয়া হয়—জান না। ইহাও কাঠ থেকে হয়। সময় সময় ভূমিকম্প হইয়া এক একটা বন মাটীর ভিতর বসিয়া যায়। অনেকদিন পূর্ব্বে যে সকল বন এই রকমে মাটীর নীচে বসিয়া গিয়াছিল, তাহারই গাছপালা মাটীর চাপে কয়লা হইয়া গিয়াছে। কয়লার উপর সময় সময় পাতার দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাতাগুলি পালই পাতা বা পালক পাতার মত। তাই মনে হয় সেকালে বড় বড় পালক পাতার গাছ ছিল।

কয়লা কি কাজে লাগে? রেলগাড়ী, ষ্টিমার ও কাপড়ের কল, তেলের কল, পাটের কল, কাগজের কল প্রভৃতি কল চালাইবার কার্য্যে লাগে। এই সব কল আগুন ও জলে চলে, এই আগুন করিতে পাথুরে কয়লা ব্যবহার করে। যে পাথুরে কয়লা দিয়া আমরা রন্ধন করি, তাহাকে কোক্ কয়লা বলে। আদত পাথুরে কয়লা একবার সামান্য রকমে আধপোড়া করিয়া লইলে কোক্ কয়লা হয়। পাথুরে কয়লার চেয়ে কোক কয়লায় শীঘ্র আগুন ধরে, আর কোক্ কয়লায় ধোঁয়া কম হয়।

কয়লার খনির কাছে কেরোসিন তেলের খনি থাকে। খনির মধ্যে কেরোসিন তেল ঘন ও ঘোলা তরল অবস্থায় পাওয়া যায়। কেরোসিন পরিষ্কার করিলে জলের মত তেল ও মোমের মত প্যারাফিন নামক পদার্থ পাওয়া যায়। এই প্যারাফিনে বাতি তৈয়ারী হয় (প্যারাফিনের বাতি দেখাও)। পাথুরে কয়লা গরম করিলে যে গ্যাস বাহির হয় তাহা আগুনে জ্বলে। এই গ্যাস জ্বালাইয়া কলিকাতার রাস্তায় আলো দেয়। কয়লা গরম করিয়া আলকাতরা বাহির করে। আবার কয়লা হইতে ম্যাজেণ্টা (লালরঙের গুঁড়া) ও মভ (বেগুণে রঙের গুঁড়া) বাহির করে। তোমরা শুনিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইবে—কয়লা হইতে এক রকম চিনি বাহির করে।

ধাতু।

উপকরণ—সোণার টাকা বা আংটী, রূপার টাকা, তামার পয়সা, নিকেলের আনি, লোহার প্রেক, ইস্পাতের ছুরি, কাঁসার গেলাস, পিতলের থালা, এলুমিনিয়মের বাটি, টিনের কৌটা, পারদ। সাধারণ ব্যবহার্য্য ধাতুদ্রব্য। মাটী ও কাচের বাসন।

(উপরোক্ত দ্রব্য বা তদ্রূপ যত প্রকার ধাতুদ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা করিবেন ও দ্রব্যগুলি সমস্তই টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিবেন।)

পিতলের থালায় একখানি ইঁটের দ্বারা আঘাত কর—ভাঙ্গিল না। মাটীর বাসনে আঘাত কর—ভাঙ্গিয়া গেল। জিজ্ঞাসা কর—আমরা মাটীর থালা বা বাটি ব্যবহার না করিয়া, আমরা পিতলের থালা ব্যবহার করি কেন? একটা বাঁশের প্রেক্ তৈয়ারী করিয়া কাঠের মধ্যে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা কর—প্রেক কাঠে প্রবেশ করিল না, ভাঙ্গিয়া গেল। লোহার প্রেক বসাইয়া দাও—বেশ বসিল। লোহা খুব শক্ত—সহজে ভাঙ্গে না। এখন অন্যান্য ধাতু একে একে দেখাও ও নাম শেখাও। ধাতুর প্রধান গুণ এই যে ইহারা ঠমক্ (ঘাতসহ) সহজে ভাঙ্গে না। তারপর ধাতুর অন্য আর একটী গুণ লক্ষ্য করিতে বল—কাঠ ও মাটী খস্‌খসে কিন্তু ধাতু বেশ চকচকে। ধাতু চকচকে বলেই দেখতে সুন্দর। এই জন্যই ধাতু দিয়া গয়না তৈয়ারী করে। বালকগণকে সোণার ও রূপার গহনার নাম করিতে বল। লোহা দিয়া কি করে? লোহা দিয়া গহনা গড়ে না কেন? লোহা—সোণা কি রূপার মত উজ্জ্বল নয়। কোন্ ধাতুর দাম বেশী? কেন? সোণাই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এবং সোণার রঙও সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। সোণার রঙ কেমন? উজ্জ্বল পীতবর্ণ। সোণার রঙে কখন ময়লা ধরে না; রূপার গহনা মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার না করিলে একটু কালো হইয়া উঠে। রূপার নূতন চক্‌চকে ও পুরাতন ময়লা টাকা দেখাও। পয়সা কি দিয়া তৈয়ারী করে? তামার রঙ কেমন? তামা রূপার চেয়ে বেশী কালো হয়। তামার পয়সাকে তেঁতুল দিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার কর, ময়লা উঠিয়া গেল—

তামার রঙ বাহির হইল। যে ধাতু দিয়া আনী তৈয়ারী করে তাহার নাম নিকেল ধাতু। নিকেল দেখিতে রূপার মত সাদা—কিন্তু রূপার মত উজ্জ্বল নয়। নিকেলের রঙও অল্পদিনেই কালো হইয়া উঠে। পিতলের বর্ণ কতকটা সোণার মত, কিন্তু পিতল সোণার মত উজ্জ্বল নয়। পিতলের বাসন না মাজিলে খুব কালো হইয়া যায়। কাঁসার বাসন পিতলের মত এত শীঘ্র কালো হয় না। রূপার মত আর এক ধাতু আছে, তার নাম এলুমিনিয়ম। রূপার মত এত সাদা নয়—একটু নীল আভাযুক্ত। এই ধাতু দিয়া থালা, বাটি, গেলাস তৈয়ারী হয়। পিতল, তামা ও কাঁসার বাটীতে অম্বল রাখিলে সে অম্বল তিতা হইয়া উঠে কিন্তু এলুমিনিয়ামের বাসনে রাখিলে তিতা হয় না। চক্‌চকে লোহার জিনিষ খুব শীঘ্র কালো হইয়া যায়। ধাতুর উপর এইরূপ যে কালো আবরণ পড়ে তাহাকে ভাল কথায় 'কলঙ্ক' বলে। লোহার উপর এই কলঙ্ক পড়িয়া লোহাকে নষ্ট করিয়া দেয়। সাধারণ কথায় কলঙ্ককে 'মরিচা' বলে। লোহাতে জল লাগিলেই মরিচা ধরে। লোহাতে বাতাস লাগিলেও লোহায় মরিচা ধরে। এই জন্য লোহার অস্ত্র ঢাকিয়া রাখা দরকার। পারদ দেখাও। পারদ তরল ধাতু। ধাতুর আর দুইটী গুণের উল্লেখ কর। ধাতুকে আগুনের তাপে গলান যায় ও ধাতু পিটিয়া পাত বা তার তৈয়ারী করা যায়। ধাতুর এই গুণ আছে বলিয়া আমরা ধাতু দিয়া নানা প্রকারের গহনা ও নানা আকারের বাসন তৈয়ারী করিতে পারি। একখানি লোহার হাতায় একটু সীসা রাখিয়া আগুনের উপর ধর। সীসা খুব শীঘ্রই গলিয়া যাইবে। মাটীর মধ্যে একটা ছোট গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গলিত সীসা ঢালিয়া দাও। দেখাও যে গর্ত্তের মত গোল একটী গুলি হইল। ঠাণ্ডা হইলে উঠাইয়া লও। এইরূপ সকল ধাতুই গলান যায়। রূপা গলাইয়া টাকা তৈয়ারী করে ও তামা গলাইয়া পয়সা তৈয়ারী করে। টাকার ও পয়সার ছাঁচ আছে—তাহার মধ্যে ধাতু গলাইয়া ঢালিয়া

দেয়। (অনেকের বাড়ীতে সন্দেশ ও ক্ষীরশা তৈয়ার করার ছাঁচ থাকে। কোন বাড়ীতে না পাইলে ময়রার দোকান হইতে একটা ছাঁচ কর্জ্জ করিয়া আনিয়া তাহার মধ্যে মাটী বা ডেলা ক্ষীর দিয়া ছাপ তুলিয়া দেখাইবে।)

বিলাতী মুদ্রার কথা।—অল্প মুল্যের বিলাতী মুদ্রা তামা অথবা নিকেল দিয়া প্রস্তুত করে না। এগুলি ব্রোঞ্জ নামক ধাতু দিয়া প্রস্তুত করে; ব্রোঞ্জ তামা ও টিনমিশ্রিত ধাতু বিশেষ।

ব্রোঞ্জ মুদ্রা।

ফার্দ্দিং	(অর্দ্ধ পয়সার মত আকার)	৻৫	মুল্য
অর্দ্ধ-পেনি	(পয়সার মত)	৻১০	,,
পেনি	(ডবল পয়সার মত আকার)	/০	,,

রূপার মুদ্রা।

৩ পেনি	(দুয়ানির মত)	৵০	মুল্য
৬ পেনি	(সিকির মত)	।৵০	,,
১ শিলিং	(আধুলির মত)	৸০	,,
ক্রাউন (৫ শিলিং)	(টাকার মত)	৩৸০	,,

সোনার মুদ্রা।

অর্দ্ধ-সভারিণ (১০ শিলিং)	সিকির আকার	৭॥০	মুল্য
সভারিণ	আধুলির আকার	১৫৲	,,

(১১ ভাগ সোনা ও ১ ভাগ তামা মিশাইয়া মুদ্রা প্রস্তুত করে। সোনা খুব নরম—তামা না মিশাইলে শক্ত হয় না)।

স্বর্ণ।—(মানচিত্রে দেখাও) স্বর্ণ অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফোর্নিয়ার খনিতে পাওয়া যায়। (খনির চিত্র দেখাও) ইহা এক প্রকার কঠিন বালি পাথরের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। পরে খনি হইতে তুলিয়া আগুনে গলাইয়া পরিষ্কার করে। ভারতবর্ষের মহীশূর রাজ্যের স্বর্ণখনি প্রসিদ্ধ। উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও আসামের কোন কোন নদীর বালুকায় স্বর্ণরেণু মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়।

রৌপ্য।—আমেরিকার অন্তর্গত মেক্সিকো, বোলিভিয়া, চিলি ও পেরু প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইউরোপের মধ্যে ইংলণ্ড, হাঙ্গেরি, স্পেন, রুসিয়া এবং এসিয়ার মধ্যে সাইবিরিয়া ও জাপানে রূপার খনি আছে। রূপা ও মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। আগুনে গলাইয়া খাঁটি রূপা বাহির করে। ভারতে এপর্য্যন্ত রূপার খনি পাওয়া যায় নাই।

তাম্র।—তাম গন্ধক অথবা অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। ইংলণ্ডের তাম্রখনি প্রসিদ্ধ। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক স্থলেই তামার খনি আছে। বাঙ্গালার সিংহভূম ও ধলভূমে এবং মধ্য প্রদেশের জব্বলপুর ও চাঁদা জেলায় তামার খনি আছে। হিমালয়ের অনেক স্থানে তামার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তামা ও টিন বা রাঙ একত্র গলাইলে কাঁসা হয়। তামা ও দস্তা মিশাইলে পিতল হয়।

লোহা।—গ্রেটবৃটন, সুইডেন ও এলবাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইউনাইটেড ষ্টেটস্ প্রভৃতি আরও অনেক দেশে লোহার খনি আছে। লৌহ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে অতি উত্তম লোহার খনি আছে। বাঙ্গালাদেশের বরাকর, চাইবাসা প্রভৃতি স্থানে উত্তম লোহা পাওয়া গিয়াছে। যেখানে লোহার খনি আছে তাহার কাছেই কয়লার খনিও পাওয়া যায়। ভগবানের ব্যবস্থা দেখ—কয়লা না হইলে লোহা গলাইয়া কার্য্যের

উপযোগী করা যায় না। তাই কয়লা আর লোহা একস্থানে। (টাটার লোহার কারখানার কথা উল্লেখ ক —এই কারখানাই ভারতের প্রধান লোহার কারখানা। কালিমাটিতে (মানভূম জেলায়) এই কারখানার প্রধান কেন্দ্র।)

বায়ু।

আমরা কি বায়ু দেখিতে পাই? তবে কেমন করিয়া জানি যে বায়ু আছে? বায়ু দেখি না বটে কিন্তু বায়ু স্পর্শ করিতে পারি। এদিক ওদিক হাত নাড়িলেই হাতে বায়ু বাধে। হাঁ, যখন বায়ু খুব জোরে বহে তখন আমরা বাতাসের শব্দও শুনিতে পাই।

বায়ু চলাচল করে—একদিক হইতে অন্য দিকে চলিয়া যায়। এখন কোন্ দিক হইতে কোন্ দিকে বায়ু যাইতেছে বল ত? ধূলা উড়াইয়া দাও—এই দিক হইতে ঐ দিকে বায়ু চলিয়াছে। এখন কোন্ কাল? এখন (মনে কর) শীতকাল। কোন্ দিকে বায়ু বাহতেছে? উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে। হাঁ, শীতকালে উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে আর গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ হইতে উত্তরে বায়ু বহে। আশ্বিনমাসে উত্তরে বায়ু আরম্ভ হয় আর বৈশাখে দক্ষিণে বায়ু আরম্ভ। এই দুই মাসে বায়ুর গতি পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয় বলিয়া এই সময় খুব ঝড় হয়। ঝড় কাহাকে বলে জান? যে বাতাস খুব জোরে বহিয়া গাছ পালা ভাঙ্গিয়া ফেলে তাহাকে ঝড় বলে। বাতাসের বেগ অনুসারে তাহার নানারূপ নাম আছে।

বাতাসের সাধারণ নাম বায়ু বা বাত। আমাদিগের পৃথিবীর চারি-দিকে একটা বায়ুর আবরণ রহিয়াছে। মাছ যেমন জলে বাস করে আমরাও তেমনি বায়ুর ভিতর বাস করিতেছি।

যে বায়ুর বেগ ঘণ্টায় ৩ মাইল তাহার নাম বাতাস (Calm)

„	„	„	১৮	„	„	সমীরণ (Gentle breeze)
„	„	„	৩৪	„	„	পবন (Strong breeze)
„	„	„	৪৮	„	„	বাত্যা (Fresh gale)
„	„	„	৭৫	„	„	ঝটিকা বা ঝড় (Storm)
„	„	„	৯০	„	„	প্রভঞ্জন (Hurricane)

বৃষ্টিযুক্ত প্রবল বায়ুর নাম ঝঞ্ঝা। (বায়ুর এই বেগ মাপিবার যন্ত্র আছে) যেমন ঘন দুধ ও পাতলা দুধ আছে—বায়ুও সেইরূপ ঘন আর পাতলা আছে। পৃথিবীর নিকট যে বায়ু তাহা খুব ঘন কিন্তু যতই উপর উঠিয়া গিয়াছে বায়ু ততই পাতলা হইয়া গিয়াছে।
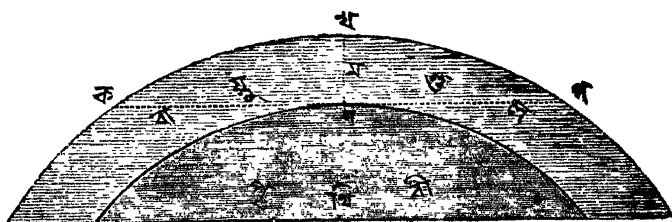
(বোর্ডে চিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাও। একটী বৃত্ত আঁক—তাহার পরিধির পাশ দিয়া প্রথমে ঘন করিয়া চক্ ঘসিয়া দাও। তারপর এই চকের ঘন বৃত্তের চারি দিকে একটু আস্তে চক্ ঘসিয়া একটু কম ঘন বৃত্ত কর, তারপর আরও কম ঘন এই প্রকারে বোর্ডের গায় মিলাইয়া দাও)।

পৃথিবীর উপর ১০০ মাইল পর্য্যন্ত বায়ু আছে, তাহার উপর বায়ুশূন্য স্থান।

আমরা বায়ু না হইলে বাঁচি না। কতক্ষণ নাক মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে পার? ঘন বায়ু না হইলে আমাদিগের নিশ্বাস লওয়ার

অসুবিধা হয়। পাতলা বায়ুতে নিশ্বাস লইয়া আমরা বাঁচিতে পারি না। মানুষ বেলুন ও উড়োকলে চড়িয়া আকাশে ওঠে—কিন্তু ৭।৮ মাইল উপর গেলেই ঘন বায়ুর অভাবে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। (বেলুন ও উড়োকলের ছবি দেখাও)।

বাতাসের ভিতর কি কি থাকে জান ? যখন প্রাতঃকালে অন্ধকার ঘরে কোন ছিদ্র দিয়া সূর্য্যের আলো প্রবেশ করে, তখন তাহার ভিতর কি দেখিতে পাও ? ধূলিকণা উড়িয়া বেড়ায়। বাতাসে নানারূপ হাল্কা জিনিষ উড়িয়া বেড়াইতেছে। তারপর বাতাসে অদৃশ্য ও দৃশ্য ভাবে কত বাষ্প আছে—একথা তোমরা জান।

এ সকল ছাড়া বায়ু নিজেও আবার তিন রকম ভিন্ন ভিন্ন বায়ু বা গ্যাসের মিশ্রণ। এই তিন রকম গ্যাসের নাম অক্‌সিজেন গ্যাস, নাইট্রোজেন গ্যাস, কারবনিক্ এসিড গ্যাস। এখন নাম মনে করিয়া রাখ, অন্য দিন তিন গ্যাসের কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব। (এই সমস্ত গ্যাসের কতকগুলি বাঙ্গালা নাম আছে বটে, কিন্তু সেই সকল বাঙ্গালা নামও বালকগণের নিকট সম পরিমাণে অবোধ্য। সুতরাং ইংরেজী নাম ব্যবহার করাই ভাল, কারণ রসায়ণের সমস্ত সূত্র বালকগণকে ইংরেজী নামের সঙ্কেত দ্বারা শিক্ষা করিতে হইবে)।

খুব গরম হইলে বায়ু উত্তাপে হাল্কা হইয়া উপরে উঠিতে থাকে। তোমরা হয়ত দেখিয়াছ আগুন লাগিলে ঊর্দ্ধগামী বাতাসের সঙ্গে ছাইগুলি উড়িয়া ক্রমেই উপরের দিকে যাইতে থাকে। (শীতকালে যখন গ্রামের লোকে পাতা জ্বালাইয়া আগুন পোহায় তখন এই পরীক্ষা দেখাইতে পার)

জলের মধ্যেও বাতাস অল্প মিশান আছে। এই বাতাসে মাছ বাঁচে। মাটীর মধ্যেও বাতাস আছে। এই বাতাস মাটীর নিম্নস্থ গাছের প্রথম অঙ্কুরকে পোষণ করে।

কারবনিক এসিড্ গ্যাস।

উপকরণ—একটী সাদা বোতল (সুগার অব মিল্কের বোতলের মত), একটু তার, একটা সরু বাতি, চুণের পরিষ্কার জল, কাচের গেলাস, একটা নল (কাচের, পিত্তলের, পাটকাঠীর, ইকড়া, কাগজ প্রভৃতি যে কোন জিনিষের) দেশলাই বাক্স।

বোতলের ভিতর চুণের পরিষ্কার জল ঢালিয়া দাও। (চুণের জল যদি অপরিষ্কার থাকে তবে একটুকরা ব্লটিং কাগজ একটা বাটির মুখে রাখিয়া, তাহার উপর আস্তে আস্তে চুণের জল ঢালিতে থাক। বাটিতে চুণের পরিষ্কার জল পড়িবে। সেই জল দিয়া পরীক্ষণ দেখাও)। কাক (কর্ক) আটিয়া বা হাত দিয়া বোতলের মুখ ধরিয়া বোতলটী ঝাঁকাও-- দেখাও যে চুণের জলের রঙ পরিবর্ত্তন হইল না।

তারপর চুণের জল ঢালিয়া ফেল। তারের একপ্রান্তে বাতির টুকরা জড়াইয়া বাঁধ ও বাতি জ্বালিয়া দাও। তারের অপর প্রান্ত ধরিয়া বাতি বোতলের মধ্যে নামাইয়া দাও। দেখিবে যে বাতির জোর ক্রমেই কমিয়া আসিবে। শেষে বাতি নিবিয়া যাইবে। বাতি নিবিবা মাত্র বোতলের মধ্যে পরিষ্কার চুণের জল খানিকটা ঢালিয়া দিয়া পূর্ব্ববৎ ঝাঁকাও এবারে চুণের জল দুধের মত সাদা হইয়া গেল। কেন?

আচ্ছা, এই কথার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করি, বাতি নিবিয়া গেল কেন? (যদি বোতলের মুখ বড় হয় তবে বাতি নিবিবে না। এরূপ বড় মুখ হইলে এক টুকরা কাঠ, ইট, টিন কি অন্য পদার্থের দ্বারা বোতলের মুখ অনেক পরিমাণে ঢাকিয়া দিবে)। বোতলের ভিতর বাতাস পাইতেছিল না বলিয়া। যদি তাহাই হয় তবে খানিক সময় জ্বলিল কেন? যদি বাতাস না পাইবার দরুণ নিবিয়া থাকে, তবে ত বোতলের মধ্যে বাতি নামান মাত্রই নিবিয়া যাইত। বাতাসের ভিতর যে সকল গ্যাস আছে বলিয়াছি, সে গ্যাসের মধ্যে অক্‌সিজেন নামক যে গ্যাস আছে, তাহার

সাহায্যেই বাতি জ্বলে। অথবা যে জিনিষের সাহায্যে বাতি খানিকক্ষণ জ্বলিল তাহাকেই অকৃসিজেন গ্যাস নাম দিলাম।

অকৃসিজেন গ্যাস নিজে পোড়ে না—পোড়ার সাহায্য করে। বাতি হইতে যে সলিতা ও তেলপোড়া সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য ছাই (অঙ্গার) উঠিতে ছিল, তাহার সহিত এই অকৃসিজেন বায়ু মিশিয়া গিয়া কারবনিক এসিডনামে এক নূতন গ্যাসের সৃষ্টি করিয়াছে। চূণের জলের সঙ্গে এই গ্যাস মিশিলে, চূণের জল ঘোলা হইয়া যায় (চূণে তখন চক্ জন্মে)।

আর এক পরীক্ষণ কর। একটা বাটি বা গেলাসে চূণের পরিষ্কার জল ঢাল। একটা নলের একপ্রান্ত ঐ জলের ভিতর ডুবাইয়া দাও ও নলের অপর প্রান্তে মুখ লাগাইয়া ফুঁ দিতে থাক। দেখিবে যে চূণের জল ঘোলা হইয়া গেল। তাহা হইলে বোঝা গেল যে বাতি জ্বালানে বোতলের ভিতর যে গ্যাস হইয়াছিল, আমাদিগের প্রশ্বাসেও সেই গ্যাস বাহির হইয়া আসে। এই প্রশ্বাসের বায়ুও কারবনিক এসিড গ্যাস।

আবার বোতলের ভিতর বাতি জ্বাল। বাতি যখন নিবিয়া যাইবে, তখন বাতিটী খুব তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া আবার শীঘ্র জ্বালিয়া দাও ও খুব শীঘ্র বোতলের ভিতর নামাইয়া দাও। এবারে বাতি নামান মাত্রই নিবিয়া যাইবে। কেন? বোতলের ভিতরস্থ বাতাসে যে অকসিজেন বায়ু ছিল তাহা পূর্ব্বেই ফুরাইয়া গিয়াছে। বোতলে এখন যে গ্যাস আছে তাহার নাম নাইট্রোজেন গ্যাস। তাহাতে বাতি জ্বলিতে পারে না।

তাহা হইলে তোমরা অকৃসিজেন, নাইট্রোজেন ও কারবনিক এসিড গ্যাসের একটা পরীক্ষা পাইলে। পরে আরও ভাল পরীক্ষা দেখাইব।

একহাজার ঘনফুট বায়ুতে	নাইট্রোজেন থাকে	৭৯০. ০	ঘনফুট
	অকসিজেন ,,	২০৯. ৬	,,
	কারবণিক এসিড ,,	'৪	,,
	বাষ্প ও ধুলার পরিমাণ	পরিবর্ত্তনশীল	

কারবণিক এসিডের মাত্রা খুব কম। এই গ্যাস বিষাক্ত। আমাদিগের প্রশ্বাসের সঙ্গে যে এই গ্যাস বাহির হইতেছে তাহা তোমাদিগকে দেখাইয়াছি। যেখানে অনেক লোক জমে সেখানে যদি বায়ু চলাচলের ভাল ব্যবস্থা না থাকে তবে বায়ুতে এই বিষাক্ত গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া সেখানকার সমস্ত লোককে অসুস্থ করে। সময় সময় এই গ্যাসের মাত্রাধিক্য বশতঃ লোকজন মরিয়াও যায়। শিক্ষক ইচ্ছা করিলে অন্ধকূপ হত্যার কথা বলিতে পারেন। বাসগৃহে ও বিদ্যালয়গৃহে অধিক দরজা জানালার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিবেন। যাত্রাগান শুনিতে গিয়া ও থিয়েটার দেখিতে গিয়া আমরা অসুস্থ হইয়া আসি। কেন?

গঙ্গা।

নদী কেমন করিয়া পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হয় তাহা তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। গঙ্গা নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সিমলার (যেখানে বড়লাট গ্রীষ্মকালে বাস করেন—মানচিত্রে দেখাও) উত্তর-পূর্ব্বে গঙ্গোত্তরী নামক স্থানে গঙ্গার জন্ম। এইখানে প্রায় এক মাইল বিস্তৃত একটা খাত আছে। এই খাত ক্রমনিম্ন। সর্ব্বদা বরফে ঢাকা থাকে। এই স্থান হইতে বরফ গলিয়া নীচে পড়িতেছে। নীচে একটা বড় গহ্বর আছে, জল তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া অপরদিক দিয়া বাহির হইয়াছে। এই গহ্বরের নাম গোমুখী। গঙ্গা গোমুখী হইতে ক্রমে হরিদ্বারে নামিয়া আসিয়াছে। গঙ্গোত্তরীর নিকট গঙ্গা প্রস্থে ১৮ হাত মাত্র ও জলের গভীরতা ১ হাত মত।

ক্রমেই যত সমতলের দিকে অগ্রসর হইয়াছে পর্ব্বত হইতে অন্যান্য নদী আসিয়া ইহার গতিপথে মিলিত হইয়াছে। বাম দিকে (উৎপত্তি স্থান হইতে মুখের দিকে যাইতে নদীর যে পার হাতের দক্ষিণে থাকে তাহাকে দক্ষিণ পার ও যে পার বামে থাকে তাহাকে বাম পার বলে)।

গঙ্গানদী
৮০
৯০
হরিদ্বার
ধবলগিরি
গৌরী শঙ্কর
কাঞ্চনজঙ্ঘা
চিলমারী
যমুনা
গঙ্গা
গোমতী
ঘর্ঘরা
গণ্ডকী
কুশী
কানপুর
এলাহাবাদ
কাশী
গঙ্গা
পাটনা
শোন
ব্রহ্মপুত্র
চিলমারী
যমুনা
সুরমা
পদ্মা
ভৈরব বাজার
ভাগিরথী
গোয়ালন্দ
চাঁদপুর
কলিকাতা
সুন্দরবন
মেঘনা
বঙ্গোপসাগর
১ইঞ্চ = ১৫০ মাইল।

গঙ্গা
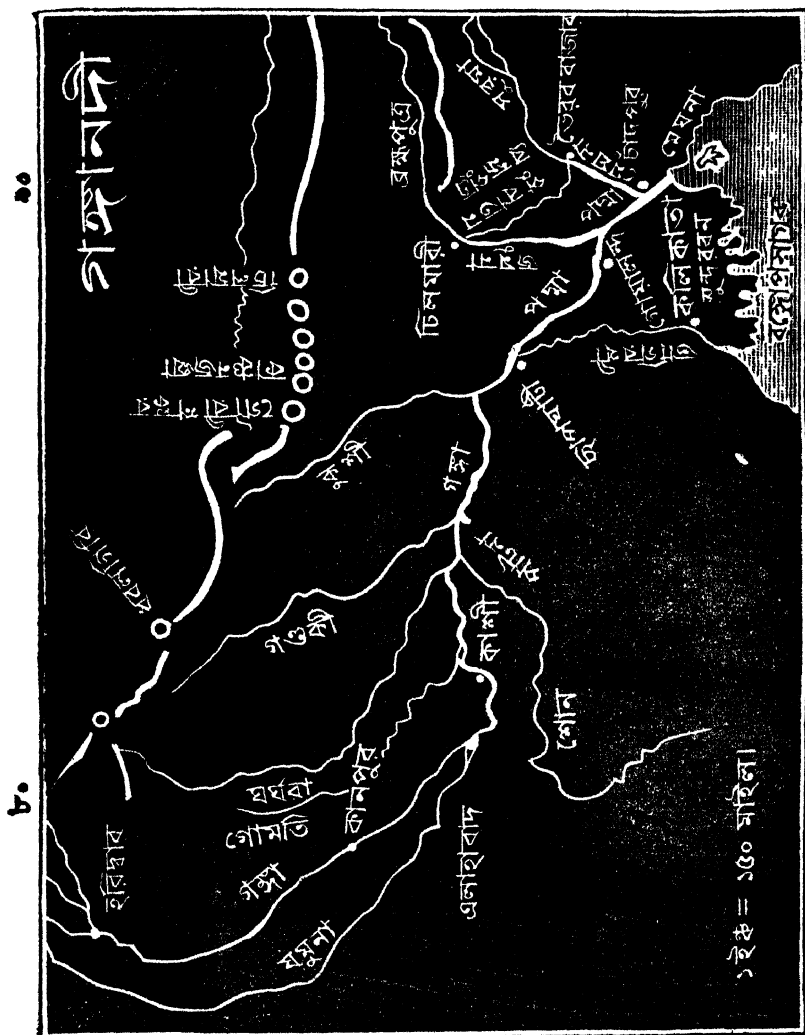
ঘর্ঘরা, গোমতী, গণ্ডকী, কৌশিকী কত জল বাহিয়া আনিয়া গঙ্গায় ঢালিতেছে। কাজেই নদী যতই সমুদ্রের দিকে যায় ততই নদী বড় হইতে থাকে। আবার দেখ দক্ষিণ দিক হইতেও যমুনা ও শোন নদী আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। এইরূপ নানা শাখাযুক্ত হওয়াতে নদী একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের মত দেখায়।

গঙ্গা নদীর সমস্ত অংশের এক নাম নয়। হরিদ্বার হইতে ভাগীরথীর উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত নাম গঙ্গা। তারপর এই স্থান হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত—নাম পদ্মা। নদী একই বটে কিন্তু হিন্দুগণ গঙ্গার জল পবিত্র মনে করেন। পদ্মার জল পবিত্র মনে করেন না। গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ উপাখ্যান আছে:—অযোধ্যার রাজা দিলীপের পুত্র ভগীরথ, তাঁহার মৃত পিতৃকুল উদ্ধার করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এমন সময় তিনি ধ্যানে জানিতে পারিলেন স্বর্গ হইতে গঙ্গা না আনিলে তাহার কামনা সিদ্ধ হইবে না। তখন তিনি বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু দয়া করিয়া তাঁহার চরণ হইতে গঙ্গা বাহির করিয়া দিলেন। (আকাশের অন্য নাম বিষ্ণুপদ—আকাশের মেঘ হইতেই নদীর উৎপত্তি হয়, সুতরাং বিষ্ণুপদ হইতে নদী নির্গত হয়—এ কথা বলার সার্থকতা আছে)। ভগীরথ একটা শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে আসিতে লাগিলেন। গঙ্গা সেই শঙ্খের শব্দ শুনিয়া তাঁহার পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। এমন সময় বহরমপুরের নিকট আসিয়া ভগীরথ প্রস্রাব করিতে বসিলেন। তখন বহরমপুরের দক্ষিণে খুব জঙ্গলময় দেশ ছিল। সেখানে এক অনার্য্য রাজা ছিলেন। তিনি এই অবসরে ভগীরথের শঙ্খ চুরি করিয়া বাজাইতে বাজাইতে নিজের বাড়ীর দিকে চলিলেন। ভগীরথ তখন উঠিয়া দেখেন যে গঙ্গা অন্য পথে চলিয়াছেন। ভগীরথ ভারি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "মা! ওপথে গেলে ত আমার কার্য্য উদ্ধার হইবে না। আমার শঙ্খ চুরি করিয়া এই অসুরটা

আপনাকে ভুলাইয়া তাহার বাড়ীর দিকে লইয়া যাইতেছে।” তখন গঙ্গা বলিলেন “আমি যে পথে চলিয়াছি, তাহা আর বদলাইতে পারি না। তবে তোমার কার্য্য উদ্ধারের জন্য এইখান হইতে একটা ধারা লইয়া তুমি সাগরের দিকে যাও। এখান হইতে যে স্রোত শঙ্খাসুরের বাড়ীর নিকট দিয়া চলিবে তাহার জলে স্নান করিলে কেহ পরিত্রাণ লাভ করিবে না। সে স্রোতের নাম পদ্মা (পদ=ত্রাণ, মা=না) হইল।”

এই মুরশিদাবাদ জেলার ছাপঘাটী নামক স্থান হইতে যে ক্ষুদ্র সরিতের উৎপত্তি হইয়াছে—তাহাই বহরমপুর, নবদ্বীপ, হুগলী, কলিকাতার নীচে চলিয়া ডায়মণ্ডহারবারের নিকট সাগরে পড়িয়াছে। এই জন্য এই স্থানে সাগরের নাম গঙ্গাসাগর। ছাপঘাটীর মোহানা হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত যে নদী তাহার প্রকৃত নাম ভাগীরথী। কারণ ইহা ভগীরথের কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্তই সৃষ্ট; তবে লোকে সাধারণতঃ ইহাকেও গঙ্গা বলিয়া থাকে। ইংরেজেরা এই নদীকে হুগলী নদী বলেন। ইংরেজী ভূগোলে উল্লিখিত গ্যাঞ্জেস নদী দ্বারা হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া (গোয়ালন্দ দিয়া) সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত নদীকেই বুঝায়। গঙ্গা ও পদ্মার মিলিত নাম ‘গ্যাঞ্জেস’। প্রকৃত পক্ষেও গঙ্গা ও পদ্মা একই নদী। কেবল ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম। হরিদ্বার হইতে ছাপঘাটীর মোহানা পর্য্যন্ত নাম গঙ্গা। ছাপঘাটীর মোহানা (মুরশিদাবাদ জেলায়) হইতে চাঁদপুর (ত্রিপুরা জেলায়) পর্য্যন্ত নাম পদ্মা। চাঁদপুর হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত নাম মেঘনা।

যেমন গঙ্গার দক্ষিণ অংশের নাম পদ্মা, সেইরূপ ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ অংশের নাম (চিলমারী হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত) জমুনা। পদ্মা (গঙ্গা) ও জমুনা (ব্রহ্মপুত্র) গোয়ালন্দের (ফরিদপুর জেলা) নিকট মিলিত হইয়াছে, এবং এই মিলিত নদী (পদ্মা নামে) চাঁদপুরের নিকট মেঘনার

সহিত মিলিত হইয়া সাগরে পড়িয়াছে। মেঘনার উৎপত্তি স্থান মণিপুর। মণিপুর হইতে কাছাড় ও শ্রীহট্টের মধ্য দিয়া বরাক, সুরমা নানা নামে আসিয়া ভৈরববাজারের (ময়মনসিংহ জেলা) নিকট পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিয়াছে। এই স্থান হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত এই নদীর নাম মেঘনা। পূর্ব্বে চিলমারীর (রঙ্গপুর জেলা) নিকট হইতে ময়মনসিংহের ভিতর দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ মেঘনায় প্রবাহিত হইত। এখন ব্রহ্মপুত্রের গতি ফিরিয়া গিয়াছে—পূর্ব্বের সেই স্রোতকে এখন পুরাতন ব্রহ্মপুত্র বলে। পশ্চিমে ভাগীরথী এবং পূর্ব্বে পদ্মা ও মেঘনা—এই দুই বাহু এবং দক্ষিণে সমুদ্রকূল ভূমি—এই ত্রিভুজাকার স্থান নানারূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীতে পরিপূর্ণ। এই ভূভাগকে গঙ্গার বদ্বীপ বলে। কলিকাতা, যশোহর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও মুরশিদাবাদ জেলা এবং সুন্দরবন এই বদ্বীপে অবস্থিত।

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে, যে সময়ে পুরাণাদিতে গঙ্গার বিবরণ লিখিত হইয়াছিল সে সময়ে গঙ্গার মোহানা এই ছাপঘাটীর নিকটেই কোন স্থানে ছিল এবং তখন ঐ থানেই সমুদ্রকূল ছিল। তারপর বদ্বীপ উৎপন্ন হইয়া পদ্মা, ভাগীরথী মেঘনা প্রভৃতি নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। গঙ্গার বদ্বীপ ক্রমেই দক্ষিণে বৃদ্ধি পাইতেছে। ৫০ বৎসরেই একটা সুবৃহৎ গ্রামের উপযোগী স্থান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গঙ্গার তীরস্থ পাঁচটী প্রধান নগরের উল্লেখ কর? গঙ্গাতীরস্থ প্রত্যেক নগরই সুন্দর অট্টালিকা শোভিত ও প্রত্যেক নগরই এক একটী পুণ্য তীর্থ ক্ষেত্র।

জাহ্নবীর কূলে কূলে
শোভে কত নগরী।
উচ্চে উচ্চ শির তুলি
মর্ত্ত্যের মমতা ভুলি

চায় সদা ঊর্দ্ধ পানে
পাপ তাপ পাসরি ॥

হরিদ্বার হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান। এখানে ১২ বৎসর পর পর কুম্ভমেলা নামে একটা সুবৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় লক্ষ লক্ষ সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়।

হের হেথা হরিদ্বারে
লক্ষ সাধু মিলিয়া,
ভক্তি গদ গদ হৃদে
পুণ্য প্রেম কোকনদে
ঢালিতেছে গঙ্গাজলে
প্রেমাঞ্জলি ভরিয়া ॥

তারপর আর একটী সহর কানপুর। এখানে সিপাহী বিদ্রোহের সময় নানাসাহেব নামক একজন মারহাট্টা সর্দ্দার নিরাশ্রয় ইংরেজ স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা হত্যা করিয়া ভারতের ইতিহাসে কলঙ্ক কাহিনী বৃদ্ধি করিয়াছেন। সেই সমস্ত মৃতদেহ যে কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই কূপের স্থানে এই শোকাবহ ঘটনার একটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

আবার নেহার হেথা
কানপুর সহরে,
ভীষণ নানার কাণ্ড
ভারত কলঙ্ক ভাণ্ড
আছে ওই কূপ মাঝে
লেখা রক্ত অক্ষরে ॥

এই এলাহাবাদ সহর। ইহাই যুক্ত প্রদেশের রাজধানী। এই সহরের নিকটে গঙ্গা যমুনার (ও সরস্বতীর) সঙ্গমস্থান। এই সঙ্গম স্থানে প্রয়াগ তীর্থ। এই সহরে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম আছে। দণ্ডকারণ্যে

গমনকালে গঙ্গা পার হইয়া রাম-সীতা এই ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

ওই যে শোভিছে তীর্থ
ত্রিবেণীর উরসে।
প্রয়াগ ইহার নাম
ভরদ্বাজ ঋষি-ধাম
পবিত্র ইহার ধূলি
রাম-পদ পরশে॥

তারপর কাশী। ভারতের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ স্থান। এখানে সংস্কৃত চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্য ধন পরিত্যাগ করিয়া এই কাশীর মনিকর্ণিকার ঘাটে চণ্ডালের কার্য্য গ্রহণ করেন ঃ—

হেরি কাশী ওঠে মনে
পুণ্য স্মৃতি জাগিয়া।
হেথায় হরিশ্চন্দ্র
দারা পুত্র সম বন্ধ
ধর্ম্মের চরণে দিলা
অকাতরে ঢালিয়া॥

আর এই পাটনা সহর। ইহার পূর্ব্বে এখানে পাটলিপুত্র নগর ছিল। সে কালের বৌদ্ধগণের এইটীই সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। রাজা অশোক এই স্থানে রাজত্ব করেন। রাজা অশোকের মত বড় রাজা পৃথিবীতে আর জন্মে নাই। ইনি নীতি ধর্ম্মমূলক শাসন দ্বারা পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করাইয়াছিলেন।

বিহারে পাটলিপুত্র
ছিল খ্যাত ভূলোকে।

হেথা সেই বৌদ্ধ যুগে
নীতির শাসনে সুখে
শাসিতেন অর্দ্ধ ধরা
নৃপশ্রেষ্ঠ অশোকে ॥

কলিকাতা।

উপকরণ—কলিকাতার নক্সা, বড়লাটের বাড়ী, মনুমেণ্ট, হাইকোর্ট, জেনারেল পোষ্ট আফিস, রাইটারস্ বিলডিংস্, হাওড়ার পুল ও এইরূপ আরও কয়েকটা ছবি। যদি একটী কি দুইটি রিয়ালিসটিস্কোপ যন্ত্র ও কলিকাতার বিভিন্ন স্থানের ১০।১২টা চিত্র সংগ্রহ করিতে পারা যায় তবে পাঠ দানের বিশেষ সুবিধা হইবে।

যাঁহারা বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলা হইতে কলিকাতা দেখিতে আসেন তাঁহারা কলিকাতার পশ্চিমদিকে হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া—গঙ্গার সেতু পার হইয়া, কলিকাতায় প্রবেশ করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জেলার লোক কলিকাতার পূর্ব্বদিকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিয়া থাকেন। আমরা শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিলাম। (নক্সায় শিয়ালদহ ষ্টেশন হাওড়া ষ্টেশন, গঙ্গা নদী ও গঙ্গার সেতু দেখাও)।

শিয়ালদহ ষ্টেশন।—শিয়ালদহ ষ্টেশনটী খুব বড়। একটা ঘরই যেন একটা গ্রাম। ষ্টেশনের মধ্যে তিনটা রেলের লাইন আছে। এই তিন জায়গা হইতেই গাড়ী ছাড়ে ও তিন জায়গাতেই গাড়ী আসিয়া লাগে। এই সকল স্থানকে প্লাটফরম বলে। ষ্টেশনের ছাদ খুব উঁচু—একটা বড় তালগাছের সমান। যেখানে যাত্রিরা টিকিট করে, সেই ঘরটী প্রকাণ্ড। এক সঙ্গে হাজার লোক থাকিতে পারে, এত জায়গা আছে। এই ঘরের ছাদও খুব উঁচু—আর সেই ছাদ সুন্দর চিত্রিত। ঘর উঁচু হওয়াতে এত লোকসমাগমেও গোলমাল কম হয়। খুব বড় বড়

অনেক দরজা আছে কাজেই বায়ু চলাচলেরও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। যে প্ল্যাটফরমে গাড়ী আসিয়া লাগে তাহার নিকটেই একটা মস্ত গাড়ী বারান্দা আছে। এইখানে অনেক ঘোড়ার গাড়ী থাকে। গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা বাসায় গেলাম। আমাদিগের বাসা ছিল কলেজ ষ্ট্রীটে। আমরা হ্যারিসন রোড দিয়া কলেজ ষ্ট্রীটের বাসায় গেলাম। তখন প্রাতঃকাল ৬টা। বাসায় গিয়া হাত মুখ ধুইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম।

কলেজ স্কোয়ার।—আমরা প্রথমে গোলদীঘি দেখিতে গেলাম। এটা একটা বড় পুকুর—ঠিক গোল নয়—ডিম্বাকৃতি। চারি দিকে বেড়াইবার জন্য সুন্দর রাস্তা। রাস্তার ধারে ধারে নানারূপ গাছ। মধ্যে মধ্যে বসিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোলা ঘর আছে। বসিবার বেঞ্চ আছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুইটী বাঁধা ঘাট। পশ্চিম ঘাটে একটী সাদা মারবেল পাথরের স্তম্ভের উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্ত্তি। এ মূর্ত্তিটীও সাদা মারবেলের পাথর দ্বারা তৈয়ারী। (বালকেরা বিদ্যাসাগরের বিষয় না জানিলে সংক্ষেপে জীবনী বলিয়া দাও)। বিদ্যাসাগর একখানি চাদর গায় দিয়া বসিয়া আছেন। পুকুরের দক্ষিণ দিকে হেয়ার সাহেবের সমাধি। এই হেয়ার সাহেব ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের জন্য বিশেষ সাহায্য করেন। পুকুরের উত্তর পারে সংস্কৃত কলেজ। উচ্চ দোতালা গৃহ—পুকুরের দিকে বড় বড় থামযুক্ত প্রকাণ্ড বারন্দা। পুকুরের দক্ষিণ পারে দাঁড়াইয়া সংস্কৃত কলেজের সুন্দর গৃহ ও পুকুরের ভিতর তাহার অনুরূপ ছায়া দেখিতে বেশ মনোরম। পুকুরের পশ্চিম দিকে কলেজ ষ্ট্রীট (রাস্তা)। এই রাস্তার ঠিক পশ্চিম দিকেই সিনেট হাউস অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহ। এই গৃহটী সুন্দর ও প্রকাণ্ড। মধ্যের যে ঘরে সভা হয় তাহার দৈর্ঘ্য ১২০ ফুট ও প্রস্থ ৬০ ফুট। ঘর এত উঁচু যে ঘাড় ভাঙ্গিয়া ছাদ দেখিতে হয়। রাস্তার উপর—গোলদীঘির দিকে মুখ করিয়া—এই গৃহের বারান্দা। রাস্তা হইতে সিঁড়ি উঠিয়াছে। অনেক গুলি ধাপ। বারান্দটী ৬টী উচ্চ থামের উপর নির্ম্মিত। এই বারান্দায় ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। ইনি আইন শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক টাকা দান করেন। সিনেট হাউসের পূর্ব্বদিকে আইন শিক্ষার কলেজ—একটী প্রকাণ্ড ৫ তালা বাড়ী। এই কলেজের পূর্ব্বে ইডেন হোষ্টেলের তেতালা বাড়ী—এখানে প্রায় ২৫০ জন কলেজের ছাত্র থাকিবার ব্যবস্থা আছে। হোষ্টেলের বাড়ীটী বেশ সুন্দর। সিনেট

হাউসের উত্তরে হেয়ার স্কুল। বাঙ্গালাদেশে এইটীই আদর্শ হাইস্কুল। এখানে ম্যাট্রিকিউলেশন পর্য্যন্ত পড়ান হয়। ইহার উত্তরে প্রেসিডেন্সি কলেজ—এইটী বাঙ্গালার আদর্শ কলেজ। এখানে সকল রকম উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই কলেজের অধ্যাপক। কলেজগৃহটী প্রকাণ্ড ও ত্রিতল। এখানে যেরূপ বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, ভারতবর্ষের আর কোন কলেজে সেরূপ ব্যবস্থা নাই। হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের মধ্যস্থ প্রাঙ্গণে হেয়ার সাহেবের প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। রাস্তা দিয়া উত্তর দিকে অল্প দূর গেলেই—যেখানে হ্যারিসন রোড্ ও কলেজ ষ্ট্রীট কাটাকাটি করিয়াছে—কৃষ্ণদাস পালের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। (কৃষ্ণদাস পালের সংক্ষিপ্ত জীবনী বল)। এই কলেজ ষ্ট্রীটে অনেকগুলি বড় বড় পুস্তকের দোকান আছে।

কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ার।—কলেজ ষ্ট্রীট দিয়া বরাবর উত্তর-মুখে গেলে হেদুয়া পুকুর পাওয়া যায়। এই পুকুরের ধারেও বেড়াইবার রাস্তা আছে। ইহার পূর্ব্বদিকে জেনারেল এসেমব্লির কলেজ। এই কলেজ খৃষ্টান পাদরী সাহেবদিগের দ্বারা পরিচালিত। প্রেসিডেন্সি কলেজের পরে এইটীই বড় কলেজ। পুকুরের পশ্চিম পারে বেথুন কলেজ। এইখানে মহিলারা পাঠ করেন। অনেক মহিলা এই কলেজ হইতে বি, এ,—এম, এ, পাশ করিয়াছেন।

বিডন স্কোয়ার, নিমতলা।—বেথুন কলেজের উত্তর দিয়া পশ্চিমে যে রাস্তা গিয়াছে তাহার নাম বিডন ষ্ট্রীট। এই রাস্তা দিয়া পশ্চিম মুখে গেলে 'বিডন স্কোয়ার' নামক একটী উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। এই উদ্যানে সন্ধ্যায় সকালে অনেকে বেড়াইতে আসেন। এখানে রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। এই রাজা বাহাদুর শব্দকল্পদ্রুম নামক একখানি বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান প্রস্তুত করেন। বিডন স্কোয়ারের

পশ্চিমে জোড়াসাঁকোর বাজার। এই বাজারে নানারূপ পিতল ও কাঁসার বাসন পাওয়া যায় বিডন ষ্ট্রীট দিয়া বরাবর পশ্চিমে গেলে গঙ্গার ধারে পৌছা যায়। এইখানে নিমতলা নামে একটী ঘাট আছে। এখানে মরা মানুষ পোড়ায়—এইটা কলিকাতার বড় শ্মশান। তোমরা গ্রামের শ্মশানের নাম শুনিয়া যেমন ভয় পাও, এখানে সে ভয় নাই। দিন রাত্রি বহু লোক যাতায়াত করিতেছে। একটা পাকাঘরের মধ্যে অনেকগুলি ইঁটের চুলা তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে। কাঠ, কয়লা মজুত আছে। ৩।৪ টাকা খরচ করিলেই একটা মানুষ পোড়ান হয়। ঘাটের নীচেই গঙ্গা। এই নিমতলার উত্তরে বাগবাজার পল্লী। তোমরা বাগবাজারের রসগোল্লার নাম শুনিয়াছ। এখানে খুব ভাল সন্দেশ ও রসগোল্লা তৈয়ারী হয়। নিমতলার দক্ষিণে হাটখোলা। এইখানে অনেক বড় বড় বাঙ্গালী মহাজনের আড়ত আছে।

আমরা দশটার সময় আহার করিয়া যাদুঘর দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। একখান দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিলাম। গাড়ীর ভাড়া প্রথম ঘণ্টায় বার আনা, তারপর প্রত্যেক ঘণ্টায় ছয় আনা হিসাবে দিতে হইবে।

যাদুঘর।—আমরা কলুটোলা ষ্ট্রীট দিয়া চলিলাম। এই কলুটোলা ষ্ট্রীটের সঙ্গে যেখানে চিৎপুর রোড মিশিয়াছে, তাহারই একটু পূর্ব্বে মুরগীহাটার বাজার। এখানে নানাবিধ খেলনার বড় বড় দোকান আছে। আমরা চিৎপুর রোড দিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিলাম। বৌবাজার ষ্ট্রীট পার হইলে এই রাস্তার নাম হইয়াছে বেন্‌টিং ষ্ট্রীট। এখানে চিনাম্যানের অনেক জুতার দোকান। এই রাস্তা দক্ষিণে ধর্ম্মতলা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। এই স্থানের একটু পূর্ব্বে চাঁদনী চক্। এখানে তৈয়ারী জামা, ছুরি, কাঁচি, জুতা, ঔষধ প্রভৃতি অনেক রকম জিনিষ বিক্রয় হয়।

যেখানে বেন্‌টিং ষ্ট্রীট ও ধর্ম্মতলা রাস্তা মিশিয়াছে সেখানে একটা প্রকাণ্ড চৌরাস্তা। চারটী বড় রাস্তা মিলিয়াছে বলিয়া এই স্থানের নাম চৌরঙ্গী। চৌরঙ্গী রাস্তা বরাবর দক্ষিণে কালীঘাটের দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার পশ্চিমে প্রকাণ্ড গড়ের মাঠ ও পূর্ব্বে সাহেবদিগের বড় বড় দোকান। নানাদিক হইতে ট্রাম গাড়ী আসিয়া এই চৌরাস্তার নিকট মিলিয়াছে। স্থানটী দেখিতে খুব সুন্দর। এই রাস্তার ধারেই যাদুঘর বা মিউজিয়াম। মিউজিয়ামে এতই দেখিবার জিনিষ আছে যে কেবল চোখ বুলাইয়া দেখিতে গেলেই একজনের তিন মাস যায়। আমরা তাড়াতাড়ি ঘরগুলি ঘুরিয়া আসিলাম। মিউজিয়ামের বাড়ী প্রকাণ্ড—এমন মোটা মোটা দেয়ালযুক্ত বাড়ী কলিকাতায় আর নাই। বাড়ী দেখিয়া মনে হয়, ইহার বুঝি আর কোন দিন ধ্বংস নাই। তেতালা বাড়ী—ভিতরের দিকে চকমিলান। উঠানে একটী ক্ষুদ্র উদ্যান: নীচের তালায় একদিকে ভারতের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত নানারূপ প্রস্তরমূর্ত্তি, শিলালিপি, কারুকার্য্যযুক্ত প্রস্তরফলক রাখা হইয়াছে। যাহারা ইতিহাসের আলোচনা করেন তাঁহারা এইখানে বসিয়া অনেক পুরাতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া থাকেন। অপরদিকে প্রস্তরীভূত জীবকঙ্কাল ও নানারূপ প্রস্তর। দ্বিতলের বারান্দায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটী প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটীর এতই সুন্দর গঠন যে হাত পাগুলি যেন মোমে গড়া বলিয়া মনে হয়। এই দ্বিতল গৃহের উত্তর কক্ষে ভূতত্ত্ব বিষয়ক নানা দ্রব্য সংগৃহীত। একখানি পাথর আছে, রবারের মত নোয়ান যায়। দেয়ালে ভারতবর্ষের একখানি প্রকাণ্ড বন্ধুর মানচিত্র (Raised map) আছে। সোণা রূপা প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ পদার্থে অনেকগুলি আলমারী ভরা। ভারতবর্ষের হীরক আছে। কোহিনুরের একটা সুন্দর আদর্শ আছে। পূর্ব্বের ঘরে গিয়া দেখিলাম একটা বাঘ ও একটা সিংহ যুদ্ধ করিতেছে। দুইটাই অবশ্য মরা—কিন্তু বেশ সুন্দর

করিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এত বড় একটা কচ্ছপের খোলা যে তা'তে চড়িয়া অনায়াসে নদী পার হওয়া যায়। একটা সামুদ্রিক মাছের (Balcno-petra Indica) দুইখানি চোয়াল আছে। চোয়াল দুখানি দেয়ালের গায় হেলাইয়া রাখা হইয়াছে। হাড়ের মাথা ছাদে ঠেকিয়াছে। এই চোয়াল দেখে মনে হয়, মাছটা অন্ততঃ ৬০ হাত লম্বা ছিল। দক্ষিণের ঘরে নানারূপ পাখী সাজান আছে। সমস্তই মরা জীব—পেটের নাড়ীভুড়ী বাহির করিয়া, তাহার স্থানে ঔষধ মাখান তুলা পুরিয়া শেলাই করিয়া দিয়াছে। যাহারা প্রাণীতত্ত্ব পাঠ করে, তাহারা এখানে আসিয়া অনেক তত্ত্ব শিক্ষা করে। পূর্ব্বের দিকে আরও নূতন ঘর হইতেছে। এক ঘরে মাটীর তৈয়ারী মানুষ দেখিলাম। ভারতের নানা জাতি মানুষের চেহারা আছে। তারপর কৃষ্ণনগরের তৈয়ারী আরও সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। এইখানে একটা বিবাহ বাড়ীর পুতুল আছে। বর, কনে, পুরোহিত, বাদাকর, এয়ো প্রভৃতি যার যেমন হওয়া উচিত, ঠিক সেইরূপ তৈয়ারী। একটা কালী বাড়ীর পুতুল আছে। ব্রাহ্মণেরা বসিয়া লুচি খাইতেছে—উঠানে পাঁঠা কাটা হইয়াছে—এইরূপ সমস্ত ব্যাপার অতি সুন্দর সাজান। একঘরে আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের গহনা ও শাড়ীর নমুনা বোঝাই। আর বেশী দেখিতে পারিলাম না। এই সব দেখিতে দেখিতেই ৫টা বাজিয়া গেল। ৫টার সময় মিউজিয়াম বন্ধ হয়। এখান হইতে আমরা মিউনিসিপাল বাজারে গেলাম।

মিউনিসিপাল বাজার।—চৌরঙ্গী হইতে অনেকদুর পর্য্যন্ত সাহেব পল্লী। সাহেবেরা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসেন তাহা তোমরা জান। এই চৌরঙ্গী পল্লী সেই জন্য ভারি পরিষ্কার। আর সাহেবেরা অনেকেই ধনী—কাজেই বাড়ীগুলিও বেশ সুন্দর। মিউনিসিপাল বাজারটী সাহেব মেমদিগের জন্যই তৈয়ারী। তবে সকলেই এখানে জিনিষ ক্রয় করিতে পারে। এই বাজার একটী প্রকাণ্ড ঘরে—

ঘরটীও বেশ সুন্দর আর বেশ উঁচু। একটা গ্রামের বড় হাট যত জায়গা জুড়িয়া বসে—এই ঘরটীতে তত জায়গা। জিনিষপত্রগুলি সুন্দররূপে সাজান। এক লাইনে কেবল ফলের দোকান, এক লাইনে শাক সবজী; সমস্তগুলি জিনিষ ধুইয়া মুছিয়া এমন সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে যে, কাঁচাই খাইতে ইচ্ছা হয়। এইরূপ এক লাইনে কেবল মাছ, এক লাইনে মাংস। মিউনিসিপালিটির একজন কর্ম্মচারী সর্ব্বদা ঘুরিয়া ঘুরিয়া জিনিষ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। কোনরূপ পচা কি খারাপ জিনিষ বিক্রয় করিবার হুকুম নাই। এ সকল ছাড়া কাপড়, জামা, ছাতা, রুমাল, মোজা, খেলনা, ছুরি, কাঁচি, দোয়াত, কলম, সুগন্ধিদ্রব্য, সাবান, ফুল, ফুলের গাছ, চাল, ডাল, ময়দা, ঘি, মাখন, রুটী, বিস্কুট, কেক প্রভৃতি সংসারের নিত্য ব্যবহার্য্য সমস্ত জিনিষই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার নিকটেই একটী বৃহৎ তেতালা ঘরে মিউনিসিপালিটীর আফিস। আমরা এই বাজার হইতে মাছ, তরকারী ও নানারূপ ফল কিনিয়া লইয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয় দিন।

মেডিকেল কলেজ।—প্রাতঃকালে মেডিকেল কলেজ দেখিতে গেলাম। আমাদিগের বাসা হইতে বেশী দূর নয়। গোলদীঘির পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে—রাস্তার অপর পারে। এখানে ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। কলেজের প্রাঙ্গণটী একটী বড় গ্রামের মত। এই প্রাঙ্গণে ১৫টী রাজবাড়ীর মত সুন্দর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ আছে। কলেজের প্রধান গৃহে কলেজ ও হাঁসপাতাল। এ গৃহটী অতি সুন্দর। মাটী হইতে দোতালা পর্য্যন্ত খুব বড় বড় সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছে। এই দোতালাতে হাঁসপাতাল। অসংখ্য রোগী। ঘর, বিছানা, কাপড় সব পরিষ্কার। সাহেব, ডাক্তার ও ছাত্রগণ রোগী দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতেছেন ও পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করিতেছেন। অনেকগুলি মেমসাহেব আছেন। ইঁহারা রোগীর

যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। একটী রোগী বলিলেন যে বাড়ীতে মা ভগিনীর নিকটও তিনি সেরূপ শুশ্রূষা আশা করিতে পারেন না। কোন গৃহে চক্ষু চিকিৎসার ব্যবস্থা, কোন গৃহে ধাত্রীবিদ্যা, কোন গৃহে জ্বর, কোন গৃহে অস্ত্রচিকিৎসা ইত্যাদি। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতেই ১০টা বাজিয়া গেল; আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিয়া স্নান, আহার করিলাম ও গাড়ী করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম।

ডালহাউসী স্কোয়ার—আমরা কলেজ ষ্ট্রীট দিয়া দক্ষিণ মুখে গিয়া বৌবাজার ষ্ট্রীটে পড়িলাম। এইখানে অনেকগুলি ভাল ভাল সন্দেশের দোকান আছে। বৌবাজার ষ্ট্রীট দিয়া পশ্চিম মুখে গেলেই ডালহাউসী স্কোয়ার। কলিকাতার মধ্যে এই স্থানটী বড়ই সুন্দর। এরূপ সুন্দর দৃশ্য ভারতের অন্য কোন সহরে নাই। ডালহাউসী স্কোয়ার একটী বড় পুকুর—তার চারিদিকে বেড়াইবার রাস্তা ও ফুলের বাগান। এই বাগানে বাঙ্গালাদেশের কয়েকজন ছোট লাটের প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। বাগানের বাহিরে চারিদিকেই প্রশস্ত রাস্তা—সেই রাস্তার উপর অতি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা। উত্তরে 'রাইটার্‌স্ বিল্‌ডিংস্' নামক একটী সুন্দর ও সুবৃহৎ গৃহ। এইখানে অনেকগুলি সরকারী অফিস বসে। পশ্চিম দিকে কলিকাতার প্রধান ডাকঘর। গৃহটী বড়ই সুন্দর—উপরে মন্দিরের মত একটা প্রকাণ্ড চূড়া। তাহার সঙ্গে খুব বড় বড় ঘড়ি লাগান। অনেক দূর হইতে এই ঘড়ি দেখা যায়। রাত্রিতে এই ঘড়ির মধ্যে আলো দেয়—কাজেই রাত্রিতেও সময় দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা সহরে এই গৃহ একটী সুন্দর গৃহ বলিয়া বিখ্যাত। সম্মুখের গোলাকার ডোম বা গম্বুজটী ২৮টী উচ্চ থামের উপর নির্ম্মিত। মাটী হইতে এই ডোমের চূড়া পর্য্যন্ত ২২২ ফুট উচ্চ। ডোমের ব্যাস ৯০ ফুট। আফিসগৃহ দোতালা। এখানে প্রায় এক হাজার কেরাণী ও দুই হাজার পিয়ন কাজ করে। পূর্ব্বে এইখানে ইংরেজের কেল্লা ছিল। সিরাজউদ্দৌলা যখন যুদ্ধ করিয়া এই কেল্লা দখল

করেন, তখন এই কেল্লার মধ্যস্থিত একটা ছোট ঘরে তিনি ১৪৬ জন ইংরেজ কয়েদী বন্ধ করিয়া রাখেন। ঘরে একটী মাত্র ছোট জানালা

কলিকাতার প্রধান ডাকঘর।
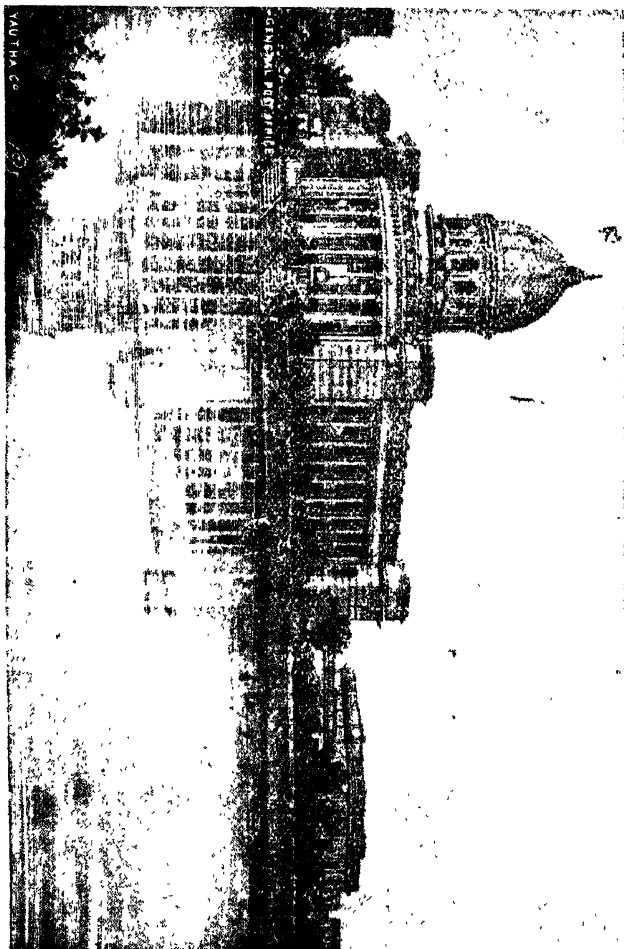
ছিল। প্রাতঃকালে ঘর খুলিলে দেখা গেল যে ২৩ জন মাত্র বাঁচিয়া আছে। এই দুর্ঘটনার নাম "অন্ধকূপ হত্যা।" রাইটার্স্ বিল্‌ডিংস্

ও ডাকঘরের মাঝে রাস্তার উপর এই ঘটনার একটী স্মৃতিস্তম্ভ আছে। দক্ষিণে টেলিগ্রাফ অফিসের সুন্দর ত্রিতল বাড়ী। পূর্ব্বে সাহেবদিগের বড় বড় দোকান। পুকুরের মধ্যে চারিদিকের এই সমস্ত সুন্দর বাড়ীর ছায়া পড়িয়া এই স্থানের দৃশ্য আরও সুন্দর করিয়া তোলে। রাজার আগমন উপলক্ষে যে রাত্রিতে কলিকাতায় আলো দেওয়া হয়, সেই রাত্রিতে এই স্থানের শোভা এত চমৎকার হইয়াছিল যে, যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা আর এ দৃশ্য জীবনে ভুলিতে পারিবেন না।

লাট সাহেবের বাড়ী।—এই ডালহাউসী পুকুর ডান হাতে করিয়া অল্প কিছু উত্তরে গেলেই লাট সাহেবের প্রকাণ্ড বাড়ী। যখন লাট সাহেব কলিকাতায় থাকেন তখন বাড়ীর উপর নিশান ওড়ে। আর তিনি কলিকাতায় না থাকিলে নিশান নামান থাকে। আমরা যেদিন দেখিতে গেলাম সেদিন লাট সাহেব কলিকাতায় ছিলেন না। কাজেই আমরা তাঁহার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলাম। এই বাড়ীর চারিদিকেই রাস্তা—দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে সাহেবদিগের দোকান, পশ্চিমে একটী প্রকাণ্ড সরকারী আফিস। বাড়ীর দক্ষিণদিক খোলা—গড়ের মাঠ। চারিদিকে ৪টী সিংহদ্বার। আমরা উত্তরদিকের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম। সমস্ত বাড়ীর জমি প্রায় ১৮।১৯ বিঘা। বাড়ী উত্তরমুখী। মাটী হইতে অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে হয়। সিঁড়িগুলি খুব বড় বড়। সিঁড়ির ৩৩টী ধাপ। এই সিঁড়ির উপরেই একটা বারান্দা—বারান্দার থামগুলি ৩০ হাত উঁচু। ইহার পরেই নানারূপ কক্ষ। যে কক্ষে সিংহাসন আছে সেটী ৬০ হাত লম্বা ও ২০ হাত প্রশস্ত। মেজেতে সোণার কাজকরা (কারপেট) গালিচা পাতা আছে। দেয়ালে ও কারনিশে সোণার গিল্টি করা। ভিতরে নানারূপ আসন ও একখানি সিংহাসন। এই সিংহাসন মহীশূরের রাজা টিপু সুলতানের ছিল। সিংহাসনে সোণার কাজ করা।

এই ঘরে নানারূপ সুন্দর সুন্দর চিত্র ও মূর্ত্তি আছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া, রাজা তৃতীয় জর্জ্জ এবং অনেক বড়লাটের ছবি। আর একটী কক্ষ বড়ই সুন্দর—এটী নাচঘর। নীচে কাঠের পাটাতন, ছাদে কাঠের প্যানেল। সমস্তই চিত্র বিচিত্র। এমন সুন্দর সাজান যে, না দেখিলে তাহা বর্ণনায় বুঝা যায় না। লাট সাহেবের বাড়ার উপর একটা বৃহৎ ডোম বা গম্বুজ আছে। শয়নঘর, আহারের ঘর, বিশ্রামের ঘর, পাঠের ঘর, ভোজনের ঘর, প্রভৃতি যে কতই সুন্দর সুন্দর কক্ষ আছে তাহা গণিয়া উঠিতে পারিলাম না। নানারূপ মারবেল পাথর দিয়া মেজেগুলি বাঁধান। নানারূপ বহুমূল্য আসবাবে গৃহ পরিপূর্ণ।

ভারতের নানা যুদ্ধে দেশীয় রাজাদিগের নিকট হইতে যে সকল পিতলের কামান কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল সেগুলি বাড়ীর উঠানে সাজান আছে। বাড়ীর চারিদিকে চার ফুট উঁচু দেয়াল আর দেয়ালের পাশে নানারূপ গাছ। লাট সাহেবের বাড়ী দেখিয়া আমরা মনুমেণ্ট দেখিতে গেলাম।

মনুমেণ্ট।—গড়ের মাঠের মধ্যে একটা ১১০ হাত উঁচু স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভের ভিতর ঘুরান সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়ি দিয়া স্তম্ভের উপর উঠিলে কেবল কলিকাতা নয়, কলিকাতার চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। ডায়মণ্ড হারবারে (সমুদ্রে) জাহাজ দেখা যায়। এই স্তম্ভের উপর দুইটী থাক্ আছে। এই থাকে দাঁড়াইতে হয়। খুব মজবুত রেলিং আছে—পড়িয়া যাইবার ভয় নাই। অকটার-লোনী নামক একজন বীর সেনাপতি নেপালের গুরখাদিগকে পরাস্ত করেন। তাঁহার সেই কীর্ত্তি স্মরণার্থে এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

তৃতীয় দিন।

আমরা প্রাতঃকালে হাঁটিয়াই জলের কল দেখিতে গেলাম। কলেজ ষ্ট্রীট দিয়া বরাবর দক্ষিণে গেলে বহুবাজার ষ্ট্রীট—বৌবাজার

পার হইয়া বরাবর দক্ষিণে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। এই রাস্তার ধারে জলের কল। ঘরের ভিতর একটা মস্ত চাকা ঘুরিতেছে। কলের জোরে নীচের পুকুর হইতে জল একটা উচ্চ ছাদে ওঠে। সেখান হইতে এই জল নল দিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে যায়। এই সমস্ত সীসার নল— মাটীর নীচে দিয়া চালাইয়া দিয়াছে। প্রথমে নদী হইতে জল আনা হয়। এই জল নানারূপ পুকুরের মধ্য দিয়া পরিষ্কার হইতে হইতে আসে। কলের ঘরের পূর্ব্বদিকে ইহার একটা পুকুর আছে। এই পুকুরের উপর ছাদ করা, তাহার উপর মাটী দিয়া ঘাস লাগান। এই পুকুরের উপর লোক-জন বেড়াইতে আসে। নীচে যে পুকুর আছে তাহা কেহ বলিয়া না দিলে সহজে বুঝিতে পারা যায় না। কলিকাতা খুব বড় সহর। একটা জলের কলে সকলের কাজ চলে না। এইজন্য এইরূপ আরও তিনটী কল আছে। এই কল দেখিয়া বরাবর দক্ষিণে বেড়াইতে গেলাম। একটু দূরেই মুসলমান ছাত্রগণের জন্য মাদ্রাসা কলেজ। ৯টার সময় ফিরিয়া আসিয়া স্নান আহার করিলাম ও গাড়ী করিয়া পুনরায় বেড়াইতে বাহিরে গেলাম।

হাইকোর্ট ও টাউন হল —ডালহাউসী স্কোয়ারের পশ্চিম দিক দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে—সেই রাস্তার দক্ষিণ দিকে গেলেই হাই-কোর্ট—লাট সাহেবের বাড়ীর পশ্চিমে, গঙ্গার পূর্ব্বে। মফঃস্বলে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট যে সকল মোকদ্দমা বিচার করেন, সেই বিচারে যদি পক্ষগণ অসন্তুষ্ট হয়, তবে তাহারা পুনর্ব্বিচারের জন্য হাইকোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করে। হাইকোর্টের জজেরা খুব বিজ্ঞ ব্যক্তি—তাহারা ধীর স্থিরভাবে সমস্ত বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দেন। হাইকোর্টে প্রায় ১৭।১৮ জন জজ আছেন। এক জন বিচার করিলে ভুল হইতে পারে বলিয়া দুই দুই জন জজ একসঙ্গে বিচার করেন। এখানে অনেক উকিল ও ব্যারিষ্টার আছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত। শ্রীযুক্ত

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (জজ) ও শ্রীযুক্ত রাসবেহারী ঘোষ (উকিল) বিদ্যাতে বুদ্ধিতে সকলের প্রধান।

হাইকোর্টের গৃহটী পাথরে তৈয়ারী। চক্ মিলান, তেতালা বাড়ী। বাড়ী পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা। দক্ষিণের দিক্ ২৮০ হাত ও পূর্ব্বদিক ২০০ হাত। নানারূপ ছোট বড় থাম ও খিলান এবং গম্বুজে বাড়ীর সম্মুখের দৃশ্য ছবির মত হইয়াছে। উঠানে একটী উদ্যান—উদ্যানের মধ্যে ফোয়ারা। দ্বিতলে উকিল বাবুগণের লাইব্রেরী ও ব্যারিষ্টারগণের লাইব্রেরী আছে। জজগণের এজলাসও এই দোতালায়।

এই হাইকোর্টের পূর্ব্বে টাউন হল গৃহ। এইখানে কলিকাতার বড় বড় সভা হইয়া থাকে। সভার দিনে খরচ বাবত ৫০৲ টাকা জমা দিতে হয়। এই ঘরটীও খুব বড়—দোতালা। ইহার সম্মুখের বারান্দার থামগুলি খুব মোটা ও উঁচু। উপর তালায় যে ঘরে বক্তৃতা হয় তাহার মাপ ১৬২ ফুট লম্বা ও ৬৫ ফুট প্রশস্ত। ঘর-ভরা চেয়ার। ঘরের কার্ণিশ দিয়া সারি ধরিয়া গ্যাস আলোর নল; রাত্রিতে যখন সমস্ত আলো জ্বালিয়া দেয়, তখন আলোর মালার মত দেখায়। এই ঘরের সম্মুখের মাঠে বড় লাট বেণ্টিঙ্কের পিতল (ব্রোঞ্জ) মূর্ত্তি আছে। ইনি সতীদাহ তুলিয়া দেন। তাই এই মূর্ত্তির নীচে একটী সতী দাহের চিত্র আছে। গড়ের মাঠের চারিদিক দিয়া এইরূপ অনেক মূর্ত্তি আছে। প্রায় মূর্ত্তিই লাট সাহেবদিগের; কতকগুলি পাথরের কিন্তু অনেকগুলিই পিতলের (ব্রোঞ্জ)।

দুর্গ।—ইহার পর আমরা গঙ্গার ধার দিয়া দুর্গ দেখিতে গেলাম। দুর্গ দেখিতে হইলে আজকাল পাশ নিতে হয়। কিন্তু সে সময়ে এমন নিয়ম ছিল না। অনেক দূর হইতে মনে হয় যে দুর্গটী বুঝি মাটীর নীচে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। চারিদিকে ক্রমোচ্চ মাটীর দেয়াল আছে। তাহাতে ঘাস লাগান। এই দেয়ালে দুর্গের অনেক ঘরের

ছাদ পর্য্যন্ত ঢাকা পড়িয়াছে। এইজন্য মনে হয় কেল্লা যেন মাটীর নীচে। এই মাটীর প্রাচীরের পরেই কেল্লা বেষ্টন করিয়া একটী বড় খাত বা পরিখা—৩০ ফুট গভীর ও ৫০ ফুট প্রশস্ত। এরূপ ব্যবস্থা আছে যে এক ঘণ্টার মধ্যে গঙ্গার জলে এই খাত পূর্ণ করিয়া ফেলা হয়। ইহার পর প্রকাণ্ড প্রাচীর। এইরূপ ভাবে এই সমস্ত খাত ও প্রাচীর গঠিত যে অল্পক্ষণ দেখিয়া ইহার নির্ম্মাণকৌশল বুঝিতে পারা যায় না। পরিখার উপর কাঠের সেতু আছে। আবশ্যক হইলে সেতু তুলিয়া লওয়া যায়। ছয়টী প্রবেশের দ্বার আছে। দ্বারে সমস্ত সময় পাহারা থাকে। কেল্লার ভিতরে একটী সহর। দশ হাজার সৈনিকের বসবাসের নিমিত্ত বাড়ী-ঘর আছে। সকল রকম জিনিষ বিক্রয়ের দোকান আছে। দুর্গের প্রাচীরের উপরে ৯৯৯ টি কামান সাজান থাকে। দুর্গমধ্যে ছোট ছোট পাহাড়ের মত করিয়া নানা আকারের গোলা সাজাইয়া রাখিয়াছে। এখন যেখানে কলিকাতার বড় ডাকঘর, পূর্ব্বে সেইখানে দুর্গ ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর এইখানে নূতন দুর্গ প্রস্তুত করা হইয়াছে। যে সময়ে এই দুর্গ নির্ম্মিত হয় তখন তৃতীয় উইলিয়াম ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন। তাঁহারই নামে এই দুর্গের নাম 'ফোর্ট উইলিয়াম'। 'ফোর্ট' অর্থ দুর্গ। এই দুর্গ নির্ম্মাণে ২০০০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩, ০০, ০০, ০০০ টাকা খরচ হইয়াছিল। দুর্গ দেখিয়া আমরা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ইডেন গার্ডেন দেখিতে গেলাম।

ইডেন গার্ডেন।—হাইকোর্টের দক্ষিণে—গঙ্গার ধারে, ইডেন গার্ডেন নামক একটী খুব বড় বাগান আছে। 'গার্ডেন' অর্থ উদ্যান। লর্ড অকল্যাণ্ড নামে একজন বড়লাট ছিলেন। তাঁহার ভগিনী মিসেস্ ইডেনের যত্নে এই বাগান প্রস্তুত হয়। সেইজন্য এই বাগানের নামের সঙ্গে সেই মহিলার নাম যোগ করা হইয়াছে। এই বাগানে অনেক সাহেব, মেম ও কলিকাতার অন্যান্য লোক বেড়াইতে আসেন। বাগানের ভিতর নানারূপ পুষ্পবৃক্ষ, তাল জাতীয় বৃক্ষ, পাতাবাহারের গাছ নানাভাবে

সাজান আছে। বাগানের কেয়ারীর ভিতর দিয়া বড় বড় রাস্তা। মাটী কাটিয়া একটি ছোট নদীও করা হইয়াছে; তাহার উপর যাতায়াতের পুল আছে। সেই নদীতে ছোট ছোট নৌকা আছে। চারি আনা দিলে সেই নৌকায় চাড়িয়া বেড়ান যায়। এই নদীর ধারে ব্রহ্মদেশ হইতে আনীত একটী সুন্দর কাঠের মন্দির রাখা হইয়াছে। বাগানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে খানিকটা স্থান বেশ খোলা—মাটীতে ঘাসগুলি এরূপ সুন্দর করিয়া ছাঁটিয়া রাখে যে মনে হয় যেন মখমলের বিছানা। এই স্থানে বসিবার জন্য অনেক বেঞ্চ আছে। সন্ধ্যার সময় কেল্লা হইতে ইংরেজ বাদ্যকর আসিয়া এখানে একটী গোল ঘরে দাঁড়াইয়া সুন্দর বাদ্য শুনায়। এখানে কয়েকটী বড় বড় কৃত্রিম ফোয়ারা আছে। এই সকল ফোয়ারা হইতে অনবরত অসংখ্য ধারায় জল উঠিতেছে। সন্ধ্যার সময় এখানে তাড়িতের আলো জ্বলে। একস্থানে তাড়িতের কল আছে—যেই সেই কল খুলিয়া দেয় আর বাগানের সমস্ত আলো একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠে। ফোয়ারার জলের উপর তাড়িতের উজ্জ্বল আলো পড়িলে অপূর্ব্ব শোভা হয়। আমরা রাত্রি ৯ টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

চতুর্থ দিন।

আমাদিগের বাসার একটী ছাত্র ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে পড়িত। তার সঙ্গে প্রাতঃকালে ক্যাম্বেল স্কুল দেখিতে গেলাম। বৌবাজার ষ্ট্রীট দিয়া বরাবর পূর্ব্বদিকে গেলে আপার সারকিউলার রোড নামক রাস্তায় পড়া যায়। এইখানে শিয়ালদহ ষ্টেশন। এই স্থান হইতে অল্প কিছু দূর দক্ষিণে গেলেই ক্যাম্বেল স্কুল। যাহারা মেট্রিকিউলেশন (বা এণ্ট্রান্স) পর্য্যন্ত পড়িয়াছে তাহারা এখানে ভর্ত্তি হইয়া ডাক্তারী শেখে। মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া কয়েকটী মহিলাও এখানে পড়িতেছেন। এখানেও অনেক রোগী আছে। হাঁসপাতালের ব্যবস্থা ভাল। বাটীর

প্রাঙ্গণটী বেশ সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ীতে ৮॥০ টার সময় ফিরিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি স্নান আহার শেষ করিলাম; কারণ সেদিন আমরা আলিপুর পশুশালা দেখিতে যাইব ঠিক করিয়াছিলাম। গড়ের মাঠের ভিতর দিয়া যে রাস্তা উত্তরমুখে গিয়াছে আমরা সেই রাস্তায় গেলাম। যাইবার সময় পথে গাড়ীতে থাকিয়াই ঘোড়দৌড়ের মাঠ, জেলখানা, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ (কেবল তৈয়ারী হইতেছে) প্রভৃতি অনেক জিনিষ দেখিলাম। আমাদিগের বাসা হইতে পশুপালায় পৌঁছিতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিল। যে গ্রামে এই পশুশালা তাহার নাম আলিপুর।

পশুশালা।—বাগানে ঢুকিতে প্রত্যেককে চার পয়সা করিয়া ফি দিতে হয়। একটা গ্রামের মত জায়গা ঘিরিয়া এই পশুশালার বাগান তৈয়ারী করিয়াছে। মধ্যে নানারূপ সুন্দর সুন্দর গাছ। সুন্দর কৃত্রিম নদী, বড় বড় রাস্তা। আর মধ্যে মধ্যে নানারূপ ঘরে বিভিন্ন প্রকারের পশু পক্ষী। উত্তরদিকের একটা ঘরে বড় বড় বাঘ, সিংহ। খুব শক্ত লোহার রেলিং দেওয়া—কাজেই কোন ভয় নাই। ৮টী বাঘ, প্রত্যেকটীই ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে। একটী বাঘ ভালুকের মত কাল। একটা বাঘ একটা ঘোড়ার মত বড়। তিনটী সিংহ। সিংহগুলি বাঘের মত চঞ্চল নয়। তারপর এক ঘরে নানারূপ শেয়াল দেখিলাম। একটা একেবারে সাদা। আর এক ঘরে নানারূপ ছোট ছোট বাঘ—এগুলিকে বন বিড়াল বলে—অর্থাৎ এগুলি বাঘের মত বড় নয় কি বিড়ালের মত ছোট নয়। ইহারা পাখী ধরিয়া খাইতে খুব মজবুত। তারপর জিরাফ ও জেব্রা দেখিলাম। জিরাফটা গলা বাড়াইয়া দিয়া একটা দশহাত উঁচু গাছের উপর ডালের পাতা খাইতেছে—জিরাফের গলা খুব লম্বা। জেব্রা দেখিতে গাধার মত—কিন্তু গায়ে গাঢ় কালরঙের ডোরা আছে বলিয়া বেশ দেখায়। এক ঘরে নানারূপ পাখী দেখিলাম। তার মধ্যে একটা 'স্বর্গ-পাখী'

ছিল। অনেক লম্বা লম্বা সাদা পালকে পাখীটীকে বড়ই সুন্দর করিয়াছে। আরও কত রকম সুন্দর সুন্দর পাখী আছে তাহার নাম মনে নাই। তারপর এক ঘরে সরীসৃপ। বড় ছোট নানারূপ তাজা সাপ কাচের ছোট ছোট ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল ঘরের একদিকে লোহার জাল লাগান। সেই দিক দিয়া বাতাস প্রবেশ করে। এই ঘরের মধ্যে শ্বেতপাথরে বাঁধান একটা ছোট পুকুর। সেই পুকুরে ৩টা কুমীর। এই ঘর দেখিয়া বানরের ঘরে ঢুকিলাম। এই ঘরেই ছেলেরা খুব আমোদ পায়। সকলেই আসিবার সময় ইহাদের জন্য কলা, পেয়ারা, বিস্কুট কিনিয়া আনে। দর্শক দেখিলেই ইহারা খাঁচার মধ্য হইতে হাত বাড়াইয়া খাবার চায়। প্রায় ১৫।১৬ রকমের বানর আছে। একটা খুব ছোট সাদা বানর আছে, সেটা আসামে পাওয়া গিয়াছিল। আসামের উল্লুক আছে। ইহারা হুকু হুকু করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলে অস্থির করিয়া তোলে। দুষ্ট ছেলেরা ইহাদিগকে ডাকাইবার জন্য নিজেরা দুই এক-বার হুকু হুকু করিয়া ডাকে—আর যাবে কোথায়—এমনি চীৎকার আরম্ভ করে যে সে ঘর হইতে পলাইতে হয়। উল্লুক বেশ দুই পায় হাঁটিতে পারে। একটা খুব বড় উল্লুক আমাদিগকে নানারূপ ব্যায়াম দেখাইল। বানরের খাঁচার খুব নিকটে যাইতে নাই। একটী বালকের একখান গরদের চাদর টানিয়া লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। একটী মুসলমান বালকের মাথা হইতে টুপি তুলিয়া নিল। এখান হইতে আমরা দক্ষিণ দিকে গেলাম। নানারূপ হরিণ, গোরু ও মহিষ দেখিলাম। একটা ঘরে বড় বড় ভালুক আছে। ভালুক চুপ করিয়া থাকিতে পারে না—একবার সম্মুখে যাইতেছে একবার পেছনে আসিতেছে। একটা অষ্ট্রীচ পাখী দেখিলাম। ঘোড়ার মত এই পাখীতে চড়িতে পারা যায়। অনেকগুলি ক্যাঙ্গারু দেখিলাম। একটা ক্যাঙ্গারুর বুকের থলের ভিতর থেকে একটা বাচ্চা মুখ বাহির করিতেছিল।

যখন বাঘ ও সিংহ ডাকিতে থাকে তখন গোরু হরিণ প্রভৃতি নিরীহ প্রাণী ভয়ে অস্থির হইয়া ছুটাছুটি করে। ইহারা ত একথা বুঝিতে পারে না যে বাঘ সিংহ ছুটিতে পারিবে না। ইহারা বেশী অস্থির হইলে রোগগ্রস্ত হইতে পারে, এই জন্য বাঘ ও সিংহকে বেশী ডাকিতে দেওয়া হয় না। কেমন ক'রে থামায় জান? সাপের ঘর থেকে একটা সাপের খাঁচা আনিয়া ইহাদের সাম্‌নে রাখিয়া দেয়। এমন জীব নাই যে সাপকে দেখিয়া ভয় না পায়। এই জন্য সাপ দেখিলেই বাঘই হউক বা সিংহই হউক চুপ করিয়া এক কোণে গিয়া বসিয়া থাকে। আমরা প্রায় সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিলাম। গড়ের মাঠে গ্যাসের আলোর লণ্ঠন জ্বালিয়া দিয়াছে—ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল। (পাথুরে কয়লা গরম করিলে এক রকম গ্যাস বাহির হয়। তাহাতে আগুন দিলেই জ্বলিতে থাকে। এক জায়গায় অনেক পাথুরে কয়লা আগুনে তাতান হইতেছে; সেই গ্যাস নল দিয়া কলিকাতার সমস্ত স্থানে চালান করিতেছে। এই সমস্ত নল মাটীর নীচে দিয়া চালান।) গঙ্গার ধারে নানারূপ ছোট বড় জাহাজের মাস্তুলগুলি দুর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন একটী বড় গুপারীর বাগানের সমস্তগুলি গাছের মাথা ঝড়ে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—কেবল গাছ গুলি খাড়া আছে। রাত্রি ৯টায় বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। তোমাদিগকে এক কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—পশুশালার একটু দক্ষিণে একটী সুন্দর বাড়ী আছে—তার নাম বেলভেডিয়ার। এই বাড়ীতে পূর্ব্বে বাঙ্গালার ছোটলাট বাস করিতেন।

পঞ্চম দিন।

আমরা প্রাতঃকালে পরেশনাথের মন্দির দেখিতে গেলাম। এটী জৈনদিগের মন্দির। মাড়োয়ারীগণ জৈনধর্ম্মাবলম্বী। এই মন্দিরটী শিয়ালদহ ষ্টেশনের কিছু উত্তরে একটা বড় গলির ভিতর। মন্দিরটী বড় নয়—তবে বেশ সুন্দর। মধ্যে একটা খুব বড় ঝাড় লণ্ঠন আছে।

মন্দিরের দেয়ালে ও থামে সোণার গিল্টি করা—বড় বড় আয়না (দর্পণ) বসান। নূতন লোক অনেক সময় অপ্রস্তুত হয়। সম্মুখে যে আয়না আছে তাহা বুঝিতে পারে না—চলিতে চলিতে গিয়া দেয়ালে কি থামে ঠোকর খায়। মন্দিরের সম্মুখে উঠানটী পাথর দিয়া বাঁধা। একটী সুন্দর ছোট পুকুর আছে—আর পুকুরের ধারে সুন্দর কতকগুলি পাথরের মূর্ত্তি আছে। আমরা ৯৷৷০ টার সময় ফিরিয়া আসিলাম ও ১১টার সময় গাড়ী করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম।

বড়বাজার।—আমরা হ্যারিসন রোড দিয়া পশ্চিমমুখে যাইতে যাইতে বড়বাজারে আসিলাম। এইখানে মাড়োয়ারীদিগের বড় বড় দোকান। কাপড়ের দোকানই বেশী। তবে বড়বাজারে চা'ল, ডা'ল, ঘি, মসলা, লোহার জিনিষ, কম্বল, রেসম, সোনা, রূপা, তামা, কাসা, ঔষধ, নানারূপ ফল, মিঠাই প্রভৃতি সমস্ত জিনিষই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মফঃস্বল ও সহরের বাজারে যে সকল জিনিষ বিক্রয় হয় তাহার প্রায় সমস্তই এই বাজার হইতে আমদানী হয়। এখানে সর্ব্বদাই লোকে লোকারণ্য। পথ চলা মুস্কিল। আমরা বড়বাজার ছাড়াইয়া গঙ্গার ধারে আসিলাম। সম্মুখে গঙ্গার পুল।

হাবড়ার পুল।—গঙ্গার উপর যে পুল আছে তাহাকে হাবড়া ব্রিজ বা হাবড়ার পুল বলে। এই পুলটী কাঠের তৈয়ারী। দুই ধারে লোক চলাচলের পথ—মধ্য দিয়া গাড়ীচলার পথ। এক সঙ্গে চার পাঁচ খানি গাড়ী চলিতে পারে—পথটী এ পরিমাণ প্রশস্ত। পুলের দুই ধারে রেলিং দেওয়া। কাহারও জলে পড়িয়া যাইবার ভয় নাই। তোমরা গ্রামের কত পুল দেখিয়াছ। জলের ভিতর বাঁশ বা থাম পুঁতিয়া তাহার উপর পুল তৈয়ারী করে। কিন্তু গঙ্গার এই পুলের থাম নাই। পুলটী নৌকার উপর রাখা হইয়াছে। জলের উপর কতকগুলি লোহার নৌকা ভাসান আছে। সেই নৌকার উপর মাস্তুলের মত মোটা মোটা থাম। এই

থামের উপর পুল—কাজেই পুলটী জলের উপর ভাসিতেছে। পুলের নীচ দিয়া সর্ব্বদা ষ্টীমার ও নৌকা যাতায়াত করে। কিন্তু বড় বড় জাহাজ যাইতে পারে না। সেই জন্য মধ্যে মধ্যে এই পুল খুলিয়া ফেলে। পুলের মধ্য হইতে কয়েকখানি নৌকা সরাইয়া লইয়া যায়। আর পুলের খানিক অংশ তাহার সঙ্গে সরিয়া যায়। বড় জাহাজ বাহির হইয়া গেলে আবার নৌকা টানিয়া আনিয়া পুল মিলাইয়া দেয়। যখন পুল খুলিয়া ফেলে, তখন লোকজন ষ্টীমারে পার হয়। পুল পার হইলে হাবড়া রেল-ষ্টেশন।

হাবড়া রেলষ্টেশন।—ভারতবর্ষের মধ্যে ইহার মত বড় ষ্টেশন আর নাই। দুই তিনটী বড় গ্রামে যত জায়গা—এই ষ্টেশন ও ইহার আনুসঙ্গিক নানারূপ ছোট-বড় ঘর প্রায় তত জায়গা জুড়িয়া আছে। ষ্টেশনের প্ল্যাটফরম ১০টী। প্রায় প্রত্যেক ১৫ মিনিট পর পরই গাড়ী ছাড়ে। এইখান হইতে গাড়ী চড়িয়া এলাহাবাদ, আগ্রা, বোম্বে, মান্দ্রাজ, দিল্লী, পুরী, নাগপুর প্রভৃতি ভারতের প্রায় সকল বড় বড় সহরে যাইতে পারা যায়। যেখানে যাত্রীরা আসিয়া বিশ্রাম করে সে ঘরটীর ভিতর প্রায় ৩ হাজার লোক বসিয়া থাকিতে পারে। ঘরটী লোহার থামের উপর তৈয়ারী—খুব উচু। ইহার চারিদিক দিয়া দোতালা তেতালা ঘর—নানারূপ গঠনে বেশ সুন্দর করিয়া গড়া। এই সমস্ত ঘরে আফিস। এখান হইতে ইষ্টইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল-নাগপুর নামক দুইটী বড় বড় রেল কোম্পানীর গাড়ী যাতায়াত করে। যাত্রিদিগের বসিবার ঘরে, গাড়ী ছাড়িবার প্ল্যাটফরমে ইলেকট্রিক পাখা ও ইলেকট্রিক আলো আছে। এই সকল পাখা সর্ব্বদাই কলে ঘুরিতেছে। অনেকগুলি টিকিটের ঘর আছে। সকল সময়েই টিকিট বিক্রী হয়। মেমসাহেবেরা টিকিট বিক্রয় করে। হাবড়া ষ্টেশন গঙ্গার পশ্চিম পারে। ঠিক গঙ্গার উপরেই। এই দিক হইতে কলিকাতার শোভা দেখিবার জিনিষ। গঙ্গার ধার দিয়া

বড় বড় সুন্দর সুন্দর বাড়ী, নদীতে বড় বড় জাহাজ, আর গঙ্গার জলে এই সমস্তের ছায়া বড়ই সুন্দর। আমরা এখান হইতে শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেন দেখিতে গেলাম। শিবপুর হাবড়ার দক্ষিণে একটী গ্রাম। ষ্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। বোটানিকেল গার্ডেন অর্থাৎ নানারূপ উদ্ভিদ শোভিত উদ্যান।

বটানিকেল গার্ডেন।—এই উদ্যান গঙ্গার পশ্চিম পারে। গঙ্গার ধারে এক মাইল পর্য্যন্ত এই উদ্যানের পূর্ব্ব সীমা। উদ্যানের জমি ৭৫০ বিঘা হইবে। ভিতরে বড় বড় রাস্তা আছে। গাড়ী চড়িয়াই বেড়ান যায়। একটী রাস্তার দুই ধারে তাল জাতীয় এক রকম গাছ লাগান—রাস্তায় এক দিকে দাঁড়াইয়া দেখিলে বড়ই সুন্দর দেখায়। আর একটী রাস্তার দুই ধারে মেহেগেনী (মেহেগ্নী) গাছের সারি। মধ্যে মধ্যে তারের ঘর আছে। তাহার উপরে লতা ও ভিতরে সুন্দর ফুলের বা পাতার গাছ। এইরূপ অনেকগুলি লতামণ্ডপ আছে। একটা বড় অশ্বত্থ গাছই খুব আশ্চর্য্য জিনিষ। এই গাছটী গুঁড়ি হইতে প্রায় চারিদিকে হাজার ফুট জমি পর্য্যন্ত জুড়িয়া আছে। গাছের বেড় ৫৫ ফুট, আর এই গাছের ছোট বড় প্রায় ২০০ শত ব (বা ঝুরি) নামিয়া মাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। একটা গাছেই যেন একটা ছোট খাট বন। নানাদেশ হইতে নানারূপ অদ্ভুদ অদ্ভুদ লতা, গুল্ম, বৃক্ষ আনিয়া এই উদ্যান সাজান হইয়াছে।

এই বাগানের পাশেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এখানেও অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর বাড়ী আছে, আর নানারূপ কল কারখানা আছে। আমরা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ষ্টীমারে গঙ্গা পার হইয়া হাইকোর্টের কাছে নামিলাম। সেখান হইতে ট্রামে চড়িয়া বাসায় আসিলাম। ট্রামগাড়ীও এক আশ্চর্য্য জিনিষ। এই গাড়ী ঘোড়ায় কি রেলগাড়ীর মত ইঞ্জিনে চালায় না। রাস্তার উপর উঁচু থামের মাথায় মাথায় তার

চালাইয়া দিয়াছে। সেই তারের সঙ্গে একটা খুব বড় তাড়িৎ কলের যোগ আছে। তারের ভিতর সর্ব্বদা তাড়িত চলিতেছে। ট্রামগাড়ীর উপরে মাস্তুলের মত একটা লোহার ডাণ্ডা লাগান আছে। ইহার মাথায় একটা ছোট চাকা। যখন ট্রাম চালাইবার দরকার হয় তখন এই ডাণ্ডার মাথার চাকাটী থামের উপরের তারে লাগাইয়া দেয়। অমনি ইহার ভিতর দিয়া তাড়িৎ শক্তি আসিয়া গাড়ী চালাইতে থাকে। ট্রামের গাড়ীতে রাত্রিতে যে আলো দেয় তাহাও তাড়িতের আলো। আমরা ৯টার সময় বাসায় ফিরিলাম। পর দিন প্রাতে হাবড়া ষ্টেশন হইতে আগ্রার তাজমহল দেখিবার জন্য পশ্চিমে রওয়ানা হইলাম।

কলিকাতার নক্‌সায় চিহ্নিত স্থানের পরিচয় :—(১) গোলদীঘি (২) হেদুয়া দীঘি (৩) নিমতলা ঘাট (৪) ডালহাউসী স্কোয়ার (৫) ফোর্ট উইলিয়ম (৬) ঘোড়দৌড়ের মাঠ (৭) লাটসাহেবের বাড়ী (৮) যাদুঘর (৯) মিউনিসিপাল বাজার (১০) বটানিকেল গার্ডেন (১১) শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (১২) খিদিরপুর ডক (১৩) ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির। (১৪) আলিপুর পশুশালা (১৫) হাবড়া ষ্টেসন (১৬) হাবড়া পুল (১৭) শিয়ালদহ ষ্টেসন।
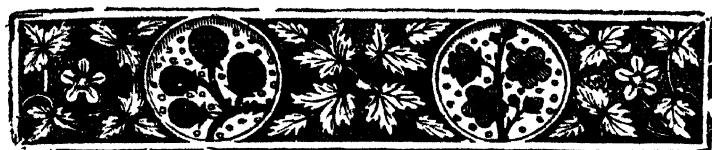
ষষ্ঠ প্রকরণ।

—:০:—

(১১।১২।১৩ বৎসরের বালক বালিকার জন্য)

১। ভারকেন্দ্র।

বালকগণকে আঙ্গুলের উপর পেনসিল রাখিয়া (ভূ সমান্তর ভাবে) ওজন করিতে বল। যে পর্য্যন্ত পেনসিলের ঠিক মধ্যস্থল আঙ্গুলের উপর না আসিবে সে পর্য্যন্ত পেনসিল ঠিক থাকিবে না। একটা ষ্টীল পেনের হ্যাণ্ডেল লও (যে হ্যাণ্ডেলের মাথা সরু ও গোড়া মোটা) এখন আঙ্গুলের উপর ওজন কর। এবারে হ্যাণ্ডেলের ঠিক মধ্যস্থল ধরিয়া ওজন চলিবে না। এবারে আঙ্গুলের উপর হইতে হ্যাণ্ডেলের মোটাদিক কম ও সরুদিকে বেশী বাহির হইয়া থাকিবে।

পেনসিল ও হ্যাণ্ডেলের মাঝখানে সূতা বাঁধিয়া দেখাও। পেন-সিলটী আগাগোড়া সমান বলিয়া তাহার মাঝখানে সূতা বাঁধিলেই চলিল কিন্তু হ্যাণ্ডেলটীর একদিক মোটা ও একদিক সরু বলিয়া, সূতা মোটা ভাগের দিকে সরাইয়া বাঁধিতে হইল।

বালকগণের হাতে এক একখানি রেকাবী বা থালা দাও ও আঙ্গুলের উপর ওজন করিতে বল। রেকাবীর ঠিক মধ্যস্থলে বা কেন্দ্রে আঙ্গুল না রাখিলে ঠিক ওজন হইবে না। বালকগণকে এক একখানি পুস্তক বা

শ্লেট এক আঙ্গুলের উপর ওজন করিতে বল। শ্লেটের যেখানে আঙ্গুল রাখিয়া ওজন করিলে, ঠিক সেইখানে একটী দাগ দিয়া রাখ। তারপর শ্লেটের উপর দুইটী কর্ণরেখা টানিয়া দেখাও যে আঙ্গুলের মাথা কর্ণরেখা দুইটীর ঠিক সংযোগস্থলেই ছিল। এই যেস্থানের উপর আঙ্গুল রাখিয়া দ্রব্যাদি ওজন করা হইল সেই স্থানটীকে ভারকেন্দ্র বলে। বস্তুটী যদি শ্লেটের মত কি অন্য কোন প্রকার জ্যামিতিক আকৃতি বিশিষ্ট হয়, তবে এইরূপ কর্ণরেখাদি টানিয়াই ভারকেন্দ্র বাহির করা যায়।

বস্তুটী অন্য আকারের হইলে নিম্নলিখিত নিয়মে ভারকেন্দ্র বাহির করা যায় :—

(১)। বস্তুটীর এক পাশে একগাছি সুতা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দাও। বস্তুটীর উপর এই সূতার বরাবর (মাটীর উপর লম্ব করিয়া) একটী রেখা টান।
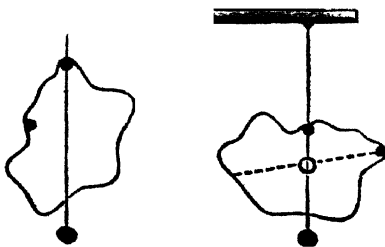
(২) বস্তুটীর আর এক পাশে সূতা বাঁধিয়া ঝুলাও ও পূর্ব্বের ন্যায় আর একটী ভূলম্ব রেখা টান।

(৩) এই দুই রেখাদ্বয় যেখানে ছেদ করিবে সেই বিন্দুই বস্তুটীর ভারকেন্দ্র।

যেখানে বস্তুটী ঝুলাইয়া বাঁধিবে ঠিক সেখানে ওলন দড়ি (একগাছি দড়ির মাথায় একখান ইট বা পাথর কি অন্য কোন ভারী জিনিষ বাঁধিলেই ওলন দড়ি হইবে) ধর। এই ওলন দড়ি বরাবর দাগ দিলেই মাটীর উপর লম্ব হইবে।

প্রমাণ কর যে কোন বস্তুর ভারকেন্দ্র আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে সে বস্তু কখনই ভূশায়ী হইবে না। সিঁড়ির মত করিয়া, একটার উপর আর একটা রাখিয়া কতকগুলি পয়সা সাজাও। যতক্ষণ উপরের পয়সার

কিঞ্চিৎ অংশ নীচের পয়সার সীমার মধ্যে থাকিবে ততক্ষণ পয়সার স্তম্ভটী (তেড়া হইলেও) পড়িয়া যাইবে না। কারণ পয়সার ভারকেন্দ্র নীচে ভূমি ছাড়াইয়া যায় নাই।

(শিক্ষক পিসানগরের সুপ্রসিদ্ধ তেড়াস্তম্ভের গল্প বলিতে পারেন)

আমরা বালতি করিয়া জল আনিবার সময় একদিকে কা'ত হই কেন? যে হাতে জলের ভার থাকে, তাহার বিপরীত দিকে মাথা হেলাইয়া দিয়া সেই দিকের ভার সমান করিয়া লই। নীচের ভূমি যত প্রশস্ত হয়, ভারকেন্দ্রের স্থানও তত বিস্তৃত হয়। পা দুখানি ফাঁক করিয়া দাঁড়াইলে সহসা একজনে ধাক্কা দিয়া ফেলিতে পারে না। দুই চরণের পার্শ্ব হইতে তাহাদের মধ্যস্থিত সমস্ত স্থান মানুষের ভারকেন্দ্রের ভূমি।

একটী কর্কের গায় দুইখানি ছুরি ঝুলাইয়া দাও (চিত্রের মত)। কর্কের ভিতর একটা মোটা স্ু'চ চালাইয়া দাও। একটা বোতলের উপর একটী পয়সা রাখিয়া তাহার উপর ঐ শলাকাযুক্ত কর্কটী খাড়া করিয়া রাখ। বেশ থাকিবে। ইচ্ছা করিলে একটু ঘুরাইয়াও দিতে পার।
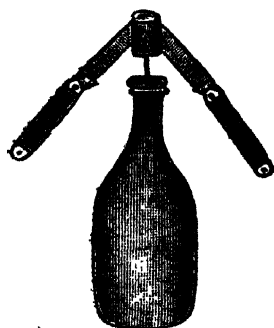
নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর :—

(১) চেয়ার হইতে উঠিবার সময় আমরা সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া উঠি কেন?

(২) একটী বালককে দেওয়ালের গায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইতে বল। ঠিক সেই ভাবে থাকিয়া তাহাকে এক পা তুলিতে বল। সে পারিবে না। কেন?

(৩) আর একটী বালককে দেয়ালের গায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইতে বল। এখন মাথা নোয়াইয়া হাত দিয়া মাটী ছুঁইতে বল। পারিবে না। কেন?

২। আপেক্ষিক গুরুত্ব।

একটা লোহার বড় (৪।৬ ইঞ্চ) গ্রেক সংগ্রহ কর। ছুরির দ্বারা এই গ্রেকের আকারের একখানি কাঠ ও একখানি শোলা প্রস্তুত করিয়া লও। বালকগণকে জিজ্ঞাসা কর কোন্‌টী ভারী? লোহা ভারী, কাঠ শোলা অপেক্ষা ভারী। কিন্তু কোন্ জিনিষ অপেক্ষা কোন্ জিনিষ কতগুণ ভারী তাহা কেহ বলিতে পারিবে না।

কেমন করিয়া জিনিষের গুরুত্বের তুলনা করা যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাও।

প্রথমে বুঝাইয়া দাও যে কোন জিনিষ মাপিতে হইলে আমরা সেই জিনিষকে, অপর একটা জিনিষের সহিত তুলনা করি। যেমন কাপড় মাপিতে হইলে আমরা বলি ১০ হাত কি ৭ হাত অর্থাৎ কাপড়খানিকে আমাদের হাতের সহিত তুলনা করিয়া তাহার পরিমাণ বুঝিয়া লই। সেইরূপ দ্রব্যাদির গুরুত্ব বুঝিতে হইলে তাহাদিগকে আমরা জলের গুরুত্বের সহিত তুলনা করিয়া বুঝিয়া লই।

মনে কর এমন একখণ্ড লোহা সংগ্রহ করিলাম যাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ ১ ফুট করিয়া অর্থাৎ এক ঘনফুট। আবার এমন একটী (বাক্সের মত) পাত্র (টিনের, পিতলের, মাটীর, কাচের, বা অন্য যে কোন পদার্থের) প্রস্তুত করিলাম যাহার মধ্যস্থানের পরিমাণ ১ ঘনফুট। এখন এই লৌহ খণ্ড ওজন কর—মনে কর যেন ৭৮০০ আউন্স (এক আউন্স প্রায় অর্দ্ধ ছটাক)। আবার ঐ পাত্রটী ওজন কর—মনে কর যেন ২০ আউন্স। এখন ঐ পাত্রে জল ঢালিয়া আবার জল সমেত ওজন কর। মনে কর যেন ১০২০ আউন্স। পাত্রের ওজন ২০ আউন্স বাদ দিলে জলের ওজন থাকিল ১০০০ আউন্স। সমান আকারের লোহার ওজন ৭৮০০ আউন্স। সুতরাং সমান আকারের জল ও লোহার তুলনায়, লোহা জল অপেক্ষা

$\frac{৭৮০০}{১০০০}$ = ৭·৮ গুণ ভারী। ইহাকেই সংক্ষেপে বলে লোহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭·৮।

আবার এই পরীক্ষা খুব সংক্ষেপেও দেখাইতে পার। এক গেলাস জল আন—পূর্ণ গেলাস। জলের মধ্যে একটা নুড়ি ফেলিয়া দাও। গেলাস হইতে জল পড়িয়া গেল। কতটা জল পড়িল? ঠিক নুড়িটা গিয়া গেলাসের মধ্যে যতটা স্থান দখল করিল, ততটা স্থানের জল বাহির হইয়া পড়িল। তাহা হইলেই বোঝা গেল যে নুড়ি নিজের আকারের পরিমাণ জল ফেলিয়া দিয়াছে।

আচ্ছা, এখন একটা ভাল নিক্তি কি দাঁড়িপাল্লা আন। একটা জলপূর্ণ গেলাস একখানি থালার উপর রাখ। একটা লোহার প্রেকের গায় একগাছি সরু সুতা বাঁধিয়া, ঐ প্রেকটা দাঁড়ীপাল্লায় ওজন কর। মনে কর ৮ তোলা হইল। তারপর প্রেকটা সুতার দ্বারা এক
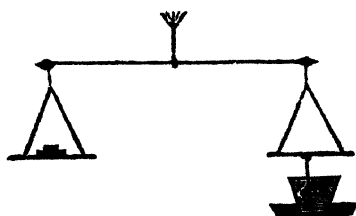
তুলাদণ্ড।

পাল্লার নীচে বাঁধিয়া দাও (চিত্র দেখ)। ঐ প্রেকটা যাহাতে গেলাসের ভিতর ডুবিয়া যায় এরূপ ভাবে পাল্লাটা ধর। জলের ভিতর প্রেক গেলেই—গেলাস হইতে খানিকটা জল থালায় পড়িয়া যাইবে। এবারে প্রেকের ওজনও কম হইবে। মনে কর ৭ তোলা। এখন অতি সাবধানে থালার জল ওজন কর। পূর্ব্বে একটা ছোট বাটি ওজন করিয়া রাখ। এখন ঐ বাটিতে, থালার জল ঢালিয়া ওজন করিয়া দেখ। বাটির ওজন বাদ দিলেই, জলের ওজন জানিতে পারিবে।

এখন দেখ লোহার ওজন ছিল ৮ তোলা। জলে ওজন করিলে লোহার ওজন হ'ল ৭ তোলা। জল ওজন করিলে হ'ল ১ তোলা। লোহা জলে প্রবেশ করিয়া যতটা জল ফেলিয়া দিয়াছে, তাহার ওজন যত, জলে প্রবেশ

করাতে লোহার ওজনও ঠিক ততটা কমিয়া গিয়াছে। তারপর লোহার ওজন ৮ তোলা। আবার ঠিক সেই লোহার মাপের জলের ওজন ১ তোলা। কাজেই লোহা জল অপেক্ষা ৭ গুণ ভারী বা লোহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭ (ঠিক হিসাবে ৭·২৪)।

এইরূপে সোণা রূপা প্রভৃতির আপেক্ষিক গুরুত্ব বাহির করিতে পারা যায়।

নানা দ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব (সমান আকারের জলের তুলনায়)।

প্লাটিনাম ধাতু	২১ · ৪৫	গুণ ভারী
সোণা	১৯ · ২৫	,,
পারা	১৩ · ৫৮	,,
রূপা	১০ · ৪৭	,,
তামা	৮ · ৯	,,
লোহা	৭ ·২৪	,,
হীরক	৩ ·৫৫	,,
দুধ	১ ·০৩	,,
তেল	·৯৮	,,
তারপিন	·৮৭	,,
শোলা	·২৫	,,

৩। তুলাদণ্ড।

একখানি ৪ ফুট লম্বা কাষ্ঠদণ্ড বা বাঁশের বাখারী সংগ্রহ কর। সেই কাঠ বা বাঁশে শিক পোড়াইয়া ৩ ইঞ্চ অন্তর অন্তর কতকগুলি ছিদ্র কর। আর একখানি ১ ফুট কি ২ ফুট লম্বা বাঁশের মাথায় হাড়কাঠের মত কাস্তা কাটিয়া লও। তাহার কাস্তায় ছিদ্র করিয়া (ঠিক হাড়কাঠের মত একটা শলাকা পরাইবার ব্যবস্থা কর। সেই কাষ্ঠখণ্ড বা বাঁশের বাখারীর মধ্য ছিদ্রের ভিতর শলাকা পরাইয়া কাস্তার উপর (চিত্র দেখ) বসাইয়া

দাও। তার বাঁকাইয়া দুইটা S এই আকারের হুক প্রস্তুত কর। দণ্ডের এক পার্শ্বস্থিত ছিদ্রের মধ্যে একটী হুক পরাইয়া তাহাতে একটী ওজন (মনে কর আধসের বাটখারা) ঝুলাইয়া দাও। অপর দিকের প্রান্তে ঠিক ঐরূপ আর একটী সমান ভার না ঝুলাইলে ওজন ঠিক হইবে না। এখন বালকগণকে শলাকা, হুক ও ওজন সরাইয়া সরাইয়া নানারূপ পরীক্ষা করিতে বল।
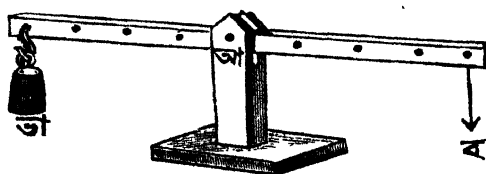
তুলাদণ্ড।

দণ্ড খুলিয়া এবারে ২নং ছিদ্রের মধ্যে শলাকা লাগাও। একদিকে থাকিল দণ্ডের ১ ফুট, আর একদিকে ৩ ফুট। দণ্ডের ছোট বাহুর প্রান্তে একটা ৩ সেরের বাটখারা (বা ১ সের ছোট ছোট ৩টী বাট-খারা কাপড়ে বাঁধিয়া) ঝুলাও। দণ্ডের বড় বাহুর প্রান্তে ১ সের বাটখারা ঝুলাইলেই ওজন ঠিক হইবে। তাই দেখ দণ্ড লম্বা হইলে অল্প ওজন দিয়া বেশী ওজনের জিনিষকে তৌল করা যায়। এইরূপ আরও পরীক্ষা করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, এক দিকের বাহুর দৈর্ঘ্যের সহিত সেই দিকের ওজন গুণ করিলে যত ফল হয়, অপর দিকের বাহুর দৈর্ঘ্যের সহিত সেই দিকের ওজন গুণ করিলে ঠিক তত হওয়া আবশ্যক। না হইলে দণ্ড ভূ সমান্তর থাকিবে না। ভূ সমান্তর না হইলে ওজনও সমান হইবে না। ওজন করিতে হইলে দণ্ডটীকে যে ভূ সমান্তর করিতে হয় তাহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া ও দেখাইয়া দাও।

প্রশ্ন।—একটী ৬ ফুট দণ্ডের এক দিকে ২ ফুট ও অপর দিকে ৪

ফুট বাহু আছে। ২ ফুট বাহুর দিকে ৪ সের ভার দিলাম, ৪ ফুট বাহুর দিকে কত ভার দিলে দণ্ড ভূ সমান্তর হইবে?

২ × ৪ = ৪ × কত?

উত্তর—২ সের।

সাধারণতঃ তুলাদণ্ডের বাহুদ্বয় দুই দিকেই সমান থাকে। অসমান বাহুদ্বয় বিশিষ্ট তুলাদণ্ডের ব্যবহার খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়।

তুলাদণ্ডে যে জিনিষ ওজন করা হয় সেই জিনিষকে 'ভার' বলে। যে বাটখারা দিয়া ওজন করা হয় তাহাকে 'বল' বলে, যে স্থানে ভর করিয়া দণ্ডটী দুইদিকে দোলে তাহাকে 'আশ্রয়' বলে। আশ্রয়ের দুই দিকের দণ্ডকে দুই 'বাহু' বলে। যেরূপে তুলাদণ্ডের বিষয় আমরা বর্ণনা করিলাম তাহাকে প্রথম প্রকার তুলাদণ্ড বলে। প্রথম প্রকার তুলাদণ্ডের আশ্রয় মধ্যে থাকে, আর ভার ও বল তাহার দুই দিকে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার তুলাদণ্ডে ভার মধ্যে থাকে, আর বল ও আশ্রয় ভারের দুই দিকে থাকে। জাঁতি দিয়া সুপারী কাট। জাঁতির কবজা আশ্রয়, সুপারী ভার, আর তোমার হাত বল। হাত দিয়া

দরজার এক খানি পাল্লা ঘুরাও। এখানে তোমার হাত বল, দরজার পাল্লা ভার ও কবজা আশ্রয়। ছুরি কাঁচি শান দিবার জাঁতাকল এই শ্রেণীর তুলাদণ্ড; নৌকার দাঁড়ও এই শ্রেণীভুক্ত—জল হ'ল আশ্রয়, নৌকা হ'ল ভার, আর তোমার হাত হ'ল বল।

তৃতীয় প্রকার তুলাদণ্ডে বল মধ্যে থাকে, আশ্রয় ও ভার বলের দুই দিকে। এরূপ তুলাদণ্ডের দৃষ্টান্ত খুব কম। আমাদিগের বাহু এই প্রকার তুলাদণ্ডের উত্তম দৃষ্টান্ত। আমারা যখন কোন জিনিষ

হাতে ধরিয়া তুলি তখন হাতের সেই জিনিষই হয় ভার, হাতের নিম্নবাহু ও উর্দ্ধবাহুকে যে দ্বিশীর পেশীযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে এবং যাহার সাহায্যে আমরা বাহু তুলিতে পারি তাহাই বল, আর আমাদিগের দেহের কনুইর নিকট যে কব্জা আছে তাহাই হইল আশ্রয়। আমা-দিগের দেহের অনেক যন্ত্রই এই শ্রেণীভুক্ত। পা দিয়া ফুটবল খেলিবার সময়—ফুটবল ভার, জঙ্ঘা ও গোড়ালীর পেশী বল, আর হাঁটুর কব্জা আশ্রয়।

স্মরণার্থ।—'আভাব' ক্রমে কেন্দ্র নিলে, তুলাদণ্ডের প্রকার মিলে।

অর্থাৎ প্রথম প্রকার তুলাদণ্ডে আ (আশ্রয়) মধ্যে থাকে, দ্বিতীয় প্রকারে ভা (ভার) ও তৃতীয় প্রকারে ব (বল) মধ্যে।

৪। তাপের কার্য্য।

একটা ছোট ঘটি জলপূর্ণ করিয়া আগুণে চাপাও। জল গরম হইলে ঘটির খানিকটা জল পড়িয়া যাইবে। কেন? উত্তাপ দিলে তরল জিনিষের আকার বাড়িয়া যায়। আকার বাড়িলে ঘটিতে ধরে না বলিয়া পড়িয়া যায়। দুধ জ্বাল দিবার সময় তোমরা হয়ত অনেক সময় দেখিয়াছ, একটু অসাবধান হইলেই দুধ উতলাইয়া মাটীতে পড়িয়া যায়। এইরূপ সকল তরল পদার্থই তাপ দিলে বাড়ে। আবার তাপ নষ্ট করিয়া দিলেই তরল পদার্থ পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। দুধ উতলাইয়া পড়িয়া যাইবার মত দেখিলে, তৎক্ষণাৎ উনন হইতে দুধের কড়াই নামাইয়া রাখ, আর দুধ পড়িবে না। ঠাণ্ডা লাগিয়া দুধ আবার পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

এক রকম রবারের বাঁশি পাওয়া যায়—মুখে একটা কাঠের ছোট নল লাগান। ফুঁ দিয়া বাজাইলে রবারের থলেটী ফুলিয়া উঠে। দাম

দাম ৫১০, ৫১৫ পয়সা। এই রকম একটা বাঁশি সংগ্রহ কর। কাঠের মুখটী খুলিয়া ফেল ও একটু সূতা দিয়া রবারের থলের মুখ খুব কসিয়া বাঁধ। আগুনের ধারে রাখ। থলেটী আস্তে আস্তে ফুলিতে থাকিবে। কেন? তাপে থলের ভিতরের বায়ু বাড়িয়া উঠিবে ও থলে ফুলিয়া যাইবে। তাই দেখ তাপে বায়ুরও আয়তন বাড়ে। উননের ভিতর আস্ত বাঁশ দিলে বাঁশ ফাটিয়া শব্দ হয়, কেন? বাঁশের পাবের মধ্যে যে বায়ু থাকে, তাপে তাহা ফুলিয়া উঠে, তাই বাঁশের পাব ফাটিয়া যায়। ঘরে আগুন লাগিলে অনেক দূর থেকে বাঁশ ফাটার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

কঠিন দ্রব্যও তাপে বাড়ে। একখানি টিনের ভিতর এমন একটী ছিদ্র কর যে একটা পিতলের গোল মোটা তার সেই ছিদ্রের ভিতর আঁট আঁট (ঢিল ঢিল ভাবে নয়) ভাবে যাতায়াত করিতে পারে। এখন এই তার বেশ গরম কর। চিমটা দিয়া ধরিয়া টিনের ঐ ছিদ্রের ভিতর চালাইতে চেষ্টা কর। এবারে ঢুকিবে না। তার আগুনের তাপে ফুলিয়া মোটা হইয়াছে। জলে ঠাণ্ডা কর—তার আবার সরু হইবে ও ছিদ্রের ভিতর পূর্ব্বের ন্যায় যাতায়াত করিবে।

উত্তাপে তার যে কেবল মোটাই হয় তাহা নহে, লম্বের দিকেও বাড়িয়া যায়। তাহারও একটা পরীক্ষা কর।

একটা লোহার ছাতার শিক, ২টী স্থচ, ৩।৪ খানি ইঁট, এক টুকরা কাঠ ও একটুকরা ভাঙ্গা কাচ সংগ্রহ কর। তারপর চিত্রের অনুরূপ করিয়া ইঁট সাজাইয়া তাহার উপর লোহার শিক রাখ। একদিকে দুইখানি ইঁট (ই ই) অপর দিকে একখানি ইঁট (ই) ও তাহার উপর একখানি কাঠ (ক)। শিকের ছিদ্রের মধ্যে (ছাতার শিকের এক প্রান্তে ছিদ্র থাকে) একটা সূঁচ (সূঁ) চালাইয়া দিয়া সেই সূঁচ কাঠের (ক) উপর পুঁতিয়া রাখ। যেন শিক না নড়িতে পারে। অপর দিকে ইঁট

দুখানির উপর একটুকরা যেমন-তেমন কাচ (কা) রাখিয়া তার উপর আড় করিয়া একটা সূঁচ (সূ) রাখ। সেই সূঁচের উপর শিকের অপর প্রান্ত রাখ। এই সূঁচের মাথায় (সূচটী কাচের উপর হইতে একটু বাহির করিয়া রাখিবে) একটা সরু খড় (খ) বিদ্ধ করিয়া ঝুলাইয়া রাখ।
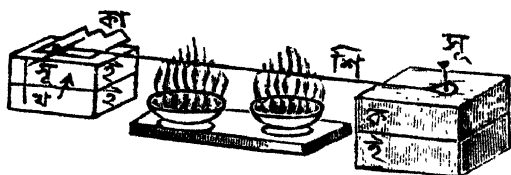
শিকের নীচে আবশ্যক মত দুই তিনটী বাটি বা সরায় কেরোসিন তেল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দাও। শিকটী যেমন দৈর্ঘ্যে বাড়িতে থাকিবে, শিকের নীচের সূঁচও সঙ্গে সঙ্গে গড়াইতে আরম্ভ করিবে। (সূঁচটী সহজে গড়াইতে পারিবে বলিয়া কাচ দেওয়া আবশ্যক।) সূঁচের মাথায় যে খড় গাঁথিয়া রাখিয়াছ সেই খড় ঘুরিয়া উঠিতে থাকিবে। এই খড় উঠিতে দেখিলেই বালকেরা বুঝিবে যে শিক বড় হইতেছে আর সেই জন্যই সূঁচ গড়াইতেছে ও সূঁচের মাথায় বিদ্ধ খড় উপরের দিকে উঠিতেছে।

প্রশ্ন।—জল গরম করিবার সময় হাঁড়ি ভরিয়া জল দেয় না কেন? কাচের বোতলে গরম জল ঢালিলে, বোতল ফাটিয়া যায় কেন?

গাড়ীর চাকায় (কাঠের) লোহার বেড় লাগায়। লোহার বেড়টীকে কাঠের চাকার পাশ (পরিধি) হইতে সামান্য একটু ছোট বা সমান করিয়া তৈয়ার করে। এই লোহার বেড়টীকে আগুনে পোড়াইয়া লাল করে। এই অবস্থায় চিম্‌টা দিয়া ধরিয়া কাঠের চাকার গায়ে পরাইয়া দেয়। লোহার চাকার বেড় একটু ছোট হইলেও, উত্তপ্ত বেড় বড় হইয়া কাঠের চাকার গায় বেশ বসিয়া যায়। সেই সময় তাহার উপর

জল ঢালে। লোহার বেড়টা ছোট হইয়া কাঠের চাকাকে এমন চাপিয়া ধরে যে আর কোনরূপে কাঠের চাকার বেড় খুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

রেল বসাইবার সময়, দুইখানি রেলের জোড়ের কাছে একটু ফাঁক রাখে। কেন? উনানের ভিতর বেল পোড়াইতে দিলে, শব্দ হয় কেন?

তাপে যে কেবল জিনিষকে বড় করে তাহাই নহে, আবার শক্ত জিনিষকে তরল করে ও তরলকে বায়বীয় করে। লাক্ষা, মোম, সীসা, গন্ধক গলাইয়া দেখাও।

জলে তাপ দিলে জল বায়বীয় আকার ধারণ করিয়া উড়িয়া যায়। আবার তাপের অভাব হইলে অর্থাৎ ঠাণ্ডা লাগিলে বায়বীয় জিনিষ তরল হয় এবং তরল জিনিষ কঠিন হয়।

শীতকালে ঘি, নারিকেল তেল কঠিন হইয়া যায়। রান্নার হাঁড়ি থেকে যে ধোঁয়ার মত পদার্থ উঠে তাহার গায় একখানি ঠাণ্ডা থাল লাগাইলে ধোঁয়া থালের গায় লাগিয়া জল হইয়া যাইবে।

বোর্ডে লিখিয়া দাও :—

কঠিন পদার্থে তাপযুক্ত হইলে তরল হয়, তরল পদার্থে তাপযুক্ত হইলে বায়বীয় হয়। বায়বীয় পদার্থ হইতে তাপ বিয়োগ করিলে তরল পদার্থ হয়, তরল পদার্থ হইতে তাপ বিয়োগ করিলে কঠিন হয়।

৫। কপিকল বা পুলী।

একটা কাঠের প্যাকিং বাকস সংগ্রহ কর। তাহার ডালা খুলিয়া ফেল। খাড়া করিয়া বসাও। এই বাক্সের মাথায় একখানি ছোট লম্বা কাঠ স্ক্রু দিয়া আঁটিয়া দাও। স্ক্রুর দুই দিকে এই দণ্ডের বাহুদ্বয়

যেন সমান হয়। এই বাহুর এক দিকে দড়ি বাঁধিয়া একটা বাটখারা বা কোন ভারী বস্তু (মনে কর /৫ সের ঝুলাও। এখন এই দণ্ডকে সমান রাখিতে হইলে দণ্ডের বাহুর অপর প্রান্তেও /৫ সের ওজন দিতে হইবে বা এই প্রান্ত সেইরূপ জোরে হাত দিয়া টানিয়া নামাইতে হইবে। ইহা
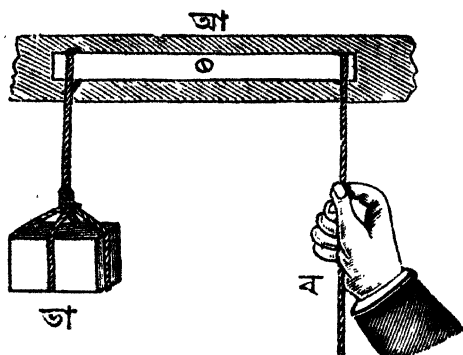
প্রথম প্রকার তুলাদণ্ডের অনুরূপ।

এখন এই দণ্ডের পরিবর্ত্তে, এই দণ্ডের দৈর্ঘ্যের সমান ব্যাস বিশিষ্ট একখানি কাঠের চাকা লাগাও। চাকার ঠিক কেন্দ্রে স্ক্রু আঁটিয়া দাও।

এখন যদি এই চাকার ব্যাসের (ক খ কাঠের) এক দিকে /৫ সের ওজন দি, তবে অপর দিকেও /৫ সের ওজনের জোরে টানিতে হইবে। (এ সকল প্রথম প্রকার তুলাদণ্ডের রূপান্তর মাত্র)। এই চক্রের ব্যাসের উভয় প্রান্তে দড়ি না বাঁধিয়া, চাকার বেড়ের উপর দিয়া (চাকার বেড়ের উপর দিয়া দড়ি চালাইবার ঘাট কাটিয়া লইবে—পাখা টানার চাকার মত) দড়ি বসাইয়া
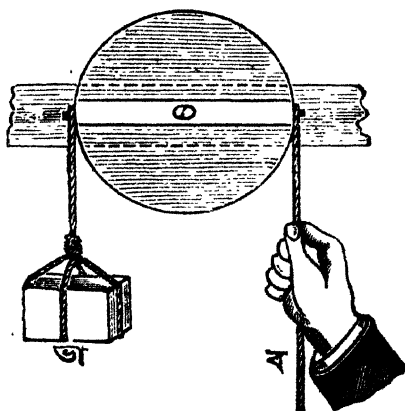
দাও। এইরূপ চাকার মত তুলাদণ্ডকেই কপিকল বা পুলী বলে। এই কপিকলের সাহায্যে আমরা সহজে একটা জিনিষকে যতদূর ইচ্ছা উচ্চে তুলিতে পারি। কপিকল যত উঁচুতে বসান হইবে, জিনিষটীও তত উচ্চে তুলিতে পারা যাইবে। উচ্চ ঘরে বিম বর্গা তুলিতে হইলে এইরূপ কপিকলের ব্যবহার করে।
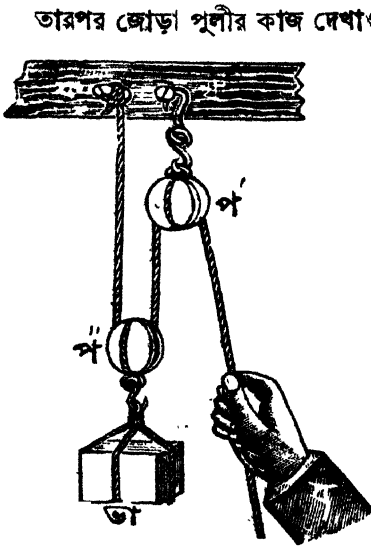
তারপর জোড়া পুলীর কাজ দেখাও। এইরূপ পুলী কিনিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীটে যে সকল ভাঙ্গা লোহা-লক্কড়ের দোকান আছে, তাহাতে খোজ করিলে (৴১৫ কি ৵০ এক আনা দাম) ২।৩টী এইরূপ কপি সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে।

চিত্রের, অনুরূপ করিয়া দুইটী পুলী সাজাও। একটা পুলী অচল (প') বা আবদ্ধ ও একটা পুলী (প'') সচল। এখন এই জোড়া পুলীর সুবিধা বুঝাইয়া দাও। মনে কর সচল পুলীর (প'') সঙ্গে ৴৮ সের ভার ঝুলান আছে। এই পুলীটী কপ'ও প'' প' এই দুই দড়ির দ্বারা ঝুলান। সুতরাং কপ' দড়ির উপর ৴৪ সের, ও প'' প' দড়ির উপর ৴৪ সের চাপ লাগিতেছে।

আবার দেখ যে পুলীটা (প') আবদ্ধ আছে, তাহার দুই দিকেও দড়ি আছে। এক দিকের দড়ি (প'প'') ৴৪ সের ভার টানিয়া রাখিয়াছে, এখন আর এক দিকে ঠিক ৴৪ সের পরিমাণ জোরে (প'ব) দড়ি টানিয়া না ধরিলে ভার ঠিক স্থানে থাকিবে না। তাই দেখ জোড়া পুলীতে এই

সুবিধা হইল—/৮ সের ভারকে /৪ সের পরিমাণ জোর দিয়া ঠিক রাখা গেল। তাহা হইলে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি—যদি দুইটা পুলী থাকে, একটা অচল ও একটা সচল, তবে বল ভারের অর্দ্ধেক (অর্থাৎ /৪ সের ওজন করিতে হইলে /২ সের বলের) প্রয়োগ করিলেই চলিতে পারে।

তার পর বোর্ডে চিত্র আঁকিয়া দেখাও যে পুলীর সংখ্যা বাড়াইলে, বলের পরিমাণ কমান যাইতে পারে। অর্থাৎ পুলীর সংখ্যা বাড়াইলে, একজন বলিষ্ঠ যুবকের কার্য্য একটী ছোট ছেলের দ্বারা সম্পন্ন করান যাইতে পারে।
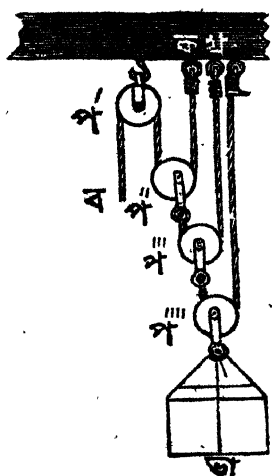
মনে কর প'ব দড়িকে ধরিয়া /১ সের ভারের যে পরিমাণ জোর—তদ্রূপ জোরে কেহ টানিতেছে। তাহা হইলে প' প'' দড়িতেও ঠিক /১ সের জোর লাগিতেছে। তাহা হইলে কপ'' দড়িতেও /১ সের টান পড়িতেছে। তাহা হইলে প' প'' দড়ি প্রথম সচল পুলীটাতে /২ সের ভার ঠিক রাখিতে পারে। এইরূপে দ্বিতীয় সচল পুলী (প''') /৪ সের ও তৃতীয় সচল পুলী (প'''') /৮ সের ভার ঠিক রাখিতে পারে। তবেই দেখ পুলীর সংখ্যা বাড়াইয়া আমরা খুব কম বলে কত গুরুভার ওজন করিতে বা উঠাইতে পারি

বল সামন্তরিক।

একজন বালকের কোমরে চাদর বাঁধিয়া অন্য দুইজন বালককে দুই বিপরীত দিক হইতে টানিতে বল। যে বালকের গায় বল বেশী, মাঝের বালকটী তাহার দিকেই সরিয়া যাইবে। যদি উভয়ের বল সমান হয়, তবে মাঝের বালকটী এক স্থানেই নিশ্চল হইয়া থাকিবে।

খুব জোরে বল্ করিলে (ক্রিকেট খেলায়) সেই বল্ ফিরাইয়া দিবার সময়, ব্যাট দ্বারা খুব জোরে সেই বলে আঘাত করিতে হয়। আবার যদি সেই বল বিপরীত দিকে না ফিরাইয়া বল্টী যেদিকে যাইতেছে সেই দিকেই আর একটু আঘাত করিয়া দেওয়া যায়, তবে উভয় জোরে বল্টী বহুদূর যায়, আর অনেক রান্ (Run) হয়। চালাক খেলোয়াড়েরা সময় ও সুবিধা বুঝিয়া বেগবান বল ফিরাইবার চেষ্টা না করিয়া বলের গতির দিকেই আঘাত করিয়া তাহাকে বহুদূরে চালাইয়া দেয়।

স্রোতে নৌকা চলিয়া যাইতেছে ; তাহাকে থামাইতে হইলে স্রোতের বলের সমান বল আবশ্যক। আবার নৌকাকে যদি স্রোতের বিপরীত দিকে চালাইতে হয়, তবে স্রোতের যত বল তাহা অপেক্ষা বেশী বলের দরকার।

দৃষ্টান্ত দাও। স্রোতের বেগ ঘণ্টায় ৩ মাইল, নৌকা চলনের বেগ ঘণ্টায় ৫ মাইল। (১) স্রোতের অভিমুখে নৌকা চালাইলে ঘণ্টায় কত মাইল যাইবে? (২) স্রোতের বিপরীত দিকে নৌকা চালাইলে ঘণ্টায় কত মাইল যাইবে?

দাঁড়ীপাল্লার ওজনের দৃষ্টান্ত দাও। একটা দাঁড়ীপাল্লায় একদিকে একটা একসেরী বাটখারা দাও, অপরদিকে পুস্তক, ইট বা অন্য কোন পদার্থ দিয়া সমান কর। দুই দিকের বল সমান হইল। এখন যেদিকে অতি সামান্য একটা বাটখারা (আধ তোলা, এক তোলা) দেওয়া

যাইবে, পাল্লা সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িবে। কাজেই একজনকে বলে পরাজয় করিতে হইলে, তাহার বলের চেয়ে একটু বেশী বল থাকা আবশ্যক।

তার পর ঘাসের উপর একটা বল্ কি মারবেল গড়াইয়া দেও। কতদূর গেল মাপিয়া দেখ। ঠিক সেইরূপ জোরে ঐ বল্‌টীকে বাড়ীর পরিস্কৃত উঠানে গড়াইয়া দাও। পূর্ব্বাপেক্ষা এবারে বেশী দূর যাইবে। মাপিয়া দেখাও। আবার ঐ বল্‌টীকে শানবাঁধা ঘরের বারান্দায় গড়াইয়া দাও। আরও দূরে যাইবে। এইরূপে (ঘলিয়া দাও) যদি ঐ বল্‌টীকে মারবেলের মেজের উপর গড়াইয়া দেওয়া যায় তবে আরও বেশী দূর চলিবে। তাই দেখ কোন জিনিষে একবার বল প্রয়োগ করিলে সে জিনিষ ক্রমাগত চলিতে থাকে। তবে যে থামিয়া যায়, সে কেবল জমির বন্ধুরতার জন্য। ইহা ছাড়া মাধ্যাকর্ষণও বল থামাইবার একটা কারণ বটে। এই ব্যাপার হইতে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি:—

কোন পদার্থ স্থির থাকিলে, তাহা স্থিরই থাকিবে—আপনা হইতে চলিতে পারিবে না। আবার যদি চলিতে থাকে, তবে চলিতেই থাকিবে, আপনা হইতে থামিতে পারিবে না। বল প্রয়োগ না করিলে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। চালাইতে হইলেও বলের দরকার, আর থামাইতে হইলেও বলের দরকার। পদার্থের এই গুণকেই (অর্থাৎ সে যে নিজে চলিতেও পারে না বা চলিলে থামিতেও পারে না) জড়ত্ব বলে।

দৃষ্টান্ত।—নৌকায় চড়িয়া যাইতেছ। নৌকাকে দাঁড় দিয়া ধাক্কা দেওয়াতে, নৌকা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তুমি নৌকাতে বসিয়াছ, নৌকার সঙ্গে তুমিও এই ধাক্কায় চলিতেছ। এখন নৌকাখানি চলিতে চলিতে যদি হঠাৎ চড়ায় ঠেকিয়া যায়, তখন নৌকা বিপরীত ধাক্কা (বল) পাইয়া থামিয়া যাইবে বটে, কিন্তু নৌকার মধ্যে তুমি সামনের

দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যাইবে। কেন? নৌকার বেগ চড়ায় থামাইল কিন্তু তোমার বেগ কেহই থামায় নাই বলিয়া তোমাকে আরও চলিতেই হইল। তবে পড়িয়া গিয়া নৌকার কাঠে বাধা পাওয়াতে তোমার বেগও থামিয়া গেল।

জিজ্ঞাসা কর:—বেগবান অশ্ব হঠাৎ থামিয়া গেলে আরোহীর কি অবস্থা হয়? রেলগাড়ী হঠাৎ থামিয়া গেলে যাত্রিগণের কি অবস্থা হয়? চলন্ত রেলগাড়ী বা ট্রামগাড়ী হইতে নামিতে হইলে যেদিকে গাড়ী চলিতেছে সেই দিকেই লাফাইয়া নামিতে হয়। বিপরীত দিকে লাফ দিলে চিৎ হইয়া পড়িয়া যাইবে। কেন?

বলের দ্বারা চালিত হইয়া সকল জিনিষ ঠিক সমানভাবে চলে না। এক লোহার বল যে ধাক্কায় দুই হাত চলিবে, একটা তত বড় কাঠের বল সেই ধাক্কায় ৮ হাত যাইবে। কোন পদার্থ নির্দ্দিষ্ট সময়ে যতদূর যায়, তাহাই উহার বেগ। যেমন রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৩০ মাইল যায়, ষ্টীমার ১৫ মাইল যায়, নৌকা ৫ মাইল যায় ইত্যাদি। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে রেলের বেগ কত?—আমরা উত্তর দি, ৩০ মাইল।

বলের দ্বারা জিনিষ চালিত হইলে সকল সময়েই সরলরেখা ক্রমে তাহার গতি হইয়া থাকে। একটী দড়িতে ঢিল বাঁধিয়া, তাহা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দাও। এতক্ষণ ঢিলের গতি বৃত্তাকারে ছিল বলিয়া, ঢিল হস্তচ্যুত হইলে তাহার সেই বৃত্তাকার গতি থাকে না। ঢিল সরল রেখায় চলিয়া যায়।

বল এক রেখা ক্রমে প্রযুক্ত হইলে কিরূপ অবস্থা হইয়া থাকে তাহা বুঝিয়াছ। এক বিন্দুতে দুইটী সমান বল, বিপরীত মুখে, এক সরল রেখা ক্রমে প্রযুক্ত হইলে, সেই বিন্দু ঠিক সাম্যাবস্থায় থাকিবে। একদিকের বল একটু বেশী হইলে, বিন্দুটী সেই দিকে চলিয়া যাইবে। কিন্তু যদি বল

দুইটী ঠিক এক রেখা ক্রমে প্রযুক্ত না হইয়া অন্যরূপ হয় তবে কি হইবে ?

একখানি নৌকা চলিতেছে—এ পারে একজন গুণ ধরিয়া টানিতেছে, অন্য পারে আর একজন টানিতেছে (এক সরলরেখা নয়)। নৌকা কোন দিকে যাইবে ? এ পারের লোকের দিকেও যাইবে না, ওপারের লোকের দিকেও যাইবে না—নদীর মাঝখান দিয়া যাইবে।

যখন মাঝিরা গুণ টানিয়া নৌকা চালায়, তখন তাহারা গুণ দিয়া নৌকাকে তীরের দিকে টানে। কিন্তু নৌকায় যে মাঝি থাকে, সে হা'ল ঘুরাইয়া নৌকাকে একটু তেড়া করিয়া অপর তীরের দিকে চালাইতে চেষ্টা করে। এই দুই বিপরীত বলের মাঝখান দিয়া নৌকা চলিয়া যায়।

এই মাঝের রাস্তার গতি ঠিক করিবার একটা সঙ্কেত আছে। মনে কর ক বিন্দুকে ক খ ও ক গ দুইটী বলে দুই দিকে (এক রেখাক্রমে নয়) টানিতেছে। এখন ক কোন্ রাস্তায় চলিবে ? খ হইতে ক গ এর সমান্তর একটী রেখা ও গ হইতে কখ এর সমান্তর একটী রেখা আঁকিয়া একটী সমান্তর ক্ষেত্র অঙ্কিত কর। ক ঘ বিন্দু যোগ কর। ক বিন্দু এই কর্ণরেখা বরাবর চলিবে। এই সঙ্কেতের নাম বল সামন্তরিক।
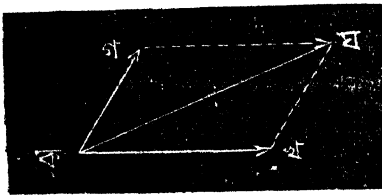
একটা অঙ্ক বুঝাইয়া দাও। মনে কর ক যেন একখানি নৌকা। খ ও গ দুই মাঝি দুই পারে গুণ টানিতেছে। খ মাঝি এক মিনিটে ২০ ফুট, ও গ মাঝি এক মিনিটে ১৫ ফুট চালাইতে পারে। খ মাঝির গায় বেশী জোর। আর দুই মাঝির গুণের মাঝখানের ক কোণ সম-

কোণ। এখন নৌকাখানি কত বেগে চালবে? (বালকেরা ৪৭ প্রতিজ্ঞার সিদ্ধান্ত জানিলেই বুঝিতে পারিবে)

কখ=২০ ফুট

কগ=১৫ ফুট

কখ=গঘ

কঘ^{২}=কগ^{২}+গঘ^{২}

=১৫^{২}+২০^{২}

=৬২৫

কঘ=২৫ ফুট

অর্থাৎ ক নৌকা মিনিটে ২৫ ফুট চলিবে।

৭। তাপমান যন্ত্র।

(থারমমিটার)

উপকরণ—একটী সূক্ষ্ম সমছিদ্র বিশিষ্ট এবং এক প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র কন্দযুক্ত কাচের নল। এক বাটি পারদ, স্পিরিট ল্যাম্প, একটী তৈয়ারী থারমমিটার ও গরম জল।

তোমাদিগের কাহার কাহার জ্বর হইয়াছে? জ্বর হইলে শরীরের অবস্থা কিরূপ হয়? সমস্ত জ্বরেই কি গা এক রকম গরম হয়? (তিন বাটিতে গরম জল রাখ—কিন্তু দুই বাটিতে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া গরম কিছু কিছু কমাইয়া দাও) পরীক্ষা করিয়া দেখ ত তিন বাটির জল সমান গরম না কম-বেশ আছে? কম-বেশ বোধ হইতেছে। কোন্‌টী কি পরিমাণ গরম? (বাটি দেখাইয়া) এ বাটির জল খুব বেশী গরম, এইটীর তার চেয়ে কম। কত কম?

এখন দেখা যাইতেছে যে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে একটা পরিমাপক চাই। তিনখানি কাপড় তুলনা করিতে হইলে আমরা

বলিয়া থাকি ১০ হাত, ৮ হাত ও ৬ হাত বা এইরূপ অন্য কোন সংখ্যা। তিন বাটিতে দুধ থাকিলে বলিতে পারি যে /১ সের, /॥০ সের, /।০ এক পোয়া পরিমাণ দুধ আছে। কিন্তু কোন্ দ্রব্যে কি পরিমাণ উষ্ণতা থাকে তাহা জানিবার উপায় কি? যে যন্ত্র দ্বারা উষ্ণতার পরিমাণ নির্ণীত হয় তাহাকে তাপমান যন্ত্র বা থারমমিটার বলে।

প্রস্তুত প্রণালী।—কাঁচের নলটীর কুন্দযুক্ত প্রান্ত স্পিরিট ল্যাম্পে অল্প অল্প করিয়া তাতাও। তাত দিতে ভয় করিও না—এ সকল কাঁচের নল আগুনে ভাঙ্গে না। ইহাতে নলের অভ্যন্তরস্থ বায়ু বাহির হইয়া যাইবে। এখন একটা করফার (ফানেলের) সাহায্যে নলের ভিতর পারদ ঢাল বা নলের খোলা মুখ পারদের বাটির মধ্যে ডুবাইয়া দাও। এইরূপ ডুবাইয়া দিলে পারদ আপনিই নলের ভিতর প্রবেশ করিবে। এইরূপে কুন্দটী ও নলের সামান্য অংশ পূর্ণ কর। এখন নলের খোলা মুখ স্পিরিট ল্যাম্পের উপর ধরিয়া গলাও। এইরূপে গলিয়া গেলে মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে—আর পারদ বাহির হইতে পারিবে না। এই সমস্ত কাচের এই একটু বিশেষত্ব থাকে যে ইহা সহজেই স্পিরিট ল্যাম্পের আগুণে গলিয়া নরম হয়।

এখন নলটী শীতল হইলে পারদ কিছুদুর নামিয়া আসিবে। যদি এই কুন্দটী বরফ গলা জলে ডুবান যায় তবে পারদ আরও নীচে নামিয়া আসিবে। বরফ খুব ঠাণ্ডা—বরফ গলা জলের ভিতর কুন্দটী রাখাতে যতদুর নামিয়া

আসিল সেই স্থানে আমরা একটি দাগ কাটিয়া রাখিলাম। ইহাই হইল ঠাণ্ডার সীমা। আবার ঐ কুন্দটী ফুটন্ত গরম জলে ডুবাইয়া দাও। এবারে
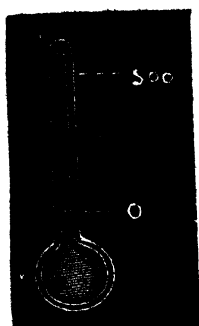
পারদ খুব উপরে উঠিল। (বালকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেই বালকেরা বলিবে যে তাপে পারদ প্রসারিত হইয়াছে—পূর্ব্বে শৈত্যে সঙ্কুচিত হইয়াছিল। এখানে একটা দাগ দাও। ইহাই গরমের সীমা। এখন এই দুই সীমার মধ্যে যে স্থান তাহাকে ১০০ ভাগে ভাগ কর। ইহারই এক এক ভাগকে এক একটা ডিগ্রী বলে। বিজ্ঞানের পরীক্ষা কালে যে সকল থারমমিটার ব্যবহার করে তাহাকে সেন্‌টীগ্রেড্ থারমমিটার বলে। এই থারমমিটারেই শৈত্যের চিহ্ন ০ ফুটন্ত জলের চিহ্ন ১০০।

কিন্তু আমাদিগের জ্বর পরীক্ষার সময় ডাক্তারেরা যে থারমমিটার ব্যবহার করেন তাহার নাম ফারনহিট থারমমিটার। ইহাতে বরফ গলা শৈত্যের স্থানকে ৩২ ও ফুটন্ত জলের উষ্ণতার স্থানকে ২১২ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এই দুই চিহ্নের মধ্য স্থানকে (২১২ — ৩২) ১৮০ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

বালকগণের শরীরের তাপ পরীক্ষা কর। নানা প্রকার গরম ও ঠাণ্ডা দ্রব্যের ভিতর থারমমিটার দিয়া সেই সকল জিনিষের তাপ পরীক্ষা কর। অল্প গরম ও অধিক গরম জলের তাপাংশ নির্ণয় কর। বলিয়া দাও যে সুস্থ মানুষের শরীরের তাপাংশ ৯৭° কি ৯৮°। ইহার উপর হইলেই জ্বর হয়। ৯৯° ও ১০০° জ্বরকে সামান্য জ্বর বলে। ১০১°, ১০২° অল্প জ্বর। ১০৩°, ১০৪° বেশী জ্বর। ১০৫°, ১০৬° কঠিন জ্বর। ১০৭° হইলে রোগী প্রায়ই বাঁচে না।

তাপমান যন্ত্রের দ্বারা যে বায়ুর উষ্ণতা পরিমাণ করে তাহাও বলিয়া

দাও। খুব রৌদ্রের সময় ও খুব প্রাতঃকালে একটা থারমমিটার দেখাইলেই বালকেরা বুঝিতে পারিবে যে বায়ুর শৈত্য বশতঃ প্রাতে পারদ নামিয়া যায় ও দ্বিপ্রহরের বায়ুর উষ্ণতা বশতঃ পারদ উর্দ্ধে উঠে। থারমমিটারের গায়ে যে বায়ু লাগে তাহাতেই অভ্যন্তরস্থ পারদ শীতল বা উষ্ণ হইয়া থাকে। এইরূপ শীতকালে, গ্রীষ্মকালে, বর্ষাকালে বায়ুর শৈত্য ও উষ্ণতার যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা থারমমিটার দৃষ্টে বেশ বুঝিতে পারা যায়। থারমমিটারের বিষয় শিক্ষাদানের পর বালকগণকে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ের থারমমিটার দৃষ্টে বায়ুর তাপাংশ লিপিবদ্ধ করিতে বলিলে তাহাদিগের বেশ শিক্ষা হইবে।

৮। আলোক (১)

১। আলোকের রশ্মি বালকেরা লক্ষ্য করিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা কর। চক্ষু অর্দ্ধেক বুঁজিয়া কোন আলোকের দিকে তাকাইলে আলোক রশ্মিগুলি কিরূপ দেখায়? বোর্ডে চিত্র অঙ্কন কর। আলোক রশ্মির
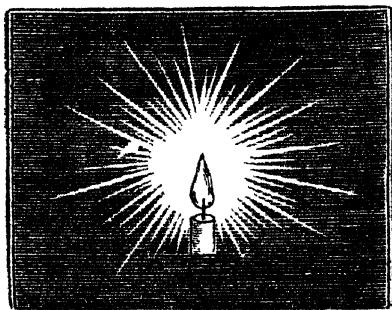
রেখাগুলি সমস্তই সরলরেখা। ঘরে আলো জ্বালিলে সেই আলো দরজার ভিতর দিয়া অনেক দুর যায়, কিন্তু অতি নিকট-ঘরের বেড়া বা দেয়ালের অন্য দিকে যাইতে পারে না। বাক্‌সের পশ্চাতে, আলমারীর পশ্চাতেও প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য এ সকল স্থান অন্ধকার থাকে। যদি আলোকের রেখা বেঁকা হইত, তবে ঘরের সমস্ত স্থানেই আলোক যাইতে পারিত। —এমন কি বাক্‌সের ভিতরেও আলো প্রবেশ করিত। প্রায় সকল জিনিষের উপরই আলোক পড়িয়া প্রতিফলিত হয়। বাহিরে একখান কাপড়

রৌদ্রে দাও—দেখিবে যে সেই কাপড়ে যে রৌদ্র পড়িয়াছে তাহাই প্রতিফলিত হইয়া ঘরে আসিয়াছে। কাপড় সরাও—ঘরের আলো কমিয়া যাইবে। ঝক্‌ঝকে বাসনে আলোক বেশ প্রতিফলিত হয়। দর্পণে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বাহিরে একখান দর্পণ ধর, প্রতিফলিত রশ্মি ঘরে প্রবেশ করিবে। তবে রশ্মি সরলরেখায় চলে বলিয়া প্রতিফলিত রশ্মিও সরল-রেখায় পড়ে। কিন্তু তাই বলিয়া আবার এই প্রতিফলিত রশ্মি যেখানে সেখানে পড়ে না। ইহারও একটা নিয়ম আছে। সূর্য্য হইতে রশ্মি আসিয়া দর্পণে
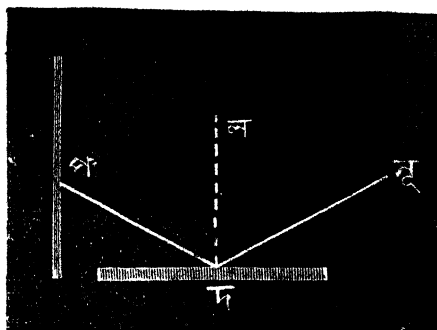
(দ) পড়িয়াছে এবং দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া আলোক রশ্মি ঘরের দেয়ালে পড়িয়াছে। কিন্তু দর্পণ এই অবস্থায় ঠিক থাকিলে প্রতিফলিত আলোক রশ্মি দেয়ালের প বিন্দু ছাড়া অন্য কোথাও পড়িবে না। অর্থাৎ যদি দ বিন্দু হইতে দর্পণের উপর একটী লম্ব উত্তোলন করা যায়, তবে সূ দ ল কোণ ল দ প কোণের সমান হইবে। দর্পণ ঘুরাও, দেয়ালে পতিত আলোকও সরিয়া যাইবে, কিন্তু সকল অবস্থাতেই লম্বের উভয় পার্শ্বস্থ কোণ সমান হইবে।

২। একটা পরীক্ষণ দেখাও। একটা কাগজের বাক্‌স সংগ্রহ কর। (জুতার বাক্‌স হইলেই হইবে) প্রস্থের পাশে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র কর। ডালার অর্দ্ধেক ভাঙ্গিয়া একটা কবাটের মত করিয়া রাখ। এখন যেদিক হইতে ঘরে আলোক আসিতেছে বাক্‌সের ছিদ্রটী সেইদিকে মুখ করিয়া রাখ। বাক্‌সের ডালা তুলিয়া দেখ যে বাহিরের জিনিষের ছায়া

উল্টা হইয়া বাক্সের ভিতর পড়িয়াছে। বাক্সের ভিতর যেন বেশী আলো না যায়—বেশী আলো গেলে ভাল দেখা যাইবে না। (বাক্সের ভিতর
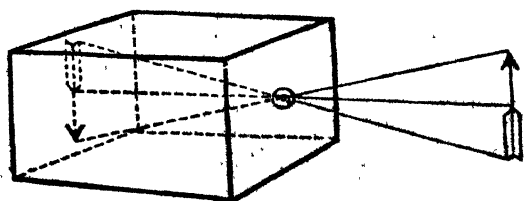
কাল রঙ করিতে পারিলে আরও ভাল হয়) ভাঙ্গা ডালাটী অল্প তুলিয়া দেখ। আর এক কথা—যদি কোন জিনিষের ছায়া দেখিতে না পাও—তবে একটী বালককে বাক্স হইতে ১০।১৫ হাত দূর দিয়া বাক্সের ঐ ছিদ্রের সম্মুখে যাতায়াত করিতে বল। বাক্সের ভিতর চাহিয়া থাক। বালকটীর উল্টা ছবি বাক্সের ভিতর চলাফেরা করিতেছে দেখিতে পাইবে। বালক যে স্থানে আসিলে বাক্সের ভিতরের ছবিটী বেশ পরিষ্কার দেখা যায় বালকটীকে সেই স্থানে দাঁড়াইতে বলিবে। এখন বালকগণকে জিজ্ঞাসা কর—বালকের মাথা নীচে ও পা উপরে কেন? বোর্ডে চিত্রাঙ্কণ করিয়া বুঝাইয়া দাও। আলোর রশ্মি সরল না হইলে এরূপ ঘটিত না। (চিত্র দেখ) তীরের মাথা হইতে যত রশ্মি আসিতেছে তাহার একটী ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া বাক্সের অপর পার্শ্বের নীচে পড়িয়াছে, কাজেই মাথা নীচে আসিয়াছে। গোড়া হইতে যে রশ্মি আসিতেছে তাহা উপরে চলিয়া গিয়াছে। কাজেই ছবি উল্টা হইয়াছে।

৩। বোর্ডে চিত্র আঁকিয়া আর একটা পরীক্ষণ দেখাও। আমরা দূরের জিনিষ ছোট দেখি কেন? এক লাইনে সমান সমান কতকগুলি লম্ব রেখা আঁক। যেন টেলিগ্রাফের থাম। দূর হইতে সকলগুলি থাম কি সমান বলিয়া মনে হয়? না, দূরের গুলি ছোট দেখায়।

কেন? পদার্থ হইতে আলোক রশ্মি সরলরেখা ক্রমে আসিয়া চক্ষুতে পতিত হইতেছে। নিকটে হইলে পদার্থের উভয় প্রান্ত নির্গত রশ্মির মিলন স্থানে কোণটী বড় হয়। কিন্তু পদার্থ যতই দূরে যায় ততই সে মিলন কোণ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া যায়।
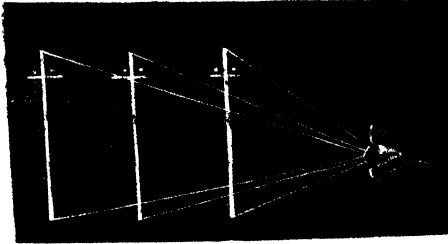
কাজেই প্রকৃত পদার্থও ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়।

৯। আলোক। (২)

এক বাটি জলের ভিতর একটা পেন্সিল একটু হেলাইয়া ধর। পেন্সিলটী যেন ঠিক জলের উপরিভাগে ভাজিয়া গিয়াছে এইরূপ দেখা যাইতেছে। কেন? এক পদার্থের ভিতর হইতে আলোক বাহির হইয়া

যদি অন্যরূপ পদার্থে প্রবেশকরে তবে ঠিক প্রবেশের স্থানে আলোকের গতি বক্র হইয়া যায়। এখানে পেন্সিলটী হইতে উৎপন্ন আলোক বাতাসের ভিতর দিয়া জলে প্রবেশ করিতেছে। জল ও বায়ু ভিন্ন পদার্থ। জল বায়ু অপেক্ষা অনেক ঘন। কাজেই ঠিক জলের উপরিভাগে পেন্সিলের আলোক বাঁকিয়া জলে প্রবেশ করিয়াছে।

আবার দেখ জল হইতে যদি কোন দ্রব্যের আলোক বাতাসে আইসে

তবে এইরূপ সে পদার্থের আলোকও বাতাসে প্রবেশ করিবার সময় বক্র হইয়া যাইবে। একটা বাটির ভিতর একটা পয়সা ফেলিয়া রাখ।

সেই বাটি ঘরের মেজেতে রাখ। তুমি বাটির নিকট হইতে পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে সরিয়া যাও। ঠিক এমন স্থানে গিয়া দাঁড়াও যে বাটির ভিতরকার পয়সা যেন না দেখা যায়। এখন অপর আর একজনকে বাটির ভিতর জল ঢালিতে বল। বাটি জলপূর্ণ হইলেই তুমি আবার পয়সা দেখিতে পাইবে। কেন? পয়সা কি ভাসিয়া উঠিয়াছে? তাহা নয়, পয়সা হইতে যে আলোক বাহির হইতেছিল তাহা পূর্ব্বে কেবল বায়ু দিয়াই চলিতেছিল। কিন্তু এখন জল ঢালাতে আলোকের গতি জল হইতে বাতাসে আসিবার সময় বক্র হইল বলিয়া তুমি দেখিতে পাইতেছ। পূর্ব্ব পরীক্ষণে যেমন দেখিয়াছিলে যে বাস্তবিক পক্ষে তোমার পেন্সিল ভাঙ্গে নাই কিন্তু ভাঙ্গা দেখায়, এই পরীক্ষণেও দেখ তুমি বাস্তবিক যেখানে পয়সা দেখিতেছ পয়সা সেখানে নাই। পয়সা যেখানে ছিল সেইখানেই আছে—কেবল আলোকের গতি বক্র হইয়া অন্য স্থানে দেখাইতেছে।

অনেক সময় খুব পরিষ্কার জলপূর্ণ নদী কি পুষ্করিণীর নীচের বালি কাদা দেখিয়া মনে হয় যে নদী বা পুকুরে বুঝি খুব কম জল। কিন্তু নামিলে কাপড় ভিজিয়া যায়। নদীর বালি হইতে যে আলোক বাহির হয় তাহা বায়ুতে প্রবেশকালে বক্রত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া আমরা বালি উঁচু বলিয়া মনে করি।

একখানি ত্রিশির কাচ (ঝাড়ের কলম) লও। রৌদ্রে ধর বা যদি কোন কৌশলে ঘরের কোন ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করা-

ইতে পার—তবে সেই আলোক রশ্মির সম্মুখে কাচখানি ধর। এমন স্থানে একখান সাদা কাপড় (বা বড় কাগজ) ঝুলাইয়া রাখ যে এই ত্রিশির কাচ ভেদ করিয়া আলোক যেন এই কাপড়ের উপর পড়ে। এখন দেখ এই আলোকে কত রঙ দেখা যাইতেছে। বালকগণকে রঙগুলির পরিচয় করাও। উপরে দেখ বেগুণে রঙ, তারপর নীল, আসমানী (পাতলা নীল), সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল [কেহ কেহ এই বর্ণগুলি ১০ রঙে ভাগ করিয়া থাকেন। দুই রঙের মাঝখানে রঙের যে ক্রম পরি-বর্ত্তন হইয়াছে তাহা বালকগণকে লক্ষ্য করিতে শিখাও। সূর্য্যের আলোকে এই সাত বর্ণ আছে। ত্রিশির কাচের ভিতর দিয়া প্রবেশ করাতে আলোকের গতি নানারূপ বক্র হইয়াছে বলিয়া রঙগুলি সমস্ত পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। এই সাত রঙ একত্র করিলেই সাদা হয়।

তারপর আর একটী পরীক্ষা দেখাও। আজকাল প্রত্যেক বিদ্যা-লয়েই অন্ততঃ একটা করিয়া রঙের বাক্স থাকে—সেই বাক্স হইতে তিন-খানি রঙ সংগ্রহ কর। আর যদি বিদ্যালয়ে না থাকে তবে কিনিয়া আন বা কোন আমিনের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া আন। এই তিনটী রঙ চীনে সিন্দুর (Red vermilion) মরকত সবুজ (Emerald green), বঙ্গেশ (Aniline violet)। ছোট ছোট তিনটুকরা কাগজ লও—এক টুকরা লাল, এক টুকরা সবুজ ও এক টুকরা বেগুণে রঙ কর। রঙ বেশ ঘন করিয়া লাগাইবে। কাগজের সাদা রঙ যেন না দেখা যায়। রঙ শুকাইয়া গেলে লাল রঙের কাজগ টুকরা ত্রিশির কাচ উৎপন্ন নানা রঙের উপর ধর। লালে লাল মিশিয়া গেল। একটু একটু করিয়া কাগজখানি সরাইতে থাক। কমলা রঙের উপর আনিলেই লাল রঙ মলিন হইয়া যাইবে। তারপর হলুদ রঙের উপর ধরিলে আরও মলিন হইবে। সবুজের উপর ধরিলে কাল দেখাইবে। এইরূপ অন্য দুই রঙের দ্বারাও পরীক্ষা করিতে পার। যে রঙের কাগজ, ত্রিশির কাচের

আলোকের ঠিক সেই রঙের উপরেই ইহার রঙ ঠিক থাকে, অন্য রঙের নিকট গেলেই কাল হইয়া যাইবে।

এই পরীক্ষণের দ্বারা আমরা ইহাই জানিতে পারিলাম যে রঙিল পদার্থ সূর্য্যের আলোকের অন্যান্য সমস্ত বর্ণই শোষণ করিয়া ফেলে, কেবল নিজের বর্ণ শোষণ করে না। অর্থাৎ লাল জবা সূর্য্যরশ্মির অন্য ৬টী বর্ণই শোষণ করে. কেবল লালবর্ণ শোষণ করিতে পারে না বলিয়া আমরা জবা লাল দেখি। এইরূপ সবুজ ঘাস সবুজবর্ণ ছাড়া আর সমস্তই শোষণ করে। রামধনুতে এই সাত রঙ দেখা যায়। মেঘের জলবিন্দুগুলি ত্রিশির কাচের কাজ করে। জলবিন্দুর ভিতর দিয়া আলোকের রশ্মি প্রবেশ করিয়া নানা বক্রত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া রশ্মির রঙগুলি নানাভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

১০। চুম্বক।

উপকরণ—দুইখানি লম্বা (বার) চুম্বক। (দাম ।০ কি ।৵০ আনা) ৮।১০টা লোহার নিব বা ছোট প্রেক। ২।৩টা সূঁচ। লোহার চূর। একটা আলী। ছোট পকেট কম্পাস (৵০) বালি।

এক গাছি সূতার সহিত একটী সূঁচ লাগাইয়া এক হাতে ঝুলাইয়া অপর হাতে একখানি বার চুম্বক ধর। চুম্বকখানি ধীরে ধীরে সূঁচের নিকট আন। কি দেখিতেছ? নিকটে আসিলে সূঁচ চুম্বকের দিকে যাইতে চাহিতেছে। যত নিকটে আসিবে ততই টান বাড়িবে। দড়ি কি সূতার দ্বারা বাঁধিয়া একটা জিনিষ টানিয়া আনা যায় কিন্তু এখানে চুম্বকের সঙ্গে আর সূঁচের সঙ্গে ত কোন দড়ি বাঁধা নাই। তবে কে টানিতেছে? এই যে অদৃশ্য একটা টান, ইহাকেই বলে চুম্বকের আকর্ষণ। বালি আর লোহার চুর মিশাইয়া দাও। এই মিশান জিনিষ

চুম্বকখানির দ্বারা নাড়। লোহার চূর চুম্বকের গায় লাগিয়া গেল কিন্তু বালি পড়িয়াই থাকিল। সূঁচ হারাইয়া গেলে অনেক সময় দর্জ্জিরা চুম্বক দিয়া চারিদিকে হাতড়াইয়া থাকে। ছোট জিনিষ মাদুরের ফাঁকে পড়িয়া থাকিলে চোখে দেখা যায় না বটে কিন্তু চুম্বক টানিয়া বাহির করে।

একখানি বার চুম্বকের উপর লোহার চূর ছড়াইয়া দাও। কি দেখিলে? চূর খণ্ডগুলি বার চুম্বকের দুই প্রান্তে লাগিয়া রহিল—চুম্বকের মাঝখানে একটাও লাগিল না। চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি দুই প্রান্তে—মাঝে আকর্ষণী শক্তি একেবারেই নাই।

একখানি বড় লোহা (দা, কুড়ালী, খন্তা) আন। একখানি বার চুম্বক দড়ি দিয়া ঝুলাও। বড় লোহাখানি বার চুম্বকের নিকট আন। এবারে লোহাই চুম্বককে টানিয়া লইল। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে লোহাও সেইরূপ চুম্বককে টানে—দুইএর মধ্যে যে জিনিষটী ছোট সেইটীই বড় জিনিষের নিকট সরিয়া যায় অর্থাৎ বড় জিনিষের দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

ঐ দড়ি ঝুলান বার চুম্বকের এক প্রান্তের নিকট অপর আর একখানি বার চুম্বকের এক প্রান্তে ধর। আকর্ষণ করিতেছে না সরিয়া যাইতেছে? যদি আকর্ষণ করে তবে ঘুরাইয়া চুম্বকের অপর প্রান্ত ধর। এবারে সরিয়া যাইবে। তবেই দেখ চুম্বকে চুম্বকে আকর্ষণও করে আবার তাড়নাও করে। এখন দেখ বার চুম্বকের এক প্রান্তে এইরূপ N একটী ইংরেজী অক্ষর দাগা আছে। ইহার অর্থ (নর্থ্) উত্তর প্রান্ত; আবার আর এক প্রান্তে দেখ S লেখা আছে। ইহার অর্থ (সাউথ্) দক্ষিণ।

এখন যদি দুই চুম্বকের N প্রান্ত, কি দুই চুম্বকের S প্রান্ত এক খানে হয়, তবে তাহারা আকর্ষণ না করিয়া পরস্পরের নিকট হইতে সরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি এক চুম্বকের N ও আর এক চুম্বকের S একত্র হয় তবে আকর্ষণ করিবে।

চুম্বকের মাঝখানে কোন আকর্ষণ নাই ইহা পরীক্ষা করিয়াছ। কিন্তু যদি চুম্বকের মাঝখানে কাটিয়া চুম্বককে দুই খণ্ড করা যায়, তবে তাহারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক চুম্বক হয় ও তাহাদের প্রান্তে আকর্ষণী শক্তি উৎপন্ন হয়।

চুম্বকের একদিকে N ও অপর দিকে S লেখে কেন? একটা সূতা দিয়া একখান বার চুম্বক ঝুলাইয়া রাখ। দেখিবে যে চুম্বকের এক প্রান্ত উত্তর দিকে ও অপর প্রান্ত দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া আছে। চুম্বক-খানি ঘুরাইয়া দাও—যখন স্থির হইবে তখন দেখিবে যে ঠিক উত্তর দক্ষিণ মুখ করিয়া আছে। এখন দেখ যে প্রান্ত উত্তর দিকে মুখ করিয়া আছে তাহার উপর N (নর্থ্) উত্তর ও যে প্রান্ত দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া আছে তাহার উপর S (সাউথ্) দক্ষিণ লেখা আছে। চুম্বকের এই গুণ আছে বলিয়াই নাবিকেরা সমুদ্র মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে ইহার সাহায্যে দিক নির্ণয় করিয়া থাকে।

ছোট লকেট কম্পাসটী (ক্ষুদ্র দিগদর্শন যন্ত্র) দেখাও। ইহার মধ্যে যে কাঁটাটী দেখা যাইতেছে উহা চুম্বক শলাকা। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখাও যে শলাকা স্থির হইলে উত্তর দক্ষিণ ভিন্ন অন্য কোন দিকে মুখ করিয়া থাকে না।

একখানি বার চুম্বকের প্রান্তে একটী লোহার নিব্ বা লোহার ছোট প্রেক লাগাও। এই নিবের প্রান্তে আর একটী নিব্ লাগাও—এইরূপে ৪।৫টী লাগাও। নিব্গুলি বেশ ঝুলিতে থাকিবে। প্রথম নিব্টী চুম্বকের N প্রান্তে (মনে কর) লাগাতে, নিবের ঐ প্রান্তে S ধর্ম্মাক্রান্ত

চুম্বক শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং নিবের অপর প্রান্তে বিপরীত N শক্তি হইয়াছে। এইরূপে সকল নিবগুলিই এক একটা চুম্বক হইয়াছে। এখন আর একখানি বার চুম্বকের S প্রান্ত আনিয়া এই চুম্বকখানির N প্রান্তে মিলাও। নিব গুলি সব পড়িয়া গেল। কেন ?

চুম্বক নিকেল ধাতুকেও সামান্যরূপ আকর্ষণ করে। একটা আনী দিয়া পরীক্ষা দেখাও। যে সকল চুম্বক ব্যবহার করা হইল এগুলি নকল চুম্বক। আদত চুম্বক এক প্রকার খনজ লোহ। এই আদত চুম্বকের সঙ্গে নানা কৌশলে ইস্পাত ঘষিয়া নকল চুম্বক প্রস্তুত করে। তোমরাও এই নকল চুম্বকের উপর (ইস্পাতের) ছুরি ঘষিয়া (আস্তে আস্তে বার চুম্বকের উপর দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুরিখানি টানিয়া লইয়া যাও। এইরূপে ৮।১০ বার কর) চুম্বক প্রস্তুত করিতে পার। এই ছুরি সূঁচ আকর্ষণ করিবে। কিন্তু এই শক্তি ২।১ দিনের বেশী থাকে না।

১১। তাড়িৎ।

উপকরণ—একখানি ১৮ ইঞ্চ মত লম্বা কাচদণ্ড, লাক্ষা (গালাবাতি) দণ্ড, গন্ধকদণ্ড, একখানি কাল চিরুণী (যাহাকে সাধারণতঃ রবারের চিরুণী বলে। বাস্তবিক পক্ষে এগুলি কেবল রবার কি গাটাপার্চা (এক রকম বৃক্ষ-নির্য্যাস) নির্ম্মিত নয়। রবার কি গাটাপার্চার সঙ্গে গন্ধক মিলাইলে শক্ত হয়। এই মিশ্র পদার্থে এগুলি প্রস্তুত করে। এই দ্রব্যের বৈদ্যুতিক শক্তি বেশ প্রবল) এক টুকরা মেটে রঙের কাগজ (Brown paper যাহা প্যাকিং কাজে ব্যবহৃত হয়), এক গামলা আগুন, একটা কর্ক সমেত শিশি, একটু তার, রেশমের সূতা, উত্তম রেশমের কাপড়, ফ্লানেল টুক্‌রা, খুব পাতলা কাগজ, পালক, মুড়ি, খই, শোলা প্রভৃতি।

সতর্কতা—তাড়িতের পরীক্ষায় যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করিবে সমস্তই যেন উত্তমরূপ শুষ্ক হয়। রৌদ্রে বা আগুনের তাপে সমস্তই শুষ্ক করিয়া লইবে।

এই ফ্লানেল দিয়া (ফ্লানেল না থাকিলে চিরুণী দিয়া খুব তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়াইয়া নিলেও হয়। যাহার মাথায় তেল নাই তাহার মাথা আঁচড়াইবে। তেল থাকিলে কাজ ভাল হইবে না) এই চিরুণীখানি ঘস। (টেবিলের উপর পাতলা কাগজের খুব ছোট ছোট টুক্‌রা রাখিয়া দাও) এই কাগজের টুক্‌রার উপর চিরুণী ধর। কি দেখিলে ? কাগজ-গুলি লাফাইয়া উঠিয়া চিরুণীতে লাগিতেছে আবার পড়িয়া যাইতেছে। এইরূপ মুড়ি, খই, পালক প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারাও পরীক্ষা কর। মুড়ি, খই প্রভৃতি কাগজের টুক্‌রার মত আকৃষ্ট হইবে। তারপর লাক্ষা, গন্ধক, ফ্লানেলের দ্বারা ও কাচদণ্ড রেশম বস্ত্রের দ্বারা ঘসিয়া এইরূপ পরীক্ষা কর। ঘর্ষণে এই সমস্ত দ্রব্যে তাড়িৎ উৎপন্ন হয়। তাড়িৎ উৎপন্ন হইলে দ্রব্যাদিতে চুম্বকের মত আকর্ষণী শক্তি উৎপন্ন হয়।

মেটে রঙের কাগজখানি আগুনের মালসার উপর ধরিয়া খুব কড়া করিয়া গরম কর। ঐ কাগজের উপর খুব তাড়াতাড়ি তোমার হাত (উত্তমরূপে পুঁছিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে) ঘস। কাগজখানি একটী বালকের মাথার উপর ধর—মাথায় যেন না লাগে। মাথার চুলগুলি খাড়া হইয়া উঠিবে, চট্‌চট্‌ শব্দ হইবে, মাকড়সার জাল মাথায় জড়াইয়া গেলে যেরূপ বোধ হয়, বালক মাথার উপর সেইরূপ দ্রব্যের অনুভব করিবে। ঐ কাগজখানি ব্ল্যাক বোর্ডে বা দেয়ালের গায় চাপিয়া ধরিলে কিছুক্ষণ লাগিয়া থাকিবে। এ সমস্তই তাড়িতাকর্ষণ। ঘর্ষণে কাগজে তাড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

একখানি সাদা চিঠির কাগজ উত্তপ্ত কোন কাষ্ঠের উপর রাখিয়া রবার (পেন্সিলের দাগ তুলিবার জন্য যে রবার ব্যবহৃত হয়—তাহা হইলেও হইবে) দিয়া ঘষিলে কাগজখানি তাড়িৎপূর্ণ হইয়া ঐ কাষ্ঠের সঙ্গে লাগিয়া থাকিবে। এই কাগজ তুলিয়া লও। দেখ ইহাও আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড আকর্ষণ করিতে পারে।

শিশির মুখে কর্ক আটিয়া তাহার উপর তার বেঁকাইয়া পুঁতিয়া দাও। (চিত্র দেখ) এই তারের সঙ্গে উত্তম রেশমের সূতা দ্বারা খুব ছোট এক
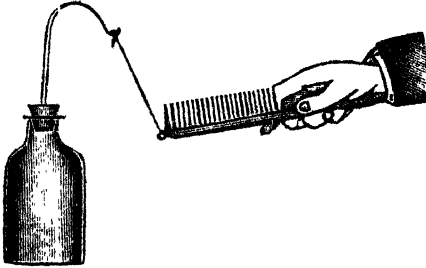
টুকরা শোলা (গোলাকার হইলেই ভাল) ঝুলাইয়া দাও। এখন চিরুণীখানি ফ্লানেলে ঘষিয়া এই শোলার নিকট ধর। শোলা আকৃষ্ট হইয়া চিরুণীতে লাগিবে। আবার চিরুণী ছাড়িয়া গিয়া শিশির গায় লাগিবে। আবার আসিয়া চিরুণীতে লাগিবে। কাচের দণ্ড রেশম বস্ত্রে ঘসিয়া (ঘসিবার পূর্ব্বে উভয় জিনিষ বেশ গরম করিয়া লইলে কাজের সুবিধা হইবে) এই শোলার নিকট ধর। শোলা আসিয়া কাচদণ্ডে লাগিয়া ফিরিয়া যাইবে।

লাক্ষা, গাটাপার্চা, রজন প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন তাড়িৎকে রজন সঞ্জাত ও কাচ হইতে উৎপন্ন তাড়িতকে কাচ সঞ্জাত তাড়িৎ বলে।

কাচদণ্ড (রেশম বস্ত্রে ঘসা) দ্বারা শোলা আকৃষ্ট করিয়া তৎক্ষণাৎ যদি লাক্ষাদণ্ড (ফ্লানেল ঘসা) এই শোলার নিকট আনয়ন করা যায় তবে শোলা আকৃষ্ট না হইয়া তাড়িত হইবে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে কাচ সঞ্জাত তাড়িত ও রজন সঞ্জাত তাড়িত ভিন্ন প্রকার শক্তি সম্পন্ন। কাচসঞ্জাত তাড়িতকে যোগাত্মক ও রজনসঞ্জাত তাড়িতকে বিয়োগাত্মক তাড়িতও বলে।

আকাশে যে বিদ্যুতের খেলা দেখিতে পাও তাহাও এই তাড়িতের কার্য্য। তাড়িত বেশী হইলে আলোক দেখা যায়। তাড়িত চলাচল করিবার সময় যে শব্দ হয় তাহাকেই মেঘগর্জ্জন বলে। তাড়িত কোন রকম জিনিষ নয়—একটা শক্তি মাত্র। যেমন

চুম্বকের আকর্ষণ—সেও ত কোন জিনিষ নয়, কিন্তু বেশ একটা শক্তি।

মেঘে ও মাটীতে তাড়িত চলাচলের সময়, যদি কেহ হঠাৎ সেই চলাচলের পথে পড়িয়া যায় তবে সেই ব্যক্তি বজ্রাহত হয় অর্থাৎ তাহার গায় তাড়িতের ধাক্কা লাগে। এই ধাক্কা এত জোরে লাগে যে মানুষ মরিয়া যায়, ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া যায়। বিদ্যুতের নানা নাম বলিয়া দাও:—

তড়িদ্দাম, সৌদামিনী, বিদ্যুৎ, চঞ্চলা, চপলা, ক্ষণপ্রভা।

১২। বায়ুর চাপ।

একটা কাচের বোতল সংগ্রহ কর। বোতলটা কাল রঙের না হইলেই হইল। বোতলের তলা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। বোতলটী বেশ শুষ্ক করিয়া লও। একগাছি দড়ি কেরোসিন তেলে ডুবাইয়া ঐ বোতলের তলার একটু উপরে জড়াইয়া দাও। তারপর ঐ দড়িতে আগুন ধরাও। আগুন নিবিয়া গেলেই, বোতলের উপর জল ঢাল। দেখিবে যে, বোতলের যে জায়গায় দড়ি জড়াইয়াছিলে ঠিক সেই দড়ির দাগে দাগে বোতল ফাটিয়া
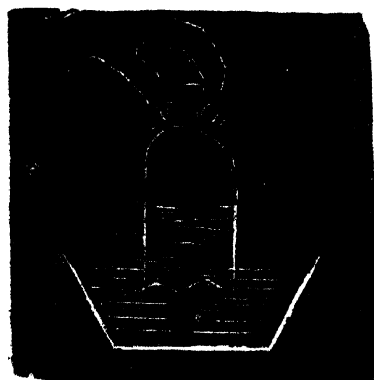
গিয়াছে। এই তলাশূন্য বোতলের মুখে একটা ভাল কাক লাগাও। এখন এই বোতল একটী জলের গামলার মধ্যে ডুবাইয়া, বোতলের গলা ধরিয়া এরূপ ভাবে উচু কর যেন বোতলের খোলা তলার কতকাংশ জলের মধ্যেই থাকে। (চিত্র দেখ) বোতলের জল গামলার জলের চেয়ে কত উচুতে আছে—তাহাই লক্ষ্য করিতে বল। এখন

কাহার জোরে এত উঁচুতে থাকিল? বোতলের কাক খুলিয়া দাও, অমনি বোতলের সব জল গামলায় পড়িয়া গেল—বোতলের মধ্যে এখন যে জল-টুকু থাকিলে, তাহার উপরিভাগ ও গামলার জলের উপরিভাগ এক সমতলে। কেন জল পড়িয়া গেল? বোতলের ভিতর বাতাস ঢুকিল বলিয়া। ঠিক কথা—এই বাতাসের চাপেই জল নামিয়া পড়িল। আচ্ছা আগে জল উঁচু হইয়াছিল কেন? বোতলের ভিতর বাতাস ঢুকিয়া জল বাহির করিয়া দিল, কিন্তু পূর্ব্বে বোতলের জল উঁচু হইয়া থাকিল কাহার জোরে? গামলার জলের উপর বাতাসের যে চাপ পড়িতেছিল, সেই চাপের বেগ বোতলের মুখের নিকট জমা হইয়া বোতলের জলকে উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। মুষ্টির ভিতর খানিকটা কাদা লইয়া চাপ দিলে, সেই কাদা আঙ্গুলের ফাঁকদিয়া বাহির হইতে থাকে, কারণ আঙ্গুলের ফাঁকে কোন চাপ নাই। গামলার জলের উপর বাতাসের চাপ পড়িলে সেই চাপের চোটে জল বোতলের মুখ দিয়া বাহির হইতে চায়, কারণ বোতলের মুখের নীচে বায়ুর চাপ নাই। জল বাহির হইতে পারে না বটে, কিন্তু এই বেগে বোতলের জল উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে।

তবে সকল জিনিষের জোরের যেমন একটা পরিমাণ আছে, বায়ুর চাপের জোরেরও সেইরূপ একটা পরিমাণ আছে। বায়ুর এইরূপ চাপে ৩৪ ফুট উচ্চ জলস্তম্ভ ঠিক থাকিতে পারে—ইহার বেশী উঁচু হইলে (মনে কর যদি জলস্তম্ভ ৩৬ ফুট উঁচু হয়) বেশীর ভাগ জল (২ ফুট জল) গামলার ভিতর নামিয়া আসিবে।

কিন্তু জল না দিয়া যদি পারদ দেওয়া যায় তবে সেই পারদস্তম্ভ ৩০ ইঞ্চ উচ্চ হইয়া থাকিবে, কারণ পারদ জল অপেক্ষা ১৩½ গুণ ভারী।

পরীক্ষণ।—একটী কাচের নল লও। ৩৪ ইঞ্চ লম্বা, একমুখ বন্ধ ও একমুখ খোলা। খোলা মুখের দিক দিয়া নলে পারদ পূর্ণ কর। পারদ পূর্ণ করিবার সময় নলটী একটা বড় গামলার ভিতর খাড়া করিয়া ধরিবে।
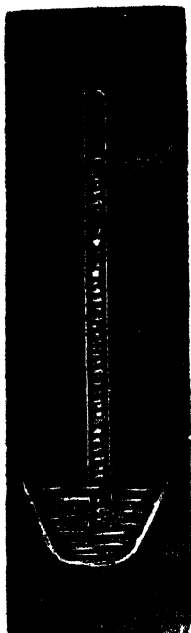
নলে পারদ পুরিবার সময় যে পারা ছিটকাইয়া পড়িবে তাহা গামলার ভিতরেই পড়িবে। ইহাতে পারদ নষ্ট হইবে না। নলটী ঝাঁকাইয়া ঝাঁকাইয়া পারদ পূর্ণ করিবে। এইরূপ ঝাঁকাইলে নলের ভিতর হইতে বায়ু বাহির হইয়া যাইবে। পারদ ঢালিয়া একটী বাটী অর্দ্ধপূর্ণ কর। বাটিটী ঐ গামলার ভিতর বসাও। এখন ঐ পারদপূর্ণ নলের খোলা মুখ আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া ধর। তারপর আস্তে আস্তে নলটী উলটাইয়া আঙ্গুল সহ নলের খোলা মুখ পারদপূর্ণ বাটির ভিতর ডুবাইয়া আঙ্গুল সরাও। এখন দেখিতে পাইবে যে নলের ভিতর হইতে পারদস্তম্ভ খানিক দূর নামিয়া আসিল। এই স্তম্ভ মাপ করিয়া দেখ। বাটির পারদের উপরিভাগ হইতে গজকাঠি বা ফুট-রুল দ্বারা মাপিলে দেখিতে পাইবে যে স্তম্ভটী প্রায় ২৯ কি ৩০ ইঞ্চ হইয়াছে। নলের উপরের অবশিষ্ট অংশ খালি পড়িয়া রহিয়াছে।

বায়ুর চাপে ২৯ কি ৩০ ইঞ্চ অপেক্ষা উচ্চ পারদস্তম্ভ ধরিয়া রাখিতে পারে না বলিয়া উপরের ৩।৪ ইঞ্চ পারদ বাটির ভিতর নামিয়া আসিয়াছে।

এই পারদপূর্ণ বাটি ও এই পারদপূর্ণ নল কোন উপায়ে একত্র রাখিয়া ব্যারমিটার বা বায়ুমান যন্ত্র প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। নলের গায় ইঞ্চের দাগ দেওয়া হয়। যদি এই ব্যারমিটার যন্ত্র লইয়া উচ্চ পাহাড়ে উঠা যায় তবে দেখা যাইবে যে পারদস্তম্ভ নলের ভিতর হইতে ক্রমে নীচে নামিয়া আসিতেছে। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে যত উপরে উঠা যায় ততই বায়ুর চাপ কমিয়া আসে। আবার এই ব্যারমিটার লইয়া যদি খনির ভিতর কি কূপের ভিতর নামা যায় তবে নলের পারদ উপরে

উঠিতে থাকে। ইহাতেই বুঝা যায় যে যত নীচে নামা যায় তত বায়ুর
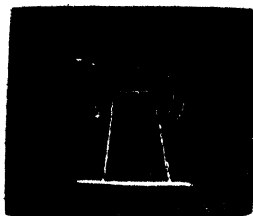
চাপ বৃদ্ধি পায়। বায়ু ঊর্দ্ধদিকেও চাপ দেয়। একটা গেলাস জলপূর্ণ কর। গেলাসের মুখ একখানি ফুলস্ক্যাপ কাগজের মত শক্ত কাগজ দিয়া ঢাকিয়া দাও। এরূপ ভাবে ঢাক যেন গেলাসের ধারের সহিত কাগজখানি বেশ লাগিয়া যায়, কোথাও ফাঁক না থাকে। এখন খুব সাবধানে অথচ চট্ করিয়া গেলাস উল্টাও। গেলাসের জল পড়িবে না। কেন? বায়ু কাগজের উপর চাপ দিতেছে বলিয়া কাগজ গেলাসের গায় লাগিয়া আছে। গেলাসে যে পরিমাণ জল আছে তাহার চাপ অপেক্ষা বায়ুর ঊর্দ্ধচাপই বেশী বলিয়া জলে কাগজ ঠেলিয়া ফেলিতে পারে না।

১৩। অক্সিজেন।

উপকরণ—একটী পিতলের পিলসুজ, একটা বড় টেষ্ট টিউব, কর্ক, একটা কাঁচের নল টেষ্ট টিউব ধরিবার চিমটা, একটা বড়মুখ বোতল, এক গামলা জল, কয়েকখানি ইট, একটা স্পিরিট ল্যাম্প, দেশলাই, ক্লোরেট অব পটাস, ম্যাঙ্গানিজ ডাই অকসাইড, কর্ক ছিদ্র করিবার যন্ত্র।

ক্লোরেট অব পটাস (গুঁড়া না থাকিলে) গুঁড়া করিয়া লও। টেষ্ট টিউবের অর্দ্ধেকের কিছু বেশী পূর্ণ করিতে হইবে—এই আন্দাজে সমান
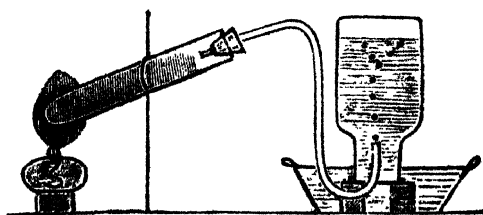
(ওজনের) সমান ক্লোরেট অব পটাসের গুঁড়া ও ম্যাঙ্গানিজ মিশাইয়া টেষ্ট টিউবে ঢালিয়া দাও। টিউবের মুখের উপযোগী একটী কাক্ লইয়া তাহাতে কাচের নল প্রবেশ করাইবার জন্য একটী ছিদ্র

কর। এখন একটী কাচের সরু নল লইয়া তাহাকে আবশ্যক মত বক্র কর। নলের যে যে স্থানে বক্র করিবে মনে করিয়াছ, নলের সেই সেই স্থান একে একে স্পিরিট ল্যাম্পের আগুনে ধর। ৫।৭ মিনিটেই নলের সেই স্থান নরম হইয়া আসিবে—ল্যাম্পের উপর রাখিয়াই নল আস্তে আস্তে বক্র কর। বক্র হইলেই আগুনের উপর হইতে নল সরাইয়া আন। আবার নলের অপর স্থান এইরূপে বক্র কর। চিত্রের অনুরূপ বক্র হইলে নলের এক প্রান্ত টেষ্ট টিউবের ছিদ্রযুক্ত কাকের ভিতর চালাইয়া দাও। গামলায় জল ঢাল। এই জলের উপর ইট বসাইয়া তাহার উপর একটা জলপূর্ণ বোতল (হাতের তালুতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া) উল্টা করিয়া বসাও ও ইটের ফাঁকদিয়া কাচের নল আনিয়া বোতলের মুখে প্রবেশ করাইয়া দাও। এখন টেষ্ট টিউবের নীচে স্পিরিট ল্যাম্প বসাইয়া তাপ দিতে থাক। দেখিবে যে ৪।৫ মিনিট পরেই বোতলের জলের ভিতর ফুঁপ্‌ড়ি যাইতে থাকিবে ও বোতলের জল সরাইয়া অক্সিজেনবায়ু বোতলের স্থান অধিকার করিবে। এই ফুঁপ্‌ড়িগুলি অক্‌সিজেন গ্যাসপুর্ণ। ম্যাঙ্গানিজ ও ক্লোরেট গুঁড়াতে যে অক্‌সিজেন আছে তাহাই তাপে বিচ্যুত হইয়া নল দিয়া চলিয়া যাইতেছে। [যখন খুব জোরে ফুঁপ্‌ড়ি উঠিতে থাকিবে তখন টেষ্ট টিউবের নীচ হইতে স্পিরিট ল্যাম্প একটু সময়ের জন্য সরাইবে। অনেক সময় এরূপ হয় যে ষ্টেট টিউব স্পিরিট ল্যাম্পের উত্তাপে গলিতে আরম্ভ করে। মধ্যে মধ্যে এইরূপ সরাইলে সে আশঙ্কা থাকে না। আর এক বিষয়ে সাবধান হইবে। পরীক্ষা হইয়া গেলে প্রথমে চেষ্ট টিউবটীর কাক খুলিয়া সরাইয়া লইবে। প্রথমে ল্যাম্প সরাইলে চেষ্ট টিউবে জল প্রবেশ করিবে ও টিউবটী ভাঙ্গিয়া যাইবে।] •

এখন একটুকরা শুষ্ক কাঠ লও—পেন্‌সিলের মত মোটা ও লম্বা হইলেই হইবে। যখন বোতল জলশূন্য হইবে, তখন ঐ কাঠটুকরা

আগুনে ধরাইয়া ডান হাতে রাখিবে। বাম হাতে বোতলটী তুলিয়া লইবা মাত্র ডান হাতের প্রজ্জ্বলিত আগুন ফুঁ দিয়া নিবাইয়া ঐ কাঠখানি বোতলের ভিতর ঢুকাইয়া দিবে। বোতলের ভিতর ঢুকান মাত্র ঐ কাঠ জ্বলিয়া উঠিবে। আবার বাহিরে আনিয়া ফুঁ দিয়া নিবাও ও তৎক্ষণাৎ বোতলে ঢুকাও। এইরূপ ৩.৪ বার করিলেও দেখিবে যে কাঠখানি বোতলে প্রবেশ করান মাত্র জ্বলিয়া উঠে। কেন জ্বলে?

অক্‌সিজেন বায়ুই দহনকার্য্যের প্রধান সহায়। বিনা অক্‌সিজেনে কোন জিনিষ জ্বালান যায় না। বোতলে কেবলই অক্সিজেন ছিল, কাজেই কাঠ প্রবেশ মাত্রই জ্বলিয়া উঠিল। ছাত্রগণকে বলিয়া দিবে—বিনা আগুনে কাঠ জ্বলে না, কাঠে আগুন থাকা চাই—অক্‌সিজেন কেবল আগুনের জোর বাড়াইতে পারে, আগুন সৃষ্টি করিতে পারে না।

এই অক্‌সিজেনপূর্ণ বোতলের মধ্যে যদি তার বাঁধিয়া একটা প্রজ্জ্বলিত বাতি নামাইয়া দাও তবে দেখিবে যে সেই বাতির আগুনের কেমন চমৎকার জোর হইয়াছে।

গন্ধকের আলো একটু নীলাভ। কিন্তু একটা তেলের পলায় গন্ধক জ্বালাইয়া অক্‌সিজেনপূর্ণ বোতলে নামাইয়া দেখ কেমন উজ্জ্বল বর্ণ দেখায়।

১৪। নাইট্রোজেন।

উপকরণ—এক গামলা জল, একটা বড়মুখ বোতল, এক টুকরা ইট, একটু ফস্‌ ফরাস।

বোতলের ভিতর বাতি জ্বালাইলে সেই বাতি খানিকক্ষণ জ্বলিয়াই নিবিয়া যায়, কেন তাহা তোমরা বোধ হয় জান? বোতলের অভ্যন্তরে যে বায়ু থাকে তাহার অক্‌সিজেন ভাগ ফুরাইয়া গেলেই বাতি নিবিয়া

যায়। বায়ুতে ৪ ভাগ নাইট্রোজেন ও ১ ভাগ অক্সিজেন আছে—একথাও
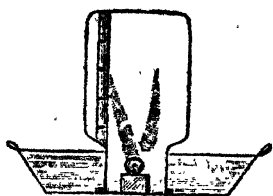
তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই বোতলের বায়ুতেও তাহা হইলে ৪ ভাগ নাইট্রোজেন ও ১ ভাগ অক্সিজেন আছে। আচ্ছা, এখন বোতলের মাপ লইয়া—এক টুকরা লম্বা কাগজ কাটিয়া লও। ডাক্তারেরা যেমন করিয়া শিশির গায় ঔষধের পরিমাণ কাটিয়া কাগজ আটিয়া দেয়, এই কাগজটুকরা সেইরূপ ৫ ভাগে ভাগ করিয়া এই বোতলের গায় আঠা দিয়া আঁট। গামলায় অল্প জল রাখ, যেন বোতলের মুখ মাত্র ডুবিতে পারে। এক টুকরা ছোট ইট আন—পাশে এত বড় হওয়া চাই যে বোতলের মুখে ঢোকে ও এত উঁচু হইবে যে গামলার ভিতর বসাইলে জলের কিঞ্চিৎ উপর তার মাথা থাকে। এই ইট জলের ভিতর বসাইয়া তাহার মাথায় মটর প্রমাণ ফস্‌ফরাস [ফস্‌ফরাস জিনিস খুব সাবধানে রাখিতে হয়—একটা জলপূর্ণ শিশিতে রাখিবে—বাতাস লাগিলেই ফস্‌ফরাস জ্বলিয়া উঠে। ফস্‌ফরাস হাত দিয়া ধরিবে না—হাতে জ্বলিয়া যাইতে পারে। একটা চিম্‌টা বা সন্না দিয়া ফস্‌ফরাস ধরিবে। বড় ফস্‌ফরাস টুকরা হইতে ছোট এক টুকরা কাটিয়া লইবে। চিম্‌টা দিয়া জলপূর্ণ শিশির ভিতর হইতে ফস্‌ফরাস বাহির করিয়া আনিবে। একখানি জলপূর্ণ থালার উপর এই ফস্‌ফরাস রাখিয়া ছুরি দিয়া একটা বড় মটরের পরিমাণ কাটিয়া লইবে ও অবশিষ্ট ফস্‌ফরাস জলপূর্ণ শিশিতে রাখিয়া কাক্‌ বন্ধ করিয়া দিবে] রাখ ও দেশলাই দিয়া জ্বালাইয়া দাও।

খালি বোতলটা উলটাইয়া এই প্রজ্জ্বলিত ফস্‌ফরাস ঢাকিয়া গামলার জলে বসাইয়া দাও। প্রথমে বোতলের মুখে কি পরিমাণ জল প্রবেশ করিল তাহা বালকগণকে লক্ষ্য করিতে বল।—খানিকক্ষণ পরে ফস্‌ফরাস

নিবিয়া যাইবে। কেন? বোতলের অক্‌সিজেন ফুরাইয়া গেলেই ফস্‌ফরাস নিবিয়া যাইবে। আচ্ছা, এখন দেখ বোতলের মুখে আর অধিক জল প্রবেশ করিয়াছে, না পূর্ব্বের পরিমাণ জলই আছে। বোতলের মুখে প্রায় এক দাগ পরিমাণ জল প্রবেশ করিয়াছে। কাগজে কয় দাগ কাটিয়াছিলে? পাঁচ দাগ। কয় দাগ পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে? এক দাগ পর্য্যন্ত। কেন? বোতলের অভ্যন্তরস্থ অক্‌সিজেন ফস্‌ফরাসের গ্যাসে মিশিয়া জলে মিশিয়া গিয়াছে। কাজেই বোতলের অক্‌সিজেনের স্থান শূন্য। সেই অক্‌সিজেনের এক ভাগ শূন্য স্থান এখন জল অধিকার করিয়াছে। অবশিষ্ট ৪ ভাগে কোন্ গ্যাস আছে? নাইট্রোজেন।

এক টুকরা তারের সহিত একটা বাতি বাঁধিয়া প্রজ্জ্বলিত কর। এই বোতলটী জল হইতে তুলিয়া লইবা মাত্রই প্রজ্জ্বলিত বাতি বোতলের ভিতর নামাইয়া দাও। কি হইল? নামান মাত্রই বাতি নিবিয়া গেল। কেন? বোতলে একটুও অক্‌সিজেন নাই। অক্‌সিজেন অগ্নি প্রজ্জ্বলনের সহায়। নাইট্রোজেনের সাহায্যে অগ্নি জ্বলে না—বরং নিবিয়া যায়। অক্‌সিজেন, নাইট্রোজেন গ্যাসের কোন বর্ণ নাই, কোন রূপ গন্ধও নাই।

১৫। হাইড্রোজেন।

উপকরণ—একটা বোতল (কর্ক সমেত), দস্তার টুকরা, সলফিউরিক এসিড, কাচের নল, দেশলাই, জল, টেষ্ট টিউব, স্পিরিট ল্যাম্প।

বায়ুর প্রধান উপকরণ কি কি? নাইট্রোজেন আর অক্‌সিজেন। হাঁ ঠিক কথা। এই দুইটী গ্যাস বা বায়ু মিশিয়া যে বায়ু হয় তাহা বায়ুর আকারেই থাকে, কিন্তু এই অক্‌সিজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন নামক এক গ্যাস মিশিয়া যে জিনিষ হয় তাহাতে আর বায়ুর আকার থাকে না।

আমরা যে জল ব্যবহার করি তাহা এই দুই গ্যাসের মিশ্রণ। এই দুই বায়ু মিশিয়া জল হয়।

হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত কর। বোতলের ভিতর দস্তার টুকরা ফেলিয়া দাও। একটা কাচের গেলাসে অর্দ্ধ আউন্স পরিমাণ সলফিউরিক এসিড ও এক আউন্স কি দেড় আউন্স জল মিশাইয়া রাখ। স্পিরিট ল্যাম্পের উপর একটা ১০।১২ ইঞ্চ কাচের নলের মধ্যভাগ ধরিয়া নরম করিতে থাক। যখন বেশ নরম হইবে, তখন নলের দুই প্রান্ত ধরিয়া টানিলেই নরম স্থানটী সূচাল হইয়া নলটী দুইখণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইবে। এখন ইহার একখণ্ড নল লইয়া দেখ যে সূঁচাল মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়াছে না কিছু ফাঁক আছে। যদি একবারে বন্ধ হইয়া থাকে তবে অতি সামান্য একটু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেই খুব সরু ছিদ্র হইবে। এই নলের সরুমুখ উপরে রাখিয়া অপর প্রান্ত সেই বোতলে কর্কের ভিতর চালাইয়া দাও। এখন বোতলে ঐ মিশ্রিত আরক ঢালিয়া দিয়া এই নল সমেত কর্ক আঁটিয়া দাও। দস্তার সহিত এই দ্রাবক মিলিত হইয়া ধূমের মত ও ফেনের মত পদার্থ উৎপন্ন হইতে থাকিবে। ২।৩ মিনিট পরে কাচের নলের সরু মুখের উপর একটা টেষ্ট টিউব ধর। ২ মিনিট পরে সেই টিউব সরাইয়া আনিয়া তাহার মুখে একটা প্রজ্জ্বলিত দেশলাইকাঠি ধর। দেখিবে যে টেষ্ট টিউবে গৃহীত গ্যাস দেশলাইএর আগুনে জ্বলিয়া গেল ও একটা শব্দ (কোঁক) হইল। হাইড্রোজেন গ্যাস নিজেই জ্বলে। যদি এইরূপ ৫।৭ বার টেষ্ট টিউবে গ্যাস করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ যে বেশ জ্বলিতেছে, তবে বোতল সংলগ্ন নলের সরুমুখেও আগুন ধরাইয়া দিতে পার। নলের মুখে গ্যাস বেশ জ্বলিতে থাকিবে (সাবধান, যদি বোতলে
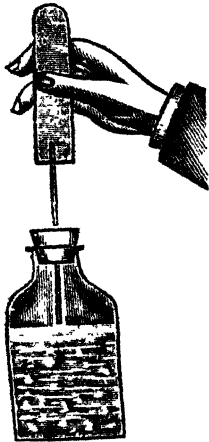
বাতাস থাকে তবে নলের মুখে আগুন ধরাইতে গেলে,ভয়ানক শব্দ করিয়া বোতল ভাঙ্গিয়া যাইবে ও সমস্ত আরক পড়িয়া যাইবে। ইহাতে নিকটস্থ কেহ আঘাতও পাইতে পারে। সুতরাং নলের মুখে আগুন ধরাইবার সময় একটা ৫।৭ হাত লম্বা কাঠির মাথায় দেশলাই বাঁধিয়া সেই কাঠি ধরিয়া আগুন ধরানই সুবিধা। বালকগণকে সরাইয়া দিবে। কিন্তু যদি ভিতরে বাতাস না থাকে তবে বেশ জ্বলিতে থাকিবে। জ্বলিতে থাকিলে আর কোন আশঙ্কা নাই।)

টেষ্ট টিউবের গা পরীক্ষা কর। দেখিবে যে তাহার গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-বিন্দু জমিয়াছে। কেন? বায়ুর অক্‌সিজেনের সঙ্গে এই হাইড্রোজেন মিশিয়া জলের সৃষ্টি করিয়াছে।

পচা পাঁকের ভিতরে এক রকম গ্যাস হয়। তাহাও বেশ জ্বলে। একটা হাঁড়ী জলপূর্ণ করিয়া পচা পুকুরে ডুবাও। হাঁড়ীর মুখ পাঁকের দিকে থাকিবে। এখন হাঁড়ীর মুখের নীচে যে পাঁক আছে, তাহা পা দিয়া ঘাঁটিতে থাক। এই পাঁক হইতে গ্যাস উঠিয়া হাঁড়ীতে প্রবেশ করিয়া হাঁড়ীর জল বাহির করিয়া দিবে। যখন হাঁড়ীর সমস্ত জল বাহির হইয়া যাইবে তখন হাঁড়ী তুলিয়া আন (উল্‌টা করিয়াই) ও মাটীতে দুই খানি ইটের উপর উল্‌টা করিয়াই বসাও। একটা লম্বা কাঠির মাথায় আগুন ধরাইয়া হাঁড়ীর মুখের নিকট আন। হাঁড়ীর গ্যাস জ্বলিতে থাকিবে।

১৬। কৃষি।

উপকরণ—বাটি, জল, মাটী, উত্তম বীজ ও মন্দ বীজ ইত্যাদি।

শুকনা মাটীর উপর একটা বীজ ফেলিয়া রাখিলে কি গাছ বাহির হয়? জল দিলে? জল দিলে বীজ ভিজিয়া নরম হইলে গাছ বাহির হয়।
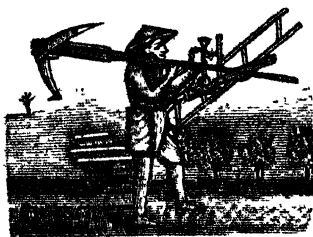
অচ্ছা, কেবল বীজই ভিজাইয়া লই-লাম—মাটী ভিজাইলাম না। মনে কর একখানি পাথরের কি ইঁটের উপর বীজ রাখিয়া জল ঢালিলাম! বীজ হইতে অঙ্কুর ও মূল বাহির হইবে বটে, কিন্তু পাথর অথবা ইটের ভিতর মূল প্রবেশ করিতে পারিবে না বলিয়া অঙ্কুর শুকাইয়া যাইবে। তাহা হইলে মূল যাহাতে সহজে মাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই জন্যই লাঙ্গল, মই, কোদাল, নিড়ানি প্রভৃতি যন্ত্রের দ্বারা মাটী ভাঙ্গিয়া গুঁড়া গুঁড়া করে।

বিনা জলে বৃক্ষ জন্মে না—ইহা তোমরা জান। জমি উত্তমরূপ কর্ষণ করিলে অর্থাৎ খুব গর্ত্ত করিয়া মাটী তুলিয়া সেই মাটী গুঁড়া গুঁড়া করিয়া ভাঙ্গিয়া গর্ত্ত পূরাইলে (লাঙ্গল খুব জোরে চাপিয়া ধরিলে অনেকদূর মাটীর নীচে যায় ও সেই নিম্নদেশের মাটী উপরে তোলে ও ভাঙ্গিয়া ফেলে) যে জমি প্রস্তুত হয় তাহা বৃক্ষাদির পক্ষে উত্তম। কেন? কারণ অনু-সন্ধান করা যাউক।

(১) মাটী বেশ গুঁড়া হইলে তাহার মধ্যে শিকড় সহজে প্রবেশ করিয়া নানাদিক হইতে বৃক্ষের খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে।

(২) মাটীর উপরিভাগ প্রায়ই রৌদ্রতাপে শুষ্ক হইয়া থাকে। যতই মাটীর নীচে যাওয়া যায় ততই জলযুক্ত রসাল মাটী পাওয়া যায়। মাটীতে যদি গর্ত্ত করিয়া তাহা গুঁড়া মাটীতে পূর্ণ করা যায়, তবে সেই গুঁড়া মাটী নীচের জল শুষিয়া উপরে তুলিতে পারে। কেমন করিয়া? পরীক্ষা দেখাও। জল যে উপরের দিকেও উঠিতে পারে, তাহা জলের ভিতর ব্লটিং কাগজ কি কাপড়ের এক প্রান্ত ডুবাইলেই দেখিতে পাইবে। এক বাটিতে একটু জল ঢাল, একবার সেই জলের উপর এক ঢেলা শক্ত মাটী

দাও ও একবার তাহার উপর গুঁড়া মাটী দাও। গুঁড়া মাটী কেমন সহজে ও স্বল্প সময়ে নীচের জল টানিয়া লইবে।

(৩) গাছের মূলে জল দিতে হয়। যদি মাটী শক্ত থাকে, তবে সে জল মূলের নিকট গিয়া মাটী ভিজাইতে পারে না। গুঁড়া মাটীর মধ্যে খুব সহজেই জল প্রবেশ করে।

(৪) অল্প গর্ত্ত করিয়া লাঙ্গল চালাইলে দুই এক বৎসর ভাল ফসল হইতে পারে কিন্তু তার পর আর সে জমিতে ভাল ফসল হয় না। কেন? জমির উপরে ফসলের যে খাদ্য থাকে তাহা দুই এক বৎসরেই ফুরাইয়া যায়। খুব গর্ত্ত করিয়া লাঙ্গল চালাইলে অনেক নীচের মাটী উপরে উঠিয়া আসে। ইহাতে ফসলের প্রচুর খাদ্য থাকে।

(৫) মাটী গুঁড়া গুঁড়া করিলে সেই মাটীর ভিতর বায়ু ও রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারে। মাটীতে বৃক্ষের যে সকল খাদ্য থাকে তাহা জলে তরল করিয়া দেয়, বায়ু ও রৌদ্রে তাহা বিশুদ্ধ করিয়া দেয়।

(৬) জমির ভিতর যে সকল কীট বাস করে, মাটী উল্টাইয়া দিলে তাহাদিগের বাসা ভাঙ্গিয়া যায় ও কীটগুলি মরিয়া যায়।

(৭) জমিতে যে সকল আগাছার অঙ্কুর থাকে, লাঙ্গলের আঘাতে সেগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়।

বৃক্ষের খাদ্য—একটী বৃক্ষ উত্তমরূপ শুষ্ক করিয়া পোড়াইলে যে ছাই পাওয়া যায় তাহা উত্তমরূপ পরীক্ষা করিলে নিম্নলিখিত দ্রব্যের মিশ্রণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়ঃ—

পটাশ (ক্ষার—শুষ্ক কলাগাছ পোড়াইলে ক্ষার পাওয়া যায়), সোডা (লবণের মত যে জিনিষ দিয়া ধোপারা কাপড় কাচে), ম্যাগনেসিয়া (ইহাও লবণের মত), চুণ, লৌহ, ফস্‌ফরাস্ (লাল দেশলাইএর উপাদান—মৃত জীব-জন্তুর হাড়ে এই জিনিষ পাওয়া যায়), গন্ধক, সিলিকা (বালি জাতীয় পদার্থ), ক্লোরিণ (লবণ হইতে এই গ্যাস পাওয়া যায়)।

সুতরাং এই সমস্ত পদার্থই বৃক্ষের খাদ্য। যে জমিতে এই সকল পদার্থ পরিমিত মত থাকে সেই জমিই কৃষির পক্ষে উত্তম। তবে জমিতে এই সকল দ্রব্যের অভাব হইলেই সার দিতে হয়। সারে অল্পাধিক পরিমাণে এই সকল দ্রব্য থাকে।

সার।— জীব-জন্তুর মল-মূত্র, খৈল, ছাই, পচা মাছ, পচা পাতা, পচা পাক প্রভৃতি সারে যবক্ষারজান, পটাশ, চূণ, লৌহ, গন্ধক ও ফস্‌ফরাস আছে। কাজেই জমিতে এই সকল সার দিলে বৃক্ষের খাদ্যের অভাব হয় না। তবে বৃক্ষ বুঝিয়া সার দিতে হয়। সকল সার সকল বৃক্ষের পক্ষে উপযোগী নয়। যে বৃক্ষের যে খাদ্যের অধিক প্রয়োজন, যে সারে সেই খাদ্য অধিক থাকে—সে বৃক্ষের পক্ষে তাহাই উপযুক্ত।

বীজ।—কেবল উত্তম জমি ও উত্তম সার হইলেই কৃষি হইবে না। উত্তম বীজ চাই।

(১) যে ফল বা শস্য উত্তমরূপে পরিপক্ক ও পরিপুষ্ট তাহার বীজই উত্তম বীজ।

(২) যে বীজের গা ফাটা নয়, বেশ তেলতেলে ও নিরেট, সেই বীজই উত্তম।

(৩) উত্তম বীজ ভারী—জলে ডুবিয়া যায়। মন্দ বীজ জলে ভাসে।

(৪) যে বীজ এক বৎসরের অধিক পুরাতন তাহাতে প্রায়ই ভাল বৃক্ষ জন্মে না।

(৫) যে বীজ স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে বা অনাবৃত অবস্থায় রাখা যায় তাহাতে উত্তম বৃক্ষ জন্মে না।

(বীজগুলিকে উত্তমরূপে ঢাকিয়া শুষ্ক স্থানে রাখিতে হইবে।)

সকল জমিতে ও সকল দেশে সকল রকম ফসল উত্তমরূপ জন্মে না। যে স্থানে যে ফসল বিশেষরূপ পরিপুষ্টি লাভ করে, সে স্থান হইতে সেই ফসলের বীজ ক্রয় করিয়া আনা সঙ্গত।

অস্থি বিন্যাস।

উপকরণ—নর-কঙ্কাল ও অন্যান্য প্রাণীর কঙ্কাল। অভাবে নর-কঙ্কালের ও পশু পক্ষীর কঙ্কালের ছবি। ঠাকুরগড়া মাটী ও কাঠি।

তোমরা নিজ নিজ শরীর টিপিয়া দেখ। শরীরের এক ভাগ বেশ নরম ও এক ভাগ বেশ শক্ত। শরীরের এই শক্ত ভাগকে অস্থি বা হাড় বলে।

এই মাটী দিয়া সকলে এক একখান লাঠি তৈয়ার কর। লাঠিটী খাড়া কর। কি হইল? ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেন? মাটী নরম জিনিস, কোন শক্ত জিনিষের আশ্রয় না পাইলে খাড়া থাকিতে পারে না। আচ্ছা, এখন এই কাঠির গায় মাটী লাগাও। এবারে কি মাটী পড়িয়া গেল? না, এবারে কাঠির সাহায্যে খাড়া আছে। প্রতিমা গড়িবার সময় কি দিয়া কাঠাম প্রস্তুত করে? বাঁশ দিয়া। কেন? কাঁচা মাটীর পুতুল খাড়া থাকিতে পারে না, ভাঙ্গিয়া পড়ে। হাঁ, ঠিক কথা। আমাদের শরীরের হাড়গুলিও আমাদিগের কাঠাম। এই হাড়ের সাহায্যেই আমরা খাড়া হইয়া থাকি। এই আমাদের শরীরের কাঠাম অর্থাৎ হাড়ের বিন্যাস দেখ। (নর-কঙ্কাল বা কঙ্কালের চিত্র দেখাও)।

এই হাতের হাড় দেখ। বাহুর নিম্নার্দ্ধে (প্রকোষ্ঠ) দুইখানি হাড়। আর এইরূপ পা'র নিম্নার্দ্ধেও (জানু) দুইখানি হাড় পাশাপাশি। বাহুর ও পা'র ঊর্দ্ধার্দ্ধের হাড় একখানি করিয়া। পিঠের হাড়গুলি ছোট ছোট টুকরা টুকরা, কিন্তু সবগুলি বেশ জোড়া লাগান। এই পিঠের হাড়ের নাম মেরুদণ্ড। তোমরা নিজ নিজ পিঠে হাত দিয়াও এই হাড়-গুলি বুঝিতে পারিবে। বুকে অনেকগুলি বেঁকা বেঁকা হাড় আছে। এই হাড়গুলি যেন বুকের উপর একটা খাঁচা তৈয়ারী করিয়াছে। এই খাঁচার মধ্যেই হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুসফুস আছে। হৃদ্‌পিণ্ডে রক্তের কারবার আর ফুসফুসে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের কারবার হয়। রক্ত ও বায়ু আমাদের প্রাণধারণের প্রধান উপকরণ। সেই জন্য এই দুই যন্ত্র এত সাবধানে

হাড়ের খাঁচার মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। তারপর দেখ আমাদিগের মাথাটা যেন একটা হাড়ের বাক্স। এই বাক্সের মধ্যেই মস্তিষ্ক আছে।
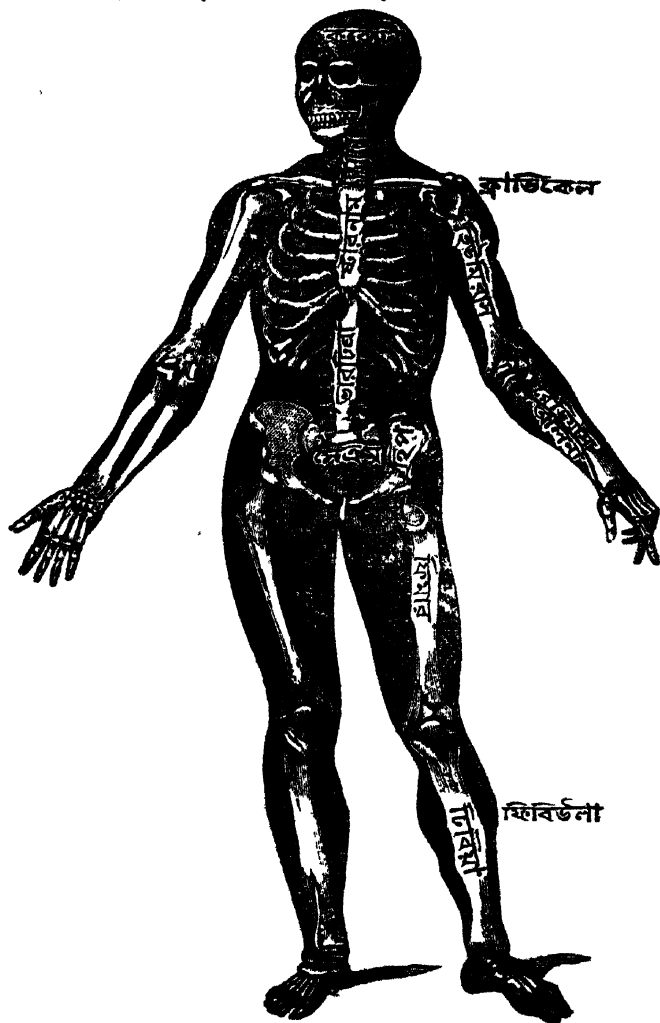
নর-কঙ্কালে অস্থি বিন্যাস।

মস্তিষ্ক নষ্ট হইয়া গেলে মানুষ মরিয়া যায়। এই জন্য এই মস্তিষ্ককে অনেক সাবধানে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে। তারপর এই দেখ কণ্ঠার দুইখানি হাড়, এই পিঠের দিকে পাখনার চ্যাপটা হাড়। এই মেরুদণ্ডের নীচে নিতম্বের হাড়। হাতের ও পায়ের আঙ্গুলগুলির হাড় কেমন খণ্ড খণ্ড।

[বালকেরা হাড়ের নাম শিক্ষা করিতে চাহিলে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে নামগুলি শিখান যাইতে পারে। দুই একটী হাড়ের সংস্কৃত নাম থাকিতে পারে, কিন্তু যখন অধিকাংশ নামই অন্যান্য দেশের ভাষা হইতে গৃহীত, তখন হাড়ের নামকরণে প্রচলিত ইংরেজী নামেরই অনুসরণ করা হইয়াছে। এই কবিতা শিলচর সেণ্ট জন এম্বুলেন্স এসোসিয়নের শ্রেণী পাঠনা উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল।

'টেম্পোর্যাল' দ্বি আঁখি পাশে — কপালে 'ফ্রণ্ট্যাল'
শিরে দ্বি 'পেরিএটাল' — নাকেতে 'ন্যাস্যাল'
পাছে 'অক্সিপিটালাস্থি' — হনুতে 'ম্যালার'
চোয়ালেতে 'ম্যাক্সিলারী' — 'আপার', 'লোয়ার'
পিঠে আছে 'ভার্টিব্রা' — নীচেতে 'সেক্রাম'
'ক্ল্যাভিকেল' কণ্ঠার হাড় — বুকে 'ষ্টারনাম'
প্রকোষ্ঠে দুখানি হাড় — 'আলনা,' 'রেডিয়াস'
প্রগণ্ডে একটী হাড় — নাম 'হিউমিরাস'
'স্ক্যাপিউলা' পাখার হাড় — পঞ্জরাস্থি 'রিব'
'ফিমার' উরুর হাড় — কটি মাঝে 'হিপ'
'টিবিয়া' জঙ্ঘাতে আছে — 'ফিবিউলার' সাথে
চরণে 'টারস্যাল' হাড় — 'কারপ্যাল' হাতে
দন্ত ধরি ছোট বড় — হাড় আছে যত
পঞ্চাশের এক উন — আর দুই শত।]

হাত ও পায়ের হাড়গুলি লম্বা লম্বা—এই হাড়গুলি ঝাঁঝরার মত ফাঁপা। সেই ফাঁপা জায়গায় এক রকম নরম জিনিষ আছে, তাহাকে বসা বলে। মাথার খুলির হাড় বাটির মত। পাঁজরার হাড় চ্যাপটা। এক হাড়ের সহিত আর এক হাড় কেমন করিয়া জোড়া আছে দেখ। এই পায়ের উপরার্দ্ধের (উরু) হাড় দেখ। ইহার মাথাটায় যেন একটা গোলা লাগান—আর এই নিতম্বের হাড়ের মধ্যে দেখ কেমন একটা গর্ত্ত আছে। এই গোলাটা এই গর্ত্তের মধ্যে বসিয়াছে ও বেশ ঘুরিতেছে। এইরূপ কব্‌জা আছে বলিয়াই আমরা হাত পা নাড়িতে পারি। আবার এক হাড়ের সঙ্গে অন্য হাড় বাঁধা আছে—এ দড়ির বাঁধন নয় বটে কিন্তু ঠিক দড়ির মতই মাংসের সূতার দ্বারা বাঁধা। এইরূপ মাংসকে মাংসপেশী বলে। মাংসপেশীর কথা পরে বলিব।

এখন অন্যান্য জীবের হাড় দেখ। এই দেখ গোরুর হাড়—ইহার পিঠে মেরুদণ্ড আছে—তবে আমাদের মেরুদণ্ড খাড়া—ইহাদের মেরুদণ্ড পড়া। তারপর আমাদিগের যেমন হাতের ও পায়ের নিম্নার্দ্ধে দুইখান ও উপরে একখান করিয়া হাড়, গোরুরও তাই। পাখীর হাড় দেখ—এইটা পাখীর মেরুদণ্ড। পায়ের ও পাখার হাড়ের সঙ্গে আমাদিগের হাত পায়ের হাড়ের মিল আছে। পশুর ও পাখীর পাঁজরের হাড় আমাদের মত। মাথার হাড়ও বাক্‌সের মত। তারপর এই মাছের হাড় দেখ—মেরুদণ্ড আছে—পাঁজরার হাড় আছে। সাপের হাড় দেখ—প্রায় মাছের হাড়ের মত। ইহাদিগের হাত পা কি পাখার হাড় নাই, কিন্তু সকলেরই মেরুদণ্ড আছে বলিয়া এই সমস্ত প্রাণীকে দণ্ডীপ্রাণী বলে।

চিংড়ী মাছের হাড় নাই, কিন্তু গায়ে শক্ত খোলা আছে। কাঁকড়ার গায়ে কেমন শক্ত একখান খোলা থাকে। পোকা, ফড়িং প্রভৃতির হাড় নাই, কিন্তু তাহাদিগের গায়ের উপর একটা শক্ত খোলা আছে—

ইহাতেই তাহাদিগের শরীরস্থ কোমল মাংসাদি রক্ষিত হইতেছে। ইহাদের মেরুদণ্ড নাই বলিয়া এই সকল জীবকে নির্দ্দণ্ডী জীব বলে।

১৮। মাংসপেশী।

উপকরণ—মাংসপেশী প্রদর্শিত চিত্র। মস্তিষ্কের চিত্র। স্নায়ুবিন্যাসের চিত্র।

শরীরের উপর হইতে চর্ম্ম খুলিয়া ফেলিলে, তাহার নীচে ও হাড়ের উপরে লাল লাল মাংস দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুর গড়িবার সময় কাদা মাটী দিয়া ঠাকুর গড়িলে, সেই ঠাকুরের গায়ে কাদা যেমন সর্ব্বত্র সমান ভাবে লেপা থাকে, আমাদিগের মাংস তেমন একভাবে লেপা নয়। চিত্রে দেখ, কতরূপ থাকে থাকে এপাশ ওপাশ করিয়া মাংস সাজান আছে। ইহারই পৃথক্ পৃথক্ মাংসগুচ্ছকে মাংসপেশী বলে। একটা

পেশী পরীক্ষা কর—পেশীর মধ্যস্থল প্রায়ই মোটা ও দুই প্রান্ত সরু। পেশী ঠিক দড়ির কাজ করে, হাড়গুলিকে একটার সহিত আর একটা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। মাংসপেশীর প্রান্তদ্বয়ে সূতার মত মাংস। পাঁঠার মাংস খাইবার সময় এই আঁসগুলি দাঁতের মধ্যে ঢুকিয়া যায়।

মাংসপেশীর দ্বারা কিরূপে হাঁড় বাঁধা আছে তাহা

মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জা।

এই হাতের চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। হাতের উর্দ্ধার্দ্ধের হাড়ের সহিত নিম্নার্দ্ধের হাড়, দুইটী পেশী-দ্বারা আবদ্ধ। একটী পেশী (ইহাকে দ্বিশির পেশী বলে) হাতের উপরে, আর একটী (ত্রিশির পেশী) হাতের নীচে। হাত গুঁটাইলে দ্বিশির ফুলিয়া উঠে, ত্রিশির লম্বা হয়। আবার হাত ছাড়িয়া দিলে দ্বিশির লম্বা হয় ও ত্রিশির ফুলিয়া উঠে। যাহারা মুদ্গর ভাঁজে বা হাতুড়ী কি কোদালির কাজ করে তাহাদের দ্বিশির পেশী বেশ উন্নত ও সবল হয়। এইরূপ পায়ের দুই অংশও পেশীতে আবদ্ধ। শরীরের মধ্যে এই পেশীটাই খুব বড়। হাঁটিবার সময় এই পেশী লম্বা হয়, বসিলে ইহা ফুলিয়া উঠে। এইরূপ শরীরের মধ্যে ছোট বড় অনেক পেশী আছে।

তারপর মাথার খুলি ভাঙ্গিলে একরূপ নরম মাংস দেখিতে পাওয়া যায়। এই নরম মাংসকে মজ্জা বলে। মাথায় যে মজ্জা আছে তাহার নাম মস্তিষ্ক। নীলদাঁড়া বা মেরুদণ্ডের মধ্যে ফাঁপা। ইহার মধ্যে একটী

মজ্জার রজ্জু আছে। ইহার নাম কসেরুকা মজ্জা। এই রজ্জু মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত। এই রজ্জু হইতে শরীরের সর্ব্বত্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রবৎ শিরা চলিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত সূত্রবৎ শিরাকে স্নায়ু বলে। শরীরের কোন স্থান স্পর্শ করিলে এই স্নায়ুতে আঘাত লাগে—নিমেষে সেই আঘাত মস্তিষ্কে গিয়া উপস্থিত হয়। তখন আমাদিগের স্পর্শজ্ঞান হয়। কোন শব্দ কাণে গেলেই এই স্নায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হয় ও সেই আঘাত মস্তিষ্কে যায়—তখনই আমরা শব্দ বুঝিতে পারি। এইরূপ যখন কোন জিনিষের ছায়া চোখে পড়ে, তখন চোখের স্নায়ু সঞ্চালিত হয় ও সেই সঞ্চালন মস্তিষ্কে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের দৃষ্টিজ্ঞান দেয়। মস্তিষ্কই সমস্ত জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল। মস্তিষ্ক নষ্ট হইলে চক্ষু দেখিতে পায় না, কাণ শুনিতে পায় না, নাসিকা ঘ্রাণ পায় না, শরীরের স্পর্শবোধ থাকে না। মস্তিষ্ক এমন আবশ্যক যন্ত্র বলিয়া ইহা খুব শক্ত বাক্সের (মাথার খুলি) মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে।

রক্ত সঞ্চালন।

উপকরণ—রক্ত সঞ্চালন প্রদর্শিত চিত্র।

আমাদিগের শরীরের যেখানেই কাটা যায়, সেইখান হইতেই রক্ত বাহির হয়। এমন কি যদি খুব সরু সূঁচ দিয়া শরীরের কোন স্থানে সামান্য আঘাত করা যায়, তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে রক্ত পড়িতে থাকে। তবেই দেখা যাইতেছে যে শরীরের সকল স্থানেই রক্ত আছে। এই রক্ত কিরূপ ভাবে আছে? বাটিতে যেরূপ ভাবে জল থাকে, আমাদের শরীরে রক্তও কি সেইরূপ ঢালা অবস্থায় আছে? না, তাহা নহে, যদি তাহাই হইত তবে নাক মুখ প্রভৃতি শরীরের ছিদ্র দিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িত। রক্ত শিরার ভিতরে আছে। এই সমস্ত শিরা নানা আকারের—বৃদ্ধা আঙ্গুলের মত মোটা শিরা হইতে আরম্ভ করিয়া চক্ষুর অদৃশ্য অতি

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা আছে। শিরার সংখ্যাও অসংখ্য। শরীরের যেখানে সূচ বিদ্ধ কর ঠিক সেই খানেই একটা শিরার গায় বিদ্ধ হইয়া রক্ত বাহির হইবে।

হৃদপিণ্ড এই সকল শিরার গোড়া অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান। হৃদপিণ্ড ঠিক বুকের মাঝখানে আছে। বুকের যেখানে হাত দিলে বুক ধুক্ ধুক্ করে সেই স্থানেই হৃদপিণ্ড। হৃদপিণ্ডের দুইদিকে দুইটী ফুস্‌ফুস্। এই ফুস্‌ফুস্ দুইটিতে আমাদিগের নিশ্বাসের বায়ু জমা হয়। হৃদপিণ্ড হইতে শরীরের সর্ব্বত্র শিরা চালিত হইয়াছে। হৃদপিণ্ডের নিকট যে সকল শিরা, সেগুলি বেশ মোটা; ক্রমেই যত দূরে গিয়াছে ততই সূক্ষ্ম হইয়াছে। ঠিক গাছের ডালের মত।

এই সকল শিরার মধ্যে আবার দুই শ্রেণী আছে। এক শ্রেণী শিরা, হৃদপিণ্ড হইতে রক্ত লইয়া শরীরের সর্ব্বত্র বিলাইয়া দিতেছে। এই শ্রেণীর শিরাকে ধমনী বলে, আর এই ধমনী শিরায় যে রক্ত বহে তাহার বর্ণ ঘোর লাল। আর এক শ্রেণীর শিরা শরীরের সর্ব্বত্র হইতে দূষিত রক্ত বহিয়া আনিয়া হৃদপিণ্ডে উপস্থিত করিতেছে। ইহাকে কৃষ্ণ শিরা কহে। এই শিরার রক্ত কাল। হাতের উপর যে সকল মোটা মোটা শিরা ভাসিয়া উঠে তাহা দেখ—তাহার ভিতর যে কাল রক্ত তাহা চর্ম্মের উপর দিয়াও বুঝিতে পারিবে। (কিরূপে কৃষ্ণ শিরা ও ধমনী পাশাপাশী জড়িত হইয়া আছে তাহা পর পৃষ্ঠার চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।)

হৃদপিণ্ডের আকার খুব বড় নয়—হাতের মুঠের মত। এই হৃদপিণ্ডের চারিটী কক্ষ আছে—দক্ষিণে দুইটী ও বামে দুইটী। হৃদপিণ্ড রক্ত পরিষ্কার করিবার কারখানা। কৃষ্ণ শিরাসকল দূষিত রক্ত ও তরল খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য নানারূপ অম্ল ও পিত্তরসে মিলিয়া তরল হইলে) বাহিয়া আনিয়া হৃদপিণ্ডের দক্ষিণ কক্ষে উপস্থিত করে। দূষিত রক্ত এই দক্ষিণ কক্ষ হইতে ফুস্‌ফুসে গমন করে। সেইখানে বিশুদ্ধ বায়ুর দ্বারা
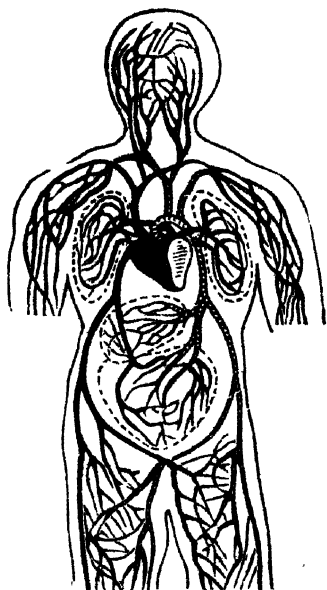
রক্ত সঞ্চালন।

(অক্সিজেন) শোধিত হইয়া, হৃদপিণ্ডের বাম কক্ষে ফিরিয়া আইসে। আবার এই বাম কক্ষ হইতে ধমনী দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র পরিচালিত হয়। শরীরের সর্ব্বস্থান হইতে দূষিত রক্ত হৃদপিণ্ডে আনীত হইয়া বিশুদ্ধ হয়। পুনঃ শরীরের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতে অর্দ্ধ মিনিট সময় লাগে। শরীরের সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ শিরা ও ধমনী পাশাপাশী আছে। কৃষ্ণ শিরা কাটিয়া গেলে অবিরাম ধারায় কাল রক্ত বাহির হয়, কিন্তু ধমনী কাটিয়া গেলে ধাক্কায় ধাক্কায় লাল রক্ত বাহির হয়। হৃদপিণ্ড হইতে সর্ব্বত্র রক্ত সঞ্চালিত হওয়ার দরুণ হৃদপিণ্ড সর্ব্বদাই ধুক্ ধুক্ করে। রক্ত সঞ্চালনের দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু ও খাদ্য শরীরের সর্ব্বত্র পরিচালিত হইতেছে। ইহাতেই শরীর সবল হইয়া থাকে।

শ্বাস প্রশ্বাস।

উপকরণ—ফুসফুসের চিত্র।

আমাদিগের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অহরহঃ নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য চলিতে থাকে। নিশ্বাস বন্ধ হইলে মানুষ মরিয়া যায়। এখন এই নিশ্বাসের কার্য্য দ্বারা আমাদিগের কি উপকার হইতেছে, তাঁহাই শুন।

গলা টিপিয়া দেখ—একটা মোটা নলের মত জিনিষ হাতে বাধিবে।

এই নলটীকেই শ্বাসনালী বলে। এই নালী বুকের ভিতর পর্য্যন্ত গিয়া দুই ডালে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার এক এক ডালের মাথায় এক এক খণ্ড (স্পঞ্জের মত) সছিদ্র মাংসপিণ্ড আছে। এই দুই মাংসপিণ্ড হৃদপিণ্ডের কতকাংশ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই দুইটীকে ফুস্‌ফুস্ বা বায়ু-কোষ বলে। শ্বাসনালী দিয়া আমরা যখন নিশ্বাস গ্রহণ করি, তখন সেই নিশ্বাস বা বায়ু এই দুই ফুস্‌ফুসে আসিয়া উপস্থিত হয়। ফুস্‌ফুস যখন এইরূপে বায়ু পুর্ণ হয় তখন ফুলিয়া উঠে। আবার যখন আমরা নিশ্বাস ছাড়িয়া দি, তখন ফুস্‌ফুস্ হইতে বায়ু বাহির হইয়া যায় আর ফুস্‌ফুস্ ছোট হইয়া পড়ে। ফুস্‌ফুস্ এইরূপ ঘন ঘন ছোট বড় হওয়াতে আমাদিগের বুকও সর্ব্বদা কামারের হাপরের মত উচু নীচু হইতেছে। পাঁঠা কাটিলে তাহার বুকের ভিতর যে ফুল্‌কা পাওয়া যায় তাহা অনেকেই দেখিয়াছ। তাহাতে ফু দিলে কেমন ফুলিয়া উঠে তাহাও জান। আমাদের বুকের ভিতরের ফুলকা বা ফুস্‌ফুস্ অনেকটা ঐ রকমের।
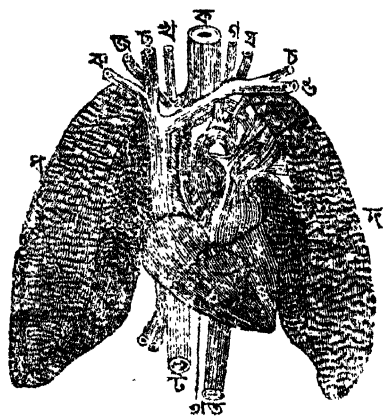
ফুস্‌ফুসের চিত্র।

আমরা নিশ্বাসের দ্বারা বায়ু হইতে অক্‌সিজেন গ্যাস গ্রহণ করি। এই অক্‌সিজেন গ্যাস ফুস্‌ফুসে গিয়া রক্ত পরিষ্কার করে। আবার যখন আমরা নিশ্বাস ফেলি (প্রশ্বাস) তখন প্রশ্বাসের সহিত শরীরের অনেক দূষিত পদার্থ পরিত্যাগ করি। অক্‌সিজেন যখন রক্ত পরিষ্কার করে তখন শরীরে তাপের উৎপত্তি হয়। আমরা সর্ব্বদাই নিশ্বাস লইতেছি,

সর্ব্বদাই রক্ত পরিষ্কারের কার্য্য চলিতেছে, সুতরাং সর্ব্বদাই শরীরে তাপ আছে। এই তাপে আবার শরীরের নানা পদার্থ ক্ষয় হইয়া অঙ্গারক বায়ুরূপে পরিণত হইতেছে।
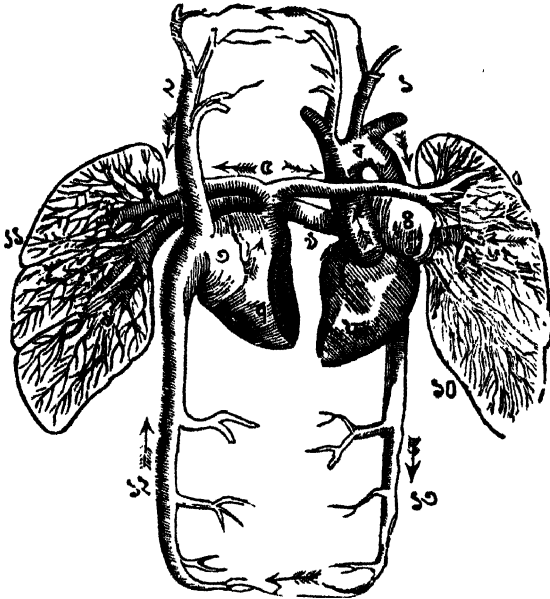
ফুস্‌ফুস কাটিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ৩, ৮ হৃদ্‌পিণ্ড খণ্ডিত।
২, ১২ কৃষ্ণ শিরা, ১৩ ধমনী।

কাঠ পোড়াইলে অঙ্গার হয় জান। সেই অঙ্গার বায়ুরূপে অদৃশ্য হইলেই অঙ্গারক বায়ু হয়। তাপে যখন শরীরের ভিতরেও এইরূপ দহন চলিতেছে, তখন সর্ব্বদাই অঙ্গার বায়ুরও সৃষ্টি হইতেছে। অক্‌সিজেন বায়ু এই অঙ্গার বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে শরীর হইতে বাহির করিয়া ফেলে। অঙ্গার বায়ুর সহিত অক্‌সিজেন মিশিলে তাঁহাকে অঙ্গারাম্ল বায়ু বা কারবণিক এসিড গ্যাস বলে (কারণ অকসিজেনের অপর নাম

অম্লজান বায়ু)। এই অঙ্গারাম্ল বায়ুকেই আমরা প্রশ্বাস দ্বারা বাহির করিয়া ফেলি। এই বায়ু মানুষের পক্ষে বড় অনিষ্টকর। অধিকক্ষণ এই বায়ু সেবন করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। সেইজন্য যে গৃহে বহু লোক বাস করে সে গৃহে বাস করা অনিষ্টজনক।

প্রশ্বাসের সহিত আমরা যথেষ্ট জলীয় বাষ্পও বাহির করিয়া থাকি। একখানি ঠাণ্ডা শ্লেট বা আয়নার উপর হাঁই দিলে বা নিশ্বাস ফেলিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রশ্বাস বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা শ্লেট বা কাচের গায় লাগিয়া জলে পরিণত হইয়া থাকে।

সুস্থ ব্যক্তি প্রতি মিনিটে ১৬ হইতে ১৮ বার নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য করে। পরিশ্রম করিলে বা খুব জ্বর হইলে শ্বাস প্রশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

(চুণের জলে ফুৎকার দিয়া অঙ্গারাম্ল গ্যাসের পরীক্ষা দেখাইতে পার। বাতিজ্বলন বিষয় পড়।)

পাকস্থলী।

উপকরণ—পাকস্থলীর চিত্র। আপত্তি না থাকিলে শিক্ষকগণ পাঁঠা কাটিয়া বালকগণকে ঐ সকল যন্ত্রের কার্য্য বুঝাইয়া দিতে পারিবেন।

আমরা যখন কোন জিনিষ খাই, তখন মুখের ভিতর সেই জিনিষ পুরিয়া দিয়া থাকি। মুখের মধ্য দিয়া সেই জিনিষ যে পেটের মধ্যে যায় ইহাও আমরা টের পাই। কিন্তু তারপর যে কি হয় তাহা বুঝিতে পারি না। আজ সেই কথাই তোমাদিগকে বলিব।

আমাদিগের মুখের মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া মলদ্বার পর্য্যন্ত একটা খুব বড় নল আছে। এই নলের কোন স্থান মোটা, কোন স্থান সরু, কোন স্থান সরল, কোন স্থান বক্র হইয়া সমস্ত পেট জুড়িয়া আছে।

ছবিতে দেখ। যখন আমরা কোন জিনিষ খাই তখন সেই জিনিষকে

দাঁত দিয়া চিবাইয়া, মুখের লালা দিয়া ভিজাইয়া নরম করিয়া লই। তারপর গিলিয়া ফেলি। গিলিলেই সেই নরম জিনিষ এই অন্ননালি দিয়া চলিয়া আসিয়া পাকস্থলী নামক একটা থলিয়াতে পড়ে। অন্ননালিটী পেপের ডাটার মত একটা নল বটে কিন্তু ভিতর সরল নহে। এই নলের মধ্যে অঙ্গুরীয় আকার থাক্ থাক্ আছে। গিলিবার সময় খাদ্যদ্রব্য একে একে, এক থাক হইতে আর এক থাকে নামিয়া যায়। এই থাক্ থাক্ না থাকিলে আমরা মাথা নীচু করিলেই খাবার জিনিষ বাহির হইয়া আসিত। তোমরা হয় ত দেখিয়াছ যে বাজীকরের ছেলেরা মাটীতে মাথা দিয়া, পা ঊর্দ্ধে উঠাইয়া দুধ ও রসগোল্লা খায়। যদি অন্ন-নালির ভিতর সরল হইত, তবে এমন করিয়া খাইতে পারিত না। দুধ বাহির হইয়া পড়িত। পাকস্থলী হইতে নানারূপ রস বাহির হইয়া থাকে। খাদ্য যখন পাকস্থলীতে আসিয়া পড়ে, তখন এই সকল রসে মিশিয়া খাদ্য খুব তরল হয়। খাদ্য পাকস্থলীতে এক ঘণ্টা হইতে ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে।

তারপর এই তরল পদার্থ ক্ষুদ্র অন্ত্রের (নাড়ি ভুঁড়ি) মধ্যে প্রবেশ

করে। এই প্রবেশের পথে যকৃত হইতে পিত্তরস ও মেটে (Sweet-bread) হইতে ক্লোমরস আসিয়া ইহাকে আরও তরল করে। ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে নানারূপ রসে মিশিয়া এই তরল পদার্থ রক্তে মিশ্রিত হয় ও পরে রক্তেই পরিণত হয়। এই ক্ষুদ্র অন্ত্র প্রায় ২০ ফুট লম্বা। পেটের মধ্যে গুটাইয়া আছে।

তারপর খাদ্যের যে অংশ অসার, সে অংশ ধীরে ধীরে বৃহৎ অন্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হয় ও বৃহৎ অন্ত্র ঘুরিয়া মলদ্বার দিয়া বিষ্ঠারূপে বাহির হইয়া যায়। এই বৃহৎ অন্ত্র ৪ ফুট লম্বা।

শক্ত খাদ্য কেমন করিয়া তরল হয় জানিতে হইলে খাদ্যের সাধারণ বিভাগ জানা আবশ্যক। খাদ্য সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর (১) মাংস জাতীয় (২) চর্ব্বি বা তৈল জাতীয় (৩) শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয়। মাছ, মাংস, ডিম, দুগ্ধ প্রভৃতি মাংস জাতীয়; মাংসের চর্ব্বি, দুগ্ধের ঘৃত, ডিমের কুসুম, সাধারণ তেল প্রভৃতি চর্ব্বি বা তৈল জাতীয়; এরারুট শ্বেতসার; চাউল, গম, সাগু, আলু প্রভৃতিতে যথেষ্ট শ্বেতসার আছে।

এক টুকরা কাপড়ের মধ্যে একটু মথা ময়দা লইয়া, সেই ময়দা একটা গামলার জলে ধুইতে থাক। গামলার জল ঘোলা হইয়া যাইবে। একটু পরে জলের নীচে এক প্রকার সাদা গুঁড়া জমিয়া যাইবে। ইহাই শ্বেতসার। ইহা জলে গলে না। আমরা যখন ভাত খাই, তখন এই শ্বেতসার খাই। তবে এই শ্বেতসার আমাদিগের মুখের লালার সহিত মিশিলে চিনি হইয়া যায়। ইহার একটা পরীক্ষা করিতে পার। প্রত্যেক বালককে চারটা করিয়া চাল চিবাইতে দাও। যখন প্রথম চিবাইতে আরম্ভ করিবে তখন বিশেষ কোন আস্বাদ পাইবে না, কিন্তু যতই বেশী চিবাইবে ও দন্তপিষ্ট চাউল মুখের লালার সহিত মিশিতে থাকিবে ততই মিষ্ট রসের আস্বাদ পাওয়া যাইবে। এইরূপে শ্বেতসার চিনিতে পরিণত হয়। চিনি জলে গলিয়া যায়। চর্ব্বি, তৈল প্রভৃতি জলে মেশে না কিন্তু পাকস্থলী

হইতে যে রস উৎপন্ন হয় তাহাতে চর্ব্বি ও তৈল জাতীয় পদার্থ গলিয়া জলবৎ হইয়া যায়।

পাখীর পাকস্থলীতে ব্যবস্থা আবার অন্যরূপ। (চিত্র দেখ) পাখী খাবার জিনিষ গিলিয়া যায়। খাদ্য প্রথম কক্ষে সঞ্চিত হয়। সেখানে এক প্রকার শ্লেষ্মরসে সিক্ত হয়। এইরূপ সিক্ত ও নরম হইলে খাদ্য দ্বিতীয় কক্ষে যায়। সেখানে আবার আর এক প্রকার রসে মিশ্রিত হইয়া খাদ্য আরও নরম হয়। তারপর খাদ্য তৃতীয় কক্ষে প্রবেশ করে। এই তৃতীয় কক্ষটী একটী শক্ত চর্ম্মের ব্যাগ। এই ব্যাগের চর্ম্ম জাঁতার মত কাজ করে।

পাখীর পাকস্থলী।

গোরুর পাকস্থলী অন্যরূপ। ইহাতে ৪টী কক্ষ। গোরু ঘাস খাইবার সময় একটুও চিবায় না। দাঁত দিয়া ঘাস কাটিয়াই গিলিয়া ফেলে। এই সমস্ত ঘাস পাকস্থলীর প্রথম কক্ষে জমা হয়। তাই প্রথম কক্ষটী খুব বড়। যখন এই প্রথম কক্ষ ঘাসে পূর্ণ হয়, তখন গোরু শয়ন করে। প্রথম কক্ষে এক প্রকার রস আছে। ইহাতে ঘাস পাতা কিঞ্চিৎ নরম হয়। প্রথম কক্ষ হইতে রসযুক্ত ঘাস দ্বিতীয় কক্ষে যায়। সেখানে আবার অন্য
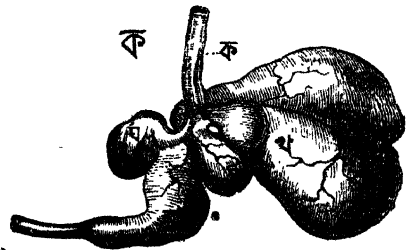
গোরুর পাকস্থলী।

এক প্রকার রসে মিশ্রিত হয়। গোরু এই দ্বিতীয় কক্ষ হইতেই ঘাসগুলি উদ্গার করিয়া মুখে আনে ও তাহা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তৃতীয় কক্ষে প্রেরণ করে। দ্বিতীয় কক্ষ হইতে যে ঘাস মুখে আনে তাহাকেই 'জাবর' বলে। গোরুর এইরূপ উদ্গিরণ করিয়া খাওয়াকে 'জাবর কাটা' বা 'রোমন্থন' করা বলে। এই জাবর তৃতীয় কক্ষে পিত্তরসে মিশ্রিত হইয়া চতুর্থ কক্ষে যায়। চতুর্থ কক্ষে শ্লোমরসে মিশ্রিত হইয়া জীর্ণ হয়। যে সমস্ত চতুষ্পদের দ্বিখণ্ডিত খুর (শূকর বাদে) তাহাদিগের পাকস্থলীর ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা।

গ্রহণ।

উপকরণ—গোলক, বল, বাতি, দেশলাই, পয়সা, চক্, ব্ল্যাকবোর্ড।

তোমরা জান যে পৃথিবী একটা বলের মত গোল, শূন্যে ভাসিয়া আছে, নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতেছে ও এইরূপ ঘূর্ণনেই দিন রাত্রি হইতেছে। আবার পৃথিবী সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিদিকেও এক বার ঘুরিয়া আসিতেছে, আর এই ঘূর্ণনেই এক বৎসর হইতেছে।

চন্দ্র আবার পৃথিবীকে প্রায় এক মাসে (২৭।২৮ দিনে) একবার ঘুরিয়া আসে। (চিত্র আঁক) চন্দ্রের নিজের কোন আলো নাই, জান। চন্দ্র সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হয়। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তৃতীয়ার দিন চাঁদ দেখিলে, দেখিতে পাইবে চাঁদের যে দিক পশ্চিমে আছে সেই দিকেই আলোক পাইয়াছে, কারণ তখন সূর্য্য পশ্চিমে। আমরা সূর্য্য দেখিতে পাই না বটে কিন্তু আকাশে অনেকক্ষণ সূর্য্যের আলোক আসিতে থাকে। সেই আলোক চাঁদের গায় লাগিয়া চাঁদ আলোকিত হয়। আবার কৃষ্ণ-পক্ষের একাদশী দ্বাদশীতে দেখিতে পাইবে চন্দ্রের যে পার্শ্ব পূর্ব্বদিকে সেই

পার্শ্বই আলোকিত হয়, কারণ ঐ ঐ তিথিতে চন্দ্র প্রায় শেষরাত্রে পূর্ব্ব-দিকে উদিত হয়, আর তখন সূর্য্যও সেইদিকে আসিতে থাকে।

চন্দ্র আমাদিগের নিকটে (২ লক্ষ মাইল) আর সূর্য্য বহু দূরে (৯ কোটী মাইল)। এখন যদি চন্দ্র ঘুরিতে ঘুরিতে এমন স্থানে আসিয়া পড়ে যে পৃথিবী মধ্যে, চন্দ্র ও সূর্য্য দুইদিকে ও তিনটীই ঠিক এক লাইনে, তবে চন্দ্রগ্রহণ হয় (চিত্র দেখ) অর্থাৎ সূর্য্যের আলোকে পৃথিবীর যে ছায়া উৎপন্ন হয়, তাহাই চন্দ্রের উপর গিয়া পড়ে। পৃথিবী গোল, সুতরাং চন্দ্রের উপর পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে তাহাও গোল। গ্রহণের সময় দেখিতে পাইবে ছায়া বেশ গোল দেখায়।
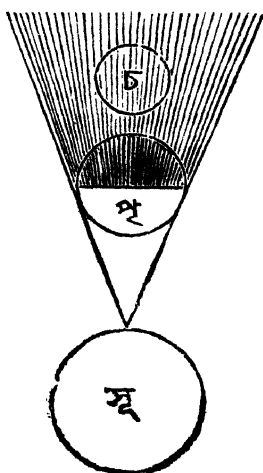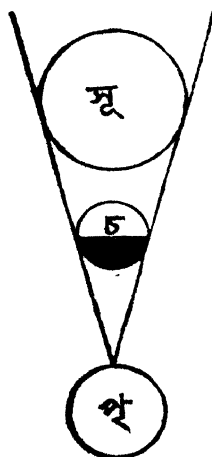
চন্দ্রগ্রহণ। সূর্য্যগ্রহণ।

আবার যদি এমন অবস্থা হয় যে চন্দ্র মধ্যে, সূর্য্য ও পৃথিবী দুই দিকে, কিন্তু তিনটীই ঠিক এক লাইনে, তবে সূর্য্যগ্রহণ হয়। চন্দ্রগ্রহণে যেরূপ পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয় দেখিলে, সূর্য্যগ্রহণে তাহা হয় না

—সূর্য্য আলোকময়। আলোকের উপর ত আর ছায়া পড়িতে পারে না। সূর্য্যগ্রহণে কেবল চন্দ্রের দ্বারা সূর্য্য ঢাকা পড়ে। চন্দ্র সূর্য্য অপেক্ষা অনেক ছোট বটে কিন্তু চন্দ্র নিকটে বলিয়া দূরের সূর্য্য এই চন্দ্রের দ্বারাই ঢাকা পড়ে। একটা পয়সা চোখের সাম্‌নে এরূপ ভাবে ধরা যাইতে পারে যে সেই পয়সার দ্বারা দেয়ালের ব্ল্যাকবোর্ড ঢাকা পড়িবে। (পয়সা এইরূপ ভাবে ধরিয়া দেখাও)। সূর্য্য চন্দ্রের দ্বারা খানিকক্ষণ ঢাকা পড়ে বলিয়া সূর্য্য দেখা যায় না। (চিত্র দেখ)। বাতি জ্বালিয়াও এই সমস্ত পরীক্ষা দেখাও।

(প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় গ্রহণ হয় না কেন, তাহা এখন বুঝাই-বার আবশ্যকতা নাই)।

সৌরজগৎ।

উপকরণ— ব্ল্যাকবোর্ড ও চক।

আকাশে যত নক্ষত্র দেখিতে পাও তাহার প্রায় সমস্তগুলিই নক্ষত্র আর অতি সামান্য কয়েকটী গ্রহ। গ্রহ আর নক্ষত্রে পার্থক্য কি? নক্ষ-ত্রের আলো মিট্‌ মিট্‌ করে আর গ্রহের আলো স্থির। আর নক্ষত্রগুলি প্রত্যেক বৎসর এক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু গ্রহগুলি এক স্থানে থাকে না। তাহাদিগের স্থান পরিবর্ত্তন হয়। একটা খুব বড় উজ্জ্বল গ্রহ বোধ হয় তোমরা চেন। সেটাকে শুকতারা বা শুক্র বলে। শীতের সময় সন্ধ্যাবেলা পশ্চিমে দেখা যায় আর গ্রীষ্মের সময় খুব প্রাতঃ-কালে পূর্ব্বদিকে দেখা যায়। এই শুক্রের আলোর সহিত যদি আকা-শের কোন বড় নক্ষত্রের আলোক তুলনা কর, তবে দেখিবে যে এই শুক্রের আলো স্থির কিন্তু নক্ষত্রের আলো চঞ্চল, মিটি মিটি করে। গ্রহের নিজের কোন আলো নাই, ইহারাও চন্দ্রের মত সূর্য্যের আলোকে

আলোকিত হয়। আর নক্ষত্রগুলি অনেক দূরে, সূর্য্যের অপেক্ষাও অনেক দূরে। এক একটী নক্ষত্র এক একটী সূর্য্য। আর কোন কোন নক্ষত্র সূর্য্যের অপেক্ষা অনেক বড়। লুব্ধক নক্ষত্র (কালপুরুষের নিকটে —একটু পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে) সূর্য্য অপেক্ষা ২০০০ গুণ বড়। সূর্য্য আমাদিগের পৃথিবীর মত শক্ত পদার্থ নহে। সোণা গলাইলে যেমন তরল ও উত্তপ্ত হয়—সূর্য্য এখনও সেইরূপ তরল ও উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে সূর্য্য হইতে কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ কোন কারণে ছিট্‌কাইয়া গিয়াছিল। সেই সকল ফোঁটা জমিয়াই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ হইয়াছে। আমাদিগের পৃথিবীও এক সময়ে তরল অবস্থায় ছিল।
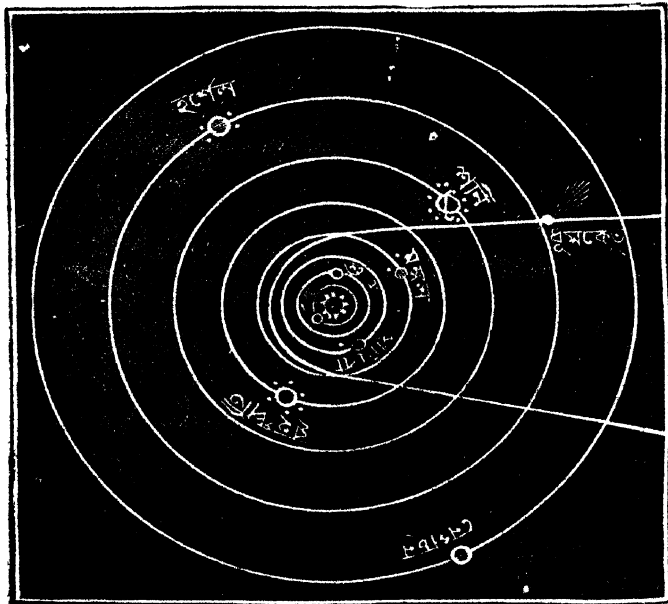
আমাদিগের পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, গ্রহগুলিও

সেইরূপ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আমাদিগের পৃথিবীও একটা গ্রহ।

সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহগুলি কিরূপে ঘুরিতেছে তাহা চিত্র আঁকিয়া বুঝাইয়া দাও। বুধ সূর্য্যের নিকট। বুধগ্রহ সূর্য্যকে প্রায় ৩ মাসে একবার প্রদক্ষিণ করে। তার পর শুক্র—ইহার প্রায় ৭॥ মাস লাগে। তার পরই আমাদিগের পৃথিবী সূর্য্যকে বার মাসে একবার ঘুরিয়া আসে। পৃথিবীর পর মঙ্গল—ইহার প্রায় ২৩ মাস সময় লাগে। ক্রমেই যত বৃত্ত বড় হইতেছে ততই দূরস্থ গ্রহগণের প্রদক্ষিণ করিতে বেশী সময় লাগিতেছে। মঙ্গলের পর বৃহস্পতি গ্রহ—ইহার একবার প্রদক্ষিণ করিতে ১২ বৎসর লাগে। শনির প্রায় ৩০ বৎসর, ইউরেনসের ৯০ বৎসর ও নেপচুণের ১৮০ বৎসর সময় লাগে। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করার নামই এক বৎসর। এখন দেখ নেপচুণের এক বৎসর সময়ে আমাদিগের দুই তিন পুরুষ কাটিয়া যায়।

এই সমস্ত গ্রহই সূর্য্যের আকর্ষণে বাঁধা আছে। বিনা সূতাতেও যে টানিয়া আনা যায় বা আকর্ষণ করা যায় তাহা চুম্বকের পরীক্ষণে দেখিয়াছ। সূর্য্য ও এই গ্রহগুলি একত্রে একটা সৌরজগৎ। প্রত্যেক নক্ষত্র যে এক একটা সূর্য্য তাহা বলিয়াছি। প্রত্যেক নক্ষত্রের চারিদিকে নানারূপ গ্রহ ঘুরিতেছে। এক একটা নক্ষত্র এক একটা সৌরজগতের কেন্দ্র স্বরূপ। তাহা হইলে বল ত বিশ্বরাজ্যে কত সৌরজগৎ আছে? অসংখ্য।

পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল। পৃথিবীর তুলনায় অন্য গ্রহ-গুলির আকার ও প্রকার :—

(১) নেপচুণ—পৃথিবী অপেক্ষা ৪ গুণ বড় আর সূর্য্যের নিকট হইতে পৃথিবী যতদূর, নেপচুণ তার চেয়ে ৩০ গুণ বেশী দূরে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে দেখা যায় যে এই গ্রহের গাত্রে অস্পষ্ট কতকগুলি

দাগ আছে। গ্রহের চতুর্দ্দিকের বায়ুমণ্ডল খুব ঘন—আর আমাদিগের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মত নয়। আমাদিগের পৃথিবী যেমন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, নেপচুণ এখনও এত ঠাণ্ডা হয় নাই।
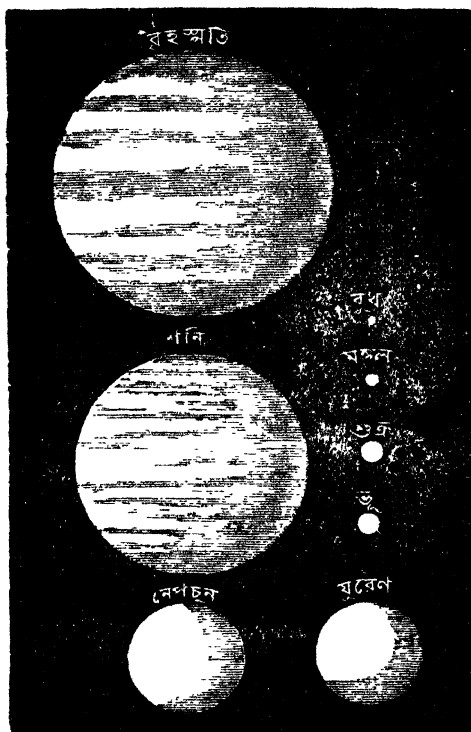
(২) উরেনস—পৃথিবী অপেক্ষা ৪গুণ বড় কিন্তু ৫ গুণ হাল্‌কা। সূর্য্য হইতে আমরা যত দূরে, উরেনস তাহা অপেক্ষা নয় গুণ বেশী দূরে। ইহার উপর কাল বড় বড় দাগ দেখিতে পাওয়া যায়; এই দাগগুলি গ্রহটীকে বেষ্টন করিয়া আছে। নেপচুণ ও উরেনস্ এখন গলিত অবস্থায় আছে বলিয়া মনে হয়। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডল নেপচুণের বায়ুমণ্ডলের মত।

(৩) শনি—পৃথিবী অপেক্ষা ৯গুণ বড়। এ গ্রহটী একটা বৃহৎ অঙ্গুরীয়কের মধ্যে প্রবিষ্ট আছে। এই অঙ্গুরীয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু অঙ্গুরীয়কের সমষ্টি। অঙ্গুরীয়কগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রপুঞ্জ বলিয়া মনে হয়। গ্রহের গায়ে বহু কৃষ্ণবর্ণ বেড় আছে। চতুর্দ্দিকে বায়ুমণ্ডল ঘন ও উজ্জ্বল মেঘে পরিপূর্ণ ও সদা সচঞ্চল। শনি এখনও খুব উত্তপ্ত।

(৪) বৃহস্পতি—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। পৃথিবী অপেক্ষা ১৩॥ গুণ বড়। প্রায় ৫ গুণ বেশী দূরে। গায়ে বহু কৃষ্ণবর্ণ মেখলা ও অসংখ্য উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ দাগ। চতুর্দ্দিকের বায়ুমণ্ডল নানারূপ বাষ্পে পরিপূর্ণ। গ্রহ এখনও উত্তপ্ত ও তরল অবস্থায় আছে।

(৫) মঙ্গল—আকারে আমাদিগের পৃথিবীর অর্দ্ধেক। আমাদিগের পৃথিবী অপেক্ষা অল্প কিছু দূরে। ঘুরিতে ঘুরিতে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর এত নিকটে আসিয়া পড়ে যে এই গ্রহটীর সূর্য্যালোক প্রাপ্ত অংশ দূরবীক্ষণের সাহায্যে বেশ দেখা যায়। মঙ্গলের উপরিভাগ কঠিন বলিয়া বোধ হয়। গ্রহগাত্রের অনেকগুলি চিহ্ন স্থায়ী। গ্রহের দুই মেরু শ্বেতবর্ণ। শীতকালে এই শ্বেতভাগ বৃদ্ধি পায়। অন্য অংশে হরিতাভ ও কমলাভ এবং কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়। হরিতাভ অংশ স্থল ও কৃষ্ণবর্ণ অংশ সমুদ্র বলিয়া মনে হয়। গ্রহের ঠিক মধ্যভাগে জালের সূত্রের মত কতকগুলি কাল রেখা আছে। এইগুলি খুব সরল ও ইহার অনেকগুলি প্রায় সহস্র মাইল। এইগুলিকে জল চলাচলের কৃত্রিম নালা বলিয়া মনে হয়। বৃহৎ নালাগুলি স্থায়ী ভাবেই থাকে কিন্তু ছোট ছোট নালাগুলি কখন কখন দেখা যায় আর কখন দেখা যায় না। আবার বড় বড় নালাগুলি সময়ে দুইটী দেখায় অর্থাৎ একটা নালার স্থানে পাশাপাশি সমান্তরভাবে দুইটা নালা দেখায়। ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ দেখা যায়। পর্ব্বত আছে বলিয়াও মনে হয়। বৃক্ষাদির ঘন সবুজবর্ণও বুঝিতে পারা যায়। গ্রহের এই সমস্ত অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে সেখানে মনুষ্যের মত কোন জীব বাস করে। একটী চঞ্চল আলোক দেখা যায়—ইহাতে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে মঙ্গলবাসী জীব আলোকের দ্বারা আমাদিগকে সঙ্কেত করিতেছেন। পৃথিবী হইতেও আলোকের দ্বারা ঐ সঙ্কেতের উত্তর দান করিবার জন্য কল্পনা চলিতেছে।

(৬) শুক্র—আকারে পৃথিবী অপেক্ষা সামান্য ছোট। খুব উজ্জ্বল।

তাজমহল।

ইহার চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডল খুব ঘন। আমাদের পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ মেঘের মত মেঘ দেখা যায়, তবে সে মেঘ যেন বেশী ঘন। উত্তর দক্ষিণে সাদা সাদা বরফ (?) দেখা যায়।

(৭) বুধ—আকার পৃথিবীর ⅓। চারিদিকে বায়ুমণ্ডল নাই। চাঁদের প্রাকৃতিক অবস্থার মত—অর্থাৎ পাহাড়-পর্ব্বত ও গর্ত্ত-গহ্বর পরিপূর্ণ, বৃক্ষলতাদি শূন্য, বায়ু শূন্য, জল শূন্য।

তাজমহল।

(A Picture Lesson)

চিত্রে পাঠনা।

উপকরণ—তাজমহলের চিত্র।

এই যে চিত্র দেখিতেছে—ইহাই আগ্রার তাজমহলের চিত্র। সাজাহান বাদশাহের নাম তোমরা শুনিয়াছ। তিনি ভারতের সম্রাট ছিলেন। তাঁহার রাণীর নাম ছিল আরজমন্দ বানু, আর সেই রাণীর উপাধি ছিল "মমতাজ মহাল"। 'মহাল' অর্থ রাজবাড়ী আর 'মমতাজ' অর্থ গৌরব অর্থাৎ রাজ-প্রাসাদের গৌরব। সেরূপ সুন্দরী নারী আর একটীও সাজাহানের রাজ-প্রাসাদে ছিল না। তোমরা জাহাঙ্গীর বাদশাহের বেগম নুরজাহান সুন্দরীর নাম শুনিয়াছ। এই মমতাজমহল সেই নুরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্রী। মমতাজ-মহলের ৭টী পুত্রকন্যা হয়। অষ্টম সন্তানের জন্মের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। সে ১৬২৯ খৃষ্টাব্দের কথা। সাজাহান মৃত বেগমের কবরের উপর এই সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার স্মৃতি জগৎবিখ্যাত করিয়াছেন। এই মন্দিরের নাম সেই বেগমের নামানুসারে তাজমহল হইয়াছে। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে তাজমহল নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। নির্ম্মাণে ১৭ বৎসর লাগে আর (প্রায়)

৩২ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ব্যয় ইহা অপেক্ষা অনেক বেশীই হইয়াছিল; কারণ অনেক জিনিসের দাম ও মজুরী পরিশোধ করা হয় নাই। পৃথিবীর মধ্যে এরূপ সুন্দর অট্টালিকা আর দ্বিতীয়টী নাই।

যমুনা নদীর তীরে এই অট্টালিকা নির্ম্মিত। অট্টালিকার বেদী ঠিক যমুনার দক্ষিণ তীর হইতে বাঁধিয়া তোলা হইয়াছে। বেদীর উপরে তাজের মন্দির। সম্মুখে উদ্যান। যমুনার তীর ব্যতীত অন্য তিন দিক প্রাচীরসংলগ্ন অনেকগুলি সুরম্য গৃহ দ্বারা বেষ্টিত। এই সমস্ত গৃহে দোকান বসিত ও এই সমস্ত গৃহের সম্মুখের বহিঃ প্রাঙ্গণে মেলা হইত। এই বহিঃ প্রাঙ্গণ ৮৮০ ফিট দীর্ঘ ও ৪৪০ ফিট প্রস্থ। এই প্রাচীরের মধ্যস্থলে উদ্যানে প্রবেশের একটী দ্বার। এই সিংহদ্বার এরূপ সুন্দর যে কেবল ইহা দেখিয়াই শিল্পকৌশলের মহিমা বুঝিতে পারা যায়। এরূপ সিংহদ্বার জগদ্বিখ্যাত তাজমহলেরই উপযোগী। এই দ্বারগৃহ লাল বালুকা প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই সমস্ত প্রস্তর খুঁদিয়া তার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত প্রস্তর বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ প্রস্তর বিন্যাসের দ্বারা নানারূপ সুন্দর সুন্দর ফুল পাতা রচনা করা হইয়াছে এবং কোরান-সরিফের অনেক বচন সুন্দর অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। এই সিংহদ্বারের উপর অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর গম্বুজ। প্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত সিঁড়ি দ্বারা এই সিংহদ্বারের উপর উঠিবার ব্যবস্থা আছে। এই দ্বারগৃহ ১৪০ ফুট উচ্চ ও ১১০ ফুট প্রশস্ত। এই সিংহদ্বারের সুদৃঢ় গঠন, সুশ্রী বিন্যাস ও সুন্দর কারুকার্য্য দেখিবার জিনিষ ও চিন্তা করিবার বিষয়।

এই সিংহদ্বার পার হইয়া তাজ-প্রাঙ্গণস্থ উদ্যানে প্রবেশ করিতে হয়। এই উদ্যানের ক্ষেত্রফল ৮৮০ বর্গফুট। এইরূপ সুরম্য উদ্যান এসিয়া-খণ্ডের আর কোথাও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সিংহদ্বার হইতে তাজ-বেদীর নিম্নদেশ পর্য্যন্ত একটী কৃত্রিম সরিৎ—জল স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ।

এই সরিতের মধ্যে মধ্যে ২৩টী কৃত্রিম ফোয়ারা আছে। এই সরিতের দৈর্ঘ্য ৮৮০ ফিট। সরিতের উভয় পার্শ্বে প্রস্তরময় নানা কারুকার্য্য শোভিত প্রশস্ত পথ। এই সরিতের মধ্যদেশে সেতুর আকারে একটী শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রশস্ত বেদিকা। তাহার চারিদিকেও ৫টী ফোয়ারা। এই বেদীর উপর উপবেশন করিবার নিমিত্ত অনেকগুলি আসন আছে। এই বেদিটীর পরিমাণ ১২৫ বর্গফুট। উত্তম পথ ও পয়ঃপ্রণালী দ্বারা উদ্যানটী ১৬টী বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত। সর্ব্বোৎকৃষ্ট লতা গুল্ম বৃক্ষাদিতে উদ্যান পরিপূর্ণ। সরিৎপার্শ্বস্থ পথ বহিয়া গেলেই তাজ-মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। দ্বিপ্রহরে সূর্য্যকিরণে—মুক্তাসম উজ্জ্বল মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত এই সুরম্য হর্ম্ম্য স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। পূর্ণিমা রজনীতে ইহার শোভা অতুলনীয়। এই তাজ-মন্দির শ্বেত প্রস্তর গঠিত একটী উচ্চ বেদীর উপর নির্ম্মিত। বেদীর উপরিভাগ ৩১৩ ফুট বর্গ। ২০টী সোপান আরোহণ করিলে বেদীর উপর উঠিতে পারা যায়। বেদীর উপরিভাগ এত মসৃণ ও উজ্জ্বল যে তাহার উপর পা দিতে ভয় হয়। জল বলিয়া ভ্রম হয়। এই বেদীর চারকোণে চারিটী স্তম্ভ, প্রত্যেকটী ১৩৩ ফুট উচ্চ। এই স্তম্ভের অভ্যন্তরে ঘুরান সোপান আছে। এই সোপান বাহিয়া স্তম্ভের উপরে উঠিতে পারা যায়। স্তম্ভের উপর উঠিলে সমস্ত আগ্রা সহর একখানি দৃশ্যপট বলিয়া মনে হয়। প্রাঙ্গণের অভ্যন্তরে পূর্ব্ব ও পশ্চিম কোণে (যমুনার দিকে) দুইটী মসজিদ আছে। তাজমহলের কথা দূরে থাকুক, এইরূপ একটী ক্ষুদ্র মসজিদ যে কোন দেশে থাকিলে সেখানে বহু দর্শকের সমাগম হইত। এই তাজ ও তাজ-সংসৃষ্ট সকল জিনিষই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা।

এখন আদত তাজ-মন্দিরের কথা শুন। মন্দিরটী হরিদ্রাভ শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত। প্রস্তরগুলি ঘষিয়া ঘষিয়া এরূপ মসৃণ করা হইয়াছে যে মনে হয় যেন মুক্তা গলাইয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে। মন্দিরের

অভ্যন্তরে নানাবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ কক্ষ। কক্ষ-প্রাচীরে প্রস্তরের জানালা। প্রস্তর কাটিয়া এরূপ সুদৃশ্য জানালা এপর্য্যন্ত পৃথিবীর আর কোন জাতি নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই। এই সমস্ত জানালার জাফরী এরূপ সুকৌশলে ও সুন্দর করিয়া কাটা হইয়াছে যে দেখিলে মনে হয় জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ একত্র হইয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে। জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কণে যতরূপ বাহাদুরী দেখান যাইতে পারে এই সমস্ত শিল্পী তাহার পরিচয় দিতে বাকী রাখে নাই। মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ শ্বেত প্রস্তরের দেয়ালে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর লতা-পাতা। এই সমস্ত লতাপাতা তুলি দ্বারা অঙ্কিত নহে—প্রাচীরের প্রস্তর খুঁদিয়া তাহার অভ্যন্তরে নানা বর্ণের সমুজ্জ্বল প্রস্তর বসাইয়া এই লতা-পাতার রচনা করা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া তুলি ও রঙে চিত্রিত লতাপাতা অপেক্ষা ইহার বর্ণবিন্যাস কোন প্রকারেই হীন নহে। পত্রের শিরাগুলি, পুষ্পদলের ভিন্ন স্থানের বিভিন্ন বর্ণ অতি সুন্দররূপে বিকশিত। ধন্য শিল্পী! মন্দিরের দ্বারদেশে শ্বেত প্রাচীরে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর বসাইয়া কোরাণের অনেকগুলি বচন চিত্রিত হইয়াছে। মন্দিরটীর ভূমি অষ্টভূজ—তবে চারিটী ভূজ ক্ষুদ্র, ৩৩ ফুট করিয়া অপর চারিটি ভূজ ১৮৬ ফুট করিয়া। মন্দিরের উপরে উঠিবার জন্য সোপান আছে। মন্দিরের উপরে ছোট বড় অনেকগুলি গম্বুজ। মধ্যে একটী বৃহৎ গম্বুজ। এইটীর ব্যাস ৫৮ ফুট ও উচ্চতা ৮০ ফুট। গম্বুজের নিম্নস্থ গৃহের উচ্চতা প্রায় ১২৫ ফুট। মাটীর উপর হইতে মন্দিবের চুড়া পর্য্যন্ত উচ্চতা ২৪৫ ফুট। গৃহমধ্যে বৃহৎ গম্বুজের নীচে তাজবিবির সমাধি। সাজাহানের মৃত্যুর পর তাঁহাকেও এই সমাধির পাশে প্রোথিত করা হইয়াছিল। এই দুইটী কবর মন্দিরের ভূমি হইতে ৩ ফুট উচ্চ। নানারূপ সুন্দর সুন্দর প্রস্তরখচিত। তবে এই দুইটী সমাধি-বেদী প্রকৃত সমাধি নহে। ঠিক এই দুই বেদীর নিম্নে মাটীর নীচে বাদশাহ ও বেগমের প্রকৃত গোর

আছে। একটী সুড়ঙ্গপথে আলো লইয়া প্রবেশ করিতে হয়। সেখানে প্রকৃত গোরের উপর যে দুইখানি প্রস্তরফলক আছে তাহা ইহারই অনুরূপ।

তাজের শোভা দেখিবার বিষয়; বর্ণনার বিষয় নয়। নয়নে সম্ভোগ করিতে হইবে, বর্ণনা শুনিয়া বা ছবি দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায় না।

যে দেশেতে যত ছিল সুন্দর শোভন,
মনিমুক্তা মরকত মনের মতন,
মর্ম্মরে মর্ম্মের সনে করিয়া গ্রন্থন,
সৃজিলে প্রেমের স্মৃতি বিখ্যাত ভুবন।

ধন্য তুমি সাজাহান প্রেমিক উদার,
ধন্যা সেই নারীরত্ন তুমি স্বামী যার।
আর ধন্য পুণ্য তট নদী যমুনার।
দেখাইলা প্রেমলীলা মর্ত্ত্যে বহুবার॥

হিমালয়।

(A Conversation Lesson)

কথোপকথনে পাঠনা।

উপকরণ—হিমালয়ের চিত্র ও ভারতবর্ষের মানচিত্র।

শিক্ষক। এই চিত্রে যে পর্ব্বতের চিত্র দেখিতেছ ইহাই হিমালয় পর্ব্বতের দৃশ্য।

ছাত্র। পর্ব্বতের মাথা সাদা কেন?

শি। হিমালয়ের শৃঙ্গ বার মাস বরফে ঢাকা থাকে।

ছা। বরফে কি পর্ব্বতের সমস্ত গা ঢাকিয়া যায়?

শি। না, বরফে কেবল পর্ব্বতের মাথার খানিকটা অংশ ঢাকা থাকে। তবে এই ছবিতে যতদুর ঢাকা দেখিতেছ, গ্রীষ্মকালে এতদুর নীচ পর্য্যন্ত বরফে ঢাকা থাকে না। (শীতকাল অর্থাৎ অক্টোবর নভেম্বর মাস ভিন্ন ছবি তুলিবার সুবিধা হয় না। অন্য সময় মেঘে আচ্ছন্ন থাকে। এই চিত্র নভেম্বর মাসে তোলা।)

ছাত্র। কেন?

শি। তোমরাই একটু চিন্তা করিলে বলিতে পারিবে।

ছা। হাঁ, বুঝেছি গ্রীষ্মকালের উত্তাপে বরফ গলিয়া যায়। আচ্ছা সমস্ত বরফ গলে না কেন?

শি। বেশ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ। তবে তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে, তোমাকে আর একটা কথা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। আমরা মাটী থেকে যতই উপরে উঠি ততই বেশী ঠাণ্ডা বোধ করি। যাঁহারা দারজিলিং বাস করেন তাঁহারা বার মাস লেপ গায় দেন—সেখানে বার মাসই শীত।

ছা। কেন? ইহার কারণ ত বুঝিলাম না। বরং আমরা যতই উপরে উঠিব ততই বেশী গরম বোধ করিব, কারণ আমরা সূর্য্যের দিকে অগ্রসর হই।

শি। সূর্য্য কত মাইল দুরে?

ছা। নয় কোটী মাইল।

শি। হিমালয় পর্ব্বত কত মাইল উচ্চ?

ছা। পাঁচ মাইল।

শি। যে জিনিষ নয় কোটী মাইল দুরে আছে—পাঁচ মাইল কি পঞ্চাশ মাইল সরিয়া গেলে কি ব্যবধানের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে? আর এক কথায় তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করি। তোমরা জান যে সমস্ত নদীই সমুদ্রে পড়িয়াছে। আমাদিগের গ্রামের নদীও সমুদ্রে পড়িয়াছে।

সমুদ্রের নিকট নদীর জল লোণা। যতই সমুদ্র হইতে দূরে যাওয়া যায়, ততই লবণত্ব কমিয়া যায়। মনে কর, গ্রামের নদীর দুই ঘাটে দুই জন জল খাইতেছে—দুই জনের মধ্যে ব্যবধান দশ হাত। এখন যে লোক ভাটীর দিকে (সমুদ্রের দিকে) জল খাইতেছে সে কি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা জলের আস্বাদ কিঞ্চিৎ অধিক লবণযুক্ত বুঝিতে পারিবে? সমুদ্র অনেক দূর বলিয়া যেমন ১০।২০ হাত ব্যবধানে জলের আস্বাদের কোন তারতম্য ঘটে না, সেইরূপ সূর্য্য বহু দূর বলিয়া ২০।৫০ মাইল ব্যবধানে সূর্য্যের উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি বুঝিতে পারা যায় না।

ছ। আচ্ছা তা যেন হইল, কিন্তু উপরে ঠাণ্ডা হইবে কেন? নীচে যেমন গরম উপরেও অন্ততঃ তত গরম হওয়া ত উচিত।

শি। বেশ কথা। তোমাকে এখন আর এক কথা বুঝাইতে হইতেছে। বায়ু উচ্চে কত মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত?

ছা। একশত মাইলের বেশী নয়।

শি। হাঁ, প্রায় ঐ রূপই। এ বিষয় একদিন তোমাদিগকে বলিয়াছি। সাধারণতঃ ৫০ মাইল ধরা হইয়া থাকে। তোমরা এ কথা জান যে নীচের বায়ু খুব ঘন আর উপরের বায়ু খুব হাল্‌কা। (বায়ুর পাঠ দেখ।)

ছা। হাঁ, জানি। আর এ কথাও জানি যে আমরা ঘন বায়ু না হইলে নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতে পারি না।

শি। হাঁ, ঠিক কথা। সেদিন এ কথাও তোমাদিগকে বলিয়াছি যে যাহারা বেলুনে চড়িয়া উপরে ওঠে, তাহারা ৭ মাইলের বেশী উঠিতে পারে না, কারণ ইহার উপরের বায়ু এত হাল্‌কা যে তাহাতে আমাদিগের নিশ্বাসের কাজ চলে না। ইহার উপরে উঠিতে গেলে নিশ্বাসের কার্য্য বন্ধ হইয়া মানুষ মরিয়া যায়।

ছা। হিমালয় পর্ব্বতের উপরে উঠিলেও কি নিশ্বাসে কষ্ট বোধ হয়?

শি। হাঁ, হইবারই কথা। কিন্তু হিমালয়ের উপর কেহই উঠিতে পারে না। সেখানে গেলে ঠাণ্ডায় রক্ত জমিয়া যায় ও ঘন বায়ুর অভাবে নিশ্বাসের কষ্ট হয়।

ছা। দারজিলিং গেলেও কি নিশ্বাসের কষ্ট হয়?

শি। না, তিন মাইল পর্য্যন্ত উঠিলে কোনরূপ কষ্ট হয় না। দারজিলিং দেড় মাইলের বেশী উচ্চ নহে। এখন উপরে ঠাণ্ডা হয় কেন তাহাই বুঝিতে চেষ্টা কর।

ছা। আপনাকে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আপনি বলিয়াছিলেন যে নিম্নের বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠে। তাহা হইলেও উপরে সমস্তই গরম বাতাস, সুতরাং উপরে বেশী গরম হওয়ারই কথা।

শি। ঠিক কথা—কিন্তু বায়ু যত গরম হয় ততই তাহা বেশী প্রসারিত হইয়া পড়ে। এক ঘরে আবদ্ধ ঠাণ্ডা বায়ুকে যদি তাপ দিয়া গরম করা যায়, তবে সে বায়ু দশ ঘর জুড়িয়া বসিবে। কিন্তু এই প্রসারণে বায়ু শীতল হইয়া পড়ে। বাটীতে গরম দুধ রাখিলে শীঘ্র ঠাণ্ডা হয় না—কিন্তু থালে ঢালিয়া দিলে শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া যায়। কাজেই বায়ু উপরে উঠিয়া আর উত্তপ্ত থাকে না—প্রসারণে ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে; কাজেই উপরের বায়ু ঠাণ্ডা—এই এক কারণ। তারপর নিম্নস্থ বায়ু উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে লাগিয়া খুব বেশী গরম হয়। উপরে ভূপৃষ্ঠের অভাবে বায়ু উষ্ণ হইতে পারে না। তারপর দেখ নীচের বায়ু সাধারণতঃ ঘন। তাহার ভিতর আবার ধূলি ও জলীয় বাষ্প আছে, সুতরাং খুব ঘন। ঘন জিনিষ যেমন বেশী গরম হইবে, পাতলা কি তাহা হইবে? জিনিষ ঘন ও পাতলা হয় পরমাণুর পরিমাণ দিয়া। পরমাণুই যদি না থাকিল তবে সূর্য্যোত্তাপে গরম হইবে কি?

ছা। ভাল কথা—উপরে ত মেঘ আছে। আপনি পরীক্ষা করিয়া

দেখাইয়াছেন যে জলের সহিত তাপ যোগ করিলে বাষ্প হয়। উপরে যখন মেঘ আছে তখন খুব তাপও আছে।

শি। আমি বাষ্পের কথা বলিয়াছি—মেঘের কথা বলি নাই। জলে তাপ দিলে বাষ্প হয়। যাহাকে প্রকৃত বাষ্প বলে তাহা অদৃশ্য। সেই তাপ কমিতে আরম্ভ করিলেই বাষ্প মেঘরূপে দেখা দেয়। সুতরাং মেঘে তাপ খুবই কম।

ছা। হাঁ, বুঝিলাম, উপরে কেন ঠাণ্ডা? কিন্তু আর এক কথা, হিমালয়ের উপরে এত বরফ জমে কেমন করিয়া? জল বিনা ত বরফ হয় না। আপনি বলিয়াছিলেন যে মেঘ ৩ মাইলের বেশী উঠে না। তবে এই জল কোথা হইতে আসে?

শি। সাধারণতঃ মেঘ ঐ তিন মাইল পর্য্যন্তই দেখা যায় বটে কিন্তু বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘে পরিণত না হইলে আরও উচ্চে উঠিতে পারে, কারণ বাষ্প মেঘ অপেক্ষা হাল্কা। এইরূপে যে বাষ্প ৫ মাইল ঊর্দ্ধে উঠিয়া বায়ুপ্রবাহে হিমালয়ের দিকে চলিতে থাকে, তাহা হিমালয়ের মস্তকে সংস্পৃষ্ট হইবামাত্র একেবারেই বরফ হইয়া যায়।

ছা। বাষ্প ত আগে জল হয়, তারপর বরফ হয়।

শি। হাঁ, তাই বটে। এখানে অত্যন্ত শৈত্য বশতঃ বাষ্প এত শীঘ্র শীঘ্র জল ও তৎপরে বরফে পরিবর্ত্তিত হয় যে বাষ্প একেবারেই বরফে পরিণত হয় বলিলেও চলে।

হিমালয়ের অত্যুচ্চ স্থান কেন যে বার মাস বরফে আবৃত থাকে তাহা বুঝিলে? গ্রীষ্মকালে কতক বরফ গলিয়া গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতির জল বাড়াইয়া দেয়। ১৬ হাজার ফুট (প্রায় ৩॥ মাইল) অপেক্ষা উচ্চ স্থান বার মাস বরফে আচ্ছন্ন থাকে। এই রেখার নীচে কখনই বরফ গলে না। এইজন্য ইহাকে চিরতুষার রেখা বলে।

ছা। তাহা হইলে হিমালয়ের মাথা আগাগোড়া বেশ চক্‌চকে সাদা দেখায়। দৃশ্য বড়ই সুন্দর বলিয়া মনে হয়।

শি। এমন সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীতে আর নাই। আমেরিকা, জর্ম্মণী, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে ভ্রমণকারিগণ অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া এই দৃশ্য দেখিতে আসেন। তোমরাও ইচ্ছা করিলে দারজিলিং গিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া আসিতে পার। চিত্রে পাহাড়ের গায় যে সহর দেখিলে, উহাই দারজিলিং সহর। (দারজিলিংএর রাস্তা বর্ণনা কর ও রেলভাড়া বলিয়া দাও) এত উচ্চ ও বিশাল পর্ব্বত পৃথিবীতে আর নাই। অমল ধবল উচ্চ পর্ব্বত অনন্ত আকাশের গায় গা ঢালিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে —মনে হয় যেন এক বিশাল দেহ অন্য বিশাল দেহকে আলিঙ্গন করিতেছে।

অমল ধবল রজত বরণ
বিচিত্র বিমল বিনোদ শোভন
ঊর্দ্ধ শুভ্র শির গগন চুম্বন
অনন্তে অনন্ত মহা আলিঙ্গন।

ছা। সূর্য্যের আলোক পড়িলে বোধ হয় খুবই চমৎকার দেখায়?

শি। লোহিত হরিৎ শ্বেত পীত আভা,
ধূমল পাটল হরিতাল বিভা,
অলক্ত হিঙ্গুল নীলকণ্ঠ শোভা,
রজত কাঞ্চন মণি জিনি প্রভা।
মিহির কিরণ রচিত স্বপন,
মানস নয়ন সদা বিমোহন॥

ছা। খুব উচ্চ উচ্চ শৃঙ্গ কয়টা আছে?

শি। পশ্চিমে শোভিছে শেখর বদরী,
নন্দা, যমুনোত্রি, কেদার কেশরী,

পূরবে ধবলগিরি মনোলোভা,
কাঞ্চনজঙ্ঘাতে তপ্ত স্বর্ণ শোভা,
শ্রীগৌরীশঙ্কর উচ্চ উচ্চতম
সরগে মরতে শৈলসেতু সম।

(মানচিত্রে দেখাইয়া দাও)

তারপর হিমালয় হইতে কি কি বড় বড় নদী বাহির হইয়াছে তাহা বলিয়াছি। মানস সরোবর, রাবণ হ্রদ প্রভৃতি অনেক হ্রদও এই হিমালয়ের জলে পুষ্ট :—

গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র পুণ্য পঞ্চনদ
সরযূ যমুনা মানসাদি হ্রদ
তোমার চরণ অমৃত শীতল
পানে সঞ্জীবিত আনন্দে বিহ্বল।

ছা। হিমালয়ে বাঘ ভালুক নাই ?

শি। অনেক জীব জন্তু আছে—তবে পর্ব্বতের খুব উচ্চ স্থানে অত্যন্ত শীত বলিয়া কোন জীবই সেখানে বাস করিতে পারে না। বাঘ, ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু নীচে বাস করে :—

হস্তী ভল্লুকাদি, গণ্ডার, শার্দ্দূল,
চমরী, কস্তুরী, শান্ত মৃগকুল,
টিয়া, কাকাতুয়া, ময়না, ময়ূরে
বিহরে নির্ভয়ে উচ্চ নীচ দূরে।

ছা। কি কি গাছ জন্মে ?

শি। শাল, দেবদারু, উচ্চ বৃক্ষ যত
সেগুণ, অর্জ্জুন, শিশু, ঝাউ শত
তোমার দেহেতে গহ্বরে কান্তারে
নানা জাতি তরু শোভিছে কাতারে।

ছা। কোনরূপ ধাতু পাওয়া যায় না ?

শি। এখনও এ বিষয়ে উত্তমরূপ অনুসন্ধান হয় নাই। তবে দুই তিনটী ধাতুর বিষয় সামান্য মাত্র জানা গিয়াছে :—

স্বর্ণ তাম্র লৌহ ধাতুর আকর
চুনি পান্না মণি স্ফটিক প্রস্তর
তব অঙ্গে গাথা আছে অগণন
কুবের ভাণ্ডার তব আভরণ।

ছা। কেবলই কি শীত, অন্য কোন ঋতু নাই ?

শি। এক সঙ্গে সকল ঋতুর সমাবেশ এই হিমালয় ভিন্ন অন্য কোথায়ও নাই। হিমালয়ের নিম্নদেশে গ্রীষ্ম বর্ষা, মধ্যদেশে শরৎ বসন্ত, উচ্চে হেমন্ত ও শীত।

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত মিলিত,
ষড় ঋতু হেথা সদা বিরাজিত।
ভারতের শিরে দিয়াছেন বিধি
হিমালয় গিরি সৌন্দর্য্যের নিধি॥

অষ্ট্রেলিয়া।

(An Information Lesson)

প্রদানে পাঠনা।

উপকরণ—মানচিত্র, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীদের চিত্র, অষ্ট্রেলিয়ার প্রাণী ও বৃক্ষের চিত্র, কাপ্তেন কুকের চিত্র।

মানচিত্রে অষ্ট্রেলিয়া দেখাও। অষ্ট্রেলিয়ার সমুদ্রকূলের সহিত কোন্ দেশের তুলনা করা যায় ? অষ্ট্রেলিয়ার সহিত আফ্রিকার তুলনা চলে। ইউরোপের চলে না। ইউরোপের সমুদ্রকূল বহু স্থানে দেশের ভিতর প্রবেশ করিয়া ইউরোপকে বাণিজ্যবিস্তারে সুবিধা করিয়া দিয়াছে।

উপসাগরগুলি দেখাও, তাহাদের নাম পড়। উত্তরে কারপেনটেরিয়া উপসাগর ও দক্ষিণে রাইট উপসাগর। উপদ্বীপের মধ্যে কেবল ইয়র্ক উপদ্বীপ উত্তরে। ভারতবর্ষের দক্ষিণে যেমন লঙ্কা, অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে সেইরূপ ট্যাসম্যানিয়া দ্বীপ। নদী ও হ্রদ খুব কম। কেবল এক মারে নদী আর ইহার ডারলিং নামক শাখা উল্লেখযোগ্য। ৩।৪টী বড় বড় হ্রদ আছে—ইরি, টরেনস, গোয়াডলার প্রধান। অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যস্থানে এমেডিসাস নামক আর একটা প্রকাণ্ড হ্রদ আছে।

তারপর দেখ, অন্যান্য মানচিত্রে যেমন অনেক নগরের নাম দেখিতে পাও, এ মানচিত্রে তাহার কিছুই নাই। কেবল পূর্ব্ব উপকূলে কতকগুলি নগর আছে। মধ্যভাগ একবারে খালি বলিলেই হয়। এই ভাগ বাসের অযোগ্য—কোথাও মরুভূমি, কোথাও ভীষণ কণ্টকময় জঙ্গল। খুব জলকষ্ট। এই মধ্যভাগের অবস্থা জানিবার জন্য অনেক লোক চেষ্টা করিয়াছে। জলের অভাবে অনেকে মারাও গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত মধ্যভাগের সমস্ত অংশের অবস্থা জানিতে পারা যায় নাই।

খুব বড় পর্ব্বত নাই। পূর্ব্বদিকে কেবল একটী পর্ব্বতশ্রেণী আছে। ৭০০০ ফিটের বেশী উচ্চ নয়। আমাদিগের দেশের দারজিলিং এর মত উচ্চ।

আমাদের দেশে যখন গ্রীষ্ম, অষ্ট্রেলিয়ায় তখন শীত। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহারা লেপ গায় দেয় আর পৌষ মাঘ মাসে পাখার হাওয়া খায়। (যদি বালকগণকে ঋতু পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝাইয়া থাক, তবে তাহাদিগকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করিবে) অষ্ট্রেলিয়ায় খুব বৃষ্টি হয় আবার সময় সময় এমন অনাবৃষ্টি হয় যে গাছপালা পশুপক্ষী মরিয়া যায়। ১৮৮৪ সনের অনাবৃষ্টিতে গাছপালা সমস্ত শুকাইয়া গিয়াছিল আর এক ক্রোটী মেষ মরিয়া গিয়াছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার গাছপালা একটু নূতন রকমের। আমাদিগের দেশে শীতের শেষে যেমন গাছের সমস্ত পাতা বিবর্ণ হইয়া পড়িয়া যায়, অষ্ট্রে-

লিয়ায় তাহা হয় না। সেখানে বৃক্ষগুলি চিরহরিৎ। আমাদের দেশের গাছের পাতার উপর পিঠ যেমন খুব ঘন সবুজ আর নীচের পিঠ সাদাটে সবুজ, অষ্ট্রেলিয়ায় সেরূপ হয় না। পাতার উপর নীচে এক রঙ্—পাতলা সবুজ। আমাদিগের গাছের পাতাগুলি যেমন আকাশের দিকে চিৎ হইয়া থাকে, অষ্ট্রেলিয়ায় পাতাগুলি সেরূপ থাকে না। পাতার কিনারটা আকাশের দিকে চিৎ না হইয়া কাৎ হইয়া থাকে। এই জন্য বড় বড় গাছের নীচেও তেমন ছায়া হয় না। বসন্তে অনেক বৃক্ষেই সুন্দর সুন্দর পুষ্প দেখা যায়। খুব বড় বড় তাল জাতীয় ও ফারণ জাতীয় বৃক্ষ আছে। পাহাড়ে ইউক্যালিপটাস (এক প্রকার নির্য্যাসপ্রদ বৃক্ষ) নামক বৃক্ষ প্রচুর। এরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষ পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নাই। এই বৃক্ষ ৪০০ ফুট (প্রায় ২৬৭ হাত) উচ্চ হইয়া থাকে। (নিকটবর্ত্তী কোন উচ্চ বৃক্ষের কি বাড়ীর উচ্চতা জানা থাকিলে তাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দাও)।

অষ্ট্রেলিয়ার জীব জন্তুও নূতন রকমের। প্রায় জন্তুরই পেটের নীচে একটা চামড়ার থলে লাগান থাকে—জামার পকেটের মত। জন্মের পর বাচ্চাগুলি এই পকেটের ভিতর প্রবেশ করে ও সেখানে ২ মাস ২॥ মাস বাস করে। তারপর খুব বড় হইলে আর পকেটে বাস করে না। এই সমস্ত জন্তুকে দ্বিগর্ভ (পেট ও পকেট) জন্তু বলে। দ্বিগর্ভ জন্তুর মধ্যে ক্যাঙ্গারুই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। (চিত্র দেখাও; পকেটের ভিতর হইতে বাচ্চা মুখ বাহির করিয়া আছে) ইহারা পশ্চাতের পা'র উপর ভর দিয়া ব্যাঙের মত লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। লেজ খুব মোটা। বসিবার সময় পাছের দুই পা ও লেজের উপর ভর দিয়া (তিন পা টুলের মত) বসে। বড় ক্যাঙ্গারুগুলি মানুষের মত উচ্চ। হংসচঞ্চু নামক আর এক অদ্ভুদ জন্তু আছে। বড় বেজীর মত জন্তু—ঠোঁট হাঁসের মত ও চারি পায়ের নখগুলি হাঁসের পায়ের নখের মত লিপ্ত।
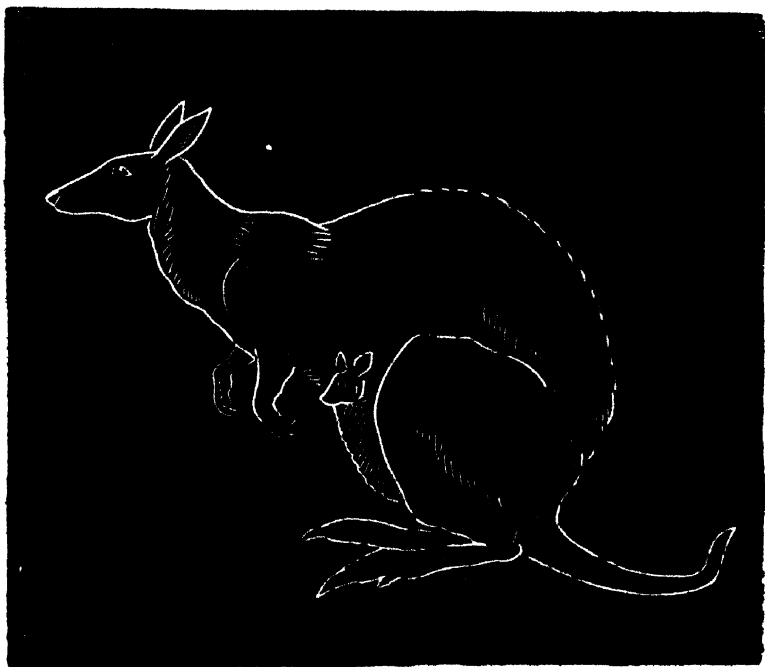
ক্যাঙ্গারু।

অনেক সুন্দর সুন্দর পাখী আছে। তার মধ্যে বেহালা পাখীই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। (চিত্র দেখাও)।

অষ্ট্রেলিয়ায় মেষপালনের ব্যবস্থা খুব বেশী। এই দেশ হইতে উল (পশম) নানা দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার সোণার খনি প্রসিদ্ধ।

পুর্ব্ব উপকূলে ভিক্টোরিয়া, নিউ সাউথ ওয়েলস ও কুইনস ল্যাণ্ড—তিনটী প্রদেশ। দক্ষিণে সাউথ অষ্ট্রেলিয়া ও পশ্চিমে ওয়েষ্ট অষ্ট্রেলিয়া। সিডনীই সর্ব্বপ্রধান নগর। নিউকাসল খুব বড় বন্দর। ভিক্টোরিয়া প্রদেশে মেলবোরণ ও সাউথ্ অষ্ট্রেলিয়ায় এডিলেইড প্রধান নগর। ট্যাসম্যানিয়ার প্রধান নগর হবার্ট।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্তেন কুক এই দেশে আগমন করিয়া (সেই সময়ের) ইংলণ্ড-রাজ তৃতীয় জর্জ্জের নামে এই দেশ দখল করেন। প্রথমে এই দেশে ইংলণ্ডের আসামিগণকে দ্বীপান্তর করা হইত। (ভারতের আসামীদিগকে কোথায় দীপান্তর করা হয়?)

তারপর ১৮৫২ সালে যখন স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইল, তখন অসংখ্য লোক আসিয়া এই দেশ ছাইয়া ফেলিল।

অষ্ট্রেলিয়া এখন ইংলণ্ডের উপনিবেশ। এখানেও পারলিয়ামেণ্ট আছে।

অষ্ট্রেলিয়ার আদি নিবাসীদিগের মত অসভ্য অন্য কোন দেশে নাই। তাহাদিগের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। ইংরেজ জাতিই এখন এদেশের প্রধান অধিবাসী। অল্পসংখ্যক চীনের লোকও আছে।
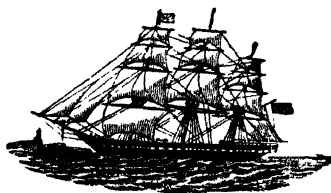
শিক্ষাদান বিষয়ে আরও দুই একটী কথা।—সাহিত্যাদি বিষয়ক পাঠ্য পুস্তকে আজকাল বিড়াল, কুকুর, কয়লা, নদী, তাজমহল, কাশী প্রভৃতি নানারূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পাঠ প্রথমে পদার্থ পরিচয়ের পদ্ধতিতে পড়াইয়া, পরে সাহিত্য হিসাবে পড়াইতে হইবে।

পদার্থ পরিচয়ের পাঠ মধুরতর করিবার জন্য শিক্ষাকালে (ইচ্ছা করিলে) মধ্যে মধ্যে পাঠদানের পূর্ব্বে বা পরে ঐ পাঠ সংস্পৃষ্ট নানারূপ গল্প বলিতে পারেন। তবে এই গল্প ক্ষুদ্র ও শিক্ষাপ্রদ হওয়া আবশ্যক। পরী বা ভূতের গল্প, বিষ্ণুশর্ম্মা বা ঈশফের গল্প, অথবা তদ্রূপ অন্যান্য অবাস্তব গল্প সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। অন্য সময়ে এরূপ গল্পের আবশ্যকতা থাকিতে পারে, কিন্তু যে পদার্থ পরিচয় শিক্ষার উদ্দেশ্য অবিমিশ্র সত্যের অনুসন্ধান, তাহার সহিত কোনরূপ মিথ্যার সংস্পর্শ না করাই সঙ্গত।

পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের সহিত যেরূপ গল্প শিক্ষাপ্রদ হইতে পারে, নিম্নে তাহার তিনটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। পশ্বাদির এই সমস্ত গুণের কথা শুনিলে বালকগণ পশুর প্রতি কখন অযথা নিষ্ঠুরাচরণ করিবে না, বরং

পশু পক্ষীর নানারূপ অপরিজ্ঞাত গুণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রলোভিত হইবে।

১। বিড়াল বিষয়ক গল্প।—এক মেম সাহেবের একটী বিড়ালী ছিল। কিছু দিন পরে সেই বিড়ালীর ৪টি ছানা হয়। কিন্তু ছানা কয়েকটী অল্প দিনের মধ্যেই মারিয়া গেল। বিড়ালী ছানার শোকে দিনরাত্র মিউ মিউ করিয়া ডাকিয়া বেড়াইত। সে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিল। মেম সাহেবও বিড়ালীর শোকে অস্থির হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে একজন বন্ধু তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে অন্য কোন বিড়ালীর দুইটি ছানা আনিয়া দিলেই বিড়ালী থামিয়া যাইবে, কারণ বিড়ালী নিজের ছানা কি অপরের ছানা তাহা চিনিতে পারে না। মেম সাহেব অনেক অনুসন্ধানে কোন বিড়ালীর ছোট ছানা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না; এমন সময়ে একদিন তাঁহার দৃষ্টিপথে তিনটী ইঁদুরের ছানা পতিত হয়। মেম সাহেব সেই ইন্দুর ছানা কয়টী লইয়া তাঁহার বিড়ালীকে আহার করিতে দিলেন। বিড়ালী ছানা কয়টীর ঘাড়ে কামড় দিয়া লইয়া গেল। বিড়ালী আর পূর্ব্বের মত মিউ মিউ করে না। মেম সাহেব মনে করিলেন তাঁহার বিড়ালী ইন্দুর ছানা খাইয়া এত খুসী হইয়াছে যে সে তাহার সন্তান-শোক ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ১০।১২ দিন পরে দেখা গেল যে বিড়ালী সেই তিনটী ইন্দুর ছানা লইয়া উঠানে খেলা করিতেছে। বিড়ালী নিজের ছানা বোধে তাহার ভক্ষ্য ইন্দুর ছানাকেই প্রতিপালন করিয়াছে।

কুক্কুট, হঁাস প্রভৃতি পক্ষী শাবক ও কুকুর শৃগালের ছানা নিজ সন্তান জ্ঞানে বিড়ালী পালন করিয়াছে—এরূপ অনেক গল্প শুনা গিয়াছে। বিড়ালীর অপত্য স্নেহ অত্যন্ত প্রবল।

২। কুকুর বিষয়ক গল্প।—এক সাহেবের একটা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর ছিল। এক দিন তিনি তাঁহার একটী বন্ধুর সহিত গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার কুকুরের আশ্চর্য্য বুদ্ধির নানারূপ গল্প করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধু সেই কুকুরের বুদ্ধি-পরিচায়ক কোন ঘটনা দেখিত চাহিলেন। সাহেব তাঁহার পকেট হইতে একটী রৌপ্য মুদ্রা বাহির করিয়া তাহার উপর পেনসিল দিয়া নিজের নাম লিখিলেন ও পথের ধারে একখানি প্রস্তরের নীচে তাহা রাখিয়া দিলেন। তাঁহারা অশ্বারোহণে তিন মাইল পথ গমন করিয়া, কুকুরকে সেই রৌপ্য মুদ্রা আনিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কুকুর আদেশ প্রাপ্ত মাত্র চলিয়া গেল। বন্ধুদ্বয় বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল তবুও কুকুর ফিরিল না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া চিন্তান্বিত বন্ধুদ্বয় নিদ্রিত হইয়া

পড়িলেন। শেষ রাত্রিতে কুকুরের শব্দ শুনিয়া বন্ধুদ্বয় জাগরিত হইলেন। কুকুর একটী কোট আনিয়া প্রভুর পদতলে স্থাপন করিল। সাহেব কিছু বুঝিতে না পারিয়া সেই কোটটী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কোটের পকেটে একটী ঘড়ী ও দুইটী রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেল। এই দুইটী মুদ্রার মধ্যে একটী সেই সাহেবের চিহ্নিত। কোটের পকেটে একখানি চিঠি ছিল। সেই চিঠির ঠিকানা ধরিয়া কোটের মালীকের অনুসন্ধান করা হইল। মালীকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি এইরূপ বলিলেন, "আমি গ্রামান্তর হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় দেখি যে পথের ধারে একটী কুকুর একখানি প্রস্তর সরাইতে চেষ্টা করিতেছে। আমি কৌতুক দেখিবার অভিপ্রায়ে নিজে গিয়া যেই পাথরখানি সরাইলাম, অমনি এই রৌপ্য মুদ্রা আমার চোখে পড়িল। আমি মুদ্রাটি পকেটস্থ করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। কুকুরটী যে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে তাহা আমি ২।১ বার লক্ষ্য করিয়াছিলাম কিন্তু গ্রাহ্য করি নাই। বাড়ী আসিয়া শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিয়াছি, কিন্তু কুকুরটী যে অলক্ষিতে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই। তারপর আমরা নিদ্রিত হইলে সে কোট মুখে করিয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।"

[এই দুইটীই বিলাতী গল্প। কেহ হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন, আমাদিগের দেশে কি এইরূপ গল্পের উপকরণ মিলে না? মিলিবে না কেন—খুব মিলে, কিন্তু কে অনুসন্ধান করে—আমরা যে বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি জীবকে ঘৃণার চক্ষে দেখি। অন্যান্য দেশে বিড়াল কুকুর—বিশেষতঃ কুকুর, অত্যন্ত আদর-যত্নে প্রতিপালিত হইতেছে। ফরাসী দেশে কুকুরকে ডিটেক্টিভ পুলিশের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।]

৩। সর্প বিষয়ক গল্প।—হুগলী জেলার অন্তঃপাতী প্রসাদপুর গ্রামে গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণের স্ত্রী পুত্র কন্যাদি কিছুই ছিল না। এই জন্য তিনি নানা জন্তু পালন করিয়া তদুপরি অপত্য স্নেহ স্থাপন করিতেন। তাঁহার গৃহমধ্যে একটী গোখুরা সর্প ছিল। সেই সর্প প্রতিদিন গাভীদোহন কালে বাহির হইত এবং যতক্ষণ ব্রাহ্মণ তাহাকে একটী বাটী দুধ পান করিতে না দিতেন, ততক্ষণ সে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিত না। যদি কোন কারণে গৌরীকান্ত অন্য কোন স্থানে যাইতেন, তবে তৎপালিত গাভী, কপোত, সর্প এবং অন্যান্য জন্তুগণের অসুখের আর পরিসীমা থাকিত না। সর্পটী তাঁহার দ্বারের নিকট পড়িয়া থাকিত। কোন ব্যক্তি সর্পভয়ে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না। ব্রাহ্মণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার পালিত জন্তুগণ বড়ই আহ্লাদিত হইত। সর্পটী লাঙ্গুল দ্বারা তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিত। গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে কোন

কোন দিন সেই সর্প বাহির হইয়া দরজায় পড়িয়া থাকিত; ব্রাহ্মণ ধমক দিয়া বিষধরকে তিরস্কার করিলেই সে পুনরায় গর্ত্তে প্রবেশ করিত। কোন কোন দিন সর্পটা তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত। ব্রাহ্মণ ঘুমের ঘোরে কতবার উহাকে পদাঘাত করিতেন, কিন্তু সর্প তথাপি তাঁহাকে একবারও দংশন করে নাই। গৌরীকান্তের মৃত্যু হইলে সর্প দুই তিন রাত্রি গর্ত্তের বাহির হইয়া কেবল ফঁশ ফঁশ শব্দ করিয়াছিল। তৎপরে সে যে কোথায় গেল, কেহ তাহা নিশ্চয় করিতে পারে নাই। (মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কৃত "জীব রহস্য" হইতে গৃহীত)।

[সর্প অতি ভীষণ পদার্থ। আমাদিগের দেশে সর্পাঘাত মৃত্যুর সংখ্যা অধিক। অন্যান্য দেশে সর্পবংশ নির্ব্বংশ করিবার ব্যবস্থা করিয়া সর্পভীতি অনেক পরিমাণে নিবারণ করিয়াছে। কিন্তু "জীবে দয়া" মন্ত্রের উপাসক হিন্দুর দেশে সর্পপূজা প্রচলিত। হিন্দু মনে করিয়াছিলেন যে সর্পের দ্বারা যখন হিতসাধনও হইতেছে, সর্প কীট পতঙ্গ ইঁদুর ভেকাদি ভক্ষণ করিয়া ইহাদিগের উৎপাত নিবারণ করিতেছে, তখন ইহাকে বিনাশ না করিয়া দয়ার সাহায্যে ইহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করাই সঙ্গত। কিন্তু এই চেষ্টা বোধ হয় ফলবতী হইল না। তাই এখন অন্যান্য জাতির অনুকরণে হিন্দুজাতিও সর্প বিনাশে মনোযোগ দিয়াছে। বিষধর লইয়া আর অধিক পরীক্ষা করিবার কষ্ট সহ্য করিতে আমরা সাহস করিলাম না।]

কখন কখন নিম্নশ্রেণীতে পদার্থপরিচয় শিক্ষাদানের শেষে বিষয়ানুযায়ী ভঙ্গী-সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই ভঙ্গী-সঙ্গীত ৪।৬ লাইনের অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কুকুর বিড়াল বিষয়ক দীর্ঘ দীর্ঘ কবিত্ব শূন্য সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া লাভ কি? ভঙ্গী-সঙ্গীত শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য আমোদের সঙ্গে বিষয় সংসৃষ্ট দুই চারিটী আবশ্যক কথা বালকের মনে গাঁথিয়া দেওয়া। আর প্রত্যেক পাঠের সঙ্গেও এইরূপ ভঙ্গী-সঙ্গীত প্রীতিপ্রদ হইবে না। দশ বারটী পাঠের পরে একটী ক্ষুদ্র সঙ্গীতই যথেষ্ট। প্রধান বিষয়ের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে উত্তম কবিতার অংশও যোগ করা যাইতে পারে।

শেষ কথা।—আমার বিদ্যালয়ে চিত্র নাই, যন্ত্র নাই, আরক নাই—আমি কেমন করিয়া পদার্থ পরিচয় বা বিজ্ঞান শিক্ষা দিব—এইরূপ

বৃথা আপত্তি দেখাইয়া বসিয়া থাকিও না। পদার্থ পরিচয় শিক্ষায় কেবল পদার্থের আবশ্যক; সংসারে পদার্থের অভাব নাই। আর যন্ত্রাদি না থাকিলে যে বিজ্ঞানের আলোচনা একেবারেই করা যায় না—এ ধারণাও ভুল। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান দুইটী আবিষ্কার—নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ ও ডারউইনের অভিব্যক্তি বাদে কোন যন্ত্রেরই আবশ্যকতা হয় নাই—কেবল প্রাণান্ত পর্য্যবেক্ষণ। আর তেমন প্রাণ থাকিলে কি কখন যন্ত্রাদিরই অভাব হয়? এই যে সেদিন জগদীশ চন্দ্র স্বহস্তরচিত বংশনির্ম্মিত যন্ত্রাদির সাহায্যে নানারূপ অত্যদ্ভুদ পরীক্ষণ দেখাইয়া বৈজ্ঞানিক জগতকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন! অভাব যন্ত্রের নয়, অভাব মন্ত্রের। মন্ত্রের সাধনা কর, যন্ত্র স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবে। যন্ত্র চিরদিনই মন্ত্রের অধীন। তাই প্রতিজ্ঞা কর—

"মন্ত্রং বা সাধয়েৎ, শরীরং বা পাতয়েৎ।"

১। পাখী।—বিদ্যালয়ের কার্য্যের জন্য কোন শিক্ষক দুই একটী পাখী পুষিতে পারেন। ময়না, টিয়া, শালিক, কাকাতুয়া, পায়রা, হাঁস ও মোরগ পোষা তেমন শক্ত নয়। কেরোসিনের বাক্স দিয়া ইহাদের বাসের ঘর করিয়া দিলেই হইল। তবে অন্ততঃ ১ দিন অন্তর এই সকল ঘর পরিষ্কার করা আবশ্যক। অন্যান্য পাখী খাঁচায় বা দাঁড়ে রাখিতে হয়। ছোলার ছাতু, ছোলা, দুধ, ধান, পাঁউরুটী, বিস্কুট প্রভৃতি ইহাদের উত্তম খাদ্য। পাখীগুলিকে পরিষ্কার জলে স্নান করান উচিত। অসুস্থ হইলে ঈষৎ উষ্ণ জল উত্তম। যে সকল পাখী পড়িতে পারে তাহাদিগকে নানা প্রকার বুলি শেখান হইয়া থাকে। এই বুলি শিখাইবার উত্তম সময় সন্ধ্যা ও উষাকাল। বুলি শিখাইবার সময় পাখীর খাঁচা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। বুলিগুলি খুব সুস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করিবে। যেখানে খুব বেশী গোলমাল, এরূপ স্থানে পাখীর খাঁচা রাখিবে না।

২। পশু।—গোরু, ঘোড়া, ছাগল, ভাড়া, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি সাধারণ গৃহ-পালিত পশু। ইহার মধ্যে বিড়াল কুকুর বালকগণের বিশেষ প্রিয়। বালকেরা অনেক সময় বিড়াল কুকুরগুলিকে বেশী বেশী করিয়া খাওয়াইয়া তাহাদিগকে অসুস্থ করিয়া ফেলে। মাংস হইলে বিড়াল কুকুরকে একবার মাত্র খাওয়াইবে। সাধারণ ডাল ভাত হইলে দুইবার। যাহাতে ইহারা খুব ছুটাছুটী করিতে পারে সেরূপ ব্যবস্থা করিবে। কুকুরকে স্নান করাইবে। সাবান দিয়া মধ্যে মধ্যে গা সাফ করিয়া দিবে।

৩। মৃত পশু পক্ষী শুকাইয়া রাখা।—বিদ্যালয়ের মিউজিয়মে ছোট ছোট মৃত পশু পক্ষী শুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মৃত পশু বা পক্ষীর পেট

চিরিয়া নাড়ী, ভুঁড়ী, মাংস, হাড়, যত যাহা কিছু বাহির করা যাইতে পারে তাহা বাহির করিয়া ফেলিবে। তারপর ফিটকারীর গুঁড়া, লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া একত্র মিশাইয়া পেটের অভ্যন্তরে সমস্ত স্থানে ঘসিয়া লাগাইবে। পেটের মধ্যে তুলা বা ছেঁড়া কাপড় বা পাট ঠাসিয়া দিয়া চামড়ায় মুখ শেলাই করিয়া দিবে ও রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। চোখ নষ্ট হইয়া যায়। কাচের চোখ কিনিয়া লাগাইবে। ।• কি ।√• আনা হইলেই এইরূপ এক জোড়া কাচের চোখ কিনিতে পাইবে। বেশী গন্ধ থাকিলে উত্তম কেরোসিন তেলে ডুবাইয়া শুকাইয়া লইবে। মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে ভুলিবে না। বর্ষাকালে পোকা ধরে। এইরূপ পোকা ধরিলে এক কাজ করিবে—গমের ভুষি আগুনে তাতাইয়া সেই ভুষি দ্বারা তৈয়ারী পশু বা পাখীটির গা ঘষিয়া দিবে।

যদি পশু পক্ষীর মৃত দেহ উত্তমরূপে রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি একত্র করিয়া আরক প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। এই আরক সহজে নষ্ট হয় না, অনেক দিন ভাল থাকে। পশু পক্ষীর দেহের অভ্যন্তরে এই আরক লাগাইবে। পরে তুলা, কাপড়, খড় প্রভৃতি পুরিয়া সেলাই করিয়া রৌদ্রে দিবে।

চা-খড়ির গুঁড়া	তিন পোয়া
কাপড়কাচা সাবান	আধ সের
পাথুরে চুণ	চারি তোলা
জল	আধ সের

মৃগনাভীর আরক (অভাবে কর্পূরের আরক। স্পিরিটের মধ্যে কর্পূর ফেলিয়া রাখিলে কর্পূর গলিয়া যায়; ইহাকেই কর্পূরের আরক বলে) চারি তোলা।

সাবান কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া জলে ফেল। তাহাতে চকের গুঁড়া মিশাইয়া জ্বালে চড়াইয়া দাও। যখন দেখিবে যে সাবান গলিয়া চকের গুঁড়ার সহিত বেশ মিশিয়াছে ও এই মিশ্রিত পদার্থ ঘন ক্ষীরের মত হইয়াছে, তখন নামাইয়া রাখ ও তাহার ভিতর চূণের গুঁড়া ঢালিয়া দিয়া খুব নাড়িতে থাক। ঠাণ্ডা হইলে ইহার ভিতর মৃগনাভীর আরক বা কর্পূরের আরক ঢালিয়া দাও। দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য এই ব্যবস্থা। মৃগনাভীর আরকের দাম কিছু বেশী বটে কিন্তু কর্পূরের আরক অপেক্ষা ইহার গন্ধ স্থায়ী।

৪। মাছ, সাপ ইত্যাদি।—বড় মাছের পেটের মধ্য হইতে সমস্ত নাড়ীভুঁড়ি বাহির করিয়া সেই স্থানে কেবল গোলমরিচের গুঁড়া দিবে। পরে শুকাইয়া গেলে পেটের মধ্যে পাট পুরিয়া সেলাই করিয়া লইবে। ছোট ছোট মাছ, পলু পোকা, ছোট সাপ স্পিরিটের

মধ্যে রাখিতে হয়। মাছের কাঁটা রক্ষা করা সহজ—মাছ সিদ্ধ করিয়া সহজেই কাঁটাগুলি আলগা করা যাইতে পারে। সাপ কি অন্য কোন জন্তুর হাড় রক্ষা করিতে হইলে, শব পুঁতিয়া রাখিতে হইবে। সাধারণতঃ ২৷৩ মাসেই মাংস পচিয়া যায়। সাপ পুঁতিবার সময় লম্বা করিয়া পুঁতিবে ও হাড় তুলিবার সময় যেমন একখানি হাড় (মেরুদণ্ডের) তুলিবে অমনি সেখানি পিতলের তারে গাঁথিবে। পরে তারসমেত হাড় গরম জলে ধুইয়া লইবে। সাপের গায় কি হাড়ে বিষ থাকে না। সুতরাং এই সকল হাড় ছুঁইতে কোন ভয় নাই।

৫। পাখীর ডিম।—নানারূপ পাখীর ডিম সংগ্রহ করিয়া রাখা যাইতে পারে। ডিম রাখিবার এই নিয়ম:—ডিমটীর গোড়া ও মাথার দিকে সূঁচের দ্বারা দুইটী সরু ছিদ্র কর। একটা ছিদ্র অপেক্ষাকৃত একটু বড় হওয়া আবশ্যক। যে দিকে ছোট ছিদ্র সেইদিকে মুখ লাগাইয়া খুব জোরে ফুঁ দাও। যদি ইহাতে ডিমের শাঁস বাহির হইয়া না আসে, তবে এক টুকরা সরু তার দিয়া ডিমের অভ্যন্তরস্থ কুসুম ভাঙ্গিয়া দাও। তারপর ফুঁ দাও। শাঁস বাহির হইয়া গেলে ডিমের অভ্যন্তর ফিটকারীর জল দিয়া সাফ করিয়া লও। ডিমটীর একদিক ফিটকারীর জলে ডুবাইয়া অপর দিকে মুখ দিয়া চুষিলেই ফিটকারীর জল ডিমের ভিতর প্রবেশ করিবে। পরে আবার ফুঁ দিয়া জল বাহির করিয়া দিয়া ডিমের খোলা শুকাইয়া লইবে। জলের সহিত Corrosive sublimate (mercuric chloride) মিশাইয়া সেই জল ব্যবহার করিলে ফিটকারীর জলের কাজ অপেক্ষা উত্তম কাজ হয় বটে, কিন্তু এই জিনিষ যেরূপ বিষাক্ত, তাহাতে সকলের পক্ষে সাবধানে ব্যবহার করা সম্ভবপর নয়।

৬। পতঙ্গ।—পতঙ্গ, প্রজাপতি প্রভৃতি মোটা কাগজের উপর আলপিন্ দিয়া আঁটিয়া রাখিলেই বেশ থাকিবে। তবে এই সমস্ত পতঙ্গগুলিকে কোন উত্তম বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিলে ভাল থাকিবে। কারণ আলগা অবস্থায় থাকিলে পিপীলিকায় নষ্ট করিতে পারে ও বাতাসের আঘাতে পাখাগুলি ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।

৭। বৃক্ষের ডাল, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি।—ব্লটিং কাগজের ভাঁজে ভাঁজে নানারূপ পত্র রাখিয়া তাহার উপর কোন ভারী জিনিসের দ্বারা চাপ দিয়া রাখিলে ১৫৷১৬ দিনে পাতাগুলির রস শুকাইয়া যাইবে কিন্তু ইহাতে পাতার রঙ ঠিক থাকে না। রঙ ঠিক রাখিতে হইলে ব্লটিং কাগজের ভাঁজে ভাঁজে পাতা সাজাইয়া তাহার উপর একটা (ধোপার) ইস্ত্রি খুব গরম করিয়া বুলাইয়া লইবে। ইহাতে রস শুকাইবে কিন্তু পাতার রঙ সম্পূর্ণ নষ্ট হইবে না। ছোট ছোট ডালও এইরূপে রক্ষা করিতে পারা যায়। ফুল রক্ষা করিতে হইলে

প্রথমে ফুলটী চিরিয়া লইয়া ব্লটিং কাগজের ভিতর রাখিবে। তারপর ইস্ত্রির চাপে শুকাইয়া লইয়া, পুনরায় ফুলের আকারে সাজাইয়া লইবে। এই সমস্ত পত্র পুষ্প একখানি খাতার পাতার ভাঁজে ভাঁজে রাখিয়া দিবে

৮। বেঙ্গের ছাতা।—নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর বেঙ্গের ছাতা আছে। বড় মুখ যুক্ত সাদা শিশিতে সাজাইয়া রাখিলে বেশ দেখায়। বেঙের ছাতা সংগ্রহ করিয়া ২।১ দিন ঘরে রাখিয়া দাও। ইহাতে উহার কতক রস বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে। এই সময়ে দুই রকম আরক তৈয়ার করিয়া লও :—(১) ২ ছটাক তুতের গুঁড়া এক বোতল গরম জলে ফেলিয়া দাও। ঠাণ্ডা হইলে তাহার সহিত আধ বোতল স্পিরিট (সুরাসার) মিশাও। এক বোতলে রাখিয়া সিপি আঁটিয়া রাখ। (২) ৩ বোতল জলের সহিত আধ বোতল স্পিরিট মিশাও। এখন বেঙের ছাতাগুলি ১ নং আরকের মধ্যে (৩।৪ ঘণ্টা) রাখিয়া দাও। তারপর এইগুলি তুলিয়া লইয়া ভিন্ন ভিন্ন শিশিতে রাখ ও ঐ সকল শিশির মধ্যে ২নং আরক ঢালিয়া দিয়া উত্তমরূপে সিপিবদ্ধ করিয়া রাখ।

৯। পত্র-কঙ্কাল।—বর্ষার পরে বৃক্ষের নীচে খোঁজ করিলে পত্র-কঙ্কাল পাওয়া যায়। অশ্বত্থ, বট, কাঁঠাল, আম্র প্রভৃতি পত্রের কঙ্কাল দেখিতেও অতি উত্তম। ইচ্ছা করিলে নানারূপ পত্রের কঙ্কাল প্রস্তুত করিয়াও লওয়া যাইতে পারে। একটা গামলায় বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবে। পত্রগুলি ঐ জলে রাখিয়া গামলাটি রৌদ্রে দাও। জল শুকাইয়া গেলে আবার জল দিবে। এক কি দেড় মাসেই পত্রের সবুজ ভাগ পচিয়া যাইবে। তখন একটু সাবধানে ধুইয়া লইলেই পত্র-কঙ্কাল পাওয়া যাইবে।

১০। পত্রের চিত্র।—ভিন্ন ভিন্ন পত্রের চিত্র প্রস্তুত করিয়া রাখা যাইতে পারে। একখানি কাগজে তেল লাগাইয়া কেরোসিনের বাতির উপর ধর। কাগজে কালি পড়িয়া যাইবে। ঐ কাগজের উপর এক একটী পত্র রাখ ও তাহার উপর আর একখানি কাগজ দিয়া খুব সাবধানে হাত দিয়া চাপ দাও। পত্রে কালি লাগিল। এখন একখান সাদা কাগজের উপর পত্রটি রাখ ও তাহার উপর অন্য কাগজ রাখিয়া হাত দিয়া চাপ দাও। নীচের সাদা কাগজে পত্রের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়া যাইবে।

১১। কাচের ও চীনামাটীর বাসনে জোড়া।—এক চামচ উত্তম চিনি কিঞ্চিৎ ফুটন্ত জলে গুলিয়া লও (রসগোল্লার রসের মত ঘন করিয়া)। বেশ ঠাণ্ডা হইলে মুরগী বা হাঁসের ডিমের শ্বেতাংশের সহিত উত্তমরূপে মিশাও। ভাঙ্গা খণ্ডের মুখে এই আঠা লাগাইয়া দড়ি দিয়া উত্তমরূপে জড়াইয়া রাখ। একদিনেই জোড়া লাগিবে।

রজন বা হলদে রঙের গঁদ ও ইটের সূক্ষ্ম চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া অগ্নির উত্তাপে মিশাইয়া লও। চীনামাটী, সাধারণ মাটী বা পাথরের বাসন ভাঙ্গিয়া গেলে এই আঠাদ্বারা জোড়া যায়।

১২। কাচের পাত্রে পিত্তলের মুখ।—ল্যাম্পের মুখ খুলিয়া গেলে এইরূপ আঠা ব্যবহার করিবে:—কাল রজন ৫ ভাগ ও মোম এক ভাগ আগুনে চাপাইয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লও। উনুনে থাকিতেই অল্প অল্প পেউড়ির গুঁড়া (এক প্রকার হলুদ রঙ—বেণে দোকানে বিক্রয় হয়) মিশাইতে থাকে। যখন কাদার মত হইবে তখন নামাইয়া রাখ। ব্যবহার করিবার সময় গরম করিয়া লইতে হইবে। যে স্থানে লাগাইবে সে স্থানও একটু তাতাইয়া লইবে। পেউড়ির পরিবর্ত্তে খুব মিহি ইটের গুঁড়ও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

১৩। কাঠ জুড়িবার আঠা।—মহিষের শৃঙ্গাদি হইতে শিরিষ নামক এক প্রকার শক্ত আঠা প্রস্তুত হয়। এই আঠা কিনিয়া টুকরা করিয়া কাটিবে ও ১২ ঘণ্টা সামান্য জলে ভিজাইয়া রাখিবে। তারপর ব্যবহারের সময় ঐ জলসমেত পাত্রটী আগুণে চাপাইবে। বেশ তরল হইলে তুলিতে করিয়া তুলিয়া লইবে ও যেখানে লাগাইতে হইবে সেখানে গরম গরম লাগাইয়া জোড়টী বাঁধিয়া রাখিবে। যন্ত্রের বাক্স, হারমোনিয়াম্ প্রভৃতি ছোট ছোট দ্রব্যের পাতলা কাঠগুলি এই আঠাতেই জুড়িয়া দেয়। (অন্য প্রকার) একটু রুটী তৈয়ারির মথা-ময়দা লইয়া এক টুকরা ন্যাকড়ার মধ্যে রাখ। পরে ঐ ন্যাকড়া জলে ডুবাইয়া ময়দাটুকু খুব রগড়াইয়া রগড়াইয়া ধোও। ১০।১২ মিনিট পরে ন্যাকড়া খুলিলে দেখিবে যে ময়দা এক রকম উত্তম আঠায় পরিণত হইয়াছে। এই আঠার সহিত একটু চুণ মিশাইয়া কাঠ জোড়।

১৪। সাবান জল।—ফুঁপড়ী উড়াইবার জন্য উত্তম সাবানের জল প্রস্তুত করিতে হইলে, নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে:—১০ গ্রাম সোডিয়াম ওলিয়েট, ৪০০ কিউবিক সেন্‌টিমিটার পরিশ্রুত শীতল জলে মিশাইয়া লও, তারপর ১০০ কিউবিক সেন্‌টি-মিটার গ্লিসারিণ মিশাইয়া খুব করিয়া ঝাঁকাও। ২।৩ দিন অন্ধকার ঘরে রাখিয়া দাও। পরে ধীরে ধীরে উপরের তরল অংশ ঢালিয়া লইয়া তাহার সহিত এক ফোঁটা তীব্র এমনিয়া মিশাও। অন্ধকারে রাখিয়া দিলে এই আরক অনেক দিন ভাল থাকে। (রস্‌কো)।

যাঁহারা এত আয়োজন করিতে অসক্ত, তাঁহারা সাধারণ গ্লিসারিণ সাবান, জলে একটু ঘন করিয়া গুলিয়া লইবেন। ইহার ভিতর একটা কাচ, কাগজ বা পাটকাঠির নলের এক প্রান্ত দিয়া তাহাতে একটু সাবান গোলা লাগাইয়া লইবেন। নলের অপর প্রান্তে মুখ দিয়া আস্তে আস্তে ফুঁ দিলেই ফুঁপড়ী হইবে।

১৫। কতকগুলি আবশ্যক জিনিষের দাম :—

স্পিরিট ল্যাম্প (সুরাসারের প্রদীপ) ...	১টা	৸০
স্পিরিট (সুরাসার)	৩ বোতল	১৷০
কাচের ফ্লাস্ক (জল বা অন্য পদার্থ গরম করিবার জন্য ছোট কলসীর মত পাত্রবিশেষ)	৩টা	১৶০
কাচের টেষ্টটিউব (জল কি অন্য কোন পদার্থ গরম করিবার জন্য খুব ছোট ছোট গেলাসের মত পাত্র)	১২টা	৵০
কাচের নল (নানা আকারের)	১২টা	৷৶০
ব্যারোমিটার (বায়ুমান যন্ত্র) প্রস্তুতের জন্য কাচের নল ...	১টা	১৲
থারমোমিটার (তাপমান যন্ত্র) প্রস্তুতের জন্য কুণ্ডযুক্ত কাচের নল	১টা	৷৶০
পারদ	...	১
ওজন করিবার নিক্তি	১টা	১।০
সলফিউরিক এসিড (গন্ধক দ্রাবক) ...	৮ আউন্স	৩।০
ফস্‌ফরাস (জলে রাখিতে হয় ; গন্ধকের মত) ...	২ ড্রাম	৷৷০
পটাস ক্লোরেট (ফিটকারীর মত সাদা পদার্থ) ...	৮ আউন্স	।০
ম্যাঙ্গানীজ (কাল গুঁড়া—খনিজ পদার্থ)	৮ আউন্স	।০
দস্তার খণ্ড	...	৵০
ম্যাগনেট (চুম্বক খণ্ড)	২ খান	১৲
পুলী (কপিকল)	৪টা	৷৷০
বটানিকেল লেন্স (বা)	১ খান	২৲
স্থূলমধ্য কাচ (এই কাচের ভিতর দিয়া ছোট জিনিষ বড় দেখা যায়)	১ খান	১৲

মোট ১০।১৫ টাকার বেশী নয়।

যে সকল জিনিষ সহজে পাওয়া যাইতে পারে (যেমন তাড়িতের পরীক্ষার জন্য একখান গাটা পার্চ্চার চিরুণী, একটু ফ্ল্যানেল ইত্যাদি) এই ফর্দ্দে সে সকল জিনিষের উল্লেখ করা হইল না। এই ফর্দ্দলিখিত জিনিষ কলিকাতা ৬৩ নং বোবাজার ষ্ট্রীটে "ইণ্ডিয়ান সায়েনটিফিক এপারেটাস্ কোম্পানীর" দোকানে পাওয়া যাইবে। পদার্থ পরিচয় শিক্ষাদানের চিত্রাদি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটীর (১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার) দোকানে পাওয়া যায়।